"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc kabirul.dmc@gmail.com

ফোন : ৪৬-২৩১৩

চার্বাক সম্প্রদায়

১৯।১ পণ্ডিতিয়া রোড কলকাতা ৭০০০২৯

আগামী ২৭শে নভেম্বর একাডেমি

নতুন নাটক। সন্ধ্যা ৬-৩০ টা

কালকেতু

রচনা : তুষার দে

পরিচালনা : জোছন দস্তিদার

আলো : তাপস সেন

সঙ্গীত : দেবাশিস দাশগুপ্ত

মঞ্চ : শ্যামল সেনগুপ্ত

রূপসজ্জা : রবীন ভট্টাচার্য

অভিনয়ে : চার্বাক সম্প্রদায়ের শিল্পীবৃন্দ

আমন্ত্রণে অভিনয়ের নাটক

পদ্য-গদ্য-প্রবন্ধ। কর্ণিক

ভুতের বেগার

আবহমান পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকার
ইতিবৃত্ত সনাতন। শুধু বাঁচবার উপায়টুকু
বিত্তের স্তর ভেদে ভিন্ন।
এই নাটকের সমাসক্তি মধ্যবিত্ত মানুষকে নিয়ে।
চারিপাশের তুমুল কর্মকাণ্ডে
এদের আপেক্ষিক একটি ক্ষমতা আছে—
যা ব্যবহৃত হয় প্রধানতঃ উচ্চের অভিলাষে,
স্বার্থে।
আর্থিক অসংগতিতে যদিও
এরা নিম্নস্তরেরই আত্মজন, তবু
উর্দ্ধতনের বিদ্যা-বৈভবের প্রতি মধ্যবিত্ত
মানুষের আকাঙ্ক্ষা প্রায় পৌরাণিক ঐতিহ্য।
তাই নিজস্ব স্বার্থে প্রভুমানুষের দল
এদের বাঁচিয়ে রাখতে চায় বিভিন্ন অনুদানে—
সংখ্যাধিক্যের বিপক্ষে।
মাঝে মাঝে রূপকথার হীরেমন পাখীর
দলছুট হ'য়ে যাওয়ার মতো ব্যতিক্রম
ঘটে এইসব মানুষের মধ্যেও। তখন সেই আপাত
নির্জন মানুষটি আক্রান্ত হয়,
শুরু হয় আর এক বেঁচে থাকার গল্প।
হয়ত কোন প্রতিবেশী
তখনও উচ্চের অনুগ্রহপ্রার্থী, কিন্তু
সেই নির্জন মানুষকে বেছে নিতে হয়
আত্মসমর্পণ অথবা আত্মঐশীর
প্রতিষ্ঠা।

২১ এক লেন কলকাতা ৭০০০৩০

কুড়ি বছরের নাট্য আন্দোলনে সংগ্রামী স্মারক

ইউ টি সি

নতুন উদ্যমে পথ চলছে

॥ হাতে রয়েছে ॥

সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় পুরস্কার-প্রাপ্ত এবং পত্র-পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত

যদিও সন্ধ্যা

একাংক 'বিবর্ণ বিস্ময়' যা আটাত্তরে পেয়েছে গণনাতীত পুরস্কার

— — — — — — — হাতে নিয়েছে — — — — — — —

অমল চক্রবর্তীর **প্রতিশ্রুত অভিমন্যু**

রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের **দাস বৃত্তান্ত**

সম্পাদনা / নির্দেশনা : সরোজ রায়

আলো/আবহ	মঞ্চ	সুর
শংকর পালুই	মলয় বক্সী/সুপ্রকাশ সান্যাল	অতিক্রম দাস

✦ উপদেষ্টা ✦

প্রভাত মুখোপাধ্যায় | গৌর দাস

✦ অভিনয়ে ✦

সরোজ রায়, শংকর পালুই, মলয় বকসী, সুপ্রকাশ সান্যাল, স্বপন চক্রবর্তী, প্রশান্ত মুখার্জী, বিভাস সান্যাল, আশীষ রায়, স্বপন দাস, প্রশান্ত ঘোষ, অঞ্জনা পাল।

॥ হাতে নেব ॥

সরোজ রায়ের কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচার / শংকর পালুইয়ের কার্তুজ

: যোগাযোগ :

ইউনিটি থিয়েটার ক্যয়ার ২৬. ভৈরব দত্ত লেন, হাওড়া ৭১১১০৬

এর প্রথম প্রয়াস

বিজন ভট্টাচার্যের একাংক

।। হাঁসখালির হাঁস ।।

ও

।। চুল্লী ।।

আলো / তাপস সেন

সঙ্গীত / অজয় সিংহরায়

মঞ্চ / রবি চট্টোপাধ্যায়

রূপসজ্জা / শক্তি সেন

ধ্বনি / শ্রীপতি দাস

নির্দেশনা / প্রণব চট্টোপাধ্যায়

৩০শে নভেম্বর '৭৮ রবীন্দ্র সদন সন্ধ্যে সাতটায়

টিকিট হলে এক সপ্তাহ আগে

যোগাযোগের ঠিকানা : ৯৩ জি, বেলতলা রোড, কোলকাতা-২৬
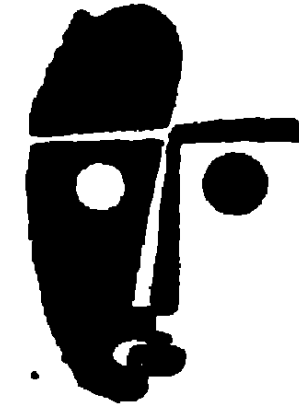
কে উঁচু ? কে নীচু !

জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে নাট্যমন্দিরের নতুন নাটক

অবনী ফিরে আয়

রচনা / প্রয়োগ :

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

নাট্যমন্দির : হংসেশ্বরী রোড। বাঁশবেড়িয়া। হুগলী

পিন : ৭১২৫০২

━━━ মানুষের ━━━ জীবন ━━━
করছে এমন যথেষ্ট সংখ্যক লোক খুঁজে পাওয়া
গেলে বর্তমান ব্যবস্থা বজায় রাখা যেতে পারে
নচেৎ — — — ।

স্বর্গে অনুষ্ঠিত জরুরী সভায় গৃহীত উল্লিখিত
সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তিনজন দেবতা পৃথিবীতে
ভালোমানুষ খুঁজতে এলেন।
বৃষ্টিতে মাথা বাঁচাতে গিয়ে জল পড়ে কয়েকটি
শব্দ মুছে গেছে।

তদন্তকারী দেবতাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে
'নচেৎ' এর পর যে তিনটি ঘর খালি আছে
তিনটি মাত্র শব্দ দিয়ে সেই শূন্য স্থানগুলি
পূরণ করতে হবে।

সেই ব্যাপারে দর্শকদেরও সাহায্যের
প্রয়োজন হতে পারে।

চিরায়ত সংগ্রামী কাহিনীর

সংগ্রাম মুখর চিরায়ত প্রযোজনা

হাওয়ার্ড ফাস্টে'র

নাটক ও পরিচালনা / চিররঞ্জন দাস

আলো / দীপক পাল

আবহ সংগীত / রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়

গীত রচনা / অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের

যোগাযোগ / ১৫৬, নগেন্দ্রনাথ রোড কলকাতা-২৮

১৩এ, ক্রীক লেন, কলকাতা-১৪

……সম্প্রতিকালের চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার
মহাকালীর বাচ্চাটিকে পৃথিবীর বিভিন্ন যাদুঘর
থেকে উচ্চমূল্যে কিনবার জন্যে আবেদন আসছে।
নানা দেশের মানব আচরণ বিশেষজ্ঞ সমাজও
শিশুটিকে চাইছে। দেশের সরকার
জাতীয় সম্পদ হিসাবে বাচ্চাটিকে নিজস্ব
হেফাজৎখানায় কড়া প্রহরায় রেখেছেন।
দ্বিতীয় মহাকালীর বাচ্চার বিপদজনক কার্যকলাপ
ক্রমশঃ গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে।
সরকার সজাগ হচ্ছেন।…

থিয়েটার ওয়ার্কশপ
প্রযোজনা

নাটক : মোহিত চট্টোপাধ্যায়
আলো : তাপস সেন
সঙ্গীত : দেবাশিস দাশগুপ্ত

মহাকালীর বাচ্চা

মেক-আপ : শক্তি সেন
মঞ্চ : রণজিৎ চক্রবর্তী
নির্দেশনা : বিভাস চক্রবর্তী
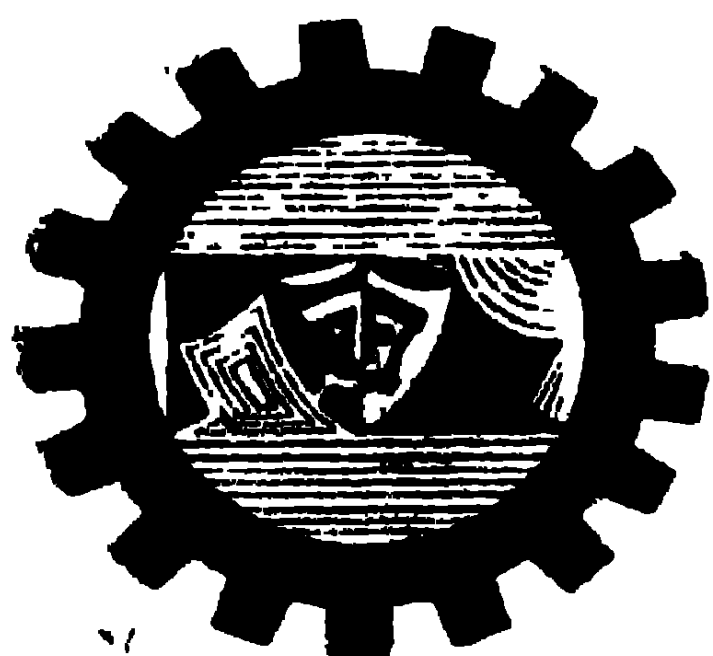
থিয়েটার ওয়ার্কশপ
১১ পাল স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০৪

ক্রান্তিকাল

প্রযোজিত নাটক

প্যান্টোমাইম

রচনা ও নির্দেশনা : নভেন্দু সেন

কয়েকটি পত্র-পত্রিকার অভিমত :

★ 'এই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য বাংলা নাটক···প্যান্টোমাইম'

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

★ 'অদ্ভুত শিল্পশোভন এই প্রযোজনা যা প্রায় কবিতার মত।...
নির্দ্বিধায় বলা যায় প্যান্টোমাইম প্রযোজনা শুধু ক্রান্তিকালের নয়
নতুন নাটকের কাল বদলকেও চিহ্নিত করবে।' —দেশ

★ 'স্বীকার করতে বাধা নেই ক্রান্তিকাল গোষ্ঠির প্যান্টোমাইম ইদানীং
কালের একটি পরীক্ষামূলক বলিষ্ঠ প্রযোজনা' —অমৃত

ক্রান্তিকালের অন্য একটি সাম্প্রতিক প্রযোজনা

সমবেত সওয়াল জবাব

(একাঙ্ক)

নাটক ও নির্দেশনা : নভেন্দু সেন

আঙ্গিক

জীবন এক নাট্যক্রিয়া □ সেই জীবনকে নিয়েই আমাদের নাট্যপ্রয়াস

আমাদের প্রযোজিত নাটক

সত্তর দশক : বিপ্লব যায় না,
বিপ্লব আসে।

আগামী প্রযোজনা

স্বরবর্ণ : 'বুঝেচ জ্যাঠা অ, আ, ই,
অক্ষরগুলো বুলেটের চেয়ে ত্যাজি।'

নাট্যকার : জ্যোৎস্নাময় ঘোষ

মধ্যাহ্ন সূর্য : 'সাহাররা চির-
কালের, সাহাররা চিরকাল থাকবে।

নাট্যকার : সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

নির্দেশনা | নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

আলো : মা খুকু

— অভিনয়ে —

অসীম বসু
অশোক গড়গড়ি
শ্যামল দাস
অমিতাভ কুশারী
সত্যজিৎ চট্টো
তাপস মুখোপাধ্যায়
প্রবীর নাগ
বাবলু মণ্ডল
স্বরাজ ঘোষ

: যোগাযোগ :

৬২, নলিনী বসু রোড
পোঃ কাঁচরাপাড়া
জিলা ২৪ পরগণা
পিন : ৭৪৩ ১৪৫

আঙ্গিকের প্রথম বার্ষিক নাট্যোৎসব ১লা অক্টোবর '৭৮
হাইওমার্স মঞ্চ | সন্ধ্যা ৭টা

যাত্রিকের নতুন নাটক

ভগীরথ ভগীরথ ভগীরথ ভগীরথ ভগীরথ ভগীরথ ভগীরথ ভগীরথ

ভগীরথ

ভগীরথ ভগীরথ ভগীরথ ভগীরথ ভগীরথ ভগীরথ ভগীরথ ভগীরথ

কবিগুরুর । ছুটি

ফাঁসি (একাঙ্ক) । সগো সোন্‌সকিতি (ঐ)

যাত্রিকের ১৬ বর্ষ নাট্য প্রতিযোগিতা শুরু ০ ২০শে জানুয়ারী '৭৯
নাম দেবার শেষ তারিখ ০ ১লা নভেম্বর হতে ১৫ই ডিসেম্বর '৭৮
এর মধ্যে। মাত্র ৩০টি সংস্থাকে নেওয়া যাবে।

— — — — — — — — — — — — — — — —

পুরোনো নাটক যাত্রিক আজও অভিনয় করছে

গঙ্গা তুমি বইছ কেন ০ বিলাসী ০ ডালিয়া ০ অভাগীর স্বর্গ
বাতাসে বারুদের গন্ধ ০ আমার জননী ০ এক যে ছিল রাজা

নাটক । রবীন্দ্র ভট্টাচার্য   প্রয়োগ । নিখিল ভট্টাচার্য

সহকারী

সুব্রত সান্যাল । বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দৃশ্য । প্রতুল কুণ্ডু   সংগীত । জগবন্ধু চক্রবর্তী
অঞ্জন দে   অরুণ ভট্টাচার্য

আলো । সঞ্জয় ভট্টাচার্য

যাত্রিক : ঠাকুরপাড়া রোড, নৈহাটি : ২৪ পরগণা

উচ্ছিন্ন মুণ্ডাজাতির মুক্তি সংগ্রামের নায়ক
ধরতিআবা বীরসা মুণ্ডার একশো বছর পূর্তিতে :

প্রতিকৃতির নিবেদন

নাটক ও নির্দেশনা | আলোক দেব

প্রতিকৃতি/১১সি সর্দার এভিনিউ, কলকাতা ৭০০০৩৭

ইয়ুথ সেণ্টার

অমল চক্রবর্তী ও সুভাষ রাহার নির্দেশনায়

রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ও অঙ্কুর

গণসংস্কৃতির পক্ষে আরও নাটক চলছে

সমর দত্তের

ডাইনোসেরাস

বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

এ ক টি অ বা স্ত ব গ ল্প

কমল ভৌমিক, সম্পাদক, ইয়ুথ সেণ্টার
১৮ শীতলাবাড়ি রোড ব্যারাকপুর চন্দনপুকুর ২৪ পরগণা

কালপুরুষ (নর্থ) ॥ নাটক করছে, করবে

কালপুরুষ (নর্থ) ॥ বিবর্ণ বিস্ময়

কালপুরুষ (নর্থ) ॥ শতাব্দীর পদাবলী

কালপুরুষ (নর্থ) ॥ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এবং দোদুলদোলা

কালপুরুষ (নর্থ) ॥ না হয় হয় না

কালপুরুষ (নর্থ) ॥ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান

কালপুরুষ (নর্থ) ॥ রাধারমণ ঘোষের নাটক

কালপুরুষ (নর্থ) ॥ রাধারমণ ঘোষ ও
অনিল ভট্টাচার্যের পরিচালনা

কালপুরুষ (নর্থ) ॥ ১১।১ ঘোষপাড়া লেন, হাওড়া ৬

কালপুরুষ (নর্থ) ॥ শারদ-অভিনন্দন জানাচ্ছে

সুন্দরম প্রযোজনা

সোস্যাল স্যাটায়ার হিসেবে সাজানো বাগানের বিষয়বস্তুর বিন্যাসের মধ্যে সমকালীনতা বজায় রেখে এমন একটা চিরকালীন শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে যেটাকে ধরে রাখার জন্যই আমাদের এই বামমার্গীয় গ্রুপ থিয়েটারগুলির এত সাধনা ॥ —গ্রুপ থিয়েটার / মে-জুলাই ৭৮

আবহ•দেবাশিস দাশগুপ্ত। আলো•অমল রায়। মঞ্চ•অজয় দত্তগুপ্ত। রূপকল্পনা•অনন্ত দাস। রূপসজ্জা•অজয় ঘোষ

নাটক ও নির্দেশনা

মনোজ মিত্র

সুন্দরম্ ৫৭ যতীন দাস রোড কলকাতা-২৯
ফোন ৪৬-৩১৩৫ (সন্ধ্যা সাতটা থেকে নটা)

২

জনগণের সংগ্রামী-নাট্যচেতনার ত্রৈমাসিক

সমবেত শিল্প নিয়ে সমবেত প্রতিরোধ

প্রথম বর্ষ। (শারদীয়া সংখ্যা) ১৯৭৮

কবিতা

করাঘাত। উৎপল দত্ত/৩০

পূর্ণাঙ্গ নাটক

মন্থন। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়/১২২-১৮৬
ফেরার। চিত্তরঞ্জন দাস/২১৩-২৬২
সমবেত সওয়াল জবাব। মলেন্দু সেন/২৬৩-২৯৭
প্রস্তুতি। নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত/২৯৮-৩৩৯

একাঙ্ক নাটক

লোহিত কণা। স্বরূপ ব্রহ্ম/৬১-৭৮
সেই সুর। সোমনাথ চৌধুরী/৭৯-৯৮
বাতাসে বারুদের গন্ধ। রবীন্দ্র ভট্টাচার্য/৯৯-১২১
গেরিলা স্কোয়াড। অমল রায়/১৮৭-২১২
আগুনে হাত রেখে। অমর গঙ্গোপাধ্যায়/৩৪৩-৩৬৩

বিজন ক্রোড়পত্র

বিজন ভট্টাচার্য : জীবনের রূপরেখা/৩৪১-৩৪২
আগুনে হাত রেখে। অমর গঙ্গোপাধ্যায়/৩৪৩-৩৬৩
গণনাট্য ও নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য। সুধী প্রধান/৩৬৪-৩৮৯
বিজন ভট্টাচার্য : ষাট সত্তরের নাটক। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়/৩৯০-৩৯২

প্রবন্ধ-আলোচনা-স্মৃতি-সমালোচনা

আহ্বান ব্যর্থ হয় নি। সম্পাদকীয়/২৭-২৯
আবার আহ্বান। সম্পাদকীয়/২৯
বেইমান স্মৃতি। শোভা সেন/৪৬-৪৮
গণনাট্যের আদর্শে গ্রুপ থিয়েটার। কল্পতরু সেনগুপ্ত/৩১-৩৫
থিয়েটারে আন্দোলন। দর্শন চৌধুরী/৩৬-৪৫
গ্রুপ থিয়েটার : গণনাট্য ও স্বাধীন থিয়েটারের মুখে। রবীন্দ্র ভট্টাচার্য/১৯-২২
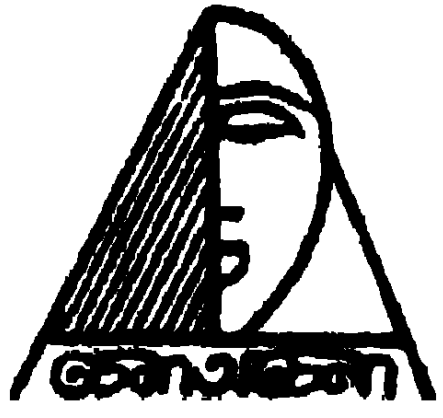
চলছে চলবে — দুঃসাহসী নাটক

নতুন ডাইনোসর নাটক

নাটক/প্রয়োগ সমর দত্ত

নাটক ॥ মহাশ্বেতা দেবী

নির্দেশনা সমর দত্ত

আয়না / একক অভিনয়ে / সুলেখা রায়

অংশগ্রহণে / বিজয় দত্ত • সুবল ব্যানার্জী • সুধীর মিত্র • রণজিৎ মিত্র • বিনয় সাহা • কল্লোল মুখার্জী • সুপ্রতীক সুর • ধ্রুব ব্যানার্জী • লক্ষ্মী সাহা • শংকর দাস • অনিল চক্রবর্তী • শ্রীকান্ত সাহা • মিহির মোদক • মাঃ কচি • তাপস মজুমদার • দিলীপ সেন • সুলেখা রায় ও সমর দত্ত এবং আরও অনেকে।

আমন্ত্রিত অভিনয়ের জন্য : ২৩।৩৩ গড়িয়াহাট রোড। কলি-২৯

গ্রুপ থিয়েটার : শিল্প ও সামাজিক দায়িত্ব। মোহন দস্তিদার/৫৩-৫৭
গ্রুপ থিয়েটার এবং তার দর্শক জনগণ। সুশান্ত রায়/৫৮-৬১
তিতাস মাঝির সমুদ্র যাত্রা। সমীর ঘোষ দস্তিদার/৩৯৩-৩৯৫
মহাকালীর বাচ্চা : একটি গবেষণার বিষয়। দীপেন্দু চক্রবর্তী/৩৯৬-৪০০
মধ্যবিত্তের প্রস্তুতি। নিখিলরঞ্জন দাস/৪০০-৪০৪
নান্দীমুখের পাপ : নান্দীমুখের পুণ্য। চিররঞ্জন দাস/৪০৪-৪১০
রবীন্দ্রনাথের বদনাম : গন্ধর্বর বদনাম। বসন্ত রায়/৪১০-৪১৩
কুম্ভকর্ণের ঘুম। রঞ্জন দাস/৪১৩-৪১৪
নানা হে। রঞ্জন দাস/৪১৫-৪১৬
প্রতিযোগিতা মঞ্চের নাটক। বিশ্বরঞ্জন দাস/৪১৬-৪২৫
চিঠিপত্র। পম্পু মজুমদার শশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী অমিতাভ রায়/৪২৬-৪২৭
গ্রুপ থিয়েটারের তালিকা : কলকাতা, মফঃস্বল ও প্রবাস/৪২৮-৪৩৮

আলোকচিত্র

প্রস্তুতি পাপপুণ্য মহাকালীর বাচ্চা / নিমাই ঘোষ

১. থিয়েটার কমিউনের প্রস্তুতির প্রথম দৃশ্যে সুজিত মুখোপাধ্যায়।
২. প্রস্তুতির এক নাটকীয় মুহূর্তে গবাক্ষবন্দী সুজিত মুখোপাধ্যায় ও সরস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩. প্রস্তুতির অন্য দৃশ্যে মণিদীপা রায় সরস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায় নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত ও সুব্রত ভট্টাচার্য।
৪. নক্ষত্র (বোকারো)-র সমবেত সওয়াল জবাব-এ তপন ভদ্র তপন বসু অসিত কানুনগো ও আশিস রায়।
৫. ক্রান্তিকাল (সোদপুর)-র সমবেত সওয়াল জবাব-এ পার্থ চ্যাটার্জী ও অন্যান্য শিল্পী।
৬. থিয়েটার ওয়ার্কশপের মহাকালীর বাচ্চার 'চলো সোনাকুঠি গ্রামে চলো'র দৃশ্যে রাম মুখোপাধ্যায় অশোক মুখোপাধ্যায় অমিয় মুখোপাধ্যায় শরদিন্দু রায় রণজিত চক্রবর্তী এবং অন্যান্যরা।
৭. নান্দীমুখের পাপপুণ্য-র এক চরম মুহূর্তে রঞ্জিত চক্রবর্তী অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামলী ঘোষ।
৮. গন্ধর্বর বদনাম-এর এক দৃশ্যে দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুকুর ভট্টাচার্য।
৯. বদনাম-এর ক্লোজআপে মুকুর ভট্টাচার্য জগন্নাথ হালদার ও কল্পনা মুখোপাধ্যায়।
১০. বদনাম-এর অন্য দৃশ্যগুলিতে কল্পনা মুখোপাধ্যায় সুধাংশু মৈত্র মিন্টু চৌধুরী জগন্নাথ হালদার শিবাজী সেন দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১১. চেনা-অচেনা (চন্দননগর)-জিওর্দানো ব্রুনো-র এক দৃশ্যে সময় দত্ত ও অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ।
১২. যাত্রিক (নৈহাটি)-এর গঙ্গা তুমি বইছ কেন-র এক দৃশ্যে যাত্রিকের শিল্পীদ্বয়।
১৩. কল্লোল (চুঁচুড়া)-র লোহিতকণায় 'মারুন, যত পারেন মারুন, তারপরেও উঠে দাঁড়াব'-র নাট্য-মুহূর্তে পরিতোষ বসু কুণাল সেন ও পঙ্কজ ব্যানার্জী।

স্কেচ
বিজন ভট্টাচার্য : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট : অজয় গুপ্ত

সম্পাদক : নৃপেন্দ্র সাহা
সংযুক্ত সম্পাদক : রমন মহেশ্বরী
কার্যকরী সম্পাদক : নিখিলরঞ্জন দাস / সহযোগী সম্পাদক : রবীন্দ্র ভট্টাচার্য
সহ-সম্পাদক : পরিতোষ বসু ও সুশান্ত রায়

নটসেনার কেলেংকারিয়াস ও

ল্যাকডিভোরিয়াস হাসির নাটক

রচনা ও পরিচালনা

সরোজ রায়

●

ভারতীয় নাট্যজগতে

ট্রেলার পদ্ধতির প্রথম প্রয়োগ

●

প্রগতিশীল হাসির নাটক সম্বন্ধে

নির্বোধ ব্যক্তিদের

প্রবেশ আপত্তিজনক

কল্‌-শোয়ের জন্যে

ডিসেম্বরের পর তারিখ আছে

পুজোতে দশদিন বোম্বাই সফর শেষে আবার

মাইম এ্যাকাডেমী মঞ্চে

৫ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬-৩১

আহ্বান ব্যর্থ হয় নি

আহ্বান ব্যর্থ হয় নি। অংশগ্রহণের আহ্বান। জনগণের সংগ্রামে অংশ-গ্রহণের আহ্বান। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ—আমাদের মাদার অর্গানাইজেশন—এ আহ্বান জানিয়েছিলেন দেশের সমস্ত স্তরের গণতান্ত্রিক শিল্পীসাথীদের, গ্রুপ থিয়েটারের সংগ্রামী বন্ধুদের, শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর। বাস্তবের সংগ্রামের পাশে দাঁড়ানোর এ আহ্বান যুগপৎ আমাদের প্রথম প্রকাশের সময়েও ঘোষণা করেছি আমরা। বৈজ্ঞানিক সমাজবাদে আস্থা রেখে লক্ষ্য ও পথের বিশ্লেষণ যখনই সঠিক হয় তখনই পরিস্থিতির মোকাবিলায় দেশের নানা কোণে—আমরা সবাই যে একই অভিজ্ঞতার শরিক একই ভাবনার সহযাত্রী—এ যোগাযোগ তারই এক উজ্জ্বল উপলব্ধি। আর এইরকমই এক উজ্জ্বল উপলব্ধির সংগ্রামী অভিজ্ঞতা—সমবেত ঐক্যের এক দীপ্ত অনুভব—রচিত হলো সেদিন কার্জন পার্কের ঈশান কোণে লেনিন মূর্তির পাদদেশে। কলে কার-খানায় মালিক গোষ্ঠীর সৃষ্ট লে-অফ লক-আউটের বিরুদ্ধে লড়াকু শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের প্রতি শিল্পীদের সংহতি জ্ঞাপনের জন্য, আরো অন্যান্য স্তরের শিল্পী সাহিত্যিক কলাকুশলীদের সঙ্গে আমরা, সমবেত শিল্পের অংশীদাররা, সেদিন সমবেত হয়েছিলাম ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সংগ্রামী অভিজ্ঞতার রক্ত রঙীন পতাকার তলায়।

'গণতান্ত্রিক শিল্পী সাহিত্যিক কলাকুশলী ও মেহনতী মানুষের ঐক্য জিন্দাবাদ' স্লোগানে মুখরিত হলো সেই ৮ই অগাস্টের ঐতিহাসিক শিল্পী সমাবেশ। মিলিত কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন আমাদির পথপ্রদর্শক গণশিল্পীরা: এসো সমিতির সাম্যে ও ঐক্যে/এসো জনতার মুখরিত সখ্যে/এসো দুঃখ তিমির ভেদি দুর্গম ধ্বংসের নিষ্ঠুর ভয় করি চূর্ণ...

আহ্বান ছিল স্বৈরতন্ত্রের চক্রান্তকে চূর্ণ করার। বহু কষ্টার্জিত গণতান্ত্রিক অধিকারকে রক্ষা করার। বাম ঐক্যের দুর্গকে সুরক্ষিত করার। আহ্বান ছিল—শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে কৃষিমজুরের স্বার্থে দাবিদাওয়ার লড়াই যখনই তুঙ্গে উঠেছে, পুঁজিপতি স্বার্থের ভারবাহীরা তখনই উপর্যুপরি আক্রমণ হানছে ছাঁটাই ক্লোজার লে-অফ লক-আউটের মারণ-তাড়নে—একে প্রতিহত করার। আহ্বান ছিল বাম গণতান্ত্রিক ঐক্যের দৃঢ় ভিত্তির ওপর সংসদীয় পথে সীমিত সামর্থ্যের জনগণের সরকারকে ছত্রভঙ্গ করানোর পুঁজিপতি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার।

এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে কার্জন পার্কের ঈশান কোণের সমবেত শিল্পীরা

মিছিলে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন ঐক্যের বন্ধনে। মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের লেলিহান অগ্নিশিখার শহীদ বেদীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে পৌছালো কলেজ স্কোয়ারের একদা কর্তিত-মস্তক বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে। বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনার ঘৃণ্য চক্রান্তের অপ-সংস্কৃতির শিকার বিদ্যাসাগরের এই মূর্তিকে সাক্ষ্য মেনে ধিক্কারে গর্জে উঠেছিল সুস্থ সংস্কৃতির স্রষ্টা সেই মিছিল।

সেই মিছিলের অংশীদার ছিলাম আমরা—কলকাতা ও মফঃস্বলের শতাধিক গ্রুপ থিয়েটার।

এই সব গ্রুপ থিয়েটার, যারা তাদের প্রযোজিত শিল্পকর্মের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাশিস্ত শাসকচক্রের মুখোশ খুলে দিয়েছে বারবার, বিভিন্ন নাট্যকর্মের মাধ্যমে জনগণের অধিকার রক্ষার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে গেছে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের লক্ষ্যে অবিচল থেকে; আজ তারা তাদের থিয়েটার-শিল্পের পাদপীঠ ছেড়ে নেমে এসেছে বাস্তবের কঠিন সংগ্রামের পথে। তাদের নাটকের চরিত্রগুলির মতই আজ তারা দৃপ্ত ভঙ্গিতে মিছিলে সামিল। শোনা গেছে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে কম্বু কণ্ঠের কোরাস: ট্রুথ উইল মেক আস ফিল সাম ডে। ও ডীপ ইন মাই হার্ট। আই ডু বিলিভ। উই শ্যাল ওভারকাম সাম ডে···

এই ওভারকাম করার শপথে দীপ্ত শত কণ্ঠের শিঞ্জিত মিছিল দেখে মনে হয়েছে, আমরা যারা এখনো এই সংগ্রামের আহ্বানে সাড়া দিই নি, শিল্পের শুচিতায় রাজনীতিকে পরিহার করে ব্যষ্টি চিন্তাকেই বড় করে মনে মনে লালন করেছি—ভেবেছি শিল্পীর কাজ শিল্প রচনার মাধ্যমে বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করা—সংগ্রামের ময়দানে সামিল হওয়ায় নয়—তারা যে শ্রেণী বৈরিতাকেই আশ্রয় দিচ্ছেন প্রকারান্তরে তাতে কি কোন সন্দেহ আছে। গণ সংগঠনের, গণ আন্দোলনের লড়াইয়ের স্তরগুলিকে অস্বীকার করে কোনদিনই বড় লড়াইয়ের রণাঙ্গনে যে পৌছানো যায় না এ সত্য মার্কসীয় দৃষ্টিকোণে গড়া আমাদের বয়ঃকনিষ্ঠ শিল্পীবন্ধুটিরও অজানা নয়। কিন্তু তবু মধ্যবিত্ত সুলভ মানসিকতার অজীর্ণ উদ্‌গার করতে করতে এখনো বহু শিল্পীবন্ধু, একদা যাঁরা গণশিল্পের মঞ্চ আলো করেছিলেন, বিচ্ছিন্ন হয়ে যারা চলে গিয়েছেন প্রতিষ্ঠার মোহে, যশের মোহে অর্থের মোহে এবং আজও বিচ্ছিন্ন রয়েছেন বা থাকতে চাইছেন তাদের অবগতির জন্য জানাই নিজেদের এই পিছুটানকে—পশ্চাদগামী মনোভাবকে ওভারকাম করে এগিয়ে আসুন। নিজেদের উপরে উঠবার সিঁড়িটাকে শিল্পস্বর্গের নন্দন কাননের সিঁড়ি ভাববেন না—কারণ স্বর্গটা শূন্য—শূন্যে লম্বমান সিঁড়ি যে কোন সময়েই ভারসাম্য হারিয়ে ভূতলশায়ী করে ফেলবে আপনার আমিত্বটাকে। সহস্রমুখী অঙ্গুলি সংকেতে আমাদের এই ভারতবর্ষের বুর্জোয়াশক্তি যতই কেন না প্রলুব্ধ করুক, ভীতিসঞ্চার করুক আপনার আমার আমিত্বটাকে—উটের মত

বালিতে মুখ গুঁজে যদি মরুঝড়ের প্রকোপ থেকে বাঁচতে চান তো বাঁচতে পারেন—কিন্তু বিপ্লবের যে শিশুটা জন্ম নিতে চলেছে তাকে কি বাঁচানোর দায়িত্ব নেই আপনার আমার ওপর? শিল্পের ঐ স্বর্গের সিঁড়িটাই বড় না কি নবজাতকের জন্মের পরিবেশ রচনাতেই উৎসর্গীকৃত হবে আপনার আমার এই শিল্পী-আমিটা?
আমাদের থিয়েটারের শপথ যদি সংগ্রামের থিয়েটারের শপথেই শেষ না হয়ে যায়, যদি শ্রেণীহীন সমাজবাদের পিপল্‌স থিয়েটার করেই একে গড়তে চাই—তাহলে আগামী দিনের আরো কঠিন সংগ্রামের জন্য আমাদের এখন থেকেই তৈরী হতে হবে। জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বান উপেক্ষা করে বুর্জোয়া শিল্পের মরুবালুতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে পারি না। সংগ্রামের আহ্বানে সাড়া আমাদের দিতেই হবে—আজ যারা এগিয়ে আসতে পারি নি, আগামীকাল এগিয়ে আসবো। এ বিশ্বাস আমাদের আছে—কারণ ইতিহাসের শিক্ষা—সংগ্রামের সঠিক বিশেষণে সঠিক আহ্বান কখনোই ব্যর্থ হয় না।

আবার আহ্বান

এক কর্তব্য শেষ হতে না হতেই আবার এক সামাজিক কর্তব্যের আহ্বান আমাদের সামনে এসে উপস্থিত। একই বছরে পরপর তিনবার বন্যা হয়ে গেল এই সেদিন। পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি জেলা মুর্শিদাবাদ বর্ধমান মেদিনীপুর হাওড়া হুগলী সবে জলের তলা থেকে উঠে ডাঙার মুখ দেখেছে। পশ্চিমবঙ্গে সর্বস্তরের শিল্পীরাও বন্যাত্রাণে পথে নেমে পড়েছিলেন ভিক্ষার ঝুলি হাতে। জনসাধারণের দানে ভরে উঠেছিল সে পাত্র। মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে ভিক্ষালব্ধ সে অর্থ তুলে দিতে না দিতেই আবার আরো এক ভয়াবহ বন্যার প্রকোপে পশ্চিমবঙ্গের সাত সাতটি জেলার কয়েক লক্ষ মানুষ বানভাসি হয়ে পড়লেন। শুধু তাই নয়, শতাব্দীর রেকর্ড বৃষ্টিতে গত ৩৬ ঘণ্টায় সমগ্র দেশ থেকে শহর কলকাতা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এই লেখা পর্যন্ত সেই অবিরাম বৃষ্টির বিরাম নেই—ইতিমধ্যেই কল্লোলিনী কলকাতার বুকে ৩৭০.১০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়ে গেছে। এখনো আকাশ ঘন কালো মেঘে আচ্ছন্ন। আমাদের দপ্তরের সামনের রাস্তা এই পার্ক ষ্ট্রীটের পূর্বাংশ আর সার্কুলার রোডের কতকাংশ জলের তলায় ডুবতে ডুবেও ডোবে নি। আমাদের ছাপাখানা—সেই সুকিয়া ষ্ট্রীট এখনো মানুষ প্রমাণ জলের তলায়। রেল তার টেলি, প্রায় সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। কলকাতাসহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এমন অভূতপূর্ব বানভাসি অবস্থা পশ্চিমবঙ্গবাসীর জীবনে যে দুর্যোগ এবং দুর্দিন নিয়ে এসেছে, তাকে মোকাবিলা করার জন্য অবিলম্বে আবার আমাদের সামূহিক ঐক্যে কাজে নেমে পড়তে হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই। দরকার কেবল অসীম মনোবল নিয়ে তাকে মোকা-বিলা করে জনগণের দুর্গতি লাঘবের চেষ্টা করা।

●

উৎপল দত্ত

করাঘাত

রোজ রাত্রে কে যেন এসে দরজায় দেয় ঘা
ধড়মড় করে ছুটে গিয়ে খুলে দেখি সব ভোঁ ভাঁ—
ততক্ষণে পাশের দোরে আরম্ভ করাঘাত
এমনি চলে ঘর থেকে ঘরে অশান্ত সারারাত।
একদিন আমি ওৎ পেতে থাকি আজকে যা হয় হোক
কলার চেপে ধরবো তাকে দেখবো কেমন লোক।
ধরা পড়ে একটু যেন লজ্জা-লজ্জা মুখে,
বললো সে, 'আছেন বুঝি তোফা মনের সুখে?'
মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়ে এসব ব্যক্তিগত প্রশ্ন।
নানা কথায় ক্রমেই আমি হতে থাকি উষ্ণ।
হঠাৎ এক গোঙানির মত দীর্ঘশ্বাস,
চামড়ার জ্যাকেট ঢাকা বুকে পাঁজরের নিঃশ্বাস,
দস্তানামোড়া হাতে সে দু'বার চাপড়ালো কপাল
সিগারেট ফেলে দিয়ে বললো, 'মাল হবে, মাল?
না, নিতান্ত ক্লান্ত বলেই চাইছি মাদক।
আপনারা যাঁরা নিশ্চিন্ত নিদ্রার সাধক,
তাঁরা ঠিক বুঝবেন না আমি কত লাইট ইয়ার হাঁটি,
একটা দ্বীপও তো নেই, তাই উদ্‌ভ্রান্ত খাটি।
সভ্যতার যেসব আবিষ্কার—
যথা লিফট্, জেট প্লেন, মোটর কার,
এসবে আমার নেই অধিকার।
তবু দিনের চৌকিদার আমি কর্তব্য করে যাই,
দুহাতে রাত্রি সরিয়ে ভোর ছটা বাজাতে চাই।
আবার ঘড়ি নেই কিনা হাতে
তাই ভুলক্রমে এসে পড়ি রাতে।
বলিহারি ঘুম যাহোক, ভাঙবে যে কবে?
আচ্ছা চলি, সরি, আবার দেখা হবে।'
চে-গুয়ে ভারার মতন বেরে টুপি ডান কান ঘেঁষে,
ঢ্যাঙা পায়ে এগিয়ে গেল বিচিত্র বেশে।
দেখি যেখানে দাঁড়িয়েছিল আমার রাত্রির ত্রাস
সেখানে অগ্নিদগ্ধ মাটি আর বিবর্ণ ঘাস।
সূর্য এসেছিল আঁধারে-পথ-হারা গেরিলার সাজে
পিঠে মেসিন গান, যাচ্ছে রোজকার কাজে।

কল্পতরু সেনগুপ্ত

গণ নাট্যের আদর্শে গ্রুপ থিয়েটার

নাটকের জন্য প্রাণ দেবার ঘটনা আমাদের দেশে নতুন নয়। এ দেশে বহু যুবক নাটক অভিনয়ের অধিকার রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন। কথাটা শুনতে বিস্ময় জাগে। নাটক ও গান আনন্দের ব্যাপার, সাধারণের ধারণায় শিল্পীরা সমাজের সৌখীন অংশ, অথচ নাটক অভিনয় করতে আর গান গাইতে গিয়ে কত যুবক প্রাণ হারিয়েছেন, জেলে আটক হয়েছেন, কত তরুণী লাঞ্ছিতা হয়েছেন! কেবলমাত্র সত্তর দশকে সন্ত্রাসের সময়ের ব্যাপার নয়, গণনাট্য সংঘের প্রারম্ভ কাল থেকে এই আক্রমণ ঘটে আসছে। গণনাট্যের কর্মীরা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে গ্রাম গ্রামান্তরে অভিনয় করতে গান গাইতে গেছেন। কেউ বন্দুকের গুলিতে, কেউ গুপ্ত ঘাতকের ছুরিতে কেউ বোমায় লুটিয়ে পড়েছেন। তার পরে এসেছে পুলিশ। হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার না করে ধরে নিয়ে গেছে গণনাট্য সংঘের আহত কর্মীদের। চল্লিশ দশকে গণনাট্য সংঘের কর্মী সুশীল মুখোপাধ্যায় এবং সমর্থক ভবমাধব ঘোষ ডিক্সন লেনের এক বাড়িতে শত্রুর অতর্কিত আক্রমণে নিহত হয়েছেন। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ও চারুপ্রকাশ ঘোষের বাড়িতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার যুব প্রতিনিধিদের সম্মানে এক অনুষ্ঠানে রাত্রির অন্ধকারে এই আক্রমণ ঘটেছিল। আক্রমণকারীরা বিদ্যুৎ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে স্টেনগান নিয়ে আক্রমণ করে। এই হত্যাকারীদের পরিচয় গোপন থাকে নি, কংগ্রেস শিবিরে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীর ভূমিকায় তাদের বারবার দেখা গেছে। আসামে গণনাট্য শিল্পী বীণা বোরা এবং এলাহাবাদে গণনাট্য সংঘের সেক্রেটারী সুভাষ মুখার্জী পুলিসের গুলিতে নিহত হন। এই ঘটনাগুলি স্বাধীনতার আগে ঘটেছে। স্বাধীন ভারতে আক্রমণটা আরো ব্যাপক হয়ে উঠেছিল। সদ্য স্বাধীন দেশের সরকার গণনাট্য সংঘের প্রতি এমন ব্যবহার করল যেন একটি বেআইনি

ঘোষিত সংস্থা। কত গণনাট্য কর্মীকে জেলে আটক করল, কত নাটকের অনুষ্ঠান পুলিশ ভেঙে দিল, কোথাও ১৪৪ ধারা জারী করে, কোথাও বলপ্রয়োগ করে অনুষ্ঠান হতে দিল না।

গণনাট্য সংঘের কী অপরাধ? সাম্রাজ্যবাদী আমলে যেমন এই নাটকের দলটিকে সহ্য করা হয় নি, স্বাধীন ভারতের শাসকদলও এঁদের সহ্য করলেন না। অথচ এই নাটকের দলটি এবং এঁদের সমভাবাপন্ন দলগুলি মানুষের দুর্দিনে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, দুর্ভিক্ষে এবং বন্যার সময় দুঃস্থের সেবাব্রত গ্রহণ করেছেন, ধর্মঘটের সময় এবং কারখানা ক্লোজারের সময় শ্রমিকের পক্ষে উপস্থিত হয়েছেন। কৃষকের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে গ্রামে গিয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। গণনাট্য সংঘের অপরাধ কী তার জবাব এই ভূমিকা দেখে বোঝা যাচ্ছে। গণনাট্য সংঘ শোষিত মানুষের সহযাত্রী—মেহনতি মানুষের সাংস্কৃতিক সংস্থা। সুতরাং বুর্জোয়া-জমিদাররা এই সংস্থাকে তাদের শত্রু মনে করবে এটা স্বাভাবিক। বুর্জোয়া-জমিদারদের প্রতিনিধি কংগ্রেস ত্রিশটি বছর রাজ্যে ও কেন্দ্রে মন্ত্রিসভা গঠন করেছে—শ্রেণীস্বার্থে গণনাট্য আন্দোলনকে সহ্য করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তার কারণ আমরা জানি। সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। এই সমাজ শ্রেণীবিভক্ত। শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমাজের বিবর্তন সাধিত হচ্ছে। আর্থ-রাজনৈতিক এই দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক-ভাবে শিল্প সংস্কৃতি সাহিত্যে প্রতিফলিত হচ্ছে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শিল্প-সংস্কৃতি শ্রেণীস্বার্থের সঙ্গে যুক্ত। যখন যে সমাজব্যবস্থা এবং সমাজে যে শ্রেণীর আধিপত্য, তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় শিল্প ও সাহিত্য। সংস্কৃতির বিকাশের ধারা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় কী চাতুর্যের সঙ্গে সমাজ পরিচালকরা শিল্পকে প্রচার কাজে ব্যবহার করছে তাদের পক্ষে। যদিও শিল্পের বনিয়াদ লোকজীবন, এবং শোষিত মানুষের শ্রমে তার সৃষ্টি সাধিত হয় বলে জীবন সংগ্রামের রূপ তাতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু সমাজ চালকরা নিপুণভাবে তাকে আড়াল করে শিল্পের বিশুদ্ধতার দোহাই দিয়ে। এই সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেও দেখা যায় কোন কোন শিল্পী সাহিত্যিক সমাজের আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামো ও ভিতরকার দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করে সমাজ পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবিতাকে স্পষ্ট করে তোলেন, পরিবর্তনের পক্ষে কথা বলেন। তাঁদের শিল্পকর্মে মানবতা সর্বোচ্চ স্থান লাভ করে এবং নিপীড়িত মানুষের জয়ধ্বনি ঘোষিত হয়। তাঁরা কালজয়ী শিল্পী সাহিত্যিকের মর্যাদা লাভ করেন এবং তাদের শিল্প সাহিত্য প্রেরণা দান করে মানবমুক্তির সংগ্রামে। এই বাংলাদেশে জাতীয় নাট্যমঞ্চের চিন্তার সূচনা হয়েছিল নির্যাতীত মানুষের পক্ষ অবলম্বন করে—দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক অভিনয়ে। যে নাটক আজো মানুষকে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রেরণা দেয়। পরবর্তীকালে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ও আন্দোলনের ধারাপথে বাংলার

নাটক সহযাত্রীরূপে চলার চেষ্টা করেছে। বাংলার নাট্য জগতের যোগ্য উত্তরাধিকারীরূপে গণনাট্য সংঘের উদ্ভব। নাট্যমঞ্চের চরম সংকট মুহূর্তে গণনাট্য সংঘ বাঁচার পথ দেখিয়েছে। উপস্থিত হয়েছে এক নতুন মর্মবাণী নিয়ে। সে বাণী বিপ্লবী মানবতাবাদের,—সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী শিল্প চেতনার। গণনাট্য সংঘের 'নবান্ন'নাটক বাংলার নাট্যমঞ্চে নতুন শিল্প চেতনা জাগিয়েছে,নবজীবনের গান আশা ও প্রেরণা জাগিয়েছে। সংস্কৃতির বিকাশপথে গণনাট্য সংঘ এমন এক আন্দোলন সৃষ্টি করল যা সুস্থ জাতীয় সংস্কৃতি রূপে জনসাধারণের কাছে বরণীয় হয়ে উঠেছে। আর গণনাট্য আন্দোলনের শরিক হয়েছে অসংখ্য নাট্যগোষ্ঠী। যারা দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত, শ্রেণী সংগ্রামে সচেতন, মেহনতি মানুষের সংগ্রামে সাথী। নাট্য আন্দোলনের এই শ্রেণী সচেতন ধারাকে বাধা দেবার চেষ্টা হয়েছে বার বার, বিভ্রান্ত কবার চেষ্টা করেছে নানাভাবে, কিন্তু শাসকদল এবং তাদের তাঁবেদার সংস্কৃতি ব্যবসায়ীরা এবং দুর্বল মনের তথাকথিত প্রগতিশীলেরা ব্যর্থ হয়েছে। জনগণের সংস্কৃতির পতাকাকে উর্ধে তুলে ধরেছে গণনাট্য সংঘ ও সহযাত্রী নাট্যগোষ্ঠীগুলি।

কংগ্রেসী শাসকদল এই ব্যর্থতার প্রতিশোধ নিয়েছে সত্তর দশকে। বামপন্থী রাজনৈতিক শক্তির ঐক্য এবং যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনে ভীত বুর্জোয়া-জমিদাররা আক্রমণ শুরু করে সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য। ফ্যাসিস্ট পদ্ধতিতে গণতন্ত্র, সাংবিধানিক অধিকার ইত্যাদি হরণ করে। এই সন্ত্রাস শাসনে যে ভাবে সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ চলেছিল তার তুলনা চলে একমাত্র হিটলার মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট দমন নীতির সঙ্গে। ইতিপূর্বে আমবা দেখেছি পুলিশ দিয়ে নাট্যানুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছে, এবার দেখা গেল সমাজ বিরোধীদের নিয়ে কংগ্রেসের ঠেঙ্গারে বাহিনী তৈরি হয়েছে এবং সেই ঠেঙ্গারেদের দিয়ে নাটক অনুষ্ঠানে বাধা দিচ্ছে, নাটকের শিল্পীদের ওপর আক্রমণ করছে। এই ঠেঙ্গারেদের হাতে বহু গণনাট্যকর্মী ও শিল্পী নিহত হয়েছেন। ১৯৭০-৭৪ সালের মধ্যে এদের দ্বারা খুন হয়েছেন অভিনেতা দুলাল অধিকারী (খড়দহ ১৯৭১), অভিনেতা সজল রায় (পানিহাটি ১৯৭০), সঙ্গীত-শিল্পী অনিল পাত্র (খড়দহ ১৯৭১), সঙ্গীত-শিল্পী অধীর চক্রবর্তী (পানিহাটি ১৯৭০), নাট্য সংগঠক শঙ্কর দত্ত (জোড়াবাগান ১৯৭১), নাট্য সংগঠক কল্যাণ ব্যানার্জী (জোড়াবাগান ১৯৭১), নাট্য সংগঠক অধ্যাপক সত্যেন্দ্র চক্রবর্তী (বেলুড়), এবং পুলিশের লাঠিচার্জে নিহত হন প্রবীর দত্ত (কার্জন পার্ক ১৯৭৪)। নাটকের জন্য শহীদ হয়েছেন এমন ঘটনা বড় দেখা যায় না। এ ছাড়া মঞ্চে চড়াও হয়ে অভিনয় বন্ধ করে দেওয়া, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে অভিনেতাদের তাড়া করা, রিহার্সালের সময় বোমা নিক্ষেপ করার মত কত ঘটনা ঘটেছে। জরুরী অবস্থার সময় কেবল গণনাট্য সংঘে নয়—কোন প্রগতিশীল নাট্যসংস্থার পক্ষে অভিনয় করা প্রায় অসম্ভব হয়েছিল। নাটক ও গান সেন্সর

করাতে হতো এবং সেন্সরের কবলে পড়ে নাটকের সংলাপ ও গান এমন খণ্ডিত হতো যে তা আর মঞ্চস্থ করার মত থাকত না। একদিকে যখন এরূপ সন্ত্রাস চলছিল অন্যদিকে অপসংস্কৃতির লাগাম খুলে দিয়েছিল মানুষের মন কুরুচিতে ভরে দেবার জন্য। শোষিত মানুষকে ধোঁকা দেবার জন্য মিথ্যা জীবনচিত্র দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে। ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষের ক্রোধকে স্তিমিত করে মনকে দুর্বল করে রাখার চেষ্টা করেছে। এই কারণেই মঞ্চে ক্যাবারে নাচের প্রবর্তন হয়েছিল, বস্ত্র-বিপ্লবের বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রায় বিবস্ত্রা নারীদেহ প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়েছিল—প্রলোভনের পাঁকে টানতে। ষাট দশকের শেষভাগে শ্রেণী সংগ্রামের চরম মুহূর্তে,যখন বুর্জোয়া-জমিদার আর মেহনতি মানুষ মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে তখন কংগ্রেসী শাসকদল পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার বনিয়াদ রক্ষার জন্য সংস্কৃতির ওপর এ ভাবে আক্রমণ করেছিল। সেই দুর্দিনের অভিজ্ঞতায় সকলে বুঝতে পেরেছেন সংস্কৃতি রাজনীতির বাইরে নয়। শিল্প যদি হয় বাস্তবের প্রতি বিশ্বস্ত, শিল্প যদি বাস্তব সত্তাকে অনুভব করার প্রক্রিয়া হয় তবে তার ওপর শোষকদের আঘাত আসবেই। সেই আক্রমণের মুখোমুখী হওয়া ছাড়া শিল্পের আপন সত্তা রক্ষার উপায় নেই। পলায়ন-বৃত্তি শিল্পীর ধর্ম নয়।

সত্তর দশকের দুঃস্বপ্নের দিনগুলি পরাজিত হয়েছে। আবার সুস্থ সংস্কৃতিকে ফিরিয়ে আনার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। নির্ভয়ে নাটক করার পরিবেশ ফিরে এসেছে। এই পরিবেশে কেউ যেন ভুলে না যান সেইসব নাট্য-কর্মী, অভিনেতা ও সঙ্গীতশিল্পীদের কথা, যাঁরা সুস্থ নাটক অভিনয় করার জন্য প্রাণ হারিয়েছেন। এঁদের আত্মদানে গণনাট্য আন্দোলনের মর্যাদা ও দায়িত্ব বেড়েছে। গণনাট্য আন্দোলন গৌরব লাভ করেছে। এই শহীদদের সম্মান রক্ষা করার দায়িত্ব কেবলমাত্র গণনাট্য সংঘের নয়—প্রগতিশীল সকল নাট্যগোষ্ঠীর। আজকের প্রগতিশীল নাটকের দলগুলিকে গ্রুপ থিয়েটার বা যে নামেই চিহ্নিত করা হোক না, গণনাট্য আন্দোলনের অনুপ্রেরণায় এই দলগুলি সংগঠিত। সমাজ পরিবর্তনের এক মহৎ আদর্শবোধ নিয়ে অধিকাংশ নাট্যগোষ্ঠী যাত্রা শুরু করেছেন। জীবনের অভিজ্ঞতায় তাঁরা বুঝেছেন।এই সমাজ ব্যবস্থায় নিরপেক্ষ-তার স্থান নেই। একথাও মনে রাখা দরকার যে গণনাট্য সংঘের ওপর যখন আক্রমণ আসে তখন সেই আক্রমণ থেকে তাঁরা বাঁচতে পারেন না, যখন দেশের সংস্কৃতি আক্রান্ত হয় তখন গণনাট্য সংঘই প্রতিরোধের আহ্বান নিয়ে এগিয়ে আসে, সংস্কৃতি কর্মীদের সংগঠিত করে।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রগতিশীল নাটকের দলগুলি নতুন নতুন নাটক প্রযোজনায় হাত দিয়েছেন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে জীবনকে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করছেন। বিভিন্ন দিক থেকে জীবনের নাট্যমুহূর্তগুলি মঞ্চে তুলে ধরছেন।

বর্তমানে কলকাতায় নাটক মঞ্চস্থ করার সুযোগ বেড়েছে—আরো বাড়বে। কিন্তু গ্রুপ থিয়েটারগুলির মানসিক দুর্বলতার একটা দিকও চোখে পড়ে। প্রগতিশীল নাটকের দলগুলিকে জেলা ও মহকুমা শহর এবং গ্রাম গঞ্জে গিয়ে অনুষ্ঠান করতে তেমন আগ্রহী মনে হয় না। এক সময় প্রগতিশীল নাট্যগোষ্ঠীগুলিতে গ্রামাঞ্চলে যাবার এবং গ্রামে গিয়ে কৃষক সমিতির কর্মীদের সঙ্গে মেলামেশার যে আগ্রহ দেখেছি আজ আর তা দেখা যায় না। যদি কোন দল জেলা শহর পর্যন্ত কখনো যানও তাঁদের ব্যবহার পেশাদার থিয়েটার থেকে আলাদা নয় বলে শুনেছি। কলকাতার বাইরে যেতে রাজি হয়ে কোন কোন দল এমন টাকা দাবি করেন যে অত টাকা দেওয়া মফঃস্বলের নাট্যোৎসাহীদের পক্ষে সম্ভব হয় না। একটি ঘটনা আমি জানি, উত্তরবঙ্গের একটি সংস্কৃতিক সংস্থা অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছিল। এই উৎসবে যোগ দিতে কলকাতার একটি প্রগতিশীল নাট্যদলের দাবি ছিল পাঁচ হাজার টাকা মজুরী, তার সঙ্গে যাতায়াত ও পথে খাবার খরচ। তার ওপর রয়েছে প্রচার, প্যাণ্ডেল ইত্যাদি। হিসাব করে দেখা গেল একটি দলের জন্য ব্যয় হবে অন্ততঃ দশ হাজার টাকা। তখন প্রশ্ন ওঠে ছোট্ট একটা শহর থেকে এত টাকা কী করে তোলা যায়! কংগ্রেসী মস্তানরা জোর জুলুম করে টাকা তুলতো কিন্তু গণতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী যুবকরা তা পারেন না। আরো প্রগতিশীল দল আছেন যাঁরা কলকাতার চৌহদ্দির বাইরে যেতে রাজি নন। অথচ এঁরা অপেশাদার থিয়েটারের সম্মান দাবি করেন, গণনাট্য আন্দোলনের সহযাত্রী বলে নিজেদের পরিচয় দেন, কৃষি-বিপ্লব থেকে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বকথা শোনান। কিন্তু গ্রামে, শিল্পাঞ্চলে না গেলে এসব কথা যে অর্থহীন শব্দমাত্র এ কথাটা স্বীকার করেন না। যদিও শ্রমিক আন্দোলন বর্তমানে খুবই শক্তিশালী কিন্তু শ্রমিকদের ওপর অপসংস্কৃতির প্রভাব কম নয়। শিল্পাঞ্চলে হিন্দীছবির দাপটে অপসংস্কৃতির ছায়াপাত ঘটেছে। গ্রুপ থিয়েটারগুলির এদিকটা নিয়ে ভাববার কথা। কৃষক ও শ্রমিক থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে সামগ্রিকভাবে নাটকের বিকাশ হয় না: গ্রামাঞ্চল ও শিল্পাঞ্চলকে অ-সংস্কৃতির অন্ধকারে রেখে প্রগতিশীল নাট্য-আন্দোলনের অগ্রগতি সম্ভব হয় না। অন্ততঃ সন্ত্রাসের বছরগুলির অভিজ্ঞতা মনে রেখে শ্রমিক কৃষকের আরো কাছে যাওয়া দরকার। গণতন্ত্রের পক্ষে প্রত্যেকটি পদক্ষেপে সহযাত্রী হবেন প্রগতিশীল নাট্যসংস্থাগুলি এই আশা করেন সকলে।

দর্শন চৌধুরী

থিয়েটারে আন্দোলন

'সাংস্কৃতিক ফ্রণ্ট হলো সামরিক ফ্রণ্টের মতই আর একটি।'

বাংলা নাটকের ধারায় গণনাট্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে
এ দেশের সামাজিক অবস্থানে ও একটি বিশিষ্ট ভাবাদর্শে।
জার্মানি, ইতালি, স্পেন, জাপান, গ্রীস প্রভৃতি
দেশে স্বৈরতান্ত্রিক শক্তি প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে,
পরাধীন ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের
অত্যাচারও তখন তুঙ্গে। বাইরের প্রেরণা
এবং দেশের তাগিদ অনেককেই নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে।
ফ্যাসী-বিরোধী আন্দোলন, প্রগতি লেখক সংঘ, প্রভৃতি
আন্তর্জাতিক সংস্থা ও তাদের আন্দোলনের সঙ্গে
বাঙালীরাও মনেপ্রাণে সংযুক্ত হয়ে পড়েছে।
এমন সময়ে লাগলো যুদ্ধ। ভারতবর্ষ যুদ্ধ করে নি।
কিন্তু রাজা ইংরেজ যুদ্ধে জড়িয়েছে। তাই
পদানত ভারতবাসীকেও যুদ্ধের পরোক্ষফল ভোগ করতে হয়েছে।
অর্থনৈতিক মন্দা, বেকারী, হতাশা, মনুষ্যত্বের অবমাননা
পাশাপাশি এসে গেল। তার ওপরে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা।
এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে কালোবাজারী, মজুতদারীর বেনিয়া চক্রান্ত।
একটা জাতির ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সব উপকরণ হাজির হলো।
শাসক ইংরেজের অত্যাচার এই উপকরণগুলিকে সাজিয়ে রাখল
এবং দমনপীড়ন অত্যাচারে নির্মম হয়ে উঠল।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই এ দেশে সাম্যবাদী আন্দোলন
গড়ে উঠতে শুরু করে। বলশেভিকদের জয় সারা পৃথিবীর
মুক্তিকামী মানুষের সঙ্গে ভারতবাসীকেও অনুপ্রাণিত করেছিল।
ফ্যাসী-বিরোধী সংগঠন কিংবা প্রগতিবাদী লেখকদের সংগঠন—
এগুলির পেছনে এই মুক্তিকামী সাম্যবাদী মানুষেরই
মানসিক সংগঠন কাজ করেছিল বেশি।
তারপরে যখন মানুষের প্রয়োজনে সংস্কৃতিকে আনতে হলো,
তখনকার সাংস্কৃতিক কর্মীরা সংগঠিত হলো ভারতীয় গণনাট্য সংঘের

পতাকাতলে। গানে, নাচে, ছায়ানৃত্যে, ছোট ট্যাবলো কিংবা নাটকে সারা দেশবাসীর মনোবেদনা ও প্রতিরোধের ছবি এরা দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে তুলে ধরতে লাগলেন। শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, অত্যাচারীর মুখোশ খুলে ধরা, মুনাফাখোর, মজুতদারের বদমায়েশি প্রকাশ করা, অর্থনৈতিক শোষণ এবং সামাজিক অবক্ষয়ের পরিণাম ; এবং এর সঙ্গে মুক্তিকামী মানুষের জীবনসংগ্রাম, প্রতিরোধ ও বাঁচার লড়াইকে সামনে এনে মানুষের মুক্তি ও শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের উপস্থিত সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তোলা—এই ছিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সকল সাংস্কৃতিক কাজের অনুপ্রেরণা।

মানুষের জীবনে আন্দোলনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও আন্দোলন শুরু হলো। এবার 'জনগণের জন্য নাটক' এই প্রতিজ্ঞাতে সাংস্কৃতিক কর্মীরা নাটককে কেবল গণনাট্য করলেন না, এর সঙ্গে আন্দোলন কথাটিও জুড়ে দিলেন। নাটক শুধুমাত্র কতিপয় বাবু কালচারের এবং মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানসিকতার চৌহদ্দিতে আটকে রইলো না। নাটক সমগ্র দেশের সাধারণ মানুষের, নিপীড়িত জনগণের মনের কাছাকাছি এসে গেল বা আনার চেষ্টা হতে লাগল। বিষয়বস্তুতে, প্রযোজনায়, অভিনয়ে এবং সামগ্রিক ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়—এই গণনাট্য বাংলা নাটককে কলকাতার কতিপয় 'দীপাবলীতেজে উজ্জ্বল' রঙ্গশালার অনুমিত প্রায়ান্ধকার কুঠরি থেকে বের করে এনে সারা বাংলার হাটে, মাঠে, বাজারে, অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত, নিম্নবিত্ত, শ্রমিক কৃষক, মেয়ে পুরুষ সবাইকার মাঝে এনে উপস্থিত করল। এবং সেখানে নাট্য প্রযোজনায় মোদ্দা দুটো কথা কাজ করল। এক এদের মত করে নাটক অভিনয় করে এদের আনন্দ দিতে হবে। দুই সঙ্গে সঙ্গে এদের মানসিকতাকে বাড়িয়ে তুলতে হবে এবং জীবনসংগ্রামের সব খবর এদের কাছে পৌছে দিতে হবে। নাট্যশালা গণ-শিল্পের হাতিয়ার হয়ে উঠল।

২.

কিন্তু স্বাধীনতা পাওয়ার বছর ঘুরতে না ঘুরতেই গণনাট্য আন্দোলনে চিড় ধরল। মধ্যবিত্ত মানসিকতার যে সব শিল্পী এখানে সমবেত হয়েছিলেন, তারা তাদের শ্রেণী অবস্থানের সহজাত ভাবনাতেই বিপ্লবী চেতনার মানসিক স্বপ্নকে সাংগঠনিক দৃঢ়তায় কার্যকরী বিপ্লবীকর্মে পর্যবসিত করতে দোটানায় ভুগতে লাগলেন। স্বাধীনতার পর যারা সরকারী শাসনযন্ত্র হাতে নিলেন তাদের সঙ্গে সাম্যবাদী ভাবনার সংঘর্ষ অনিবার্যভাবেই দেখা দিল। তারা ভারতীয় গণনাট্য সংঘকে এবং তাদের কাজকর্মকে ভালভাবে নিলেন না। এতদিন একটা অদৃশ্য শত্রু এবং বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে যে মানসিকতায় লড়াই চালানো যাচ্ছিল, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তা আর অনেকের পক্ষেই সম্ভব হলো না। অনেকের মধ্যেই যে মূল ভাবাদর্শ গভীরভাবে কাজ করে নি এটাই তার প্রমাণ। এর ওপর

নতুন শাসক যখন কম্যুনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করল, তখন এই নাট্য-কর্মীদের অনেকাংশই মহাফাঁপরে পড়লেন। নাটক করব, হাততালি কুড়োব, অভিনয়ে চাতুর্য দেখাব, পারলে জণগণের সুখ দুঃখের কথাও বলব, ভালোকথা। কিন্তু রাজনৈতিক ভাবে বেআইনি একটি সংগঠনের হয়ে এসব করতে যাওয়ার মধ্যে জীবনের ঝুঁকি অনেক বেশি। তখন থেকেই গণনাট্যকর্মীদের মধ্যে 'হয়তো-তাইতো-নয়তো' শুরু হয়ে গেল। সংগঠনের সঙ্গে শিল্পীদের স্বভাবতই মতপার্থক্য ঘটতে লাগল। সংগঠন তখনো নাটককে জনগণের জন্যই তৈরী করতে চাইছেন, শিল্পীদের অনেকাংশ নাটককে শিল্প হিসেবেই দেখতে চাইছেন। সংগঠনের অনেকেই খুব ভালো সাংগঠনিক ছিলেন না আবার অনেকেই সংগঠন বুঝলেও, সংস্কৃতি-শিল্প ও সংগঠনকে একসঙ্গে মেলাবার মানসিকতায় পৌছতে পারেন নি। আর নাট্যশিল্পীদের অনেকেই নাটককে সুন্দরভাবে করার দিকে ঝুঁকলেন, গণনাট্যর মূল দাবিকে অস্বীকার করে।

স্বভাবতই গণনাট্য শিল্পীদের বেশ বড় একটি অংশ এর থেকে বেরিয়ে এসে অবক্ষয়ী বুর্জোয়া সাহিত্য সংস্কৃতির পরিবেশে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে লাগলেন। শিল্প যে গণসংগ্রামের হাতিয়ার এমন ভাবনা তারা আর ভাবতেই পারলেন না। বরং থিয়েটারকে বিশুদ্ধ শিল্পের মোড়ক দিয়ে স্বস্তি বোধ করলেন। গণনাট্যের মধ্যে থাকার সময়েই এরা প্রকারান্তরে এই চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাই দেখি, কলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী মহলের উপযোগী 'বিসর্জন' প্রযোজনা এরা তখনই করেছিলেন এবং এটা যে তদানীন্তন গণনাট্য আন্দোলনের কত পরিপন্থী তা বোঝা গেল যখন রূপনারায়ণের তীরে এক গ্রামে বিশাল জন সমাবেশে এই 'বিসর্জন' এরা অভিনয় করতে গেলেন। জনগণের কাছে যাওয়া তো দূরের কথা, সেখান থেকে পালিয়ে তারা বাঁচলেন।

গণনাট্য থেকে বেরিয়ে এসে নবনাট্য নামে একটি আন্দোলন এখানে চালাবার চেষ্টা হতে লাগল। এবার ঝোঁকটা 'গণে'র দিকে নয়, 'নব'র দিকে। নাটককে নবতর করতে হবে। যত দুশ্চিন্তা নাটককে নিয়ে, যেন জনগণ কিছুই নয়! নাট্যশিল্পের একচুল এদিক ওদিক হলে সব গেল। শিল্পকে ঘষে মেজে আরো গভীর কর। এবং স্বভাবতই জনগণের শিল্প, তাদের থেকে অনেক দূরে চলে গেল, শিল্প শিল্পের জন্যই মাথা ঘামাতে লাগল। এবং অতি সত্বর কায়েমী পুঁজিবাদী স্বার্থ তার এস্টাব্লিশমেণ্টের সমস্ত পসরা নিয়ে এদের সাহায্যে এগিয়ে এল। প্রচারটা হলো এদের বেশি। খ্যাতি, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা অতি দ্রুত এদের করায়ত্ত হতে থাকল। শ্রেণীদ্বন্দ্বের নিরন্তর সংগ্রামে যে শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠায় গণনাট্য আন্দোলন তার নাটক ও বিষয়বস্তুকে নিয়োজিত করেছিল, নবনাট্য আন্দোলনের কর্মীরা তা থেকে সরে এসে অবক্ষয়ী সমাজের হতাশা, ব্যক্তিজীবনের ট্র্যাজেডি নাটকীয় কলাকৌশলের সূক্ষ্ম শিল্পের

মাধ্যমে প্রচার করতে থাকলেন।

তবে এ কথা ঠিক, গণনাট্য আন্দোলনের হাত-ফেরতা হয়ে এরা এসেছিলেন বলে এবং মূলতঃ নাট্যবোধ এদের প্রবল ছিল বলে, এদের নাট্য প্রচেষ্টা তদানীন্তন গতানুগতিক পেশাদারী নাট্যপ্রচেষ্টার থেকে সর্বদাই মুক্ত থাকার চেষ্টা করেছে। তথাকথিত ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও সামাজিক নাটকের যে চর্বিত-চর্বণ পেশাদারী মঞ্চগুলিতে চলছিল—নবনাট্যের কর্মীরা তাকে পরিত্যাগ করলেন। সমসাময়িক জীবনভাবনা, ধ্রুপদী নাট্যবিষয় ও নাটক, বিদেশী নাটক এরা নানাভাবে ও রূপে শুরু করলেন। বাংলা নাটকের বিষয়ের বিস্তার, অভিনয়ে উচ্চমান, প্রযোজনার সামগ্রিক খুঁটিনাটি নিয়ে চিন্তা এবং মঞ্চোপকরণের প্রতি শৈল্পিক নিষ্ঠা থাকার ফলেই এদের নাট্যপ্রযোজনা অতি সত্বর শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহলে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করল।

ব্যবসায়িক সংবাদপত্র এবং কায়েমী সরকার দু হাত তুলে এদের আশীর্বাদ করলেন। কিছু কিছু সংবাদপত্র নবনাট্যকে এত বেশি মাথায় তুললেন যে. পেশাদারী থিয়েটার পর্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠল। অচিরাৎ সংবাদপত্র ও সরকারের আনুকূল্য পাওয়ার কারণটা কি? সংবাদপত্র এটা বুঝেছিল যে, গতানুগতিক পেশাদারী থিয়েটার আর চলে না। কিন্তু নতুন যে গণনাট্য শুরু হয়েছিল তাও তো বিপজ্জনক। সে যে নাটক দিয়ে জীবনের মর্মমূল ধরে টান দিচ্ছে। নাটকে তারা রাজনীতির গন্ধ পেয়ে শঙ্কিত হলেন। নাটকে প্রেমের গন্ধ, স্নেহের গন্ধ, ধর্মের গন্ধ, মদের গন্ধ থাকলে নাক চাপা দিতে হয় না। কিন্তু সত্যিকারের জীবনযন্ত্রণা এবং জীবনসংগ্রামের গন্ধ থাকলেই এদের নাককান ও চোখ তিনটেই চাপা দিতে হয়। এবং শুধু নিজের ইন্দ্রিয় চাপা দেওয়া নয়, নাট্যকর্মীদের প্রচেষ্টাকেও যে চাপা দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই গণনাট্য থেকে বেরিয়ে যখন নবনাট্য সৃষ্টি হলো তখন এদের উল্লাস দেখে কে? সরকার এই নতুন নাট্যদলগুলিকে সরকারী পুরস্কার দিয়ে সম্বর্ধনা জানালেন। আর কলকাতাকেন্দ্রিক জীবনবিমুখ শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহল হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। নাট্যতত্ত্ব ও শিল্পের খুঁটিনাটি নিয়ে চায়ের ভাঁড়ে মুখ ভিজিয়ে ঠোঁটে সিগারেট গুঁজে প্রচুর ধূম্রোদ্গীরণ করতে লাগলেন।

আর কিছুদিনের মধ্যেই এই নবনাট্যধারা তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে সমাজ বিচ্ছিন্ন অ্যাবস্ট্রাকট্ নাটকের গাড্ডায় গিয়ে পড়ল। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার অবক্ষয়ী-সংস্কৃতির চোয়ানো ঢেঁকুর উদ্গীরিত হতে থাকল নবনাট্যের ধারায়। স্টেজে অমল বিমল কমল এবং ইন্দ্রজিৎ ও মানসী তাদের জীবনের গোলোক ধাঁধাঁয় পাঁচ চার তিন দুই এক শূন্যের কিমিতিবাদী ভাবনায় দুলতে দুলতে আমাদের শ্রেণী-দ্বন্দ্বের চিন্তা থেকে বহুদূরে সরিয়ে নিয়ে চলে গেল।

এই কি সৎ নাট্য? সত্তাটা কার প্রতি? নাকি নবনাট্যের মধ্যেও প্রকারা-

স্তরে জীবনের ছবি ফুটে উঠছিল, সংগ্রামের শপথ কখনো দৃঢ়মুষ্টি ধারণ করে ফেলছিল ? তাই কি সেখান থেকেও নাটককে সরিয়ে নিয়ে আরো মুক্ত আরো পরিষ্কার করে নেওয়া হলো ? পরিশ্রুত সৎ নাট্যের প্রকোপে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী-মহল-নির্ভর অডিটোরিয়ামগুলিও খাঁ খাঁ করতে থাকল। শিল্পের নিদারুণ সৌন্দর্যের সন্ধানেও বা কতজন আর মাথা ধরাতে রাজি হবে !

মধ্যবিত্ত মানসিকতায় ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার চিন্তা যাবে কোথায় ? নবনাট্যের শুরু থেকেই এই ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা মাথা চাড়া দিতে শুরু করেছিল। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের আওতায় থাকলে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা থাকে না, সেখানে সম্মিলিত প্রয়াসটাই বড়, একক ব্যক্তির নাম-ধামের প্রচার হয় না। তাইতো গ্রুপ থিয়েটার। আমি বড় হয়ে একটা দল প্রতিষ্ঠা করে দিলাম। সেখানে আরেকজন ক্রমে বড় হয়ে উঠলে অনিবার্য সংঘাত এবং পরিণতিতে নতুন আরেকটি গ্রুপ থিয়েটার। গ্রুপ থিয়েটারে তাই একজন কর্তাব্যক্তির প্রচারটাই হয় বেশি, যদিও বলা হয় এখানে সবাই সমান। কিন্তু প্রত্যেকটি গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে একজন না একজনের নামই জড়িত বা উচ্চারিত হয়ে থাকছে।

তাই এখান থেকেই নাট্য-আন্দোলন তাদের কাছে প্রকারান্তরে খ্যাতি প্রতিষ্ঠার প্ল্যাটফরমে পরিণত হলো। এদের কেউ কেউ দুটি নাটক প্রযোজনা করবার আগেই খানিকটা খ্যাতি পেল এবং অচিরাৎ সেই খ্যাতি ভাঙিয়ে হয় বুর্জোয়া এস্টাব্লিশমেন্টের সিনেমায় নয়তো এখনকার তথাকথিত বৃহৎ পুঁজি বিনিয়োগকারী যাত্রায় নয় তো গতানুগতিক অবক্ষয় এবং অপসংস্কৃতির ধারক পেশাদার থিয়েটারে যোগ দিতে থাকল।

এখানে অর্থনৈতিক প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। গ্রুপ থিয়েটার করতে আসে প্রধানতঃ নিম্নবিত্ত ও সাধারণ মধ্যবিত্তঘরের শিক্ষিত ছেলেরা। প্রথমতঃ তারা নাটককে ভালবাসে। ভাল নাটক করতে চাওয়ার একটা ইচ্ছা এদের প্রত্যেকেরই আছে। তার জন্যে কর্মস্থলে ঝঞ্চাট, বাড়িতে গোলমাল (বেকার হলে আরো বেশি) সব সহ্য করে এরা থিয়েটার করতে আসে। থিয়েটার থেকে তারা পয়সা পায় না, কখনো বা হাত খরচা পায়। তবু গ্রুপ থিয়েটারে লেগে থাকে। ভালো নাটক করে সুস্থ সংস্কৃতিকে সঞ্জীবিত রাখার একটা প্রয়াস ওদের সবসময়েই থাকে। এ জন্যে এরা ধন্যবাদার্হ। কিন্তু গণনাট্য আন্দোলনের যে মূল প্রেরণা বা আদর্শ তা সবসময়ে এদের প্রয়াসের পেছনে কার্যকরী থাকে না। মুখ্যতঃ যেটা ক্রমশঃ কার্যকরী হয়ে ওঠে তা হলো অর্থনৈতিক প্রশ্ন। কলকাতা-কেন্দ্রিক শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহল নির্ভর বলে এদের নাট্যপ্রয়াসও সীমাবদ্ধ। ফলে যে অর্থ খরচ করে এরা নাট্য প্রযোজনা করেন, তা থেকে লাভ তো হয়ই না, বরং কখনো কখনো লোকসানের মাত্রা বেড়েই চলে। পকেটের পয়সা খরচ করে কলকাতায় এরা নাটক নামান। মফঃস্বলে এবং দূর বাংলায় এদের যদি ডাকা

হয় এবং বলা হয়, আপনাদের যা খরচ তাই দেওয়া হবে, তাহলে এরা রাজি হন না। সেখানে নিজেদের সমস্ত খরচ খরচা বাদেও মোটা লাভ তারা দাবি করেন। মফঃস্বলের প্রস্তাবে রাজি হলে একটা সুবিধে যে তাতে লোকসানের ভয় থাকে না। উপরন্তু দুটো পয়সা পাওয়া যায়। কিন্তু কলকাতায় করলে নিজেদের উদ্যম ও পয়সা যায়, লাভের ঘরে প্রায় শূন্য থাকে এবং লোকসানের সম্ভাবনা সব সময়েই থাকে। কেননা, প্রযোজনার খরচ, হল ভাড়া, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি সব মিলিয়ে যা খরচ পড়ে, হলের সীমিত সংখ্যক টিকিট বিক্রী করে তা থেকে যোগ-বিয়োগ নিষ্ফল হয়ে পড়ে। তবু তারা গাটগচ্চা দিয়েও শো করবেন, মফঃস্বলের লাভা-লাভের একতরফা প্রস্তাবে রাজি হবেন না। ব্যতিক্রমের কথায় পরে আসছি।
কলকাতায় লোকসান দিয়ে শো করব এবং কতবড় স্বার্থত্যাগ করছি বলে প্রচার করব, কথাটা ঠিক অতটা সত্যি নয়। এতদিনে গ্রুপ থিয়েটারের কার্যকারিতা দেখে আমরা বুঝে ফেলেছি যে, কলকাতায় খরচ করে 'শো' করাটা তাদের পক্ষে ব্যবসায়ের ভাষায় 'ইনভেস্টমেণ্ট'। লাভটা উঠে আসে অন্য জায়গা থেকে। এখানে থিয়েটার করতে পারলে প্রচার হয় খ্যাতি বাড়ে, সম্মান আসে। এগুলি অলৌকিক লাভ। আর লৌকিক লাভ হলো—ঐ খ্যাতি সম্মান ভাঙিয়ে ছোট গ্রুপের ছেলেরা নামকরা বড় গ্রুপে যেতে পারে, বড় গ্রুপের নামী ছেলেরা যাত্রা, সিনেমা কিংবা পেশাদার থিয়েটারে ঢুকে পড়তে পারে। এখন এমন অবস্থা যে, কেউ কেউ শুধুমাত্র প্রথম থিয়েটারের রিহার্সাল দিতে দিতেই যেটুকু নাম ছড়াচ্ছে তাই ভাঙিয়ে ও সব জায়গায় চলে যাচ্ছেন। যারা সত্যিকারের নাট্যপ্রেমী, এত প্রলোভন সত্ত্বেও নাটক কামড়ে পড়ে আছেন, দুর্জনেরা বলার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে যে, তারা এখনো কোন জায়গা থেকে ডাক পাচ্ছে না, এমনি কপাল!
গণ আন্দোলন থেকে গ্রুপ থিয়েটার অনেকখানি সরে আসায় বিপরীত মেরুর শক্তিশালী গোষ্ঠী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। গ্রুপ থিয়েটারের শিল্পীদের এক পা প্ল্যাটফরমে এবং এক পা ট্রেনে থাকায় এস্টাব্লিশমেণ্ট অতি সহজেই এদের কিনে নিতে পারছে। গ্রুপ থিয়েটারে সমর্থ ভাবাদর্শ না থাকায় বিক্ষিপ্ত শিল্পীরা অতি সহজেই নানা খপ্পরে পড়ে যাচ্ছে। এবং সেখানে প্রচুর পয়সা আরো খ্যাতি ও আজকের বিচ্ছিন্ন সমাজব্যবস্থার দৌলতে আরো বেশি সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেয়ে যাচ্ছেন। এই প্রলোভন জয় করে নাটকে নিষ্ঠ হয়ে থাকতে গেলে যে শক্ত বনিয়াদ এবং মূলীভূত মতাদর্শের ভিতের ওপরে নিজেদের দাঁড় করাতে হয়, বর্তমান গ্রুপ থিয়েটারে তা নেই। আর নেই বলেই, এস্টাব্লিশমেণ্ট এদের সহজে ক্রয় করছে এবং বৃহৎ জনমানসে এদের বিকৃত ও কদাকার করে প্রচার করে ছেড়ে দিচ্ছে। বহুৎ প্রতিষ্ঠিত এক গ্রুপ থিয়েটার শিল্পীর কোলে বসে ক্যাবারে নর্তকী নিতম্ব দোলাচ্ছে এমন দৃশ্য পেশাদার থিয়েটার তার দ্রুত-বিশ্ব-

দর্শনে দেখিয়ে দিচ্ছে। আর গতানুগতিক সিনেমা তো তাদের ভাঁড় কিংবা ভিলেনের ট্রেডমার্ক দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। ফলে এই গ্রুপ থিয়েটার শিল্পীদের পরে মঞ্চে উঠে কৌতুক করতে হয়, অন্য কিছু আর লোকে তাদের কাছে ভাবতে পারে না।

আন্দোলনের কথাটা এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিলাম। গ্রুপ থিয়েটারের কার্যাবলী আলোচনা করতে গেলে থিয়েটারের কার্যগত ও প্রকরণগত অনেক গুণাবলীর কথা আসতে পারে, ব্যর্থতাও আসতে পারে। কিন্তু যেটা কিছুতেই আসে না, সেটা হলো ঐ আন্দোলন। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহলের কাছে থিয়েটার করে আন্দোলন হয় না, বাহবা পাওয়া যায়। কিছুদিন আগে এক প্রখ্যাত গ্রুপ-থিয়েটারের নির্দেশক আক্ষেপ করেছিলেন যে, দর্শকরা তাদের নাটক দেখে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে বসেন, তাদের নাটক কোথায় কতটা প্রতিবিপ্লবী বা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়েছে। মুশকিল হচ্ছে, এদের দর্শক যারা তাদের নাটক দেখিয়ে শেখাবার কিছু নেই, তারা সব জেনে বসে আছেন। তাই সবজান্তা এরা বিশ্লেষণ করতে পারেন, উজ্জীবিত কি এদের নাটক দেখিয়ে করানো যাবে! অথচ যে বিশাল জনগণকে নাটকের মাধ্যমে গণআন্দোলনে সামিল করার প্রয়োজন, সেখানে এদের নাটক যাবে না, গেলেও এদের নাটকের মাথামুণ্ড তারা ধরতেই পারবে না। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর ওপর ভরসা করে আন্দোলনের যে পরিণাম, থিয়েটারের ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে। অসাধারণ ও সূক্ষ্ম উপস্থাপনার নাটক 'জগন্নাথ' বুদ্ধিজীবীমহলে তোলপাড় ফেলেছে। অথচ আমি নিজে দেখেছি, দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে এই নাটকের অভিনয়ের সময় অরুণবাবু প্রায়ই অভিনয় থামিয়ে এগিয়ে এসে বলছিলেন—আপনারা চুপ না করলে আমরা অভিনয় বন্ধ করে দেব। রবীন্দ্রসদন-নির্ভর নাটক দিয়ে গণনাট্য আন্দোলন হয় না।

গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে এইভাবে অনেক কিছু জড়িয়ে যাচ্ছে বলে, ব্যাপারটা সামলাতে গ্রুপ থিয়েটারের অনেকেই নিজেদের তৈরী এই থিয়েটারকে এখন 'অন্য থিয়েটার' নামে চালাতে চাইছেন। সোজা কথায় তারা তাদেরকে এখন আর কোন নাট্য আন্দোলনে জড়িত রাখতে চাইছেন না। অন্য থিয়েটার বলতে তারা কি বোঝাতে চাইছেন তা এখনো পরিষ্কার নয়। তবে আমাদের কাছে এটা খুবই পরিষ্কার যে তারা তাদের ভাবনার ও চলনের গোঁজামিলটা এমন একটা কিম্ভূত নামের আড়ালে ঢাকতে চাইছেন। তাদের চালচলন প্রায় পেশাদার থিয়েটারের মতন, ভাবনাচিন্তা দক্ষিণপন্থীদের মত, আকাঙ্ক্ষা পুঁজি-বাদীদের দিকে—এবং সর্বোপরি ব্যক্তিক প্রতিষ্ঠার মোহে আচ্ছন্ন। এবং এদের নিজেদের দল যে কেবলই ভাঙছে তার মূলে আদর্শের অনুপ্রেরণা নয়—ব্যক্তিক উচ্চাশা ও প্রতিষ্ঠার মোহ।

অন্য থিয়েটার আন্দোলনের অনেক্ হোতার এখন একমাত্র চিন্তা তিনকাঠা জমির জন্য। তারা প্রকাশ্যেই একথা বলছেন যে, তাদের হাতে যদি কেউ খানিকটা জমি দেয় সেখানে তারা নিজেদের মনোমত থিয়েটার হল তৈরী করবেন এবং তাতেই বাংলার নাট্যআন্দোলন যথার্থ পথ খুঁজে পাবে। আর এটাও ঠিক যে সেই জমি হতে হবে কলকাতায় ; আর সেই কলকাতায় তৈরী থিয়েটারে অন্য থিয়েটার বাংলা নাট্যঅন্দোলনের সদ্গতি করবেন। এস্টাব্লিশমেণ্টের মোহে আচ্ছন্ন এরা এ কথা বলতে গৌরব বোধ করছেন — নিজেদের কৃতকার্যের জন্য লজ্জা পেতেও এরা ভুলে গেছেন।

অন্য থিয়েটার কথাটির মধ্যে সম্ভবত মার্কিনী গন্ধ পেয়ে অনেকে কথাটি পালটে নিজেদের ঐ একই রকম থিয়েটারকে বলছেন 'ঠিক থিয়েটার'। সত্যি, নামে আসছে যাচ্ছে — কাজ পিছচ্ছে কিন্তু। ঠিক থিয়েটারের ঠিক নাটক বলতে এরা বলছেন — শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষিত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীতে যা ঠিক তা-ই ঠিক নাটক। মানুষ সম্পর্কে নিজের সম্পর্কে শ্রেণী সম্পর্কে সচেতনতাই ঠিক নাটকের বিষয়। কথাটা শোনালো ভাল। অথচ এদেরই হোতার প্রধানতম নেতা দল ফেলে একা সারা মার্কিনী মুল্লুক ঘুরে এলেন এই ঠিক নাটকের নানা উপচার নিয়ে। অথচ কলকাতার বাইরে যেতে গেলে এদের দর এখন সবচেয়ে বেশি। তাছাড়া ঠিক নাটক যে গ্রামবাংলা বুঝতে পারবে না। আর খুব ভালো মঞ্চ ব্যবস্থার উপযোগী স্টেজ না হলে যে ঠিক নাটক ঠিকভাবে হবে না। ভাবের ঘরেই চুরি হলো, নামে কিছুই এলো গেল না।

৩.

ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যআন্দোলনের শেষ কিন্তু এখানেই নয়। গণনাট্য-আন্দোলনের ক্ষেত্রে গ্রুপ থিয়েটারগুলি একটা কাজ করে যাচ্ছে সেটা মানতে হবে। তারা শক্ত হাতে দাঁতে দাঁত চেপে বাংলা নাটককে অপসংস্কৃতির হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। যাত্রা, সিনেমা, পেশাদার থিয়েটার ও অন্যান্য জীবনাচরণের অপসংস্কৃতির প্রচণ্ড আঘাত থেকে নাটককে তারা মুক্ত রাখার অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। নাট্যআন্দোলনের প্রাথমিক স্তরের অনেকখানি কাজ তারা এগিয়ে রেখেছেন। তাছাড়া নাট্যাভিনয়ের মানকে এবং নাটকের নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার সংযোগে থিয়েটার মাধ্যমকে অনেক শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত করতে পেরেছেন। যে নাটককে নিয়ে গণআন্দোলনে সামিল হতে হবে তার অনেকখানি প্রস্তুতি গ্রুপ থিয়েটারের মাধ্যমেই হয়েছে বা হচ্ছে। তাদের এই ঐতিহাসিক প্রস্তুতিকে গণনাট্যআন্দোলনে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং প্রয়োজনে এই প্রস্তুতিকে কাজে লাগাতে হবে।

গণনাট্য শিল্পীদের সবাই যে আন্দোলনের ধারা থেকে সরে এসেছিলেন তা তো নয়। ভারতীয় গণনাট্যসংঘের উদ্যোগে যে নাট্যআন্দোলন শুরু হয়েছিল

তা থেমে যায়নি। গণনাট্য থেকে বেরিয়ে গিয়ে যারা বুর্জোয়া সংস্কৃতির পৃষ্ঠ-পোষক হয়েছিলেন তাদের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা ও প্রচার এত বেশি সুকৌশলে করা হয়েছে যে মূল গণনাট্য ধারা বুঝি মুখ থুবড়ে পথভ্রান্ত হয়েছে—এমন একটা ধারণা গড়ে তোলা হয়েছে বা হচ্ছে। কিন্তু আজকের গ্রামে গঞ্জে ও শহরতলীতে অসংখ্য নাট্যকর্মী নিরলসভাবে যে গণনাট্যের সাধনা করে চলেছেন নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে, তারাই ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যআন্দোলনকে জনমানসের মুখোমুখী দাঁড় করাচ্ছেন। বুর্জোয়া সংস্কৃতির ধারকেরা তাদের প্রচার পছন্দ করেন না বলেই তাদের পেটোয়া প্রচার মাধ্যমগুলি তাদের কথা বলে না, যদিও বলে তা নিন্দার্থেই। সাতাত্তরের নাট্যসমীক্ষা করতে গিয়ে দেশ-পত্রিকায় তাদের নাট্যসমালোচক (যিনি একাধিক গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত) স্বাভাবিকভাবেই গ্রামবাংলার শহরতলীর নাট্যাভিনয়ের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু পিপল্‌স থিয়েটারের আদর্শকে সঙ্গে নিয়ে এই যে গ্রামবাংলার 'অখ্যাত' নাট্যদলগুলি এগিয়ে চলেছে তার প্রচার জনগণের মাধ্যমেই হচ্ছে। মূল গণ-নাট্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত থেকে কিংবা ভাবনার সামিল হয়ে এই নাট্যদলগুলি নানা বিপরীতমুখী পরিস্থিতিতে সুস্থির থেকে নাট্যআন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। কলকাতাকেন্দ্রিক পেশাদার থিয়েটার ও প্রায় পেশাদার গ্রুপ থিয়েটার কিংবা অন্য থিয়েটারের সঙ্গে সংগ্রাম করে এই গণনাট্যধারাকে জাগ্রত রাখতে হবে। গ্রুপ থিয়েটারের যারা এখনো কিয়দংশ গণনাট্য আন্দোলনের ভাবধারা বজায় রাখার চেষ্টা করছেন তাদেরও সাথী করতে হবে। গ্রুপ থিয়েটার কিংবা অন্য থিয়েটার শুধুমাত্র কলকাতার মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে, কখনো তার বাইরে গেলে শুধুমাত্র অনেক পয়সার লোভে কল-শোয় যাচ্ছে, যাতে কলকাতায় নিশ্চিন্তে শো করতে পারে। আর গ্রামগঞ্জের শহরতলীর গণনাট্য আজ সারা বাংলা ও বহির্বাংলা জুড়ে বিস্তৃত হয়ে চলেছে আপামর জনগণের সংগ্রামী চেতনার সঙ্গে যুক্ত থেকে।

তারা কি রকম নাটক করছে তার একটা বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া গেল কিছুদিন আগে। প. বঙ্গ সরকার আয়োজিত যুব উৎসবের অঙ্গ হিসেবে যে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল কলকাতার বুকে, এই আটাত্তরের মার্চে, তাতে সবশুদ্ধ প্রায় একশো কুড়িখানি নাটক অভিনীত হলো। কলকাতার ঠিকানার দু একটি বাদ দিলে আর সব নাট্যদলই বাইরের। এগুলির মধ্য থেকে এগারোটি নাটককে চূড়ান্ত-নির্বাচনের জন্য বাছাই করা হয়। অন্ততঃ এবং আপাততঃ এই কয়টি নাটক সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, এরা কলকাতার তথাকথিত নাট্য-দলগুলির সঙ্গে অভিনয় ও প্রয়োজনাগত দিক দিয়ে পাল্লা কষে যেতে পারে। গ্রুপ থিয়েটারের যারা এই প্রতিযোগিতায় বিচারক ও দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, তাদের প্রায় সবাই আমাকে বলেছেন যে, বিষয়বস্তু, আঙ্গিক,

উপস্থাপনা, অভিনয় ইত্যাদি দিক দিয়ে এরা অনেক এগিয়ে আছে। যারা নাক সিঁটকে এদের নাটক দেখতে এসেছিলেন তারাই উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছিলেন সেদিনগুলো।

এই দলগুলির সবকটিই যে উচ্চাঙ্গের তা নয়। কিন্তু শতাধিক দলের প্রত্যেকটির আন্তরিকতা এবং গণনাট্য সম্পর্কে সুস্থির ভাবনা আমাদের আশান্বিত করে। এদের নাটক বেশির ভাগ নিজেদেরই লেখা, দলের প্রত্যেকেই প্রায় সাম্যবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী, বয়সে প্রায় সবাই তরুণ এবং এদের মধ্যে অনেকেই তাদের নিজস্ব অঞ্চলের রাজনৈতিক কর্মী। এরা নাটক করতে পেলেই খুশি, পয়সা ও নামের জন্য নাটক করতে হয়, এমন ভাবনা এদের এখনো আসে নি। নিজেদের সামর্থ্য ও কাদের জন্য নাটক করতে হবে—এই দুটো এদের কাছে পরিষ্কার বলেই, এদের নাটকের মঞ্চোপকরণ স্বল্প, প্রযোজনার বাহুল্য নেই, বিষয়বস্তুকে নিয়ে ঘোরপ্যাঁচ নেই এবং অতি সাম্প্রতিক বিষয় থেকে শুরু করে সুদূর অতীত এবং এদেশ-বিদেশ সর্বত্রই এঁরা বিষয়ের সন্ধান করেন। এবং সেই বিষয় সম্পর্কে সবাই একনিষ্ঠ—যেখানে শোষণ, যেখানে শোষিত মানুষের নিপীড়ন এবং যেখানেই বাঁচবার লড়াই সমুন্নত—সেখানেই এদের বিচরণ।

কলকাতায় এতবড় নাট্যআন্দোলনের ছবি ফুটে উঠলো, অথচ তথাকথিত কোন নাট্যসমালোচকই এর সম্পর্কে একটি কথাও বললেন না। কোন সংবাদ-পত্রও খবর ছাপলেন না। অখ্যাত অবজ্ঞাত নাট্যদলগুলি আবার গ্রামেগঞ্জে ফিরে দ্বিগুণ উৎসাহে নাটক করতে লেগে গেল।

এদের সম্পর্কে সাবধানবাণী হলো এই—এদের সবাই সব সময়ে যে নিষ্ঠ থাকতে পারছে তা নয়। কখনো অতিবিপ্লবী, কখনো প্রতিবিপ্লবী হয়ে পড়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার নিদর্শনও থাকছে। যেনতেন ভাবে দল গড়ে যে কোন নাটক নামিয়ে দেবার প্রচেষ্টাও রয়েছে। প্রাথমিক নাট্যবোধহীন নির্দেশক ও অভিনেতাও দেখা যাচ্ছে। আঙ্গিকগত কৌশলের দিকে ঝোঁক এবং স্বভাবতই বিষয়বস্তুতে খামতি থাকছে। নামের মোহ উঁকিঝুঁকি মারছে, একটু ভালো নাটক করলেই একাডেমিতে দেখাতে না পারার উসখুসুনি রয়ে যাচ্ছে। এগুলি সুস্থ নয়। এগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হাজার হাজার টাকা পাওয়ার জন্য ধরণা দিক (গুটি পাঁচেক এখনই পাচ্ছে), ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে মিশ্রনামে নাটক করুক, নাটক করে যাত্রা-থিয়েটার সিনেমায় চান্স পাক, এবং কলকাতার মধ্যেই ঘুরপাক খাক। কলকাতার মোহ কাটিয়ে উঠে গণনাট্য তার নাট্যআন্দোলনের ধারা দিগ-বিদিকে ছড়িয়ে দিক, এবং গণ-আন্দোলনের পাশে থেকে নাট্যআন্দোলন তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করুক।

শোভা সেন

বেইমান স্মৃতি

ওকে ? ডুরে শাড়ী পরা গাঁয়ের বৌটি ?
ধানের মড়াই খালি।
এক কলসী ধান লুকিয়ে রেখেছিল।
স্বামী, পুত্র, শ্বশুর, দেওর-জা ভরা সংসার,
সোনার সংসার চোখের সামনে তিল তিল করে
ধ্বংসের মুখে এগিয়ে চলে।
শুধু চোখের জল আর অসহায় দৃষ্টি মেলে
তাকিয়ে থাকে। চেনো একে ?
স্মৃতির ঝাপসা দৃষ্টিতে যেন চিনি চিনি মনে হয়।
রাধিকা না ? কুঞ্জ-র বৌ ?
নবান্নের নায়িকা। ৩৪ বছর আগের কথা।
স্মৃতি বেইমানি করে।
হারিয়ে গেছে কত কথা, কত চরিত্র,
মনে পড়ে জীয়ন কন্যা-র উলুপীর মাকে।
কিন্তু সে তো জীবন পায় নি।
নাটক মঞ্চস্থই হলো না।
মহড়ার দিন কটা কেটেছিল উত্তেজনায়।
বাংলা নাটকের পরীক্ষা নিরীক্ষার একটি
অভূতপূর্ব সুযোগ হারালাম।
অপেরাধর্মী নাটক।
নীলদর্পণের সাবিত্রী তো জলজল করছে
স্মৃতির দর্পণে। ঐ তো স্বামী হারা,
পুত্র হারা নারী ছুটে বেড়ায়
তার ছেলের সন্ধানে। পাগলিনী সাবিত্রী
দেখে ছেলের মুখের আদল, সব ছেলের মুখে।
মৃত ছেলেকে ছড়া পড়িয়ে ঘুম পাড়ায় আর
উঠে খোঁজে। সেই মুখ সব মানুষের মুখে।
বিজনবাবুর নাটকে এটাই ছিল সমাপ্তি।

অলীকবাবুর পিসনী

মনে পড়ে মাদার কারেজও ব্রেশট দেখিয়েছেন মৃত কন্যার মাথা কোলে নিয়ে মা গাইছেন ঘুমপাড়ানি গান।

দূর থেকে দেখি মঞ্চে দাঁড়িয়ে শেক্সপীয়রের মানস কন্যা। এমন ক্রূর, খল নায়িকা আর সৃষ্টি হয় নি এর আগে। লেডি ম্যাকবেথ। রাজ হত্যায় উদ্দীপ্ত করে স্বামীকে, উচ্চাকাঙ্ক্ষার বলি এই দম্পতির পরিণতি ভয়ঙ্কর। শিউরে উঠি। কিন্তু চরিত্রটিকে ভালবেসে ফেলেছি। এ সব চরিত্র সৃষ্টিতেই তো আনন্দ। কঠিনও বটে। শেক্সপীয়রে হলো হাতে খড়ি। তবে অনুবাদ আড়ষ্ট থাকায় অসুবিধে হয়েছিল। সেটা প্রোফেসর নীরেন রায়ের অনুবাদ ছিল। পরে করেছি এল-টি-জিতে। সেটা পূর্ণাঙ্গ ম্যাকবেথের প্রযোজনা, অনুবাদ ইঞ্জিনীয়র কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের।

ভিড় করা চরিত্রগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে স্মৃতির অলিন্দে। ৩৪ বছরের জমানো খাতার জীর্ণ পাতাগুলি কিছু কিছু খসে তো পড়বেই।

রানী গুণবতী কি কিছু বলছেন? রানীগিরি ঘুচিয়ে দিল গ্রামের দর্শক। ছুট ছুট। পোষাক খসে পড়লো, গহনা, মুখের রং ঢং সবই উঠে গেল ত্রাসে। পালিয়ে এলাম। এ এক অভিজ্ঞতা। শহুরে দর্শক বাহবা দিলেই মাথা গরম করে নিরক্ষর জনতার সামনে রাজা উজির মারতে চাও মারতে পারো, তবে আমাদের ঠকালে, প্যাদাবো।

এবার কার পালা! অত মনে নেই বাপু। তবুও চেষ্টা করো, চেষ্টা করো। গম্ভীর আদেশ শুনি নিজের অন্তরেরই। এবার সামনে এসে দাঁড়ালো ম্যাজিস্ট্রেটের বৌ, গোগোলের বইতে ছিল সে মেয়রের স্ত্রী। কি ন্যাকা ন্যাকা চরিত্র। ওপর-তলার আমলাদের চেহারা আর কি? জীবনটাই তো কৃত্রিম। তবে হাসাতে পেরেছি দর্শককে। ঐটুকুই যা উপরি পাওনা।

স্মৃতির স্লেটে 'কলঙ্ক' পড়লো নাকি? কিন্তু কলঙ্ক যে অকলঙ্ক হয়ে বিরাজ করছে। বিজনবাবুর নাটিকাটি অসাধারণ লেগেছিল। সঙ্গে ছিলেন শাশুড়ী প্রভাদেবী। কলঙ্কিনী বৌকে আড়াল করেন

বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ-র পুঁটি

শাশুড়ী। হাড়ি, ডোমের দল। যুদ্ধের ফল বৌ এর গর্ভে সাদা চামড়ার শিশুর জন্ম। একঘরে করে মাতব্বরেরা। কিন্তু সত্যিই কি তাকে দোষ দেয়া যায়? সে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে মারে ঐ মাতব্বরদের মুখে। চলে যায় দিগন্তের দিকে। স্বামী ভুল বুঝতে পেরে ছুটে যায় তাকে ফেরাতে। নাটকের শেষ। কিন্তু অভিজ্ঞতার শুরু।

নানা চরিত্রের মেলা। সৃষ্টির আনন্দে বিধাতার যা আনন্দ, আমাদেরও তাই। তবে সার্থক সৃষ্টি কটাই বা আছে?

বাস্তহারা-র 'দলিল'। স্মৃতির দলিলে সে দলিলেরও একটা স্বাক্ষর আছে। তবে তেমন রেখাপাত তো করে নি। শুধু গণনাট্য সংঘের কনফারেন্স হলো বোম্বেতে। এ নাটকে নিয়ে যাওয়া হলো। বাংলার গৌরব তার নাটকে, এমন প্রমাণ রেখে আসতে পারিনি।

শুরু হলো লিট্‌ল্‌ থিয়েটারের ইতিহাস*। ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়লাম এই গ্রুপের সঙ্গে। সে স্মৃতি সংগ্রামের স্মৃতি। সে স্মৃতি যেমন কঠোর, তেমনি কোমল, যেমন স্বপ্ন, তেমন বাস্তব, যেমন যশের শীর্ষে তেমনি সমস্যায় জর্জর। সে ইতিহাস বিরাট, বিশাল। তা লেখার বাসনা আছে। স্মৃতি র বেইমানি স্মরণ রেখেই সে কাজে এগিয়ে যেতে হবে সময় থাকতে। তবে এটুকু স্বীকার করতেই হবে ভুলিবার মত জিনিষ গুলারে তুলিবার কেন চেষ্টা। ধুলির প্রাপ্য ধুলিরে না দিলে জঞ্জাল জমে শেষটা।

---

* লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপে অভিনীত নাটক ও চরিত্রের তালিকা।

১. ম্যাকবেথ: লেডি ম্যাক্‌বেথ। ২. চাঁদির কৌটো: মেনকা। ৩. বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ: প্রথমে ফতি পরে পুঁটি। ৪. গর্কীর মা: মা। ৫. তপতী: তপতী। ৬. দ্বাদশ রজনী, শেক্সপীয়রের টুয়েলফ্‌থ নাইট: মারিয়া। ৭. সিরাজদ্দৌলা: লুৎফউন্নিসা। ৮ অলীকবাবু: পিসনী। ৯. শোধ-বোধ: বিধুমুখী। ১০. নীচের মহল: অন্নদা। ১১. ছায়ানট: সুচরিতা। ১২. ওথেলো: এমিলিয়া। ১৩ অঙ্গার: বিনুর মা। ১৪. ফেরারী ফৌজ: বঙ্গবাসী দেবী। ১৫. তিতাস একটি নদীর নাম: বাসন্তী। ১৬. রোমিও জুলিয়েট: নার্স। ১৭. প্রোফেসর মামলক: এলেন মামলক। ১৮. কল্লোল: কৃষ্ণাবাঈ। ১৯. অজেয় ভিয়েৎনাম: কিম জুয়েন। ২০. তীর: সাঁনবো ওরাওঁ। ২১. মানুষের অধিকারে: মিসেস লিবোভিট্‌স্‌। ২২. যুদ্ধং দেহি: অজীর্ণকান্তা। ২৩. লেনিনের ডাক: আকুলিনা বাসনোভা। ২৪. চৈতালি রাতের স্বপ্ন: টিটানিয়া।

মধ্যবিত্তের প্রস্তুতি

গ্রুপ থিয়েটারের প্রস্তুতি

মফঃস্বলের একটি নাটক ঃ দুটি প্রযোজনা

নক্ষত্র (বোকারো)-র প্রযোজনায়
সমবেত সওয়াল জবাব

সমবেত সওয়াল জবাব
ক্রান্তিকাল (সোদপুর)-র প্রযোজনায়

রবীন্দ্র ভট্টাচার্য

গ্রুপ থিয়েটার : গণনাট্য ও স্বাধীন থিয়েটারের বৃত্তে

আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে শুনে শশক ত্রিভুবন পার হওয়ার দৌড়ে
একদিন নাকি মেতে উঠেছিল ! ভয় ব্যাপারটার এমন সম্মোহনী শক্তি
আছে যে শশকের অবস্থার কথা ভেবে বনের অন্যান্য প্রাণীরাও তাকে
অনুসরণ করতে বাধ্য হলো। সত্যি কথা বলতে কি, এই আকাশ
ভেঙ্গে পড়ার কাহিনী যত মিথ্যাই হোক না কেন, আমাদের
বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশ নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার আশায়
মাঝে মাঝে আপামর জনগণের মধ্যে 'এই আকাশ ভেঙ্গে পড়ার
গল্প ফাঁদে। আচমকা বিপদের আশংকায় কে না
সর্বনাশের কথা চিন্তা করবে। অতএব পেছন পেছন ছুটতে থাকে।
একই রকম ভাবে বোকা বানানোর কৌশলকে কাজে লাগিয়ে
নাট্যক্ষেত্রে একটা বিরাট গ্যাপ তৈরী করতে পেরেছিল
সাম্রাজ্যবাদী শাসক এবং তার একান্ত বশংবদ চাটুকারের দল।
উনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের
দশক পর্যন্ত না দেখে না বুঝে ছোটা ক্রিয়াটি বেশ তাজা ছিল।
এই জন্যই নীলদর্পণ এবং অন্যান্য দর্পণ নাটকের পর মানুষের মধ্যে
যতদিন জনগণই নায়ক হিসাবে মঞ্চে দেখা না দিল,
ততদিন জনগণ মঞ্চ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করতে বাধ্য হলো।
চল্লিশের দশকে ফ্যাসি বিরোধী লেখক সম্মেলন,
প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ, গণনাট্য সংঘের কার্যক্রম না আসা
পর্যন্ত শহরের পেশাদারী সংস্কৃতিই একমাত্র সংস্কৃতি হিসেবে
গণ্য করা হতো। এই প্রায় শতাব্দীর গ্যাপ তৈরী করেছিল
সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ। ব্রিটিশ বোকা শশকের ভূমিকায় না থেকে
ধূর্ত শৃগালের ভূমিকায় অভিনয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল।
পুরো কালচারটাকে কলকাতা শহরের মধ্যে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে
রাখার জন্য সেই মত প্রচার চালিয়েছিল এবং অর্থ খরচ করেছিল।
সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা ফল পেয়েছিল বৈকি !
অনেককেই আকাশ ভাঙার কথা শুনিয়ে অস্থির করেছিল।
নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির বহর দেখে আরও বেশি শোষণের
পরিকল্পনায় মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল।

সামন্তপ্রভুরা প্রভুপাদ ব্রিটিশ সিংহের এক কাঠি ওপরে থাকত। নিজেদের কদর্য চরিত্রের রূপ প্রকাশ করতো বাগানবাড়িতে। প্রসাদ পেত গাঁয়ের মাথা আর পুরোহিত শ্রেণীর কেউ কেউ। জমিদারের পকেটে থেকে এই সব লোকেরা তার শোষণের কাজে সাহায্য করতো। বাগানবাড়ির বাঈজীর নাচ, খিস্তি-খেউড়ের অনুষ্ঠানকে শুদ্ধ কালচার বলে জনগণের মধ্যে চালিয়ে দেওয়া হতো। গ্রামীণ সংস্কৃতিকে পুরোপুরি গোল্লায় দেবার কাজটা জমিদার এবং মহাজন শ্রেণী বেশ ভালভাবেই চালিয়ে আসছিল। মাঝে মাঝে পূজামণ্ডপে যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানেও বিষয়বস্তুর প্রতি নজর রেখে কাজ করা হয়েছে। মানুষকে শত দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও কি ভাবে সতী-সাধ্বী হতে হয়, বিধাতাই একমাত্র—এ কথা মনে রেখে অন্ধ বাপ-মাকে কাঁধে করে ভিক্ষে করাই পুত্রের একমাত্র কর্তব্য, রাজা এবং পুরোহিতই সব—এরাই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, অতএব গ্রামীণ সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে সরাসরি অস্বীকার করে ইউরো-কালচারের একটা জগা-খিচুরী কালচার প্রবিষ্ট করানো হয়েছিল।

একদিক থেকে চোখ ঝলসান শহর কলকাতার সংস্কৃতি, আবার অন্যদিকে গ্রামের তথাকথিত কালচার অক্টোপাশের মত ঘিরে রাখল সারা দেশটাকে। যেহেতু শোষক তার নিজের শোষণের সুবিধার জন্য কাজটা করেছে সেহেতু শোষিত জনগণ এই ফাঁকি ধরে ফেলে যখনই বাইরে আসার জন্য আন্দোলন করতে চেয়েছে তখনই শাসক সর্বশক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করেছে। সামাজিক অর্থনৈতিক অবিচারের প্রকৃত রূপ সংস্কৃতি থেকে বহুদিন পর্যন্ত উহ্য রাখতে হয়েছিল। যেগুলো ঘটেছে তাকে উদাহরণ হিসাবে খাড়া করা সম্ভব হবে না। ব্যতিক্রম বলাই ভাল। তবে সেই ব্যতিক্রমগুলোকে সামনে এনে এ কথা বলা চলে যে এতে জীবন ছিল। এই একটি দুটিই সহস্র, লক্ষ, অযুতকে প্রেরণা দিয়ে নিজেদের টিঁকে থাকার প্রশ্নটিকে হাতুড়ির ঘা দিয়ে জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল। এরই ফলশ্রুতি বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

একদিকে বিশ্বযুদ্ধ। অন্যদিকে মন্বন্তর। শোষণ শোষণ—আর শোষণ! লক্ষ লক্ষ লোক মরছে। পুঁজিপতিরা গরীবের হাড়ে গড়ে তুলছে ইমারত। শ্রমিক কারখানা থেকে বিতাড়িত, কৃষককে করা হয়েছে জমি থেকে বঞ্চিত, সাধারণ মানুষ খাদ্য-অর্থ-বস্ত্র সব কিছুতেই অভাব দেখতে পাচ্ছে। সর্বহারা মানুষেরা এতদিন ধরে যে ব্যথা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল তারই প্রকাশ যেন দেখতে পেল। প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সঙ্গে জন্ম নিল জনগণের বিপ্লবী সংস্কৃতি। জবানবন্দী, নবান্ন নাটক প্রযোজনার সার্থক রূপের মধ্যেই গণনাট্য সংঘের জন্ম এবং তার সার্থকতার পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশিত হয়ে উঠল।

গণনাট্যের ধারা মানুষের মনে কেন সাড়া জাগাল এবং এখনও সেই ধারা নানা খাতে কেন প্রবহমান তা সেই সময়ের একনিষ্ঠ কর্মী কমরেড নিরঞ্জন সেনের

উদ্ধৃতি থেকে প্রমাণ করা সহজ হবে :

"ভারতীয় গণনাট্য সংঘ কোন ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টায় গঠিত হয়নি—এটা যৌথ প্রয়াসের ফল, সর্বজনীন আদর্শে অনুপ্রাণিত। এটা ছিল জনগণ কর্তৃক, জনগণ সমর্থিত, জনগণের জন্য—এই সর্বজনগ্রাহ্য লক্ষ্যে পৌঁছোবার জন্য একটি সংঘবদ্ধ পরিবার। ...'গণনাট্যের নায়ক জনগণ' এই আদর্শবাণী নির্দেশিত পথে তাঁরা সংগীত, নৃত্য, নাটক এবং ভারতের সর্বভাষা এবং উপভাষার প্রায় সবকটি শক্তিশালী ঐতিহ্যময় লোকশিল্পের মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যাবলী জনগণের সামনে উপস্থাপনা ক'রে দেশবাসীর ব্রিটিশ বিরোধী, ফ্যাসী বিরোধী মানসিকতাকে জাগরূক করে দিতে গণনাট্য কর্মীরা" বদ্ধ পরিকর হলেন। বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনগণের জন্য সংস্কৃতির এই বিরাট দায়িত্ব গণনাট্য গ্রহণ করেছিল বলেই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গ্রাম-মফঃস্বল-শহর সর্বত্রই এই মঞ্চকে মানুষ গ্রহণ করল। মঞ্চে নিজেদের অবয়বকে দেখে জনগণ আরও নিকটবর্তী হলো। মঞ্চকে নিজেদের বলে ভাবতে পারল। সেই সঙ্গে ইউরো-কালচারের কবরস্থ হওয়ার সময় ঘনিয়ে এল। গ্রামে-মফঃস্বলের তথাকথিত কালচারের ভরাডুবি হতে লাগল।

আদর্শ প্রচার করা হতে লাগল শিল্পকে মাধ্যম করে। তাই বলে শিল্পসৃষ্টিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে নয়। শিল্পকে সত্য হতে হবে সে জন্য গণেরা নিজেদের শোষিত হওয়ার কাহিনী বিবৃত করে শাসকের প্রকৃত চিত্রকে তুলে ধরতে লাগল। মহৎ শিল্প হলো মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে। শিল্পকে সব সময় আদর্শধৃত হতে হবে। সে আদর্শ-প্রচারে শিল্পের শিল্পত্ব হানি হয় না, তা প্রমাণিত হলো। স্বর্গীয় সাধন ভট্টাচার্যের কথায়—প্রত্যেক মহৎ শিল্পই এক অর্থে প্রচারধর্মী শিল্প। সুস্থ সুন্দর রুচিশীল শিল্প যা পেশাদারী মঞ্চ থেকে বাইরে চলে আসতে পেরেছিল, পুঁজিপতি এবং সাম্রাজ্যবাদীদের পচা গলা একঘেঁয়ে রুচিবিকারগ্রস্ত রোগীর বমনসদৃশ উদ্দেশ্য প্রণোদিত তথাকথিত শিল্পকর্মের নাগপাশ ছিন্ন করতে পেরেছিল তার কারণ গণনাট্যের মহৎ আদর্শ। নতুন সংকল্প, নতুন কর্মপন্থা নিয়ে শোষিত মানুষ নিজের প্রয়োজনে গণনাট্যের এই সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে বিভিন্ন গ্রুপ থিয়েটার সংগঠনের মাধ্যমে স্বাধীন থিয়েটারের প্রবর্তন করল।

স্বাধীন থিয়েটার যখন পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে সাধারণ মানুষকে শোষণের বিরুদ্ধে একত্রিত করে সংগ্রাম করে চলেছে তখন শিল্পব্যবসায়ীরা বুঝতে পারল শ্রেণী-সংগ্রাম সমাজের অন্তঃস্থলে কি ভাবে অনুপ্রবেশ করেছে। গণনাট্যের বলিষ্ঠ সংগঠনকে ভাঙবার কাজে তারা সচেষ্ট হলো। স্বাধীন থিয়েটার-এর বলিষ্ঠ কর্মীদের নানাভাবে কেনাবেচা চলতে লাগল। আদর্শ নিষ্ঠায় সকলকে আজকের অর্থনীতিতে পাওয়া যাবে এ চিন্তা করা অন্যায়। যার ফলে শহরাঞ্চলে

নানা ছলছুতো করে দল থেকে অনেকেই বেরিয়ে নতুন দল গড়লেন। আদর্শের বুলি মুখে রেখে প্রায় পেশাদারী হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করলেন। শাসক মনে করেছিল এইভাবে এ আন্দোলনকে শেষ করা যাবে। কিন্তু তারা এর ব্যাপকতা সম্বন্ধে ভুল ধারণা করে রেখেছিল। অ্যাবসার্ড নাটক, অন্য নাটক নাম দিয়ে অনেক বজ্জাতি হলো। আসলে আদর্শবাদী সত্তা ও শিল্পী সত্তাকে একসঙ্গে সকলের মন থেকে মুছে ফেলা কোনক্রমেই সম্ভব হলো না। বিপরীত ভাবে বৃহত্তর অংশ নতুন রীতি ও প্রগতিকে আঁকড়ে ধরে পথ চলা শুরু করল।

সার্বজনীন মুক্তির আদর্শ প্রচার করবার জন্য যে সংস্কৃতি, তা শুধু শহর কলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। শাসকশ্রেণী অনেক চেষ্টা করেও গ্রাম-মফঃস্বলে এর জোয়ারকে আটকে রাখতে পারে নি। এ জন্য শহর কলকাতার বাইরে সমস্ত রকম অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও গ্রুপ থিয়েটার তথা স্বাধীন থিয়েটার আন্দোলন চ্যালেঞ্জ জানিয়ে চলেছে, পদ্ধতির পরিবর্তন করে, গ্রামের মঞ্চ স্থায়ী হোক বা না হোক, আঙ্গিক যতটুকুই হোক, নাটক অভিনীত হয়ে চলেছে। সকলের সমবেত প্রচেষ্টায়, যেমন সমবায় ব্যাঙ্ক ইত্যাদি খোলা হয়, তেমনি মফঃস্বলে গ্রামে বহু গ্রুপ থিয়েটারের প্রচেষ্টায় প্রতিযোগিতা এবং নাট্যোৎসবের আসর বসিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ নাটক, সংগীত, নৃত্য অস্থায়ী মঞ্চে হয়ে চলেছে। মেহেনতি মানুষের জীবন-জীবিকা সেই সঙ্গে সুখ দুঃখ এবং তার জন্য সংগ্রামের কথা থাকায় অধিক মানুষ ক্রমশঃ এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছে। গ্রামাঞ্চলের গম্ভীরা, ছৌ, রসিয়া, কবির লড়াই সামন্তপ্রভুদের চাটুকার বৃত্তি ছেড়ে শোষণের রূপকে মঞ্চে এনে হাজির করছে। এই বিপ্লবী বিষয়বস্তু আগামী দিনকে আরো আলোকময় করতে সাহায্য করছে বলেই স্বাধীন থিয়েটার আন্দোলনের প্রতি একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের আগ্রহ বেড়েছে, তেমনি শাসক শ্রেণীর অপ্রত্যক্ষ নির্দেশে আঙ্গিকের বাড়াবাড়ি করে মানুষের মনকে ভোজবাজি দিয়ে সম্মোহিত করার প্রচেষ্টাও চলেছে।

স্বাধীন থিয়েটার যা এই শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে মানুষ নিজের প্রয়োজনে গণনাট্য সংঘ মারফৎ গ্রহণ করেছে তাকে গ্রামীণ করে না তোলবার প্রচেষ্টা সমানে চলেছে। বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে আজ এই থিয়েটার সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছে সত্য, কিন্তু একে আরও উন্নত এবং শক্তিশালী করে একশ ভাগ সত্যি-কারের জীবনের রূপ আনার জন্য শ্রমিক-কৃষকের অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই সংস্কৃতির নেতৃত্ব তাদের হাতে পৌছচ্ছে ততক্ষণ এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য হয়েছে বলে আমরা দাবি করতে পারি না।

জোছন দস্তিদার

গ্রুপ থিয়েটার : শিল্প ও সামাজিক দায়িত্ব

মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব, সেই হেতু
এই সমাজের প্রতি তার দায় দায়িত্বও প্রচুর।
মানুষ তার ব্যক্তিগত জীবনে যে কাজই করুন না কেন, সেই
কাজের সুফল এবং কু-ফল সমাজের ভাল এবং খারাপ করেই,
প্রত্যক্ষ ভাবেই হোক আর পরোক্ষ ভাবেই হোক। মানব-সভ্যতার
বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক রূপ-রেখারও পরিবর্তন ঘটেছে
প্রতি সময়ে, প্রতি ক্ষেত্রে। এই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে
জন্ম নিয়েছে শ্রেণী-বৈষম্য, জন্ম নিয়েছে সুবিধে-
ভোগী শ্রেণী—জন্ম নিয়েছে মানব সভ্যতার
থেকে সব কিছু বঞ্চিত নিষ্পেষিত শ্রেণী।
মানব ইতিহাসের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত যদি
ধারাবাহিকতার খতিয়ান নেওয়া যায়—দেখা যাবে
এই সুবিধেভোগী শ্রেণীর মানুষরাই শিল্প
সাহিত্য সৃষ্টির সুবিধে পেয়েছেন এবং সৃষ্টি করেছেন।
প্রথম মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েট রাশিয়ায় এক
নতুন ধরণের সামাজিক প্রথার পত্তনি ঘটে।
যেখানে মূল লক্ষ্য ছিল সমাজে কোনো শ্রেণী থাকবে না।
সকলে সব কাজ করার সুযোগ এবং সুবিধে পাবে,
যথার্থ গুণ প্রকাশের যথাযথ পথের নিশানা
নিরিখ ও তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ সমাজের।
সেখানে কোনো ভেদাভেদ চলবে না। মানব সভ্যতায় এ
এক নতুন চিন্তাধারার সংযোজন। এই সংযোজন শ্রেণী-
বৈষম্য পূর্ণ দেশের প্রত্যেক মানুষের মনে নতুন
করে আদ্যোপান্ত ভাববার সূত্রপাত ঘটাল।
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সারা পৃথিবীর প্রায় চার ভাগের দেড় ভাগ
মানুষের শ্রেণীগত বঞ্চনার শিকল মুক্ত হলো।
মানুষের ভাবনা-চিন্তার স্রোতও নতুন ধারায় বইতে শুরু করলো।
যে সমাজ ব্যবস্থাকে এতদিন ধরে তারা জানতো যে,

এ ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন কোনো কালেই সম্ভব নয়—তাঁরা নিজের চোখে দেখল, তা ভাঙা সম্ভব, পরিবর্তন করা সম্ভব। মানুষের যত রকম গুণ, তাকে প্রকাশ করার সব রকম রাস্তা মুক্ত করা সম্ভব।

সেই শুভ সূচনা থেকেই বাংলা নাট্য ইতিহাসের গতি এক দারুণ ভিন্ন চিন্তায় এবং ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করলো। সেদিন এই কাজের পুরোধায় যাঁরা ছিলেন তারাও কিন্তু আমাদের সেই সুবিধেভোগী-শ্রেণী থেকে আগত। যাঁরা লেখাপড়া করার সুযোগ পেয়েছেন, যাঁরা বিশ্বমানব ইতিহাস জানবার সুযোগ সুবিধের অধিকারী, তারাই সেদিনের সেই নাট্য-সূচনার অগ্রণী বাহিনী। এই সুবিধেভোগী মানুষরাই কেন শ্রেণীবিভক্ত সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন এবং আজও চাইছেন তার বিস্তারিত আলোচনার সুবিধে এই নিবন্ধে নেই। এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে গ্রুপ থিয়েটারের নাটক ও তার সামাজিক দায়িত্ব।

যে কোন সাহিত্য, শিল্প সমকালীন মানব-জীবন দর্পণ। নাট্যশিল্প অবশ্য-ম্ভাবী ভাবেই সমকালীন। সময়ের পরিবর্তেনর সঙ্গে সঙ্গে সেই নাটকের মূল্যও ক্ষীণ হয়ে যায়। বেশির ভাগ নাটকের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা আর থাকে না। তখন সেই নাটক সমকালীন 'মানব ইতিহাসের' পংক্তিভুক্ত হয়ে যায়।

যেহেতু নাটকের উপাদান মানুষ এবং মানুষের সামাজিক জীবন, সেই হেতুই সেই সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ অতি অবশ্যই নাটকে থাকতে হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানব সমাজের যেমন ক্ষতি করেছিল—তেমনি বহু মঙ্গলের জন্ম দিয়ে গেছে। এই বাংলা দেশ তখন দ্বিধা-বিভক্ত হয় নি। এই বিশ্বযুদ্ধে একদল মুনাফাবাজ কালোবাজারী ব্যবসাদার মানুষের মুখের অন্নকে মজুত করে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করেছিল। জন্তুর মত মানুষ পথে পথে ছুটো অন্নের জন্য ময়লা ডাস্টবিন থেকে ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে নিজেদের উদর পূরণের চেষ্টা করেছিল, বহু শত মানুষের অকাল মৃত্যু ঘটেছিল কলকাতার রাজপথে। শ্রেণীহীন সমাজের প্রবক্তারা মানবতার এই জঘন্য অবমাননার বিরুদ্ধে তাদের সব রকম প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন সেদিন। জন্ম নিয়েছিল গণনাট্য সংঘ, সৃষ্টি হয়েছিল নবান্ন নাটকের।

এই প্রথম একদল শ্রেণীহীন সমাজের প্রবক্তা, মানবদরদী সমাজ সচেতন মানুষ, নাট্যশিল্পকে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার না করে এই দুর্ভিক্ষের কারণ বিশ্লেষণ করে গ্রামে-গঞ্জের মানুষকে বোঝাবার ব্রত নিয়ে কাজ শুরু করলেন। এঁরা কেউ কোন কাজের জন্যে কোন পয়সা পেতেন না এবং তাঁরা দাবিও করতেন না। এঁরা সবাই অপেশাদার, সমাজ সচেতন শিল্পী।

সেই আদর্শবাদী শ্রেণীহীন সমাজ-সংগঠকদের অপেশাদারী নাট্য-প্রবাহের ধারাবাহিকতা অবলম্বন করে আজ বহু নাট্যদল শতধায় বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন

জায়গায় কাজ করে চলেছেন। এই সব নাট্যদলই গ্রুপ থিয়েটার। আজ তাঁদেরও মূল বক্তব্য – শ্রেণীহীন সমাজ, শোষণহীন সমাজ। যে সমাজে শোষণ থাকবে না, থাকবে প্রত্যেক মানুষের সুস্থ সবল জীবন ধারণের পূর্ণ অধিকার এবং তাদের সৃজনীশক্তি প্রকাশের সমান সুযোগ।

এবারে আসা যাক আজকের নাটকের কথায়, গ্রুপ থিয়েটারের কথায়। উল্লিখিত পথিকৃতদের পথ ধরে আজকের নাট্যকাররা কি পারছেন আজকের শোষিত মানুষের কথা বলতে? পারছেন কি বিভিন্ন গ্রুপ থিয়েটার তাদের সুখ-দুঃখের, মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে বাঁচার শরিক হতে? বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, আমি বলবো—না, পারছেন না হতে। এই না পারার কারণ কিন্তু বহু গভীরে। ইদানীংকালে যারা নাটক লেখেন তাঁদের এই নাট্য রচনার সময় হচ্ছে তাদের অন্য কাজ (যে কাজ করে তাদের জীবন চালাতে হয়) করার পর। তাঁদের পারিবারিক আর্থিক অবস্থা অতি ভয়াবহ। মাসের দশ-পনের তারিখের পর তাঁদের ধার করে সংসার চালাতে হয়। ধরা বাঁধা রোজগারের নিয়মিত কাজ ছাড়াও তাদের সংসারের আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে নিয়মিত কাজের সময়ের পরেও অন্য কাজ করতে হয়। সব কাজ মিটিয়ে কিংবা দু চার দিন সব কাজ থেকে ফাঁকি দিয়ে তাঁদের নাটক লেখার কাজ করতে হয়। এতে হয়ত নাটক লেখা হয়, কিন্তু ভাল নাটক লেখা হয় না। সেই কারণেই ইদানীং ভাল নাটক লেখাও হচ্ছে না। ভালো নাটক লেখা না হলে ভালো প্রযোজনার কোনো প্রশ্নই আসে না।

গ্রুপ থিয়েটার-এর বর্তমান অবস্থা কি? প্রথমত নাটকের অভাব, দ্বিতীয়ত মহলা ঘরের অভাব, তৃতীয়ত অভিনেতৃর অভাব, চতুর্থত মঞ্চের অভাব, পঞ্চমত দর্শকের অভাব, সর্বোপরি দারুণ অর্থের অভাব। এ ছাড়াও দলের বেশির ভাগ কর্মীর সময়ের অভাব। এই অবস্থা কি থিয়েটারের বেলায় একমাত্র প্রযোজ্য? সহজ উত্তর—না। নাটক লেখে মানুষ, নাটক করে মানুষ, নাটক দেখে মানুষ, নাটকের বিষয়বস্তু মানুষ। বর্তমানে সেই মানুষের অবস্থা বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে নাট্য ও নাট্যপ্রযোজনা ভাল হচ্ছে না কেন? বর্তমানে বেশির ভাগ মানুষ অর্ধাহারে-অনাহারে জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। যারা লেখা পড়ার সুবিধে পেয়েছে, তারা সেই লেখা পড়াকে কাজে লাগাবার জায়গা পাচ্ছে না, যারা কষ্ট করে যে কাজই শিখে থাকুক না কেন, কেউ সেই কাজকে ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে না। কারণ, এই সব কাজের সুযোগ দেবার মালিক আজ গোটা কয়েক পরিবার মাত্তর। এই সরকারের হাতে সুযোগ অতি নগণ্য। কেন না কাজের জায়গার মধ্যে বেশির ভাগ জায়গার মালিক সেই উল্লিখিত গোটা কয়েক পরিবার। যতদিন না দেশের সব কিছুর মালিক এই দেশের মানুষ অর্থাৎ সরকার হচ্ছে—ততদিন মানুষের বৃহত্তর অংশের কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না।

এমন কি তারা তাদের ন্যূনতম বাঁচার সুযোগও পাবে না। সুতরাং এই সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে না পারলে সাধারণ মানুষের চলমান জীবনের পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নেই। মানুষের জীবনের কোনো পরিবর্তন না হলে তাদের সৃষ্ট কোনো কিছুরই পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়। এ-প্রসঙ্গে চীনের বিশ্ববিখ্যাত লেখক লু-শুনের একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করছি। তিনি লিখেছেন:

'একবার এক সাহিত্য বাসরে আমি আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। এই আসরের আয়োজন করেছিল সাংহাই ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা। তখন গোটা চীনদেশ জুড়ে চলেছে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ। দেশে সত্য কথা বলা – সত্য কাজ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। অর্থনৈতিক-সামাজিক অবস্থা এমন এক ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল যে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিল। এমতাবস্থায় সাহিত্য-বাসরের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল: সাহিত্য ও তার সামাজিক দায়িত্ব। আমি কখনও কোথাও কোন প্রবন্ধ বা সাহিত্য-শিল্প সম্বন্ধে কিছুই লিখিত অবস্থায় নিয়ে যেতাম না। উল্লিখিত সাহিত্য বাসরেও আমি লিখিত কিছুই নিয়ে যাই নি। ভেবেছিলাম সাহিত্য-বাসরে যাবার দীর্ঘপথ যখন বাসে যাব, তখন আমি সাহিত্য-বাসরে কি বলব ভেবে নেব।

জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষের তখন স্বাধীন মত প্রকাশও ছিল এক রকম অসম্ভব। বাসে চড়লাম আমি। বসবার জায়গাও পেলাম এবং ভাবতেও শুরু করলাম। কিন্তু ভাবা গেল না। কেন না সারা রাস্তাটা এত ভাঙ্গা-চোরা, এবড়ো-খেবড়ো যে আমি নিজের শরীরকে ঝাঁকুনির হাত থেকে বাঁচাতেই ব্যস্ত হয়ে রইলাম। পড়ে যাবার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতেই সাহিত্য-বাসরের নির্দিষ্ট জায়গায় এসে বাস দাঁড়াল। আমাকে নেমে যেতে হলো। সাহিত্য-বাসরে আমি কি বলবো তা আর আমার ভাবা হলো না! নির্দিষ্ট সময়ে আমাকে আমার বক্তব্য পেশ করার জন্যে ডাকা হলো। আমি আমার বক্তব্য পেশ করতে উঠলাম। শ্রোতৃমণ্ডলীকে বললাম—আমি কেন ভেবে আসতে পারি নি। বাড়ি থেকে আসরে আসার রাস্তার কথা বললাম। বললাম ঝাঁকুনির কথা। আমার অপারগতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলাম। কিন্তু এই পথের ঝাঁকুনি থেকে আমার এক নতুন বলার কথা জন্ম নিয়েছে, আমি সেইটেই আপনাদের কাছে পেশ করতে চাই। আজ গোটা চীন দেশের অবস্থা ঐ রাস্তার মত ভাঙ্গা-চোরা, এবড়ো-খেবড়ো। মানুষ বাঁচবার চেষ্টা করেও হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, বাঁচতে পারছে না। যেমন পথে বাসের ঝাঁকুনিতে সিটে বসতে পারছিলাম না, হুমড়ি খেয়ে পড়ছিলাম। আসুন আমরা সবাই মিলে আমাদের এই পবিত্র মাতৃভূমি মহান চীনদেশের সারা শরীরের ক্ষত সারাবার চেষ্টা করি। চেষ্টা করি, সুস্থ চীনদেশের জন্ম দিতে। যেখানে মানুষ বাঁচবার সব সুযোগ পাবে, ভাববার অবকাশ পাবে। ভাবনারও

অবকাশ চাই, স্থান চাই, নিজস্ব পরিবেশ চাই। যতদিন তা না পারবো ততদিন জীবনধর্মী সাহিত্যের জন্ম হওয়া এক নিদারুণ অসম্ভব কাজ।'

লু-শুনের নিবন্ধের সঙ্গে আজকের আমি সম্পূর্ণ একমত। আজ আমাদের সারা দেশ এক প্রচণ্ড ক্ষতি এবং পচনের পথ ধরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলছে। সমগ্র দেশের মানুষের এই মুহূর্তের পবিত্র কাজ হলো দেশকে এই ক্ষয় এবং পচনের হাত থেকে বাঁচানো।

সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য সব রকম প্রচেষ্টায় নিজেদের যুক্ত করা, ভাববার পরিবেশ সৃষ্টি করা, চিন্তার এক পবিত্র কুলায় তৈরী করা। সব কাজেরই নিজস্ব পরিবেশের একান্ত প্রয়োজন। যতদিন না এই প্রয়োজন মেটাতে পারছি ততদিন শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির নামে সৃষ্টি সৃষ্টি খেলা চলবে। জীবনধর্মী সাহিত্যের সৃষ্টি হবে না। তার মানে এই নয় যে যতদিন না আমরা পরিবেশ তৈরী করতে পারছি, ততদিন শিল্প রচনা বন্ধ রাখতে হবে। যেমন বর্তমানে সামাজিক অবস্থায় সাধারণ মানুষকে বাঁচতে দেওয়া হচ্ছে না – কিন্তু তারা নানা পথে নানা ধরণের প্রচেষ্টায় বাঁচবার জন্যে লড়াই করে চলেছে – তেমনি শিল্পকর্মী মানে শিল্পীদেরও নিজের শিল্পকে বাঁচাবার চেষ্টা করে যেতে হবে। এরই মধ্যে টিঁকে থাকার দুরন্ত ইচ্ছেকে জ্বলন্ত লেখায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালাতেই হবে। প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়মেই মানুষ কখনও কোনো অবস্থায় থেমে থাকাকে মেনে নেয়নি – নিতে পারে নি। তেমনি আজও পারবে না। যারা থেমে থাকার প্রবক্তা, যারা জীবনকে ছলে-বলে কৌশলে পিছু-টানে আটকে রাখতে চায় তাদের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ করার সাহস ও শক্তির প্রচার করাই আজকের সমাজ সচেতন শিল্পীর মূল কর্তব্য এবং পবিত্র দায়িত্ব।

সুশান্ত রায়

গ্রুপ থিয়েটার এবং তার দর্শক জনগণ

এই গ্রুপ থিয়েটার এবং তার দর্শক জনগণের প্রসঙ্গে
অনেক কথাই এসে যায়। এসে যায় সামাজিক,
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা।
এসে যায় দর্শকদের মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্যের কথা।
এসে যায় নাটক ও নাট্যগোষ্ঠীগুলির
কথা। চার পাশের সংকটের কথা।
এই চারপাশের আবর্তিত সংকটের মধ্যে
আমরা যারা মধ্যবিত্ত, যারা ডিক্লাস্‌ড হতে চেয়েও
সদা সচেষ্ট আপার ক্লাসে উঠতে, সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই
শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বড় শিকার।
যে আমরা লড়াই করছি শ্রেণীহীন
সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার, সেই আমাদেরই একাংশ আবার শোষক
শ্রেণীর তাঁবেদারি করছি বেশি বেশি। আজকের
গ্রুপ থিয়েটার এবং তার দর্শক জনগণের
মধ্যে এই মধ্যবিত্ত মানসিকতার দ্বন্দ্বই প্রকট।
একই সঙ্গে প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল।
রাজনৈতিক লড়াই যত তীব্র হচ্ছে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও
প্রত্যেক শিবিরের পক্ষে নিজেদের মতামত প্রচারের জন্য
নাটকের ব্যবহারের প্রয়োজন তথা
নিজেদের নাটকের দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।
আর তাই মধ্যবিত্ত দর্শক-সমাজও দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে।
এক সচেতন দর্শক শিক্ষিত এবং নিরক্ষর গ্রামীণ কৃষিজীবি
বা কারখানার শ্রমজীবী জনগণ—এই একটা ভাগ।
দুই অচেতন দর্শক অর্ধ-শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত—এই নিয়ে
আর একটা ভাগ। এই দুই শ্রেণীর দর্শক নিয়েই সামগ্রিক দর্শক জনগণ।
সচেতন দর্শকরা শুধু মাত্র মনোরঞ্জনের জন্য নাটক দেখতে আসেন না।

এরা নিজেদের আদর্শ সম্পর্কে সচেতন এবং জীবনের সঠিক প্রবাহ কোন অভিমুখী সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ রূপে অবহিত। এরা প্রগতিশীল এবং যুক্তিবাদী। এরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকা ও তাদের নিজেদের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। এরা বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর দ্বারা অভিনীত নাটকগুলো দেখে থাকেন। প্রগতিশীল তথা শোষিত মানুষের আদর্শ, মতামত, যা জীবনকে সার্বিকভাবে মুক্তি এবং স্বাধীনতা লাভে সাহায্য করে, তাকে নিয়ে লড়াই করবার দায়িত্ব স্বাভাবিক ভাবে এসে পড়ে সচেতন দর্শক সমাজ এবং সেই আদর্শ ও সম-মতাবলম্বী নাট্যগোষ্ঠী গুলির ওপর। সচেতন দর্শককে নাটকের গুণাগণ বিচার করতে হয় আদর্শ অনুসরণের পরিপ্রেক্ষিতেই।

এই দর্শকই নাটকের মতাদর্শগত পার্থক্যটুকু উপলব্ধি করতে পারেন। এবং এই লড়াইকেই বড় করে দেখেন। এরা সবকিছু গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে তারপর মতামত ব্যক্ত করেন। এরা মতাদর্শগত বিরোধের সাথে কোনমতেই আপোষ করেন না, কারণ তা জীবনকে উত্তীর্ণতায় পৌছতে সাহায্য করে না, এবং সামগ্রিক কল্যাণ ও অগ্রগতিকে উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যেতে মদত দেয় না। সচেতন দর্শক জীবনের সংস্কারমুক্ত উন্নত-স্তর ও মূল্যের জন্য আগ্রহী। তাই কালোত্তীর্ণ নাটকের পথের অন্তরায়গুলো সরাতে এই দর্শক সক্রিয়ভাবে জোর দিয়ে থাকেন। সচেতন দর্শকের রসগ্রাহী মনোভাবের দরুণ নাট্যকার, তথা অভিনেতা ও অভিনেত্রীরাও প্রভাবিত হন। নাটকের মধ্যে, অভিনয়ের মধ্যে কুশলতাকে এই দর্শকই বুঝতে পারেন এবং তাকে সঠিক পথে নিয়ে যাবার জন্য সচেষ্ট হন এবং প্রয়াস চালান; জনগণের সাথে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে চান। অর্থাৎ সঠিক মতাদর্শের প্রতি নাট্যগোষ্ঠীর কর্মধারাকে চালিত করবার জন্য, এই দর্শকরাই অভিনেতা অভিনেত্রী এবং নাট্যকারকে প্রভাবিত করেন এবং অনুপ্রেরণা যোগান। সঠিক আদর্শ অর্থাৎ প্রগতিশীল চেতনার প্রতি আস্থা না থাকলে এবং সচেতন দর্শকদের এই অনু-প্রেরণা কাজে লাগাতে না পারলে জনগণের সাথে সেই গোষ্ঠী, তথা নাট্যকার, অভিনেতা, অভিনেত্রী এবং অন্যান্য কলাকুশলীদের সাথে সাধারণ মানুষের ব্যবধান সঠিক কারণেই বাড়তে থাকে এবং অবশেষে সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

অচেতন দর্শকরা সচেতন দর্শকদের দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়ে নাটক দেখার প্রতি আগ্রহী হন। এরা নাটকের বিষয়বস্তু এবং অভিনয়াংশের ওপরেই বেশি জোর দিয়ে থাকেন। এরা নাটকের গোষ্ঠীদের কাছে লক্ষ্মীস্বরূপ। মানে এরা এসে দেখলে টেখলে সাধারণ দর্শকেরা এসে ভীড় করে, ফলে শিক্ষিত দর্শক যারা সংখ্যায় অল্প, তারা যেন প্রায় বস্তুতঃ উপেক্ষিত হন। এরা থিয়েটারের মূল লক্ষ্যের দিকে এমন ভাবে তাকান যেন এরা থিয়েটারের

সব জেনে বসে আছেন। অর্ধ-শিক্ষিত দর্শকের যে অভিমান প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করে তাতে কোন কোন ক্ষেত্রে নাট্যগোষ্ঠীর সুবিধা হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষতিও হয়। এরা সুচিন্তিত মন্তব্য করতে জানেন না ফলে অশিক্ষিত দর্শকেরা এদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নাটকের ভালো মন্দ, উৎকর্ষ অপকর্ষ ইত্যাদি বিচার না করেই সেটিকে বর্জন অথবা গ্রহণ করে বসেন। ফলে কোন গোষ্ঠী ভালো নাটক মঞ্চস্থ করেও দেনার দায়ে দর্শকের অভাবে লালবাতি জ্বালেন, আর কোন গোষ্ঠী ততো ভালো কাজ না করেও দিব্যি উতরে যান। অর্ধ-শিক্ষিত দর্শকদের কিছু অংশ নিজেদের 'ইনটেলেক্‌চুয়াল' ভাবেন এবং হাব-ভাবে তা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেন। এরা নাট্যগোষ্ঠীদের কোনও ভাবে প্রভাবিত করতে পারেন না যদিও তারা তার জন্য সচেষ্ট হন। থিয়েটার রক্ষার মহান দায়িত্ব তাদের কাঁধে ন্যস্ত, তারা নিজেরা অন্ততঃ তাই ভাবেন এবং এই ভাবনার ফলে মাঝে মাঝে হাস্যকর কাজকর্ম করে থাকেন।

এই অর্ধ-শিক্ষিত দর্শকদের একাংশ আবার সমালোচকের মধ্যে বিদ্যমান। এরা নাটকের 'ডি-সেকশন' করে দেখে নেন, যে-'নাটকের বুকের মধ্যে নাটক আছে কিনা'। এরা বিশেষ ভঙ্গীতে গিয়ে প্রেক্ষাগৃহে বসেন। দাদা সম্বোধনে আপ্যায়িত হন এবং ইত্যাদি ইত্যাদির পর সমালোচনায় লেখেন, 'এখানে ক-এর বদলে খ হইয়াছে।' ঠিক কি হলে ভালো হয় তা তারা জানেন না বলে, গঠনমূলক সমালোচনার পথ এরা পরিহার করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে গঠনমূলক সমালোচনা একমাত্র সচেতন দর্শকের দ্বারাই সম্ভব। এই শিক্ষিত দর্শকের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প বলেই অর্ধ-শিক্ষিত দর্শকেরা নাটকের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাঁকিয়ে বসে আছেন, এবং এরা ভেবে নিয়েছেন এদের হাতে ক্ষমতা যথেষ্ট। সুতরাং এদের সমালোচনার মূল্য অনেকখানি জুড়ে আছে থিয়েটারের ক্ষেত্রে যা থেকে থিয়েটারে ক্রমশঃ অবক্ষয় এসে বাসা বাঁধতে শুরু করেছে এবং শিক্ষিত দর্শকদের দায় দায়িত্ব আরো অনেক বেশি পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে এই অর্ধ-শিক্ষিত দর্শকদের অসুস্থ আচরণের ফলে।

অর্থনৈতিক সংকটের সাথে সাথে সামাজিক সংকট এবং অবক্ষয় এসে গিয়েছে মানুষের জীবনে। নাট্য বা নাট্য আন্দোলনও এই সংকট থেকে অব্যাহতি পায় নি। এতে নাটক ও থিয়েটারের মধেও বহু বেনো জল ঢুকে গেছে। নাটক ও থিয়েটারের ক্ষেত্রে শিক্ষিত অশিক্ষিত অভিনেতা অভিনেত্রীরা সহ অবস্থানে বাধ্য হয়েছে। এই চাপের মধ্যে হু হু করে অর্ধ-শিক্ষিত দর্শকেরা দখল করে নিচ্ছে এই থিয়েটার এবং সাংস্কৃতিক জগতের নিয়ন্ত্রণের দায়ভার।

ফলে বেড়ে চলেছে অশিক্ষিত দর্শকের সংখ্যা। যৌনতা জাঁকিয়ে বসছিল বেশ কিছু গ্রুপ থিয়েটারের প্রযোজনায়। পেশাদারী মঞ্চের কাছে আত্মসমর্পণ অথবা আঁতাত, কিংবা অপেশাদারী নাট্যমঞ্চের নব জাগরণ এটা স্থির করবার সময়

এসেছে এখন। অশিক্ষিত দর্শকেরা নাটক ভালোবাসেন নিজেদের স্বার্থে। টাকা পয়সা, গাড়ি বাড়ি ইত্যাদি যেমন সামাজিক মর্যাদার মানদণ্ড স্বরূপ তার সাথে বর্তমানের তথাকথিত আভিজাত্যের মানদণ্ড স্বরূপ ধার্য হয়েছে গ্রুপ থিয়েটার বা অপেশাদারী থিয়েটারগুলিতে নিয়মিত হাজির হওয়া (অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে)। নাটকাভিনয় দেখতে এসে সমাজের কর্তা ব্যক্তিদের সাথে কার কতোটা মাখামাখি, তা নিয়ে আলোচনা করা, অথবা নাটকের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে 'পটাটো চিপসের' প্যাকেট শব্দ করে খোলা এবং অন্যের মনোযোগ বা নিবিষ্টতা ভঙ্গ করা যেন একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা বিশেষ কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর অভিনয়ের প্রতি অন্ধসমর্থন এবং অনুরক্ততায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। 'তিনি বা তাহারা ভুল করিলেও উহা অমৃত সমান' গোছের একটা ব্যাপারে তারা বিশ্বাস করেন এবং বিশেষ উৎসাহিতও বোধ করেন। এরা পুরোপুরি অশিক্ষিত দর্শক। অথচ এদের বাদ দিয়ে নাটকের দর্শকের কথা চিন্তা করা বাতুলতা। শহরের এই অশিক্ষিত দর্শকেরা প্রতারিত হলেও মুখে তা প্রকাশ না করে বিশিষ্ট বোদ্ধার ভাণ করে ফিরে যান। কিন্তু গ্রামে যেখানে সচেতন দর্শক অথবা অভিনেতা অভিনেত্রীর বড় অভাব (গ্রামীণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর জন্য যা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে পরিস্ফুট এবং যা প্রগতিশীল চেতনার প্রসার লাভ না হওয়ার দরুণ উদ্ভূত) সেখানের অশিক্ষিত দর্শকেরা অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন নাটকের প্রতি। ফলে নাট্যসংস্থাকে বাঁচিয়ে রাখা কষ্টকর হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি সংকটের চাপের পরেও দর্শককুলের যে অসন্তুষ্টির চাপ আসে তাকে অতিক্রম করা সহজসাধ্য হয় না সেই ঝঞ্ঝাপীড়িত নাট্যগোষ্ঠীসমূহের। এর পরেও আছে অর্ধ-শিক্ষিত দর্শকের সবজান্তার ভাণ ও অসম আচরণ।

অপেশাদারী নাট্যসংস্থাগুলোরও জনগণকে শিক্ষিত করার কাজের দায়িত্ব নেয়া উচিত। যৌন-আবেদন মূলক নাটক দেখবার প্রবণতাকে রুখতে গেলে, এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে, পাশাপাশি বলিষ্ঠ ও সৎ নাটকের প্রযোজনা করা দরকার। মানুষের চেতনার মানকে ধীরে ধীরে উন্নত ও সম্প্রসারিত করা দরকার। তাতে যেমন দর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, তেমনি নাট্য সংস্থাগুলোরও নাটক পরিবেশনে দৃঢ়তা ও আস্থা বাড়বে। অর্ধ-শিক্ষিত দর্শকের দাপট কমবে এবং সমালোচনার নতুন দিক উন্মোচিত হবে।

অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে লড়াই-এর কথা যারা ভাবেন বা ভাবছেন, তাদেরও নিজেদের সেইভাবে প্রস্তুত করবার জন্য প্রয়াসী হতে হবে। যারা নাটক লিখবেন, অভিনয় করবেন, বা মঞ্চের ভেতরের কাজ করবেন তারা থিয়েটারের ভেতরের লড়াই করবেন, আর দর্শক জনগণ বিশেষ করে সচেতন দর্শক জনগণ করবেন বাইরের লড়াই, কারণ ভেতরের ও বাইরের লড়াই-এর অগ্রণীর ভূমিকা তো তাদেরি।

নাটক : লোহিত কণা

নাট্যকার : স্বরূপ ব্রহ্ম। জন্ম : ১৯৩৯। পেশা : সরকারী কর্মচারী। কল্লোল-এর সঙ্গে গোড়া থেকেই যুক্ত। এঁর পূর্ণাঙ্গ নাটক : ষড়যন্ত্র, প্রজাপতি, ঋষি ইত্যাদি। একাঙ্ক নাটক : মাটি, মেঠো ঝড়, অদ্ভুত পাঁচালী ইত্যাদি।

রচনাকাল : ১৯৭৭

চরিত্রলিপি : বৃদ্ধ। অল্পবয়সী। ১ম যুবক। ২য় যুবক। জনি।

প্রথম অভিনয় : নভেম্বর ১৯৭৭, আঢ্যবাড়ী, কামারপাড়া, চুঁচুড়া।

প্রযোজনা : কল্লোল, চুঁচুড়া। অভিনয়শিল্পী : বৃদ্ধ পরিতোষ বসু। অল্পবয়সী প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। ১ম যুবক সৌরেন সোম/কুশল সেন। ২য় যুবক উৎপল গঙ্গোপাধ্যায়। জনি বিশ্বনাথ পাল। নেপথ্য শিল্পী : সঙ্গীত বিমল চক্রবর্তী। আলোকসম্পাত শান্তি নন্দী। রূপসজ্জা : অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্দেশনা : অমল বসু।

প্রদর্শনী : আঢ্যবাড়ী, কামারপাড়া, চুঁচুড়া। সংগম, হাওড়া। উদয়সংঘ, খড়্গপুর। রঙ্গাজীব, কল্যাণী-র প্রতিযোগিতা মঞ্চ, ২য় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা, ২য় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। হাইওমার্স ইনস্টিটিউট, কাঁচরাপাড়া-র প্রতিযোগিতা মঞ্চ। আনুমানিক দর্শক : ৪ হাজার।

অনুমোদন : অভিনয়ের জন্য সংলগ্ন ঠিকানায় অনুমতিগ্রহণ কাম্য। স্বরূপ ব্রহ্ম কল্লোল ষণ্ডেশ্বরতলা পালগলি চুঁচুড়া হুগলী।

লোহিত কণা

স্বরূপ ব্রহ্ম

১ম যুবক : তা তোর পারুলকে বিদায় জানিয়ে এসেছিস তো ?
অল্পবয়সী : তার মানে আপনারা কি আমাদের খুন করবেন নাকি ?
বৃদ্ধ : হ্যাঁ—তোমাকে, আমাকে। কিন্তু আমাদের আদর্শকে নয়। আমাদের চিন্তাকে নয়।

অল্পবয়সী : কেন ?
বৃদ্ধ : কেন ? ওটাকে পারা যাবে না। যায়ও না। তাই ভবিষ্যৎ জয় আমাদের।

গভীর জঙ্গলের এক অংশ। এখন রাত্রি মধ্যযাম। ইতস্তত শিয়াল কুকুরের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে গাছপালার রোমাঞ্চকর ঝিরঝির শব্দ। কিছু জীবজন্তুর সন্ত্রস্ত পলায়নপর পদশব্দ আবহাওয়াকে আরো ভয়ংকর করে তুলেছে। একটা জোরালো আলো মঞ্চে ছিটকে এসে পড়ল। বোঝা গেল একটা মোটর জাতীয় কোন বাষ্পীয় যান এল। সেই ক্ষণিক আলোতে মঞ্চে দেখা গেল একটা বড় গাছ। আর তার পাশে মাঝামাঝি উচ্চতার কিছু গাছ পালা। মোটরটা এখন চলে গেল। একটু নীরবতা। তারপরে একজন বছর ২৫।২৬ বয়সী ছোকরা হাতে একটা ছোট টর্চ নিয়ে সন্তর্পণে প্রবেশ করে। তার পোষাক-আশাক গুণ্ডা শ্রেণীর। তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে অস্বাভাবিক সন্ত্রস্তভাব। চারিপাশ খুব ভাল করে দেখে। কোন একটা শব্দে চমকে উঠে এক পাশে সরে যায়। ছোকরাটি বোঝে—ওটি তার অমূলক ভীতি। আশ্বস্ত হয়। তারপর হাত নেড়ে কাউকে যেন ইঙ্গিত করে ডাক দেয়। ওপাশে দেখা যায় —একটি বৃদ্ধ, বয়স ৫৮-৬০-এর মধ্যে। গায়ে পাঞ্জাবি। পরনে পাতলুন। কাঁধে সাইড ব্যাগ। তার পিছনে একজন ভদ্র গোছের নিরীহ প্রকৃতি একটি ২০-২২ বছরের তরুণ। দু জনেই বাঁধা। তাদের পেছনে ঢোকে অপর একটি যুবক—যে প্রথম যুবকটির সমগোত্রীয়। এর হাতে একটা ছোট্ট হ্যারিকেন। অপর হাতে একটি উদ্ধত ছোরা। প্রথম এবং দ্বিতীয় যুবক, বৃদ্ধ ও তরুণকে গাছের সঙ্গে দ্রুত বেঁধে ফেলে। হ্যারিকেনটা একটা গাছের ডালে বেঁধে রাখে। আবদ্ধ মানুষ দুটির মুখে কোন কথা নেই। যুবক দুটি একটু আশ্বস্ত হয়। প্রথমজন সিগারেট ধরায় এবং দ্বিতীয়কেও ধরাবার জন্যে একটা ছুঁড়ে দেয়। অন্ধকারে সিগারেটের আগুন জোনাকীর মত জ্বলতে থাকে। সামান্য নীরবতা।

১ম যুবক গাঁইতিটা আনতে হবে।

২য় যুবক : সিগারেটের শেষ টান দুটো দিয়ে নিই।

১ম যুবক : তাড়াতাড়ি কাজটা এগিয়ে রাখা ভাল।

২য় যুবক : সেটা কি আর অজানা! নিজেদের বিপদের কথাটাও তো ভাবতে হবে।

১ম যুবক : উঁহু। এখানে সিগারেটের টুকরো ফেলে রাখা যাবে না, পকেটে করে নিয়ে যেতে হবে। সাবধান।

২য় যুবক : [তৎক্ষণাৎ তুলে নেয় সিগারেটের টুকরো] আরে ভুলেই গেছিলাম। কখন কখনও এমন সব অবস্থা আসে যে ঠিক ভুলগুলো থেকেই যায়।

১ম হাসে। ২য় দ্রুত বেরিয়ে যায়। গাছে বাঁধা মানুষটির কাছে ১ম এগিয়ে যায়।

অল্পবয়সী : [ভীষণ আতঙ্কিত, গলা কাঁপছে] আমাদের এখানে নিয়ে এলেন কেন ? [১ম একবার তাকায়। কোন কথা না বলে বাঁধনগুলো টেনে টেনে দেখতে থাকে। উত্তেজনায় গলার স্বর উচ্চ হয়ে ওঠে] বললেন না, কেন এখানে নিয়ে এলেন ? আম-রা···

কথা শেষ হয় না, ১ম কঠোরভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ সপাটে একটা চড় মারে। অল্প বয়সী নীরব হয়ে ফোঁপাতে থাকে।

১ম যুবক : এটা চেঁচাবার জায়গা নয় ! [বৃদ্ধকে] ওকে বলে দে এই নিস্তব্ধতার মধ্যে চেঁচালে গলার আওয়াজ অনেকদূর অবধি পৌছায়।

বৃদ্ধর মুখে কোন কথা নেই। চোখে মুখে আশ্চর্য রকম ঔদাসীন্য। কিন্তু নিরুত্তর। ১ম যুবক নিজের জায়গায় ফিরে আসার আগেই ২য় যুবক একটা বড় গাঁইতি নিয়ে ঢোকে।

১ম যুবক : এনেছিস ? তাহলে আর দেরী করে কি লাভ ?

২য় যুবক : মোটেই না। গাঁইতিটা যা বড় আর ভারি, দু চার মিনিটের মধ্যেই প্রমাণ সাইজের গর্ত হয়ে যাবে।

১ম যুবক গাঁইতিটা নিয়ে ফলায় হাত বুলোতে বুলোতে

১ম যুবক : মাটি কাটার আর দরকার কী ! এর চাপেই···

দু জনেই হাসে। গাঁইতির চাপটা যে কি— সেটা দু জনের চোখের নাচনেই বোঝা যায়।

২য় যুবক : হ্যাঁ রে সঙ্গে মাল আছে ? একটুখানি গলায় না ঢাললেই নয়, এক নাগাড়ে দম বন্ধ করে কাজ করতে করতে গলাটা ড্রাই হয়ে যাচ্ছে !

১ম যুবক : আমার কাছে নেই !

২য় যুবক : কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখলাম, একটা বড় সাইজ কেনা হলো।

১ম যুবক : ওটা জনির কাছে আছে। জনি যদি দয়া করে একটু পেসাদ দেয় তবেই গলা ভিজবে, নইলে ও রসে ঢুঁ ঢুঁ।

২য় যুবক : দুস্ শালা। এতে টেম্পো ছুটে যায় ! এসব কাজ করতে হলে চাই মাল।

১ম যুবক : হাঁ রে তোর কাছে চেম্বারটা আছে তো ?

২য় যুবক : হুঁ ! সে গুড়েও বালি।

১ম যুবক : কটা চেম্বার দিয়েছিল ?

২য় যুবক : মাত্র একটা। তাও জনির কাছে।

১ম যুবক : আমাদের কাছে তাহলে শুধু দুটো চাকু !

২য় যুবক : ব্যস ! দাঁড়াও শালা. এই কাজটি একবার শেষ করে নিই, তারপর ক-বার এম. এল এ হও, কতদিন মন্ত্রী সাজতে পারো একবার দেখে নেব।

প্রচণ্ড বিরক্তিতে পায়চারী করতে থাকে।

১ম যুবক : জনি কখন আসবে বলেছে ?

২য় যুবক : আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিস না, কথা বলতে ভাল লাগছে না।

একটু নীরবতা।

১ম যুবক : জনি না এলে কাজটা শেষ হবে না যে !

২য় যুবক : এখুনি এসে পড়বে। আর কিছু জিজ্ঞাসা করবি না।

১ম যুবক গাঁইতিটা নিয়ে উঠে পড়ে মঞ্চের পিছনের অংশে একটা উঁচু অংশে গাঁইতিটা রাখে।

১ম যুবক : এইখানে গর্তটা খুঁড়লে ভাল হয় !

২য় যুবক উত্তর দেয় না। শুধু একবার তাকায়। তারপর আস্তে আস্তে বাঁধা মানুষ দুটোর কাছে যায়। অল্পবয়সী যুবকের দাড়ি-গোঁফ গুলোকে দুহাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে। যুবকটি কঁকিয়ে ওঠে।

অল্পবয়সী : উঃ লাগছে ! ছেড়ে দিন।

১ম যুবক : [২য় যুবককে] আঃ কি করছিস ? ছ্যাবলামি রাখ।

২য় যুবক : ছ্যাবলামি নয়। শুনেছি বিপ্লবীরা নকল দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে লোকের চোখে ধুলো দেয়। তাই দেখলাম, জালি-মাল নয়। একেবারে গাল ফুঁড়ে গজিয়েছে। জেনুইন। [অল্পবয়েসী যুবককে] এই এঁচড়ে পাকা, দাড়ি গোঁফ রেখেছিস কেন ?

অল্পবয়সী : কারণ আছে।

১ম যুবক : কারণটা কি ?

২য় যুবক : নাকি দাড়ি গোঁফ রেখে পাড়ার মেয়েদের কাছে রোমিও রোমিও ভাব নিয়ে বিপ্লব করিস ?

অল্পবয়সী : আমার কাকামণি মারা গেছেন ! আমার অশৌচ চলছে—[হঠাৎ প্রশ্ন করে] আচ্ছা আমাদের এখানে আনলেন কেন ?

২য় যুবক : তোর সঙ্গে বিপ্লব বিপ্লব খেলব বলে।

অল্পবয়সী : আমি বিপ্লবী নই ! মা কালীর দিব্যি !

১ম যুবক : [ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে] নাঃ, তুমি বিপ্লব করো না, শুধুমাত্র বিপ্লবীদের সাথে ঘোরাফেরা করো। তাদের হুকুম তামিল কর।

অল্পবয়সী : নাঃ ! এসব মিথ্যে। যারা রাজনীতি করে, পার্টি করে তাদের সকলেই আমার জানাশোনা। আর তাছাড়া কেনই বা হবে না ? সবাই তো বাড়ির আশেপাশেই থাকে। দু বেলা দেখা হয়।

১ম যুবক : [ব্যঙ্গাত্মক] দু বেলা দেখা হয় ? কি করে ?

অল্পবয়সী : বারে পার্টিটাকে তো আর ব্যাণ্ড করা হয় নি। তাই তারা তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, আর দেখা হওয়াটিও স্বাভাবিক।

১ম যুবক : [২য় যুবককে] বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে। ছোকরা নিজে পার্টি করে না। যারা পার্টি করে তাদের সঙ্গে আলাপ করে, ঘোরা ফেরা করে।

অল্পবয়সী : সেটা কি অন্যায় ?

বৃদ্ধ অল্পবয়সীর বাচালতায় চঞ্চল হয়ে ওঠে।

১ম যুবক : না, একদম অন্যায় নয় ! একশবার ঠিক। আর ঠিক বলেই তোকে এখানে এনেছি।

অল্পবয়সী : তাহলে ওদের সকলকে এই ভাবে আনছেন ?

২য় যুবক : শুধু ওদের নয়। ওদের দলের পুঁচকে ইঁদুরকেও আনব।

অল্পবয়সী : এই ভাবে ওদের দেশছাড়া করবেন ? এ কখনও হয় ?

২য় যুবক : হয় হয়। খুব হয়।

অল্পবয়সী : তাহলে আপনারাই লোকের চোখে ছোট হয়ে যাবেন !

২য় যুবক : যাবো ! যেমন তোর কাছে খুব ছোট হয়ে গেলাম।

অল্পবয়সীর ইনটেস্টাইন-এ প্রচণ্ড ঘুঁষি মারে। অল্পবয়সী হঠাৎ এই মার খেয়ে বাচ্চা ছেলের মত কেঁদে ওঠে।

অল্পবয়সী : লেগেছে ! খুব লেগেছে ! মরে গেলাম। আমার নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে গেছে ! বাবাগো ! মরে গেলাম !

২য় যুবক কাল বিলম্ব না করে পকেট থেকে রুমাল বার করে অল্পবয়সীর মুখে গুঁজে দেয়। অল্পবয়সীর কণ্ঠ থেকে একটা বিশ্রী যন্ত্রণাদগ্ধ গোঙানি বেরিয়ে আসতে থাকে। ১ম যুবক তৎপর হয়ে ওঠে।

১ম যুবক : আর দেরী করা চলে না ! মাটি খোঁড় !

২য় যুবক : দুস্ শালা, একফোঁটা মাল পেটে পড়ল না—আমি গর্তটর্ত খুঁড়তে পারবো না ! যা করার তুই কর !

১ম যুবক : জনির কানে কথাটা গেলে—

২য় যুবক : যা হবার হবে। খুন ও কোনদিন করেনি। আমরাও করিনি। এই প্রথম হাতেখড়ি। কি আর করবে ? না হয় দু চার ঘা ঝাড় দেবে।

১ম যুবক : দেরী হয়ে যাচ্ছে যে।

২য় যুবক : ওই বুড়োকে দিয়ে খোঁড়া। যা মজবুত আছে তাতে একটা গর্ত খোঁড়ানো যাবে।

১ম যুবক স্থির চোখে বুড়োর দিকে তাকিয়ে একটুখানি ভাবে। তারপর বৃদ্ধের কাছে এগিয়ে যায়। বাঁধন খুলে দেয়।

১ম যুবক : [বৃদ্ধকে] যা বলা হলো শুনলি তো ? এখন সুবোধ বালকের মত কাজ কর। বেগড়বাই করলে এইটা তোর পক্ষে যথেষ্ট।

বৃদ্ধের মুখে কোন কথা নেই। নীরবে এগিয়ে গিয়ে গাঁইতিটা তুলে নেয়। তারপর গর্ত খোঁড়া শুরু করে।

১ম যুবক : [সিগারেট ধরিয়ে ২য় যুবককেও একটা দেয়] নে ধরা। কিন্তু শেষ হয়ে গেলে পকেটে রাখবি।

২য় যুবক : [সিগারেট টেনে] আঃ। জো হুকুম হুজুর। কিন্তু দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে না।

১ম যুবক : জনির পকেটে মাল, তুই করছিস হা-হুতাশ। [হাসে]

২য় যুবক : কত রাত হল দেখ তো।

১ম যুবক : [ঘড়ি দেখে] দেড়টা।

২য় যুবক : আরো ঘণ্টাখানেক হাতে আছে।

১ম যুবক : তা আছে।

২য় যুবকের দৃষ্টি মাটি কাটার দিকে পড়ে। হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে।

২য় যুবক : আরে, আরে বুড়ো করছে কি ?

১ম যুবক : [চমকে চাকু প্রস্তুত করে উঠে দাঁড়ায়] কি হলো ?

২য় যুবক : আরে না-না, তেমন কিছু নয়।

১ম যুবক : তবে ?

২য় যুবক : কেমনভাবে মাটি কাটছে দেখ।

১ম যুবক কোন কথা না বলে শুধু বৃদ্ধকে দেখে। ২য় যুবক এগিয়ে গিয়ে বৃদ্ধের হাত চেপে ধরে।

—আরে—এই বুড়ো, বিপ্লব মাড়াতে জানো, আর মাটি কাটতে জানো না ?

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

—তাকাচ্ছিস কি ?—কানা না, ন্যাকামি হচ্ছে ?

বৃদ্ধ : কেন কি হলো ?

২য় যুবক : আবার পিঁয়াজী হচ্ছে। এই ভাবে কেউ মাটি কাটে ?—একবার এখানে গাঁইতি মারছিস, একবার ওখানে গাঁইতি চালাচ্ছিস ?

বৃদ্ধ : [স্থির কণ্ঠে] ও ! এই কথা !

২য় যুবক : গর্তটা শেষ হবে কখন ?

বৃদ্ধ : একটু অসুবিধা হচ্ছে কিনা ?

২য় যুবক : কিসের অসুবিধে ?

বৃদ্ধ : রাতের বেলায় নব্বইভাগ দেখতে পাই না কিনা। তায় এখানে যে ভীষণ অন্ধকার, যেন নরক।

১ম যুবক : তোদের মত লোকের নরক ছাড়া আর কোথাও জায়গা হবে না। ঠিকমত গাঁইতি চালা। ঝট্‌পট্‌।

বৃদ্ধ কোন কথা না বলে হাতের আন্দাজ করে নিয়ে গাঁইতি চালানো শুরু করে। ২য় যুবক এতক্ষণে অল্পবয়সী যুবকের কাছে যায়।

২য় যুবক : এই পাড়ার বিপ্লবী, রোমিও রুমালটা খুলে নিই ?

অল্পবয়সী কথা বলতে পারে না। শুধু ঘাড় নাড়ে।

২য় যুবক : উঁহুঃ! অত সহজে খুলছি না। আগে তোর ফিঁয়াসীর নাম বলবি বল ?

অল্পবয়সী আপাতত বাঁচবার জন্য স্বীকৃত জানায়। ২য় যুবক রুমাল বার করে নিয়ে পকেটের মধ্যে চালান দেয়।

ফাসকেলাস। এবার ছুঁড়ির নাম বল।

অল্পবয়সী : [হাঁপাচ্ছে] বলছি। একটু জল পাওয়া যাবে না ?

২য় যুবক : না, একদম না! তবে মাল এলে—ও বাবা, তোরা তো আবার ওসবে ঘেন্না করিস। সে যাক। জল হলো না। ফিঁয়াসীর নাম বল।

অল্পবয়সী একটু ভাবে। মুখে উঁ উঁ আওয়াজ করতে থাকে—যেন যা হোক একটা নাম বলে এদের খুশি করা দরকার।

১ম যুবক : কি হলো রে, বল ?

এগিয়ে আসে।

অল্পবয়সী : উঁ-উঁ—পারুল।

২য় যুবক : কি নামের ছিরি! ওসব শালা সেই কাননবালা—উমাশশীর টাইমের নাম।

১ম যুবক : তা তোর পারুলকে বিদায় জানিয়ে এসেছিস তো ?

অল্পবয়সী : [চমকে ওঠে] তার-মানে—আপনারা কি আমাদের খুন করবেন নাকি ?

বৃদ্ধ : [গাঁইতি চালাতে চালাতে] হ্যাঁ! তোমাকে—আমাকে। কিন্তু আমাদের আদর্শকে নয়। আমাদের চিন্তাকে নয়।

অল্পবয়সী : কেন ?

বৃদ্ধ : কেন ? ওটাকে মারা যাবে না। যায়ও না। তাই ভবিষ্যৎ জয় আমাদের।

সজোরে গাঁইতি চালায়। ১ম যুবক ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসে বৃদ্ধের পেছনে দাঁড়ায়। বৃদ্ধ গাঁইতিটা রেখে অনুভূতির সাহায্যে ১ম যুবকের মুখোমুখি হন।

—কিছু বলবেন ? [১ম যুবক নিরুত্তর]—কিছু করবেন ?

একটু নিস্তব্ধ থেকে হঠাৎ ১ম যুবক বৃদ্ধের হাঁটু। জাং-এর ওপর বুট শুদ্ধ লাথি মারে। বৃদ্ধ পড়ে যায়। ১ম যুবক ক্ষিপ্ত কুকুরের মত এলোপাথারি মেরে চলে। অল্পবয়সী

যুবক এই দারুণ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ে। অপর দিকে আর এক অদ্ভুত দৃশ্য। বৃদ্ধ অত মারের পরও একটুকু টুঁ শব্দ করে না। সহ্যশক্তি দ্বিগুণ করে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না।

২য় যুবক : [১ম যুবককে] শালা, রাতকানা বুড়োকে তুলে ধর, নইলে উঠতে পারবে না !

বৃদ্ধ : [অন্ধকার হাতরাতে হাতরাতে]—নাঃ, তার দরকার হবে না। আমি নিজেই উঠে দাঁড়াব। তারপর আপনারা দুজনে মিলে আমাকে মারুন। দেখবেন, তারপরও উঠে দাঁড়াব। যতক্ষণ না প্রাণটা বেরুচ্ছে, ততক্ষণ একই চেষ্টা, একই লড়াই—কেননা, ভবিষ্যৎ জয় আমাদেরই !

১ম যুবক : এই কথার মধ্যে এমন কি আছে রে বুড়ো, বারবার বলছিস ?

বৃদ্ধ : সেটা আপনাদের না জানলেও চলবে। আপনারা খুন করতে এসেছেন, খুন করুন।

২য় যুবক ইতিমধ্যে কতখানি গর্ত খোঁড়া হয়েছে দেখতে গিয়েছিল।

২য় যুবক : আরে, এখনও গর্তের অনেকখানি বাকি যে রে !

১ম যুবক : থাক। বুড়ো ঢ্যামনাটাকে গাছে বেঁধে রাখ। ওই এঁচড়ে পাকাটাকে আন। ও বাকিটা সেরে দিক।

২য় যুবক অল্পবয়সীকে খুলে আনে। অল্পবয়সী সভয়ে গর্তটাকে দেখে।

২য় যুবক : দেখছিস কি ! গাঁইতি চালা !

অল্পবয়সী গাঁইতি চালাতে শুরু করে। কাছাকাছি শুকনো পাতা মাড়িয়ে কারুর আসার পদশব্দ শোনা যায়। সকলে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। ২য় যুবক সন্ত্রস্তভাবে এগিয়ে গিয়ে দেখে। এক মুহূর্ত পরে আনন্দে লাফিয়ে ওঠে।

২য় যুবক : মারহাব্বা ! জনি আ গয়া ! জনি সুইটি ! মেরে সিনা পর আও !

ঈষৎ টলায়মান জনি ঢোকে। খুব গম্ভীর। কঠিন স্বাস্থ্য।

২য় যুবক : জনি ডিয়ার ! মালের বোতলটা দে ! ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

জনি পকেট থেকে বোতলটা বার করে দেয়। ২য় যুবক এক নিঃশ্বাসে পান করে। জনি একটা পাথরের গায়ে ঠেসান দিয়ে বসে।

২য় যুবক : আঃ ! বুকের মধ্যে যেন ঠাণ্ডা গোমুখীর গঙ্গা ঝরে পড়ছে, নে ধর ! [প্রথম যুবক পান করে। বোতলটা জনিকে ফেরৎ দেয়। জনি বোতলটা দেখে নেয়।] আছে—আছে ! বেশিটাই আছে, নে খা !

জনি : না এখুনি খাবো না। অনেকটা খেয়েছি।

১ম যুবক : এর মধ্যে অতটা খেলি কেন ?

জনি : জীবনে প্রথম লাশ নেব, একটু ফ্রেম আপ না হলে, হয়ত লাশ নেওয়া নাও হতে পারে।

২য় যুবক : এবার তাহলে আমরা আশেপাশে ঘুরে আসি। পথটথ সব ক্লিয়ার করে আসি। তুই ততক্ষণ কাজ শেষ করে রাখ, শিকার খেলা ভারি মজাদার।

জনি : জানি। কিন্তু তোদেরও সামনে থাকতে হবে।

১ম যুবক : কেন ফ্রেণ্ড, ভয় করছে? ভূত আসবে?

জনি : আমি লাশ নেব, আর তোরা হাওয়া খেয়ে বেড়িয়ে আইনের আওতার বাইরে থাকবি — তা কি হয়?

১ম যুবক : আইন ভদ্দরলোকদের জন্য, আমাদের জন্য নয়।

জনি : ভদ্দরলোকেরা আদালতে ক'বার যায়, ভীড় করি তো আমরা, আমাদের জন্যেই তো প্রয়োজনমত নতুন নতুন আইন তৈরী হয়। সে যাই হোক, যতখানি কাজ এগিয়ে রাখার আমি রাখছি। কিন্তু আসল কাজের সময় তোদের চাই, মনে রাখিস। দ্যাট্স অল!

দুজনে বিভ্রান্ত ভাবে চলে যায়। জনি বোতল খোলে। সামান্য নিস্তব্ধতা। বৃদ্ধ একটু চনমনে হয়ে ওঠে। জনি অল্পবয়সীর গর্ত খোঁড়ার কাজ দেখে। পিস্তলটা বার করে হাতের কাছে প্রস্তুত রাখে। অল্পবয়সী পিস্তল দেখে চমকে ওঠে। গাঁইতি হাতে স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। জনি গ্রাহ্য করে না। আবার বোতলে মন দেয়। বৃদ্ধ গলা খাঁকারি দেয় তবুও জ'ন গ্রাহ্য করে না। এবার বৃদ্ধ কথা বলে :

বৃদ্ধ : ইয়ে একটা কথা বলছিলাম! — মানে জিজ্ঞাসা করছিলাম।

জনি : বলুন!

বৃদ্ধ : আলোটা একটু বাড়িয়ে দেওয়া যাবে না? ভীষণ কম আলো।

জনি : হ্যারিকেনের আলো এর বেশি বাড়ানো যাবে না।

বৃদ্ধ : অ — [আবার নীরবতা] — আচ্ছা, ওরা দুজনে কি চলে গেল?

জনি : চলে যায় নি। আশেপাশেই আছে। আবার আসবে।

বৃদ্ধ : আচ্ছা, ওরা আমাকে বৃদ্ধ দেখেও তুই তোকারি করে কথা বলছিল, কিন্তু আপনি আমাকে আপনি সম্বোধন করলেন কেন?

জনি : সেটা আমার অভিরুচি। জানেন তো এমারসন সাহেবের কথাটা — লাইফ ইজ নট সো শর্ট বাট্ অলওয়েজ টাইম ফর কার্ট্‌সি!

বৃদ্ধ : আশ্চর্য!

জনি : কি আশ্চর্য?

বৃদ্ধ : মনে হচ্ছে, আপনি লেখাপড়া জানেন?

জনি : [নেশা ক্রমশঃ জমে উঠছে] এত বকবক করছেন কেন? মতলব টতলব থাকলে ছাড়ুন। বিশেষ সুবিধা হবে না।

বৃদ্ধ : যাই মতলব থাকুক, এখন তো আমি আপনাদের মুঠোর মধ্যে। ক-ঘণ্টাই বা বাঁচতে পাবো। তাই ফাঁসীর আসামীর যদি কিছু জবাব দেন,

তাহলেও কি আপনার খুব অসুবিধা হবে ?

জনি : [অবাক] হ্যাঁ – না – মানে – জিজ্ঞাস্য থাকলে করতে পারেন।

বৃদ্ধ : আপনি কতদূর পড়াশুনা করেছেন ?

জনি : বি. এ. পড়তে পড়তে ছেড়ে দিয়েছিলাম।

বৃদ্ধ : ছেড়ে দিয়েছিলেন, কেন ?

জনি : সে অনেক কথা।

বৃদ্ধ : শোনার কৌতূহল হচ্ছে।

জনি : আমরা তিন ভাই, এক বোন, মা আর বাবা। এই ছিল সংসার। বড় ভাই কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করতেন। কোনো এক ধর্মঘটের সময়ে কারখানার মালিকের বন্দুকের গুলিতে মারা যায়। বাবা ছিলেন জন্ম বিপ্লবী। তাঁর রক্তের প্রতিটি ধমনীতে সমাজ পাল্টানোর শ্লোগান ধ্বনিত হত। – [হঠাৎ] – আচ্ছা এসব জেনে আপনার লাভ ? আমার মগজ ধোলাইয়ের মতলব আছে নাকি ?

বৃদ্ধ : ভাল বলেছেন ! মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অন্যের মগজ ধোলাই করব কি, নিজের মাথাই ঠিক রাখতে পারছি না। তবে আপনার যদি আপত্তি থাকে, আর প্রশ্ন করব না।

জনি : [একটু নীরব থেকে] ফাঁসীর আসামী ! না – না – প্রশ্ন করুন, আপত্তি নেই। যতক্ষণ বেঁচে আছেন, কথা বলে মনটাকে স্টিয়ার আপ করে নিন।

বৃদ্ধ : আপনার মা ?

জনি : বলছি – আমার তখন কলেজ জীবন। সেই সময় খাদ্য আন্দোলনের এক সাধারণ মিছিলে মা ছিলেন। এটা বাবার প্রভাব বলতে পারেন। কিন্তু অকারণে পুলিশ গুলি চালালে মা পুলিশকে চ্যালেঞ্জ জানান। ব্যাস পরিণামে তাঁর বুকে এসে গেঁথে গেল একটা সিসের বুলেট। দু বার ছটফট করলেন, তারপর চিরনীরব। এরপর একদিন একদল হিংস্র নেকড়ে হঠাৎ আমাদের বাড়িতে ঢুকে আমার বোনটাকে লুটের মাল করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেল। রেখে গেল, বোনটার অসহায় দেহটা। প্রাণহীন।

অল্প যন্ত্রণা [illegible] থেকে চুপসারে এগিয়ে আসে। তার লক্ষ্য জনির পায়ের কাছে পড়ে থাকা [illegible]। সে আরও লক্ষ্য করছে জনির নেশাটা ক্রমশঃ বেশ জমে উঠছে।

বৃদ্ধ : বেচারী ! [দীর্ঘশ্বাস ফেলে] – এভাবে যে কত ভালো লোক শেষ হয়ে গেল ! তারপর আপনার ছোট ভাই ?

জনি : সে এখনও বেঁচে আছে বটে, তবে সেও শুনছি বাবাদের বিপ্লবীদলের একজন হোলটাইমার। এটা সে ভাল করেনি। কারণ হয়ত একদিন আমার কাছে নির্দেশ আসবে, তাকেও শেষ করতে হবে।

বৃদ্ধ : সে নির্দেশ এলে, আপনি তাকে শেষ করবেন ?

জনি : এখনও ঠিক জানি না ! ও প্রশ্ন করবেন না। শুনতেও ভাল লাগছে না।

বৃদ্ধ : ঠিক আছে। মাপ করবেন – আমারই ভুল হয়েছে। আপনার বাবার কথা বলুন।

জনি : বাবা ! [একটু ভাবে] – তিনি এক আশ্চর্য লোক। ফুলের মত কোমল, বজ্রের মতো কঠিন ! যতটুকু তাঁর কথা মনে আছে – তাঁর সেই রূপ-টুকু মনে পড়ে।

বৃদ্ধ : "যতটুকু" মানে ? কত বছর বয়সে তাঁকে শেষ দেখেছেন ?

জনি : আমি যখন ক্লাস থ্রীতে পড়ি – সেই বছরই শেষ দেখা। একদিন শুনলাম – বাবা নাকি ভীষণ অপরাধী তাই তাঁকে পুলিশ খুঁজছে। মা তাড়াতাড়ি বাবাকে গোপন পথ দিয়ে পাচার করে দিলেন। ব্যস, সেই শেষ ! আজ অবধি তাঁর দেখা পাইনি। বেঁচে আছেন কি না, তাও জানি না।

বৃদ্ধ : দেখতে ইচ্ছে করে না ?

জনি : করে। দেখতে ইচ্ছে করে, যে মানুষটাকে এত মানুষ ভালোবাসে, সে কেমন ? আগের মতই আছে, নাকি আরো বিশাল শক্তি নিয়ে লোক-চক্ষুর অন্তরালে ঘোরাফেরা করছে ! সত্যি বলতে কি, আমার বাবার মত খুব কম লোকই আছে যারা বাবার মত পার্টিকে এত ভালোবাসে, ভাবুন তো, কী ভীষণ তাঁর ত্যাগ !

বৃদ্ধ : আমার শেষ প্রশ্ন – যে বাড়ির প্রতিটি মানুষ এত মহান, সে বংশে আপনি কেন এ পথ বেছে নিলেন ?

জনি : প্রবাদটা উল্টে নিন – আমি হলাম প্রহ্লাদ কুলে দৈত্য।

হেসে ওঠে। বোতলটা মুখে ঢালবার জন্য ঘাড়টা পেছু দিকে ঝোঁকাতেই অল্পবয়সী পিস্তলটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে! কিন্তু অতি সতর্ক জনি বুট সমেত পা দিয়ে লোহার মত অল্পবয়সীর হাতটাকে মাটির সঙ্গে চেপে ধরে। অল্পবয়সী ব্যর্থতায়, ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে! জনি খুব শান্ত মেজাজে পিস্তলটা তুলে নেয়। অল্পবয়সীর হাতটা ছেড়ে দেয়। অল্পবয়সীর মুখে কথা নেই। আছে মৃত্যু ভয়াল আতঙ্ক। জনি বোতল আর পিস্তলটা পকেটে রেখে আস্তে আস্তে উঠে অল্পবয়সীর সামনাসামনি দাঁড়ায়। তারপর তাকে এলোপাথারি মারের পর পিছু দিক থেকে বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরে ডান হাতে একখানা ছোরা তার বুকের ওপর উঁচিয়ে ধরে। অল্পবয়সী শিশুর মত কেঁদে ওঠে।

অল্পবয়সী : পায়ে পড়ি, আমাকে মারবেন না। দয়া করুন। আর কিছুক্ষণ পর তো মরবই। তাই আর একটু বাঁচতে দিন। পৃথিবীর আলো হাওয়া একটু দম ভরে নিতে দিন। এইটুকু করুণা ভিক্ষে দিন।

জনি একটু অন্যমনস্কের মত ভাবে। তারপর আস্তে আস্তে ছোরাটা নামিয়ে নিয়ে অল্পবয়সীকে ছেড়ে দেয়। অল্পবয়সী দৌড়ে গিয়ে এককোণে চুপ করে বসে। এবার সে আরও বেশি হতাশ চোখ দুটি তার উপর দিকে উঠে ক্রমশঃ স্থির হয়ে যায়। কিছুটা যেন উদভ্রান্ত।

জনি : [পিস্তলটি মুছতে মুছতে] ফুঃ। এই আপনারা বিপ্লবী ! চোরের মত—

বৃদ্ধ : একটু ভুল হচ্ছে। এই ছেলেটি হয়ত আমাদের আদর্শকে ভালোবাসে। কিন্তু আমাদের পার্টির নিয়মিত কর্মী নয়। এমন কি –

জনি : কি করে জানব – এ আপনাদের লোক নয় ?

বৃদ্ধ : প্রথমতঃ এই নির্জন অরণ্যে আমার মুখের কথাই যথেষ্ট। এখানে প্রমাণ দেবার সুযোগ বা সময় কোথায়। দ্বিতীয়তঃ ওর ওই আত্মরক্ষার ভঙ্গীটাও সবল মানসিকতার লক্ষণ নয়। বুঝতে পারলেন নিশ্চয়ই। এখানে এর বেশি আমার আর কিছু বলার রসদ নেই।

জনি : তবু জানতে চাই।

বৃদ্ধ : [সামান্য উত্তেজিত] কিন্তু আমি যদি আপনার কাছে প্রশ্ন রাখি আজ যারা লোকচক্ষুর অন্তরালে এই নীরন্ধ্র অরণ্যের অন্ধকারে আপনাদের পাঠিয়েছে আমাদের খুন করতে—তারাই তো দেশের তখৎ-এ-তাউসে মহা সমারোহে আসীন হয়ে গণতন্ত্রের ঢক্কা নিনাদ করছে—তারা কেন আপনাদের দিয়ে চৌর্যবৃত্তি করাচ্ছে ? তারা পারল না—তাদের রাজনৈতিক শক্তি দিয়ে আমাদের রাজনৈতিক শক্তির মোকাবিলা করতে ?

হাঁপাতে থাকেন। জনি থমকে যায়।

জনি : [কিছুক্ষণ দেখে] মায়ের কাছে বাবার দৃঢ়তার কথা যা শুনেছিলাম তা যেন হু-বহু মিলে যাচ্ছে।

বৃদ্ধ : [অনেকটা শান্ত] হয়ত হবে। আমার বোধ হয় এতটা উত্তেজিত না হওয়াটাই উচিত। কিন্তু কেন জানি না আপনার কাছে, আর আপনার কাছেই বা বলি কেন, বরং আপনাদের কাছে কথাগুলো না বললে খুব একটা অন্যায় হত।

জনি : কারণ ?

বৃদ্ধ : বংশের রক্তধারায় আপনার মধ্যে যে বিপ্লবের বীজ ঘুমিয়ে রয়েছে তাকে আমি বা যে কেউ, যদি আজ কিংবা কাল প্রচণ্ড আঘাতে জাগিয়ে না তুলতে পারি, তাহলে একটা মহৎ অধ্যায় পৃথিবীর বিপ্লবী-মানুষের অজ্ঞাতে থেকে যাবে। এটা ঠিক নয়। সেই বিপ্লবের বীজকে বিধ্বংসী বিস্ফোরণে ফাটিয়ে দিলে, আগামী পৃথিবীর চেহারা পালটে যাবে। জন্ম নেবে নতুন একটা দুনিয়া, জন্ম নেবে স্বাধীন সুখী মানুষের দল। [ক্লান্ত হাসি] এই দেখুন আমি আবার উত্তেজিত হয়ে পড়ছি। ও প্রসঙ্গ থাক। কিন্তু আপনি কেন প্রহ্লাদকুলে দৈত্য হলেন, সেটা তো শোনা হলো না ?

জনি : না শুনলেই বা ক্ষতি কি ?

বৃদ্ধ : লজ্জা হচ্ছে ? না কি এড়িয়ে যেতে চান ?

জনি : কোনটাই নয়।

বৃদ্ধ : তাহলে আমার মত মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের কাছে জীবনের সমস্ত অন্যায় একবার প্রকাশ করলে আপনি নিজে খানিকটা হালকা হতে পারতেন।

জনি : [অন্যমনস্ক] হুঁ, তা ঠিক! আমার কথা বিশেষ কিছুই নয়। মানুষ খুনের মিথ্যে অপবাদে বাবা বাড়ি ছাড়া। মা মরল। বোনটাও শেষ হলো। কেমন যেন সিনেমার মত পর পর ঘটে গেল। আমি কেমন যেন বেপরোয়া হয়ে উঠলাম। কলেজ পড়ি—এমন সময় সারা দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মাথা চাড়া দিল। হাতে পয়সা নেই। ভাবলাম—এই তো সুযোগ। দোকান লুঠে হাত মেলালাম।

বৃদ্ধ : ছিঃ-ছিঃ! এটা ভীষণ গর্হিত কাজ! আপনার মত শিক্ষিত ছেলে—

জনি : দূর্ শিক্ষিতের নিকুচি করেছে। একটা বংশ বলে লোপটা হতে বসেছে। বলতে গেলে শেষ বংশধর আমি, তখন অনাহারে। তাই লুঠ করতে গিয়ে পুলিশের গুলি সামলালাম বটে, কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম। জেল হলো।

বৃদ্ধ : তারপর বেরোলেন কি ভাবে?

জনি : স্থানীয় এক এম. এল. এ.-দাদার সাহায্যে। তার এক কলমের খোঁচায় মুক্তি পেলাম, পেলাম বটে, কিন্তু মুচ্‌লেকা দিতে হলো।

বৃদ্ধ : মুচলেকা!

জনি : হ্যাঁ! [সামান্য হেসে] অলিখিত মুচ্‌লেকা!

বৃদ্ধ : সেটা কি ধরণের?

জনি : এম. এল. এ.-দাদার আমার প্রতি আদেশ হলো—আমাকে তার দেহরক্ষীর কাজ করতে হবে। লিখিত মুচ্‌লেকার মত জড়িয়ে গেলাম। নয়ত আমার বেঁচে থাকাটা—

বৃদ্ধ : ব্যস্! আর আমার শোনার কিছু নেই। এবার ব্যবস্থা করুন। তবে একটা দুঃখ রয়ে গেল—আপনারা আমাদের তস্করের মত চুপি চুপি ধরে এনে খুন করছেন। [দীর্ঘশ্বাস] উপযুক্ত একটা সুযোগ পেলাম না।

জনি : পেলে কি করতেন?

বৃদ্ধ : প্রথমেই আপনাদের বলতাম—আপনাদের এই ব্যক্তি-সন্ত্রাস কোন যুগে, কোন রাষ্ট্রে একটা মহৎ আদর্শবাদকে ধ্বংস করতে পারেনি, পারবেও না। কেন না, আমরা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের এক বিশাল অংশের অভিজ্ঞতা হতে জেনেছি যে সামাজিক, অর্থনৈতিক থেকে রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্যে ব্যক্তি-সন্ত্রাসকে হাতিয়ার করা ভুল। সর্বাঙ্গীন সংগ্রামের জন্যে চাই—সমগ্র মানুষের সচেতন সমাবেশ। নতুবা সমস্ত চেষ্টা, হয় আজ, নয় তো কাল ব্যর্থ হবেই।

জনি : [স্তম্ভিত] আশ্চর্য! কী ভীষণ আশ্চর্য! [ছট্‌ফট্ করতে থাকে]

—কথাগুলো কি দারুণ চেনা-চেনা লাগছে। মনে হচ্ছে এত আপনজনের কওয়া কথা।

বৃদ্ধ : [প্রচণ্ড গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চগ্রামে] আমাদের জন্যে কবর প্রস্তুত। নিন, আমি প্রস্তুত। আপনার চাকু প্রস্তুত। আপনার জলন্ত পিস্তলও প্রস্তুত। যেটা ইচ্ছে আপনি ব্যবহার করুন। আমাদের কোন উপযুক্ত সুযোগ নেই। এক রকম নিষ্কণ্টক আপনাদের পথ।

জনি : [মুখে বিচিত্রহাসি] ইয়েস আই হ্যাভ্ মেড আপ মাই মাইণ্ড।

অল্পবয়সী আর থাকতে পারে না। ছুটে গিয়ে বৃদ্ধকে এলোপাথারী ঝাঁকানি দিতে থাকে।

অল্পবয়সী : আমি—আমি প্রস্তুত নই! কিছুতেই নয়! আমি মরব না। মরতে চাই না।

জনি বিহ্বল।

জনি : একটা কথা এবার আমি জিজ্ঞেস করতে পারি?

বৃদ্ধ : নিশ্চয়ই।

জনি : আপনার সম্বন্ধে কিছু বললেন না তো!

বৃদ্ধ : বিস্তৃত বলার প্রয়োজন নেই। সংক্ষেপেই বলছি।

জনি : হ্যাঁ সেই ভাল। সময় অল্প।

বৃদ্ধ : আমি তোমার জন্মদাতা। আর তুমি হলে শংকর। জনি নও। ওটা তোমাদের গুণ্ডা দলের নাম। তাই না?

যেন বাজ পড়ে। জনি বসতে পারে না। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায়। বাক্‌রোধ হয়ে গেছে। অল্পবয়সী কেমন যেন বিহ্বল হয়ে আস্তে আস্তে পিছু হটে।

জনি : বা-বা! মানে—যাঁর সম্বন্ধে আমি বিরাট—বিরাট কিছু ভাবতাম—

বৃদ্ধ : অর্থাৎ আমার ব্যক্তিসত্তাকে দেবতার পর্যায়ে এনে ফেলে চিন্তা করতে। এটা ঠিক নয়। একজন রাজনীতিক ব্যক্তির ঊর্ধে নন। তাঁকে দেবতার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া মানেই তাঁকে পরোক্ষে হত্যা করার সামিল।

জনি : কিন্তু আপনাকে একদিনও ঘরে দেখিনি কেন?

বৃদ্ধ : আমার নামে মিথ্যা ওয়ারেণ্ট জারি হওয়ার পর থেকে আমি দীর্ঘদিন নিরুদ্দেশ হয়ে যাই। ইতিমধ্যে বাড়িতে পরপর দুর্ঘটনা ঘটে চলল—সে তো তুমি জানো। তারপর অনেকদিন পর যখন ওয়ারেণ্ট উঠে গেল, তখন বাড়ি ফিরে দেখি কেউ নেই। বুঝলাম সব ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। তাই পার্টির হোল টাইমার হয়ে কাজ করছি।

জনি : সন্তুর কোনো খবর জানেন?

বৃদ্ধ : মাঝে মাঝে দেখা হয়। সে এখান থেকে প্রায় সত্তর মাইল দূরে একটা গ্রামে হোলটাইমারের কাজ করছে। আমার কনিষ্ঠ সন্তান হিসেবে আমি সন্তুর জন্য গর্বিত।

জনি : আপনি ধরা পড়লেন কি ভাবে ?

বৃদ্ধ : তোমাদের এম এল এ দাদা আমাকে 'একজন জঙ্গীকর্মী হিসেবে জানেন। আগামী নির্বাচনে, আমি এখানে থাকলে তার পরাজয় অনিবার্য জেনেই আমাকে রাস্তা থেকে রাতের অন্ধকারে তুলে এনেছে — যেমন অনেক জায়গাতে এ ঘটনা আজকাল হামেশাই ঘটছে।

জনি : আপনি আগে থেকে সাবধান হন নি কেন ?

বৃদ্ধ : যতই সতর্কতা অবলম্বন করি, এক একটা সময় আসে যেটাকে সতর্কতার মধ্যেও অসতর্কতা বলতে পারো, সেইরকম একটা অসতর্ক মুহূর্তে আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছিলাম। অন্ধকার হলেও কিছু লোকজনের যাতায়াত ছিল, ভাবলাম এইটুকু পথ পার হয়ে যাব। কিন্তু হলো না। একটা কালো ভ্যান হুস করে এসে আমার সামনে থামল, তারপর তিনজন যুবক যার মধ্যে তুমিও ছিলে, সেই গাড়ি থেকে নেমে আমার মুখে কাপড় বেঁধে তুলে নিলে !

জনি : না বাবা, আর শুনতে চাই না।

বৃদ্ধ : বেশ এবার তোমার বিচার !

জনি বৃদ্ধের মুখের দিকে পাথরের মত নিথর হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে অল্পবয়সীর কাছে যায়। পিস্তল বার করে। পিস্তলের ডগায় তাকে নির্দেশ দেয় বৃদ্ধের পাশে যেতে। অল্পবয়সী তাই করে। জনি বৃদ্ধের হাত খুলে দেয়। তারপর দুজনের সামনে পিস্তল উঁচিয়ে ধরে। এগিয়ে গিয়ে এদিক ওদিক তাকায়। তারপর ক্ষিপ্রগতিতে বাবার হাতে পিস্তল তুলে দেয়।

জনি : [অল্পবয়সীকে] বাবার হাতে পিস্তল রইল। এখান থেকে পালাও।

অল্পবয়সী : যদি ওরা আমাদের ধরে ফেলে ?

জনি : পারবে না। ওদের আসার সময় হয়ে গেল। চেষ্টা করবে এই গভীর বনের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে চলতে। তাহলে আর ভয় নেই। ওদের কাছে কোনো আলো নেই বা পিস্তল ! যাও আর দাঁড়িও না। যাও। বাবা—

বৃদ্ধ : গুড বাই মাই বয় ! আশা করছি, লড়াইয়ের ময়দানে তোমার সঙ্গে আমরা হাতে হাত দিয়ে লড়াই করার সুযোগ পাবো। গুড বাই !

দ্রুত বেরিয়ে যায়। জনি সামান্যক্ষণ এদিক ওদিক দেখে দৌড়ে গিয়ে কবরের মধ্যে দ্রুত হাত চালিয়ে মাটি চাপা দেয়। হাত পা ঝেড়ে জামা কাপড় ঠিকমত গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ১ম ও ২য় যুবক প্রবেশ করে।

১ম যুবক : জনি !

জনি : ইয়েস !

২য় যুবক : ও-কে ?

জনি। অল রাইট !

১ম যুবক : [হো হো করে হেসে] আমরা কিন্তু আইনের বাইরে।

জনি : ইজ ইট ? দেন ড্যাম ইয়োর আইন। আই অ্যাম নাও অ্যাবাভ ইয়োর ল ! অনেক উঁচুতে। অনে—ক ! অ—নে-ক !

১ম ও ২য় যুবকদ্বয় চলে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। জনি বৃদ্ধ ও অল্পবয়সীর পথের দিকে পা বাড়ায়। গাছের ডালে ডালে ভোরের পাখীরা কলতানে ভরিয়ে তোলে।

ও হেনরী-র

'দি কপ অ্যাণ্ড দি অ্যানথেম্' অবলম্বনে

সেই সুর

সোমনাথ চৌধুরী

এবার ফেরো। এখনো সময় আছে। এতটুকু উষ্ণতার জন্যে হেন কোন খারাপ কাজ নেই যা তুমি করলে না—কি পেলে? শতকোটি সূর্যের মালিক আজ এতটুকু উষ্ণতার কাঙাল—হায়! সেই ঝোড়ো আবেগ, সেই স্বর্গ, সেই প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা টগবগে ফুটন্ত যৌবনকে কেন তুমি এ ভাবে হত্যা করলে যুবক — কেন?

নাটক : সেই সুর

নাট্যকার : সোমনাথ চৌধুরী। জন্ম : ২৬ জুলাই, ১৯৫০। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে এম এস সি। পেশা : অধ্যাপনা। নাট্যচর্চার সূত্রপাত নৈহাটির এল এম এ সি-তে। সেই সুর এঁর দ্বিতীয় রচনা।

চরিত্রলিপি : যুবক। বিবেক। যতীন। কেষ্ট। চোর। ভজহরি। ওস্তাদ। মদনা। লোকটা। প্রথম কনস্টেবল্। দ্বিতীয় কনস্টেবল্।

প্রথম অভিনয় : ২৩ জানুয়ারি ১৯৭৬।

প্রযোজনা : এল এম এ সি, নৈহাটি। অভিনয়শিল্পী : যুবক : অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। বিবেক : বাদল মুখোপাধ্যায়। যতীন : অচিন্ত্য চট্টোপাধ্যায়/সোমনাথ চৌধুরী। কেষ্ট : ঝণ্টু সেনগুপ্ত/সোমনাথ চৌধুরী/রাণাদিত্য ভদ্র। চোর : গোপাল দাস। খাবারওয়ালা : সুকান্তি লাহিড়ী/সোমনাথ চৌধুরী/জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। ওস্তাদ : সঞ্চিৎ ভট্টাচার্য/সোমনাথ চৌধুরী/অমিয় ঘোষ। মদনা : ঝণ্টু সেনগুপ্ত। লোকটা : অচিন্ত্য চট্টোপাধ্যায়/সোমনাথ চৌধুরী/অমিয় ঘোষ/তপন দাস। প্রথম কন্স্টেব্ল্ : প্রভাত দাস/সোমনাথ চৌধুরী। দ্বিতীয় কন্স্টেব্ল্ : জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়/অম্বিকা চট্টোপাধ্যায়।

প্রতিযোগিতায় প্রাপ্ত পুরস্কার :

একটি নাট্যোৎসব (গোস্বামী পাড়া পূজা প্রাঙ্গন), ৮টি আমন্ত্রণ—(টাউন ক্লাব, নৈহাটি; কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়; হিন্দুস্থান অ্যারো, ব্যারাকপুর; প্রতিবিম্ব, মাদ্রাজ; ব্যানার্জী পাড়া, নৈহাটি; শিল্পালোক, ভাটপাড়া; দিলীপ স্পোর্টিং ক্লাব, পাণ্ডুয়া ও রূপান্তর, নৈহাটি) ছাড়া ৩১টি অভিনয় হয়েছে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মঞ্চে : হাইওমার্স ইনস্টি, কাঁচরাপাড়া—৮ম, শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা-পরিচালনা। প্রতিরূপ পলতা—৪র্থ, শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা ও পাণ্ডুলিপি। পল্লী সেবক ব্যারাকপুর—১ম। যুবসংঘ ভাটপাড়া—৪র্থ, শ্রেষ্ঠ মঞ্চসজ্জা ২য় শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপি—অভিনেতা। ভাবরূপ ইছাপুর—৩য়, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। সাগ্নিক গারুলিয়া—২য়, শ্রেষ্ঠ নির্দেশনা চরিত্রাভিনেতা। পানিহাটি ক্লাব সোদপুর—৫ম, ৩য়—নির্দেশনা-চরিত্রাভিনেতা-অভিনেতা। কল্লোল চুঁচুড়া—৬ষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা। অগ্রণী ব্যারাকপুর—কোন পুরস্কার নেই। তরুণ সংঘ খড়দহ—৮ম, ২য় শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা। আমরা কজন চুঁচুড়া—৪র্থ, ২য় শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা। নবীন সংঘ ব্যারাকপুর—৪র্থ, শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা। শিশু সংঘ বাঁশবেড়িয়া—২য় শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা। যান্ত্রিক নৈহাটি—১ম, শ্রেষ্ঠ - নির্দেশনা - মঞ্চসজ্জা - পাণ্ডুলিপি - চরিত্রাভিনেতা। প্রগতি আতপুর—৪র্থ, শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা। ত্রিবেণী টিস্যু ত্রিবেণী—কোন পুরস্কার নেই। ক্লোরাইড ইণ্ডিয়া শ্যামনগর—১ম, চরিত্রাভিনেতা ২য়। জাগৃতি আতপুর—৫র্থ, চরিত্রাভিনেতা ২য়। ব্লক যুব কেন্দ্র ফুলিয়া—১ম, শ্রেষ্ঠ - অভিনেতা - চরিত্রাভিনেতা - নির্দেশনা। প্রান্তিক বহরমপুর—৩য় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। মহুয়া হালিশহর — ৩য়, শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা। শ্রীলতা ইনস্টিটিউশন চিত্তরঞ্জন — ৩য় শ্রেষ্ঠ - নির্দেশনা - অভিনেতা। স্টুডেন্টস থিয়েটার হালিশহর — ২য়, শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা। চাণক্য পত্রিকা পানিহাটি — ৩য়। বন্ধু মহল বেলুড় — ৫র্থ, শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা। সারণী সোদপুর — ফলাফল অপ্রকাশিত। নবারুণ শান্তিপুর — ১ম, শ্রেষ্ঠ - নির্দেশনা - অভিনেতা। লিটল রিক্রিয়েশান ক্লাব বাঙ্গুর কলকাতা — শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা। বলাগড় ব্যাণ্ডেল — ২য়, শ্রেষ্ঠ - অভিনেতা - নির্দেশনা - পাণ্ডুলিপি - চরিত্রাভিনেতা। অভিযাত্রী চুঁচুড়া — ২য়, অভিনেতা ৪র্থ।

রজনী : এ পর্যন্ত ৪০ বার অভিনীত। আনুমানিক দর্শক ২০ হাজার।

একটি নির্জন পার্ক। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। শীতের সন্ধ্যা। চারিদিকে ধোঁয়াশাচ্ছন্ন। অদূরে রেলিং। তার পেছনে রাস্তা। তারও পেছনে ইঁটের-টোপর-মাথায়-পরা কলকাতা শহর গাঢ় ধোঁয়াশায় ডুবে আছে। ব্যাকগ্রাউণ্ডে ট্রাম, বাস, রিক্সা ও জনতার কোলাহলের ঐকতান বাইরে জীবনপ্রবাহের ইঙ্গিত দিচ্ছে। রাস্তায় মাঝে মাঝে দেখা যায় একটি পুলিশ পায়চারী করছে। ডাউন স্টেজে একটি গাছের তলায় একটি বেঞ্চি। একটি যুবক বসে। তার পরণে ছেঁড়া মলিন পায়জামা ও পাঞ্জাবি। চুল উসকো খুসকো। মুখে অল্প দাড়ি। চোখের কোণে কালি পড়েছে। গায়ে একটা খবরের কাগজ চাপা দিয়ে ঠাণ্ডায় হি হি করে কাঁপছে। মশা মারছে। গাছ থেকে মাঝে মাঝে পাতা খসে পড়ছে। যুবকটির কোলে একটা পড়ল।

বিবেক প্রবেশ করে। চেহারা ও সাজ পোষাক যুবকের মতই।

বিবেক : [যুবকের পাশে বসে] কি ? আজকেও হলো না ? [যুবক ঘাড় নেড়ে জানায়-না] হুঁ-উম্। দিনকাল বড়ই খারাপ।

যুবক : [হাত ঘসতে ঘসতে] হবে, হবে—অত চিন্তা কি ?

বিবেক : অতই সোজা ? জেলগুলো সব হাউসফুল নটকে দিয়েছে। বলে রিয়েল ইয়েকেই জায়গা দিতে পারছে না—

যুবক : দেবে দেবে। ওরা দেবে না, ওদের বাপ দেবে।

বিবেক : হ্যাঁ দিল তো। কটা দিন কম চেষ্টা তো আর করলে না।

যুবক : তাতে কি হয়েছে ? ফেইলিওর ইজ দ্য পিলার অব সাক্সেস্।

বিবেক : ও বাবা জ্ঞান যে দেখছি টনটনে।

যুবক : [শিষ দিচ্ছিল। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে] নাঃ, তুমি ঠিকই বলেছ। দিনকাল সত্যিই বড় খারাপ। এখন আর আগের মত নেই। দাবা উল্টে গেছে—

বিবেক : তবে ? শেষ পর্যন্ত আমার কথাটা মানলে তো ? আগে আগে শীত পড়তে না পড়তেই একটা জুতো বা একটা ফাউন্টেন পেন বা কটা টাকা চুরি করে কত সহজেই তুমি জেলে চলে যেতে। আর এতক্ষণে লপসী খেয়ে, কম্বল মুড়ি দিয়ে, সেলের নির্জন কোণে—আঃ—কম্বলের ভেতর—

যুবক : [হঠাৎ রেগে উঠে] আঃ—তুমি থামো তো। বকর বকর করে একেবারে জ্বালিয়ে মারলে।

বিবেক : বাচ্চলে ! আমি আবার তোমায় জ্বালালাম কখন ! তুমি খামোখাই চটে যাচ্ছ।

যুবক : চটব না ? চরম দুঃখের দিনে চরম সুখের কথা মনে করিয়ে দেবার মত দুঃখ আর কিসে আছে ?

বিবেক : ও তোমার দুঃখ হচ্ছে ? তা দুঃখ হবারই তো কথা। সত্যিই তো এমন কিছু একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়—জেলের ভেতরে এই শীতের তিনটে মাস খালি কাটান। তিনটে মাসের নিশ্চিত খাওয়া শোওয়া, মনের মত সঙ্গ, পুলিশ আর শীতের হাত থেকে নিরাপদ থাকা—এই।

যুবক : ধ্যাৎ—সেই থেকে খালি আগড়োম বাগড়োম। আমি বলে মরছি নিজের জ্বালায়।

বিবেক : এ্যাই জানো, তুমি যখন সেই নিউ মার্কেটে—আহ্ হা কি যেন নাম ছাই দোকানটার—শো কেসে একটা ঢিল ছুঁড়ে মারলে, ঝনঝন্ করে ভেঙ্গে গেল। লোকগুলো সব হৈ হৈ করে উঠল। তুমি পুলিশটাকে কত করে বোঝাতে চেষ্টা করলে, যে তুমিই এ কাজ করেছ—পুলিশটা বিশ্বাসই করলে না। তোমাকে দু-একজন সাপোর্টও করলে। পুলিশটা বললে, সত্যি (?) এ কাজ করলে তুমি নাকি দৌড়ে পালাতে। এই বলে একটা ট্যাক্সী ধরবার জন্যে ছুটছিল, তার পেছনে দৌড়ে গেল। তখন আমার এত হাসি পাচ্ছিল না। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

যুবক : [ভেঙচিয়ে] হাসি পাচ্ছিল না। এই তুমি যাও তো এখান থেকে।

বিবেক : [হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে] সব থেকে মজা হয়েছে লাইট হাউসের সামনে, তুমি মেয়েটাকে যখন চোখ টিপলে। ভাবলে মেয়েটা এইবার চেঁচামেচি করে তোমায় পুলিশের হাতে তুলে দেবে। ওমা ! কোথায় কি ! মেয়েটা তো তা করলেই না, উল্টে বললে, আমিই বলব ভাবছিলাম। কিন্তু ঐ পুলিশটার জন্যে—হাঃ হাঃ হাঃ—তখন আমার পেটটা ফাটে আর কি—হাঃ হাঃ হাঃ—

যুবক : [চেঁচিয়ে] তুমি যাবে এখান থেকে ?

বিবেক : [হাসি থামাতে থামাতে] আহা-হা চটছো কেন ? আচ্ছা আচ্ছা আমি একটা কথা বলি শোন—

যুবক : তোমার কোন কথাই আমি শুনতে চাই না। গেট আউট, গেট আউট।

বিবেক : আহা-হা শোনই না। তুমি যাতে জেলে যেতে পার, এই ঠাণ্ডায় যাতে বাইরে থেকে কষ্ট না পাও—আমি সেই উপদেশই তোমাকে দেব।

যুবক : তোমাকে দয়া করে কোন উপদেশ দিতে হবে না। তুমি বিদেয় হও।

বিবেক : অ, শুনবে না ?

যুবক : না।

বিবেক : কি করবে তাহলে ?

যুবক : আমি যাই করি সেটা তোমার দেখার দরকার নেই তুমি কাটো।

বিবেক : বেশ।

বিবেক চলে যেতে থাকে। যুবকটি হাই তুলে শুয়ে পড়ে। বিবেক হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায়।

বিবেক : ও ঘুমোবে ? এই ঠাণ্ডায় ?

যুবক। কি জ্বালায় পড়লাম রে বাবা ! আচ্ছা তুমি কি কিছুতেই যাবে না ?

বিবেক : ঠিক আছে, ঠিক আছে, যখন আমার কথা শুনবেই না—তখন জমে মর এই ঠাণ্ডায়। আমি চললুম।

বিবেক চলে যায়। যুবকটি খবরের কাগজ গায়ে চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ে। একজন ভদ্রলোক প্রবেশ করেন। নাম যতীন। টিপিক্যাল কেরানী চরিত্র। পরণে ধুতি সার্ট। গায়ে চাদর। হাতে ফোলিও ব্যাগ ও একটি প্যাকেট। মাথায় একটি মাঙ্কি ক্যাপ। বেঞ্চের দিকে এগিয়ে যান।

যতীন : এই যে বাবাজী, একটু উঠতে হবে যে বাপধন। বুঝতে পারছি, আপনার খুবই কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আমাকে যে একজনের জন্যে এখানে অপেক্ষা করতে হবে। জানি বেঞ্চিটা আপনার পিতৃদেবের। তা এই অধমকে না হয় একটু বসতেই দিলেন। এই ঠাণ্ডায় আর কাঁহাতক দাঁড়িয়ে থাকা যায়। [যুবকটি অত্যন্ত অনিচ্ছা সহকারে উঠে একপাশে সরে বসে] হুঁ ! যত্ত সব। পার্কে একটু বসবার উপায় নেই—স্টেশনে পা ফেলবার উপায় নেই। ধরে চাবকায় না যে কেন এদের।

গজগজ করতে করতে বেঞ্চে বসেন। ফোলিও ব্যাগটি ও প্যাকেটটি পাশে রাখেন। মুখের সিগারেটে শেষ ছুটো টান মেরে ফেলে দেন। ব্যাগ থেকে একটি বই বার করে পড়তে থাকেন। মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখেন। যুবকটি ফেলে দেওয়া সিগারেটের টুকরোটা কায়দা করে কুড়িয়ে করে টান দিতে থাকে। তারপর হঠাৎ মাথায় যেন একটা বুদ্ধি খেলে যায়। যতীনের প্যাকেটটা নিয়ে আপন মনে চলে যেতে থাকে।

যতীন : (লাফিয়ে উঠে) আরে, আরে একী ! (ছুটে গিয়ে যুবকটির কলার চেপে ধরে) এই যে বাবাজি, অভ্যেসগুলো তো বেশ ভালোই দেখছি। শালা—

যুবক : কি বলতে চান কি আপনি ?

যতীন: মারব এক চড়—বদন বিগড়ে যাবে। চুরি করবার আর জায়গা পাও নি ?

যুবক : বলেন কি ? আমার জিনিষ, আমি নেব তাতে কার কি বলবার আছে ?

যতীন : তোমার জিনিষ ?

যুবক : আমার না তো কি আপনার পিতৃদেবের ?

যতীন : তা আমার—কি—পিতৃদেব, মানে বাপ—মুখ সামলে কথা বল।

যুবক : আমার মুখ সামলানো আছে। আপনি কলার ছেড়ে কথা বলুন।

এই সময়ে যতীনের এক বন্ধু, যার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল, কেষ্ট প্রবেশ করে।

এও এক টিপিক্যাল কেরানী। সার্ট, প্যান্ট, ফুলহাতা সোয়েটার এবং মাথায় গলায় একটা মাফলার জড়ান। যতীনকে যুবকের সঙ্গে ঐ অবস্থায় দেখে এগিয়ে যায়।

কেষ্ট : আরে ! কি হয়েছে যতীন –

যতীন : এই যে এসেছ কেষ্ট – আরে ভাই তোমার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছি আর বেটাচ্ছেলে সেই ফাঁকে মালটা নিয়ে সটকান, ধরতেই আবার উল্টে জবাব, এটা নাকি ওর। বোঝ, কি দিনকালটাই এল বল দেখি !

কেষ্ট : সে কি !

যতীন : তাহলে আর বলছি কি ?

কেষ্ট : থাক্‌গে যাক। যা হবার তা হয়েছে। ও দিকে আবার অনেক দেরী হয়ে গেল। প্যাকেটটা নিয়ে এখন ছেড়ে দাও দিকি। [যুবকের দিকে এগিয়ে] এই, জানিস এ পাড়ায় আমার অনেক জানাশোনা – খবর দিলে ঠেংড়ি খুলে নিত।

যুবকের হাত থেকে প্যাকেটটা নিতে যায়।

যুবক : [হাত সরিয়ে নেয়] দাঁড়ান দাঁড়ান। ওসব রোয়াব অন্য জায়গায় দেখাবেন। উনি আগে প্রমাণ করুন তো জিনিষটা ওঁর।

যতীন : [একটু ঘাবড়ে গিয়ে] বোঝ –

কেষ্ট : হুঁ, সহজে হবে না দেখছি। দাঁড়াও একটা পুলিশ – ও বেটাচ্ছেলেকে আমি দেখাচ্ছি।

যুবক : হ্যাঁ তাই ডাকুন। আমিও তো তাই চাই –

যতীন : [বেশ ঘাবড়ে গেছে] ঐ শোন।

যুবক : কি হলো ডাকুন। আচ্ছা ঠিক আছে আমিই ডাকছি। [রেলিংয়ের দিকে এগিয়ে যায়। রাস্তায় ঝুঁকে ডাকে] সেপাইজী – এ সেপাইজী –

যতীন : [হঠাৎ যেন চটকা ভাঙ্গে ওর দিকে ছুটে যায়] আহা-হা-শুনুন, শুনুন – এই যে মশাই –

কেষ্ট : [বাধা দিয়ে] ডাকুক না –

যতীন : অসুবিধে আছে। এই যে ও মশাই ?

কেষ্ট : [আবার বাধা দেয়] তুমি দাঁড়াও তো –

যতীন : আঃ বলছি না অসুবিধে আছে। [কেষ্ট তবু বাধা দেয়] ধ্যাৎ-তেরী [কেষ্টর হাত ছাড়িয়ে ছুটে গিয়ে যুবককে ধরে] এই যে শুনছেন – শুনুন – তা তো বটেই – মানে কী জানেন – ইয়ে – এমন ভুল তো মাঝে মাঝেই হয় – আমি – তা এটা যদি আপনারই হয় তো আপনি নিন না – মানে আজই বিকেলে একটা রেষ্টুরেন্টে কুড়িয়ে পেয়েছি – তা আপনি যদি নিজের জিনিষ বলে চিনতে পেরে থাকেন তো আপনি –

কেষ্ট : সত্যি তুমি পারও বটে। ফালতু ঝঞ্ঝাট পাকিয়ে খামোখা খানিকটা

দেরী করিয়ে দিলে। এখন চল।

যতীন : কিছু মনে করবেন না। মানে—বুঝতেই তো পারছেন একটা ভুল বোঝাবুঝি—মানে—মিস্‌আণ্ডারস্ট্যান্ডিং—

কেষ্ট : হয়েছে হয়েছে। চল তো এখন। কত দেরী হয়ে গেল—

যতীন : দাঁড়াও একটু বুঝিয়ে নিই—

কেষ্ট : আর বোঝাতে হবে না—অনেক বুঝিয়েছ। প্রত্যেক জায়গায় একটা ঝঞ্ঝাট না বাঁধিয়ে তোমার শান্তি হয় না—চল।

কেষ্ট জোর করে ধরে নিয়ে যায়। যুবকটি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে প্যাকেটটা মাটিতে আছড়ে ফেলে বেঞ্চে গিয়ে বসে। তারপর কি মনে হতে আবার কুড়িয়ে নিয়ে ওদের ডাকে।

যুবক : এই যে, ও মশাই শুনছেন—হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাকেই—শুনুন [যতীন একটু ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করে] এই নিন। এটা আমি আপনাকে দান করলাম।

যতীন : [হতভম্ব হয়ে যায়] এ্যাঁ!

যুবক : হ্যাঁ। যান—কাটুন।

যতীন : হ্যাঁ—না মানে—ইয়ে বলছিলুম কি—দেখুন—

যুবকটি : [রাগে গড়গড় করছে] চোপ্‌ একটা কথা নয়—যান্‌ আবার কথা—যান [এক রকম ধাক্কা দিয়ে বার করে দেয়] শালা—

বিবেক প্রবেশ করে।

বিবেক : [হেসে গড়িয়ে পড়ছে] হাঃ হাঃ হাঃ—

যুবক : হাসবার কি হয়েছে?

বিবেক : [হাসতে হাসতে] হাসছি দুটো কারণে। এক, তোমার অবস্থা দেখে—দুই, ওটা ফেরৎ দেওয়াতে লোকটার মুখের অবস্থা দেখে।

যুবক : [গম্ভীর হয়ে] হুম্‌।

বিবেক : যাক্‌গে—তা—এবার কি করবে ভাবছ?

যুবক : জানি না।

বিবেক : তাহলে আমি বলি শোন।

যুবক : তোমাকে, দয়া করে, আর কোন জ্ঞান দিতে হবে না। আমার চিন্তা আমাকেই করতে দাও।

বিবেক : তুমি আর আমি কি আলাদা?

যুবক : এ তো আচ্ছা ফ্যাসাদ হলো দেখছি—

বিবেক : লক্ষ্মীটি আমার কথাটা একবার শোন।

যুবক : আমি তোমার কোন কথা শুনব না, শুনব না, শুনব না—হয়েছে। তুমি এবার দয়া করে বিদেয় হও।

বিবেক : আচ্ছা তুমি আমাকে সহ্য করতে পার না কেন বল তো ?

যুবক : জানি না, তুমি যাও।

বিবেক : হুম্।

যুবক : কি ?

বিবেক : নিজের মুখোমুখি দাঁড়াতে বড় ভয় তোমার।

যুবক : আচ্ছা, আচ্ছা খুব হয়েছে। তুমি মহাপণ্ডিত ! এখন যাও।

বিবেক : আচ্ছা, ঠিক আছে—

বিবেক বেরিয়ে যায়। একটি অল্প বয়সী ছেলে দৌড়ে প্রবেশ করে হাবভাব চোরের মত। হাঁফাচ্ছে। চোখেমুখে আতঙ্ক, বগলে একটা অ্যাটাচি। যুবক আপন মনে বসে ভাবছে। ওকে লক্ষ্য করে নি।

চোর : এই শুনছেন [যুবক একভাবে বসে। চোরটা ধাক্কা দেয়] এই যে, ও মশাই শুনছেন ?

যুবক : [বিরক্ত হয়ে] কি ?

চোর : আমার এই জিনিষটা রইল। একটু লক্ষ্য রাখবেন। হ্যাঁ—আমি এক্ষুণি আসছি।

দ্রুত প্রস্থান।

চোরটি বেরিয়ে যেতে না যেতেই দুজন কনস্টেবল দৌড়ে ঢোকে।

১ম কনস্টেবল : [ঢুকেই চুলের মুঠি ধরে] এ্যাই শালে—

২য় কনস্টেবল : আরে এ নেহি, এ নেহি। ওহ্ তো প্যাণ্টবালা থা।

১ম কনস্টেবল : হাঁ ? হাঁ—হাঁ। তব ইয়ে কৌন ? ইয়ে সামান তো উসিকো সাথ থা ?

২য় কনস্টেবল : হামারা মালুম হোয়ে কি ওহ্ শালা ফেক্‌কে ভাগ গিয়া—

যুবক : [এতক্ষণে সব বোঝে] এই—ইয়ে তো হামারা চিজ হ্যায়। আমিই তো এটা নিয়ে ভাগছিলাম।

কনস্টেবল্ দুজন পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে হো হো করে হাসতে থাকে।

যুবক : কেয়া হুয়া ? এ সেপাইজি ? তুমহারা বিশওয়াস হোতা নেহি !

১ম কনস্টেবল : নেহি।

যুবক : কাহে ?

২য় কনস্টেবল : আরে কোই আদমী আপনা কসুর কবুল করে !

১ম কনস্টেবল : আউর তুম এ লেকে ভাগতা রহা তো কাহে নেই শাস ফুলাতা ?

যুবক : [হঠাৎ খুব জোরে হাঁফাতে থাকে] লেকিন ম্যাঁয় সাচ্ বোলতা হুঁ—বিশওয়াস কিজিয়ে—

ওরা দুজন খুব হাসতে থাকে।

১ম কনস্টেবল : এ শালা দিমাক খারাপ হ্যায়।

২য় কনস্টেবল : [মাথা দেখিয়ে] পাগল — পাগল।

১ম কনস্টেবল : এ ভজুয়া লে চল।

২য় কনস্টেবল : লেকিন ও শালে কিধার গিয়া এক দফে না দেখি ?

১ম কনস্টেবল : হাঁ ওহ্ শালা হামলোগকো লিয়ে বইঠা হ্যায় ! কিধার ভাগ গিয়া।

২য় কনস্টেবল : [অ্যাটাচিটা নিতে যায়] তো চল্।

যুবক : [অ্যাটাচিটা আঁকড়ে ধরে] নেহি — হাম নেহি দেগা — ইয়ে হামারা হ্যায়।

১ম কনস্টেবল : [ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়] হট্ শালা। হামারা হ্যায় — তেরা বাপকা হ্যায় — শালা !

কনস্টেবল দুজন বেরিয়ে যায়। যুবক মাটিতে পড়ে। চোখ খুলে দেখতে পায় একটা বিড়ি শিশিরে ভেজা। সেটা হাতে নেয়। জামায় মোছে। এধার ওধার তাকাতে থাকে আগুনের জন্যে। কাউকে দেখা যায় না। বিবেক প্রবেশ করে।

বিবেক : না, তোমার বরাতটা নেহাতই ফাটা।

যুবক : তুমি আবার এসেছ ?

বিবেক : অনেক তো হলো। এবার আমার কথাটা একটু শোন। তোমার ভাল হবে।

যুবক : সারা জীবন ধরে অনেক ভাল তুমি আমার করেছ। আর ভাল তোমায় করতে হবে না।

বিবেক : শুনবে না তাহলে ?

যুবক : না।

বিবেক . তবে মরো গে যাও। আমি চললাম।

যুবক : হ্যাঁ তাই যাও। দয়া করে এই ভালটুকু তুমি কর।

বিবেক : কিন্তু আমি আবার আসব। আসতে আমাকে হবেই। তুমি আমাকে দেখতে না পারলেও আমি যে তোমার কষ্ট একদম সহ্য করতে পারি না।

যুবক : ওহ্ ! কী আমার দরদরে !

বিবেক : বল। কিন্তু তুমি ভাল করেই জানো, আমি তোমায় কত ভালবাসি।

যুবক : হয়েছে — হয়েছে। ভালবাসা। ভারী আমার ভালবাসা দেখানেবালা এলেন। আজ কার জন্যে আমার এই অবস্থা ? এত কষ্ট কার জন্যে ?

বিবেক : আমার জন্যে ?

যুবক : না — আমার জন্যে !

বিবেক : এই পৃথিবীর নিয়ম। যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর। আমি কোথায় তোমার ভালর জন্যে—

যুবক : হ্যাঁ হ্যাঁ! এতদিন তোমার কথা শুনে এই ভাল তো আমার হলো। যাক্‌গে আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। তোমার সঙ্গে কথা বলতেও আমার প্রবৃত্তি হয় না। আমি তোমাকে ঘেন্না করি। বুঝেছ, আমি তোমাকে ঘেন্না করি।

বিবেক : [আহত কণ্ঠে] ওঃ!

যুবক : হ্যাঁ এবার তুমি বিদেয় হও।

বিবেক : আচ্ছা—আচ্ছা।

প্রস্থান।

ঘুরে—রেলিংয়ের ওধারে রাস্তায় একজন খাবারওয়ালাকে দেখা যায়। কাঁধে একটা খাবারের বাক্স—কাঁচ লাগানো। তার উপরে একটা লম্ফ জ্বলছে। পরণে হাঁটু পর্যন্ত ময়লা একটা ধুতি। গায়ে তালি মারা জামার ওপরে একটা ময়লা চাদর জড়ান। গলায় কণ্ঠী।

যুবক : এই যে—ও ভাই—এদিকে এদিকে। [খাবারওয়ালা ইশারায় ওকে অপেক্ষা করতে বলে। একটু বাদে ঢোকে] দেখি ভাই একটু আগুনটা—

লম্ফর আগুনে বিড়ি ধরায়। তারপর সুখটান দিতে থাকে।

খাবারওয়ালা : এই জন্যি-আমারে শুধুমুধু ডেকি আনলেন?

যুবক : হ্যাঁ—না, না—খাব খাব। কি আছে?

খাবারওয়ালা : [বেঞ্চির এক ধারে বসে] তাই বলেন। এই শেষমেষ যা পড়ি আছে। খানকয় কচুরী আর দুখান অমৃত্তি।

যুবক : গরম?

খাবারওয়ালা : এত রেতে—আর এই ঠাণ্ডায় কি গরম থাকে বাবু!

যুবক : দেখি চারখানা কচুরী। কত করে তোমার কচুরী?

খাবারওয়ালা : [শালপাতার ঠোঙায় কচুরী দিতে দিতে] দশ পয়সা।

যুবক : অ—তবে থাক।

খাবারওয়ালা : ক্যান্—থাকবে ক্যান্?

যুবক : ধ্যুর—ঐ ঠাণ্ডা কচুরী আবার দশ পয়সা!

খাবারওয়ালা : আপনি জ্যাখেন না কোথায় দশ পয়সার কমে পাওয়া যায়। দোকানে সব বিশ পয়সা।

যুবক : আরে যাও যাও। ও ঠাণ্ডা বাসি মাল আমি নেব না।

খাবারওয়ালা : বাসি কন কি? সব দুপুরি করা—

যুবক : হোক্‌গে। ও ঠাণ্ডা মাল আমি দশ পয়সায় নেব না। পাঁচ পয়সায় হবে?

খাবারওয়ালা: পাঁচ পয়সা! আপনে হাসালেন ছ্যাখছি।

যুবক: তোমার হাসি পাচ্ছে? তা বাইরে গিয়ে হাস যত তোমার ইচ্ছে। এখানে জ্বালিও না।

খাবারওয়ালা: যাক্ গে শোনেন বাবু—সব শেষ হয়্যি গেছে। এই শেষ কয়েকখান পড়ি আছে। আট পয়সা করি-দিত্তি পারি। নিবেন?

যুবক: আমি তো যা বলার বলে দিয়েছি।

খাবারওয়ালা: আচ্ছা নেন—সাত পয়সা করি দেব। দেখেন নস্ কইর‍্যা দিচ্ছি।

যুবক: পাঁচ পয়সার এক পয়সা আমি বেশি দেব না।

খাবারওয়ালা: [হঠাৎ রেগে ওঠে] আপনের নেওনের ইচ্ছা নাই তাই কন। [গজগজ করতে করতে বেরিয়ে যায়] এমন হারামজাদা লোক—

প্রস্থান।

যুবক বসে বিড়ি খাচ্ছে। নেপথ্যে বিবেকের গলা ভেসে আসে। যুবক এমন ভাবে কথা বলে যেন তার সামনেই বিবেক বসে।

বিবেক: লোকটা কিন্তু ঠিক বুঝতে পেরেছে তোমার ভাঁড়ে মা ভবানী। কি করে বুঝল বলত? [যুবক চুপ করে বসে] কি হলো? কি ভাবছ?

যুবক: ভাবছি, তোমার মত নির্লজ্জ এই পৃথিবীতে আমি আর দুটো দেখিনি। নাঃ, স্বীকার করছি তোমার স্ট্যামিনা আছে।

বিবেক: তা আছে। কি করব বল? শেষদিন পর্যন্ত আমাকে যে তোমার সঙ্গেই থাকতে হবে। কিন্তু তুমি যা ফ্যাসাদ বাঁধালে তার থেকে কি করে মুক্তি পাবে তাই ভাবো।

যুবক: কেন?

বিবেক: তুমি কি ভাবছ যে ও একেবারে চলে গেল?

যুবক: হ্যাঁ।

বিবেক: মোটেই না। ওর এই শেষ কখানা মাল নিয়ে আর কত ঘুরবে। এক্ষুণি এসে বলবে, বাবু ছ পয়সায় ছেড়ে দিচ্ছি ছ্যাখেন।

যুবক: আমি নেব না।

বিবেক: কিন্তু ও যখন পাঁচ পয়সাতেই রাজি হয়ে যাবে—তখন?

যুবক: ধ্যাৎ।

বিবেক: হাঃ হাঃ ঐ তো ফিরে আসছে।

নেপথ্যে বিবেকের গলা মিলিয়ে যেতে না যেতেই খাবারওয়ালা প্রবেশ করে।

খাবারওয়ালা: বাবু ছ পয়সায় ছেড়ে দিচ্ছি ছ্যাখেন।

যুবক: কেন বারবার জ্বালাচ্ছ বল দেখি? আমি তো বলেই দিয়েছি।

খাবারওয়ালা :   ন্যান্। খুব নস হয়ি গ্যাল। এই ক খানার জন্যি আর—ক খান দেব কন ?

যুবক :   মাথা খেয়েছে।

খাবারওয়ালা :   মুখে কুলুপ এঁটি বসি থাকলে চলবে! আমার শ্যাষ বাসটা আর ফ্যাল করায়ে দিবেন না। কন—

যুবক :   [হঠাৎ খুব মেজাজের সঙ্গে] চারটে দাও।

খাবারওয়ালা :   [শালপাতার ঠোঙা এগিয়ে দেয়] ন্যান ধরেন।

যুবক :   [খেতে খেতে] নাম কি তোমার ?

খাবারওয়ালা :   এঁজ্ঞে ভজহরি।

যুবক :   কোথায় থাকো ? এখানেই ?

খাবারওয়ালা :   এঁজ্ঞে না। টাকি।

যুবক :   বাবা! রোজ এতদূর থেকে খাবার বিক্রী করতে আস!

খাবারওয়ালা :   এই যখন চাষবাসের কাজ থাকে না তখনই খালি, নইলি আর আসা হয় কই।

যুবক :   বাব্বা! পারোও বটে।

খাবারওয়ালা :   তা কি করব বলেন ? গতর না খাটালি কে বসি বসি ভাত দেবে ?

যুবক :   চুরি কর না কেন ?

খাবারওয়ালা :   এঁ্যা ? বাবু কি যে কন! [নাক কান মুলতে থাকে] ছোটনোক হতি পারি কিন্তু ঐ দুম্মতি য্যান ভগমান কখন না দ্যান।

যুবক :   কেন ? লজ্জা কিসের ? এখন তো ঐটেই একমাত্র সম্মানজনক কাজ।

খাবারওয়ালা :   ছাড়ান দ্যান ওসব। আর নিবেন ?

যুবক :   দেবে ? আচ্ছা দাও—আর দুটো দাও। [খাবার নেয়। খেতে খেতে] লাভ টাভ হয় ?

খাবারওয়ালা :   ঐ যা হয়।

যুবক :   চলে ?

খাবারওয়ালা :   চলে কি আর বাবু ঐ—আমাদের হাল। জানেনই তো সব।

যুবক :   দেখি আর চারটে দাও।

খাবারওয়ালা।   আর তো নাই।

যুবক :   শেষ হয়ে গেল ? [বাক্সয় ঝুঁকে দেখে] ওটা কি ?

খাবারওয়ালা :   অমৃত্তি—এই দুখানাই মাত্তর কাছে। দেব ?

যুবক :   দাও। কে কে আছে দেশে ?

খাবারওয়ালা :   বউ আছে।

যুবক :   ছেলে পিলে ?

খাবারওয়ালা : আছে।

যুবক : কটা ?

খাবারওয়ালা : [ট্যাঁক থেকে বিড়ি বার করতে করতে] আট্‌ডা ছেলি — আর পাঁচডা মেয়ি।

যুবক : বাব্বা !

খাবারওয়ালা : তাওতো তিন্‌ডে মরি গ্যাল।

বিড়ি ধরায়।

যুবক : আর আছে নাকি ভাই ?

খাবারওয়ালা : [ওকে একটা বিড়ি দেয়] ভদ্দরনোকিদের মত তো আর আমাদের না। যত বেশি ছেলে হবে তত বেশি পয়সা নে ঘরে তুলতি পারবনে। তা আপনের কয়ডা বাবু ?

যুবক : আমার ? বাঃ তোমার তো বেশ এলেম আছে দেখছি। আমার — আমার কটা বলি — দাঁড়াও একটু ভেবে দেখি।

খাবারওয়ালা : আমার আর ড্যারানের সময় নাই। আমারে ছেড়ি ছান বাবু — ওদিকে আবার নেট হয়ি যাবে।

যুবক : তা যাও না। আমি কি তোমাকে ধরে রেখেছি নাকি ?

খাবারওয়ালা : পয়সাডা দিয়ি ছান। ঐ বাঁধনেই তো ধরি রেখেছেন। নইলি —

যুবক : [অবাক হয়ে] কিসের পয়সা ?

খাবারওয়ালা : ঐ যে খেলেন —

যুবক : কি খেলাম ? তুমি তো আজব লোক দেখছি —

খাবারওয়ালা : ছান ছান। [হেসে] শেষ বাসটা চলি গ্যালে —

যুবক : যাঃ বাবা ! আরে ! কি দেবটা কি ? আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল তো ?

খাবারওয়ালা : ক্যান মস্করা করছেন।

যুবক : কে তোমার সঙ্গে মস্করা করছে — বাজে কথা বলছ কেন ?

খাবারওয়ালা : [এবার একটু সন্দেহ হয়] কি আমি বাজে কথা বলছি — আপনি আমার থে' খাবার খান নাই ?

যুবক : না।

খাবারওয়ালা : খান নাই ?

যুবক : না।

খাবারওয়ালা : [আস্তে আস্তে উঠে চাদরটা কোমরে বাঁধতে থাকে] হুঁ — আমার পেরথমেই সন্দ হয়েছিল। শালা ঠগ্‌ —

যুবক : এই মুখ সামলে কথা বল —

খাবারওয়ালা : [যুবকের দিকে এগোতে এগোতে] তোর সঙ্গি কি মুখ

সামলাব রে—শালা চোর। তাই আমারে উপদেশ দেওয়া হচ্ছিল, চুরি কর না ক্যান।

এগিয়ে এসে ওকে ঝাপটে ধরে।

যুবক : এ্যাই, এ্যাই কি হচ্ছে কি—

খাবারওয়ালা : আমি তোর পকেট দেখব।

পাঞ্জাবির দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেয়। দেখা যায় দু পকেটই ফুটো। ট্যাক হাতড়ে দেখে।

যুবক : ধ্যাৎ তেরী। এই মাইরী লাগছে।

খাবারওয়ালা : [ওর কলার চেপে ধরে] ছাড়ব ড্যাঁরা। তোরে ফোকুটি আর এট্টু খাওয়ে নিই—

যুবক : দেখ ভাল হবে না কিন্তু—বলে দিচ্ছি।

খাবারওয়ালা : তুই কি ভয় দেখাচ্ছিস রে হারামজাদা! পকেটে পয়সা না থাকে তো খাস ক্যান্? গুখেকোর ব্যাটা।

মারতে থাকে।

যুবক : এ্যাই এ্যাই গায়ে হাত দেবে না বলে দিচ্ছি। অত কথার কি আছে—একটা পুলিশ ডেকে আমাকে ধরিয়ে দাও।

খাবারওয়ালা : পুলিশ কি হবে আঁটকুড়ির ব্যাটা—আমি একাই তোরে শায়েস্তা করতি পারব। তোর চোদ্দপুরুষের আমি একাই কি করে উদ্ধার করি দ্যাখ্।

যুবককে মাটিতে একরকম পেড়ে ফেলে। যুবকটি নিজেকে কোন রকমে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। মঞ্চের অন্য দিক দিয়ে দুজন গুণ্ডা শ্রেণীর লোক ঢোকে। সঙ্গে একটা পেটি, যার ভেতরে ব্লাডারে ভরা চোলাই মদ, কোকেন, ইত্যাদি রয়েছে।

ওস্তাদ : আবে, এই ভাল করে ধর। হঁ্যা—এইখানটায় রাখ। [ওরা কেউই যুবক ও খাবারওয়ালাকে লক্ষ্য করেনি] এই মদনা—[পকেট থেকে টাকা বার করে দেয়] তুই ট্যাক্সিটাকে ছেড়ে দিয়ে আয়—যা।

মদনা : [হঠাৎ ওদের দেখতে পায়] এ্যাই গুরু, দেখ মাইরী ওদিকে আবার কি! শালা রাজেশ খান্না আর প্রেম চোপরা মাইরী!

ওস্তাদ : এ আবার কি ঝুট ঝামেলা বে—দাঁড়া তো। [গিয়ে খাবারওয়ালাকে টেনে ছাড়িয়ে নেয়] এ্যাই শালা কি হয়েছে বে?

খাবারওয়ালা : [হাঁফাতে হাঁফাতে] এই তো আপনারাই বিচার করেন—

ওস্তাদ : কি হয়েছে কি?

খাবারওয়ালা : এই হারামী, কাছে একটা পয়সা নেই আগে বলে নি—খাবার টাবার খেয়ি এখন বলে কি না [প্রবল উত্তেজনায় আটকে যায়। কেঁদে ফেলে] আমি গরীব মানুষ। আমি কোথায় পাই বলেন দিনি? একটা বিড়ি

খাইয়েছি হারামীর বাচ্চাকে—

ওস্তাদ : ঠিক আছে দাঁড়া। [যুবকের দিকে এগিয়ে যায়। চুলের মুঠি ধরে টেনে তোলে] আবে এই—তুই ওর খাবার খেয়েছিস ?

যুবক : হাঁ।

ওস্তাদ : তা পয়সা দে।

যুবক : পয়সা নেই।

ওস্তাদ : শালা পয়সা নেই তো খাবার সময় মনে ছিল না ? পয়সা নেই তো খেয়েছিলিস কেন ?

যুবক : ক্ষিদে পেয়েছিল তাই—

ওস্তাদ : তা পকেটে যখন পয়সা নেই চাঁদ তখন ক্ষিদে পায় কেন ?

যুবক : দেখবার মত চোখ তো কারো নেই, তবু এই নরকে চাঁদ ওঠে কেন ?

ওস্তাদ : উরে শালা—বুকে আয় মাইরী! এ শালা কে রে ? নির্ঘাৎ রোবে ঠাকুরের বাচ্ছা।

মদনা : গুরু, কি করবে এখন ?

ওস্তাদ : কি করি বল তো—

মদনা : আমি বলি কি, এ শালার পয়সাটা মিটিয়ে দিয়ে এখন এ ঝুট ঝামেলা হটাও শালা।

ওস্তাদ : ভাল বলেছিস। দাঁড়া। [খাবারওয়ালাকে] এ্যাই কত হয়েছে বে তোর ?

খাবারওয়ালা : এঁজ্ঞে ছয়ডা কচুরী—

ওস্তাদ : [ধমকে] আরে ধ্যাৎ। মোট কত হয়েছে তাই বল।

খাবারওয়ালা : এঁজ্ঞে একটাকা।

ওস্তাদ : [টাকা দেয়] চল হাট। হাট।

খাবারওয়ালা : যেতেছি—যেতেছি বাবা।

বাক্স নিয়ে প্রস্থান।

ওস্তাদ : এই মদনা, তুই গেলি না—

মদনা : হাঁ এই যাই। ঐ শালার জন্যেই তো আটকে গেলাম।

প্রস্থানোদ্যত।

ওস্তাদ : দাঁড়া—চ তোর সঙ্গে আমিও যাই দেখি সে পার্টি এল কি না।

মদনা : তাহলে মালটা পড়ে থাকবে এখানে ?

ওস্তাদ : তাও তো বটে। দাঁড়া—আ বে এই (যুবক নির্বিকারভাবে বসে। ওস্তাদ আরো গলা তুলে) আ বে এই শালা হারামীর বাচ্চা ?

যুবক : কি ?

ওস্তাদ : ও, শালা উত্তর দিচ্ছে ছাখ্ যেন আমার বাপ। আ বে এই, তোকে

খাওয়ালাম কি এমনি! শোন্, ঐ মালটা ঐখানে রইল, দেখবি—আমরা এখুনি আসছি। যদি শালা এদিক ওদিক হয় তো লাশ একেবারে গায়ের হয়ে যাবে বুঝেছিস? [যুবক ঘাড় নাড়ে। মদনাকে] নে চ।

যুবক : দেখি একটা সিগারেট দেখি।

ওস্তাদ : ওরে শালা।

মদনা : দিয়ে দাও ; দিয়ে দাও।

যুবক : [সিগারেট নেয় ওস্তাদের হাত থেকে। ওস্তাদকে প্রস্থানোদ্যত দেখে] আগুনটা দেখি।

ওস্তাদ : আই বা—একে বে? শালা প্রাইম মিনিস্টারের ছানা [লাইটার ধরায়] লে বে লে, ধরা—আর দেখতে হবে না। [মদনাকে] লে চ।

যুবক নিবিষ্টমনে সিগারেটে টান দিতে থাকে। কি মনে হতে ওঠে। এধার ওধার তাকিয়ে একবার দেখে নেয়। তারপর গিয়ে ওদের নিয়ে আসা বাক্সর ডালাটা খোলে। একটা ব্লাডার তুলে দেখে। গন্ধ শোঁকে। চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। কোকনের বাক্স-গুলো ও দেখে। তারপর সব ঠিক ঠাক রেখে ডালাটা বন্ধ করে দেয়। সিগারেটে দুটো টান মেরে লাফিয়ে ওঠে আনন্দে। সিগারেট ছুড়ে ফেলে দেয়।

যুবক : (চীৎকার করে) সেপাইজী এ সেপাইজী।

১ম কনস্টেবল : [অনেক দূর থেকে] ক্যা রে—

যুবকটি আনন্দে নাচতে থাকে। একটু বাদে ১ম কনস্টেবল প্রবেশ করে।

১ম কনস্টেবল : কেয়া রে?

যুবক : [নাচতে নাচতে] হুঁ হুঁ—

১ম কনস্টেবল : কেয়া?

যুবক : হুঁ হুঁ—

১ম কনস্টেবল : [না বোঝার ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়ে] হুঁ হুঁ।

যুবক : এইবার? বারেবার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান! এইবার কি হবে?

১ম কনস্টেবল : কিসকা কেয়া হোগা?

যুবক : কিসকা কেয়া হোগা! ইধার আইয়ে—[কনস্টেবলকে নিয়ে গিয়ে বাক্সর ডালা খুলে এক এক করে সব মাল বার করে দেখায়) এবার? ইয়ে সব হামারা—হাম আজকাল এইসব করতা হ্যায়।

১ম কনস্টেবল : তো কেয়া!

যুবক : কেয়া আবার। লে চল হামকো।

১ম কনস্টেবল : যাঃ শালা—এ কোন রে—

যুবক : তুমহারা ভগ্নীপতি। অভি লে চল শশুরাল—

১ম কনস্টেবল : ভাগ শালা—ভাগ হিঁয়াসে।

এমন সময় ওস্তাদ প্রবেশ করে।

ওস্তাদ : কেয়া রে—কেয়া হুয়া রে মদন ?

১ম কনস্টেবল : হে হে হে মেরা রাজ্জা আ গিয়া। দেখ্ দেখ্ এ হারামী কা বোলে দেখ—এ মাল উসকা !

ওস্তাদ : কি ?

১ম কনস্টেবল : হ্যাঁ।

যুবক : হ্যাঁ আমারই তো। এ সব হামারা—মঁয় কসম খাকে বোলতা হায়—আভি লে চল।

ওস্তাদ : [এগিয়ে এসে জামার কলার ধরে] কি ? ! এ মাল তোর [এলোপাতাড়ি মারতে থাকে] কোথায় তোর খাবারের দেনা মেটালাম—শালা বেইমান [যুবকটি মাটিতে পড়ে যায়। ওস্তাদ টেনে তোলে] এবার বল—কার মাল ?

যুবক : আমার--এ সেপাইজী।

ওস্তাদ : [সজোরে পেটে লাথি মারে] তুই বানচোত আমায় চিনিস না—এ মাল তোর ? শালা রেণ্ডির বাচ্চা—

প্রচণ্ড মারতে থাকে। এমন সময় মদন ঢোকে। সঙ্গে একজন লোক। ওদের খদ্দের।

মদন : কি হলো এই গুরু [ছাড়াতে চেষ্টা করে] কি করছ কি ?

ওস্তাদ : ছেড়ে দে, শালাকে আজ আমি—

মদন : [অতিকষ্টে ছাড়িয়ে নেয়] আরে কি হলো বলবে তো।

১ম কনস্টেবল : এ মদনবাবু শুনিয়ে—আপলোগ তো মাল রাখকে চলা গিয়া। আজ ইধার ডিউটি থা—তো হাম ডিউটি দেতা রহা। ইয়ে হারামী হামকো বুলালো। ওসকো বাদ বোলে কি—

ওস্তাদ : [আবার তেড়ে যায়] এ মাল নাকি ওর। শালা—

মদন : [বাধা দেয়] ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। কি যে ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ কর মাইরী বুঝি না। ওর যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে—

ওস্তাদ : পার্টি এসেছে ?

মদন : হ্যাঁ এই তো।

ওস্তাদ : টাকা এনেছেন ?

লোকটি : হ্যাঁ।

পকেট থেকে একতাড়া নোট বার করে দেয়।

ওস্তাদ : (গুনে নিয়ে) একি ছশো বিশ !

লোকটি : ওর বেশি দেওয়া যাবে না।

ওস্তাদ : তাহলে মালও দেওয়া যাবে না।

লোকটি : কেন ফালতু ঝঞ্ঝাট করছেন ? আপনাদের সঙ্গে এতদিনের কারবার—

ওস্তাদ : তা কি? মাল লসে ছেড়ে দিতে হবে!

লোকটি : [পকেট থেকে টাকা বার করে ওস্তাদের হাতে গুঁজে দেয়] আচ্ছা বাবা—আর পনের টাকা দিচ্ছি। আর ঝামেলা করবেন না।

ওস্তাদ : [মদনার দিকে তাকায়। ও দিয়ে দেবার ইঙ্গিত করে] ঠিক আছে। কিন্তু এ রকম হতে থাকলে লেনদেন চালানো শক্ত হবে। এ মদনা তোল।

লোকটা ও মদন পেটিটা নিয়ে বেরিয়ে যায়। ওস্তাদও ওদের পেছন পেছন বেরিয়ে যেতে থাকে।

১ম কনস্টেবল : [ওকে থামায়] অ্যাই মেরা রাজা। বহুৎ দিন বাদ তুয়ার সাথ ভেট ভইল। তু শালা বহুৎ দুবলা হো গইল।

ওস্তাদ : হ্যাঁ শালা টাকার গন্ধ নাকে যেতেই দরদ একেবারে উথলে উঠল।

১ম কনস্টেবল : কেয়া—তুয়ার সাথ হামার টাকার সম্বন্ধ! তু দিস না হামাকে টাকা। তোর টাকা হামি ছোঁবে না।

ওস্তাদ : [দশটা টাকা বার করে দেয়] লে বে লে—অনেক ফুটিয়েছিস।

১ম কনস্টেবল : [অভিমান করে টাকাটা নেয়] হায় রাম! মোটে দশ! আর পাঁচ রুপেয়া ছোড় মাইরী।

ওস্তাদ : কি দরদ উপে গেল—ঐ লিয়ে বাড়ি যা।

১ম কনস্টেবল : এ-এ রাজা—এ মাইরী—আর পাঁচ ছোড়—

যুবক আস্তে আস্তে উঠে বসে। সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপছে। মুখে, চোখে কালশিটের দাগ। ঠোঁটে কষ বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। এমন সময় একটা অপূর্ব সুর ভেসে আসে। ও কেমন যেন হয়ে যায়। বেঞ্চিটায় উঠে বসবার চেষ্টা করে। থমকে যায়। বিবেক প্রবেশ করে।

বিবেক : কি হলো? যেন থমকে গেলে—কে যেন থামিয়ে দিল তোমাকে—

যুবক : আচ্ছা ঐ—কোথায় বাজছে?

বিবেক : শুনতে পেয়েছ তাহলে।

যুবক : তুমি পাচ্ছ না?

বিবেক : হ্যাঁ আমি তো অহরহ শুনছি। তুমিই শুনতে পাও না। কষের রক্তটা মুছে নাও।

যুবক। কোথায় যেন—

বিবেক : বলতো কোথায়—কবে?

যুবক : মনে পড়ছে না—মনে পড়ছে না। [একটু যেন মনে পড়ে যায়] অনেকদিন আগে—

বিবেক : হ্যাঁ অনেকদিন আগে। যখন তোমার জীবনে মা ছিল, গোলাপফুল ছিল, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, বন্ধুবান্ধব ছিল, আরো, আরো অনেক কিছু ছিল—সেইসব দিনের কথা। মনে পড়ছে? মনে পড়ে সেই দিনগুলো? সেই স্নেহ, মমতা, ভালবাসা আর আবেগ মাখানো সেই স্বপ্নিল দিনগুলো। যখন তুমি

একজন মানুষ ছিলে এই সুর সেদিনের। সেই পচা, ভূতো, গণশা, হেবো, লাটাই সবাই মিলে গাঙ্গুলীদের পুকুরটাতে—ঝাঁপাই জুড়ে পুকুরটাকে তোলপাড় করে তুলতে—এই সুর সেদিনের। সন্ধ্যেবেলা ঘরে হ্যারিকেনের আলো—আর বাইরে পাকা ধানের মিষ্টি গন্ধ, ঝিঁঝিঁর ডাক আর আকাশ ভরা জোনাকি। তোমার বাবা তোমাকে পড়াতেন। তুমি বানান করে পড়তে, এই পৃথিবী আমাদের—এখানকার যত ফল ফুল, যত গন্ধ রস, যত আলোক বাতাস, যত কিছু সম্পদ, যত কিছু আনন্দ তাহাতে আমাদের সমান অধিকার। মনে পড়ে, তখন তোমার সারা গায়ে কি রকম কাঁটা দিয়ে উঠত আর ঠিক তক্ষুণি শুনতে পেতে এই সুর। আরো রাতে যখন বাইরে শেয়ালের ডাক শুনে ভয় পেয়ে মাকে বাদুরের মত ঝাপটে ধরে মায়ের বুকে মুখ লুকোতে—আর তোমার মা বরাভয়ের মত অজস্র চুমোয় তোমাকে ভরিয়ে দিতেন। তখন নির্ভয়ে তুমি এই সুর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তে। মনে পড়ছে? [যুবকের চোখ দিয়ে টস্‌টস্ করে জল গড়িয়ে পড়ছে] আর একটু বড় হলে, যখন তোমাদের পাশের বাড়ির হারাণ চাটুজ্জ্যের মেয়ে তোমার মনে একটু আধটু করে রং ধরাতে শুরু করেছে, যখন এই পৃথিবীর অন্যায়, অবিচার আর নিষ্ঠুরতা দেখতে পেয়ে তোমার ইচ্ছে হতো সমস্ত কিছু ভেঙ্গে গুড়িয়ে ফেলে নতুন এক স্বর্গ রচনা করতে—তখনই এই সুর তোমার মস্তিষ্কের কোষে গুণগুণিয়ে উঠত। মনে আছে?

যুবক : [নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে। পারে না। ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে] তুমি চুপ কর।

বিবেক : না আজ আর তুমি আমাকে থামাতে পারবে না। কি হবে যুবক এই ভাবে বেঁচে থেকে? এই ঘৃণ্য দিনগুলো, মূল্যহীন কামনা বাসনা, মৃত আশা আকাঙ্ক্ষা, এই ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রবৃত্তি আর এই নীচ মনোভাব—এই নিয়েই তো আজ তোমার যা কিছু অস্তিত্ব। এই পচা নর্দমার কীটের মত জীবন তোমার ভাল লাগে? এবার ফেরো। এখনো সময় আছে। এতটুকু উষ্ণতার জন্যে হেন কোন খারাপ কাজ তো নেই যা তুমি করলে না—কি পেলে? শতকোটি সূর্যের মালিক আজ এতটুকু উষ্ণতার কাঙাল—হায়। সেই ঝোড়ো আবেগ, সেই স্বর্গ, সেই প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা টগবগে ফুটন্ত যৌবনকে কেন তুমি এ ভাবে হত্যা করলে যুবক—কেন?

যুবক : [হাউ হাউ করে কাঁদছে] আমি কি করতে পারতাম? আমি কি করতে পারি?

বিবেক : তুমিই তো পারতে। একমাত্র তুমিই তো পার আমাকে মুক্ত করতে। ফিনকি দিয়ে ওঠা উৎসারিত ঝর্ণার মত অজস্র ফেনিল ধারায় এই পৃথিবীর জঞ্জাল ধুয়ে সাফ করে দিতে।

যুবক : আঃ তুমি যাও। তুমি যাও। আমি আর পারছি না।

বিবেক : তার আগে তুমি কথা দাও। বল। বল তুমি আমাকে সেই লাভাস্রোত ফিরিয়ে দেবে। বল। বল যুবক। চুপ করে থেকো না। আমি অনেক অপেক্ষা করেছি। যুগযুগান্তর ধরে তোমাদের কাছে কাঙালের মত এইটুকু ভিক্ষে চেয়ে চেয়ে আজ আমি বড় ক্লান্ত। আজ আমি কিছুতেই যাব না। কথা দাও। বল তুমি মানুষ হবে—বল।

যুবক নিজেকে সামলাতে সামলাতে ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। এমন সময় ১ম কন্‌স্টেবল্ প্রবেশ করে এবং সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে যুবককে দেখতে থাকে। বিবেকের উপস্থিতি ওর চোখে ধরা পড়েনি।

বিবেক : আঃ! তুমি আমাকে বাঁচালে যুবক। বেশ তবে আমি যাই। তুমি আমাকে কথা দিয়েছ মনে থাকে যেন।

প্রস্থান।

১ম কন্‌স্টেবল্ : [যুবকের কলার ধরে তোলে] এ্যাই ছুপকে ছুপকে ক্যা করতা হ্যায় রে?

যুবক : কুছ নেহি তো সেপাইজী।

১ম কন্‌স্টেবল্ : কুছ নেহি? তো হামকো দেখকে উধার কাহে ধুষতা?

যুবক : ম্যায় সাচ বোলতা হুঁ সেপাইজী—ম্যায় কুছ নেহি কিয়া।

১ম কন্‌স্টেবল্। চোপ্ শালা। চল।

যুবক : সেপাইজী—বিশওয়াস কিজিয়ে—এইবার অন্তত আমি কিচ্ছু করিনি।

১ম কন্‌স্টেবল্ : হাঁ হাঁ হুঁয়া যাকে বোলে গা। চল।

ধাক্কা মেরেঠেলে বার করে নিয়ে যায়। নেপথ্যে আদালতে যে রকম হল্লা হয় সেই রকম হল্লা শোনা যায়। তারপরে হাতুড়ি পেটার শব্দ।

মাইক্রোফোন : অর্ডার, অর্ডার, অর্ডার। আমি নিজে অনেক চিন্তা করে এবং মহামান্য জুরীবৃন্দের সঙ্গে একমত হয়ে, আমাদের সুমহান ভারতীয় ঐতিহ্য বজায় রাখতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৯-এর হ, ৪৭২-এর য, ২৫৩২-এর ব, ১৮১-এর র এবং ৮৮৫-এর ল ধারা অনুসারে আসামীকে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলাম।

মঞ্চ ফাঁকা। জেলের পেটানো ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসে। আস্তে আস্তে পর্দা পড়ে।

বাতাসে বারুদের গন্ধ

রবীন্দ্র ভট্টাচার্য

অফিসার: অত সহজে বরফ গলে না। আমরা তোমার সুমনকে চিনি না। আমরা তোমার সুমনকে কোনদিন দেখি নি। পা ছাড়ো পা ছাড়, হারামজাদী। পাঁচ মিনিট সময় দিলাম। এর মধ্যে এখান থেকে না গেলে হাবিলদারের হাতে তুলে দেব। সারারাত তুই খাদ্য জোগাবি ঐ গাঁজাখোরটার।

নাটক : বাতাসে বারুদের গন্ধ

নাট্যকার : রবীন্দ্র ভট্টাচার্য। জন্ম ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪ : নৈহাটি। গণনাট্যে বিশ্বাসী। মফঃস্বল বাংলার গ্রুপ থিয়েটার নিয়ে নাট্য-আন্দোলনের একজন অকৃত্রিম সংগঠক। এ পর্যন্ত ৬২টি নাটকের রচয়িতা। যাত্রিকে-র সঙ্গে সূত্রপাত থেকেই যুক্ত।

রচনাকাল : ১৯৭৬

চরিত্রলিপি : ১ম বক্তা। ২য় বক্তা। ৩য় বক্তা। ৪র্থ বক্তা। পুলিশ অফিসার। ইন্সপেক্টর চ্যাটার্জী। সাংবাদিক। শশাঙ্ক চক্রবর্তী। মনসুর মিঞা। প্রশান্ত সরকার। হানিফ। সুমন। নিতাই। অম্বা।

প্রথম অভিনয় : নভেম্বর '৭৭ মহুয়া নাট্যসংস্থা আয়োজিত প্রতিযোগিতা মঞ্চে।

প্রযোজনা : যাত্রিক, নৈহাটি। অভিনয়শিল্পী : পুলিশ অফিসার সুব্রত সান্যাল / অঞ্জন দে। সাংবাদিক বিশ্বনাথ ব্যানার্জি। পুলিশ ইনস্‌পেক্টর অমিত চ্যাটার্জি। শশাঙ্ক হরিমোহন ঘোষ / অনিল মুখোপাধ্যায়। মনসুর স্বপন ভট্টাচার্য। প্রশান্ত সরকার জগবন্ধু চক্রবর্তী। সুমন প্রতুল কুণ্ডু। নিতাই রমেন বসু। হানিফ প্রবীর দে। অম্বা রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। দর্শক অরুণ ভট্টাচার্য, শিবপ্রসাদ পোদ্দার, প্রবীর দে, রমেন বসু।

রজনী : ২৬। রৈবতক, বালি। মহুয়া, হালিশহর। শিল্পীমন, ব্যারাকপুর। রঙ্গাজীব, কল্যাণী। প্রগতি, সুন্দিয়া। নিত্যনতুন সংঘ, ইছাপুর। শ্রীলতা ইনষ্টিটিউট, চিত্তরঞ্জন। তরুণ সংঘ, খড়দহ। স্টুডেন্টস থিয়েটার গ্রুপ, হালিশহর। প্রতাপপুর অভিযাত্রী, চুঁচুড়া। বলাকা, রিষড়া। সি. পি. আই (এম) রাজ্য সম্মেলন, কলকাতা। তালপুকুর, ব্যারাকপুর। উদয়ন, ব্যাণ্ডেল। হাইওমার্স, কাঁচরাপাড়া। ব্যানার্জিপাড়া স্পোর্টিং, নৈহাটি। জাগৃতি, আতপুর। সাগ্নিক, নৈহাটি। উত্তর গরিফা কালচারাল। শিল্পী-লোক, ভাটপাড়া। বড়াগড় এসোসিয়েশন, ব্যাণ্ডেল। রূপান্তর, নৈহাটি। যুগসন্ধি, নৈহাটি। প্রান্তিক, বহরমপুর। নেহেরু অমর সঙ্ঘ, সুন্দিয়া। ঐকতান, হুগলি।

ডিসেম্বর ১৯৭৭ থেকে জুলাই ১৯৭৮ পর্যন্ত উপরিলিখিত স্থানগুলিতে মোট ১৪টি প্রতিযোগিতা এবং ১২টি আমন্ত্রিত অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে 'যাত্রিক' ছ টি শ্রেষ্ঠ প্রযোজনাসহ অন্যান্য পুরস্কারের অধিকারী হয়েছে।

অনুমোদন : অভিনয়ের জন্য যাত্রিক বা গ্রুপ থিয়েটারের ঠিকানায় যোগাযোগ কাম্য।

নাটকের নাম ইত্যাদি ঘোষণা করার পর দর্শকের আলো নেভার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের মধ্য থেকে চারজন বক্তা চার কোণের থেকে তাদের বক্তব্য রাখবে। প্রথম বলতে বলতে দ্বিতীয়ের কাছে আসবে। দ্বিতীয় তৃতীয়ের কাছে এই ভাবে চলবে। একে অপরকে টর্চ এর আলো দিয়ে আলোকিত করবে।

১ম বক্তা : আজ সকালের সংবাদপত্র নিন। গতকাল রাতে একটা অনুষ্ঠানে মৃত্যুর অতীত নাটকের নিতাই ঘোষকে জোর করে মঞ্চ থেকে—

২য় বক্তা : সংবাদ! সংবাদ! সংবাদ! আজ বারাসাতের লোকেরা অবাক বিস্ময়ে দেখেছে রেল লাইনের ধারে দশটা তাজা লাশ! রক্ত! রক্তে চার-পাশের সবুজ ঘাস—

৩য় বক্তা : আজকের তাজা খবর! খবর—তাজা খবর! দশটা তাজা ছেলের প্রাণ ফুস করে শেষ হয়ে গেছে। থেঁতলে গেছে। তুবড়ে গেছে। বেঁকে গেছে। ওগুলো যে মানুষ ছিল, তাজা যৌবন ছিল তা ভাবতে গেলে মানুষকে—

৪র্থ বক্তা : কলকাতা থেকে কয়েক মাইল দূরের খবর—শিশির ভেজা মাটিতে চাপ-চাপ রক্তের চিহ্ন। সুমন-হারা অম্বার আর্ত চিৎকার বারাসাতের প্রত্যেকটি লোক শুনতে পাচ্ছে। দশটা তাজা যৌবনের থেঁতলে যাওয়া দেহ—

মেশিনগান চলার আওয়াজ তারপর নেপথ্যে অম্বার কণ্ঠের আওয়াজ শোনা যায়।

নেপথ্যে অম্বা : সুমন—সুমন—সুমনরে!

১ম বক্তা : বাতাসে বারুদের গন্ধ! বারাসাতে রাতের অন্ধকারে এক ঝলক বিদ্যুৎ। পেছনে টেনে নিয়ে যাওয়া হাত বাঁধা।

২য় বক্তা : বাতাসে বারুদের গন্ধ। শিশুরা খেলছিল মায়ের কোলে, খান্‌খান্‌ করে দিল নিস্তব্ধতা। বন্দুকের গুলির বিকট অট্টহাস্য। মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে এল শিশু, আঁকড়ে ধরল মাকে, কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল।

নেপথ্যে অম্বা : সুমন—! নিতাই—! সুমনরে—নিতাইরে—!

৩য় বক্তা : বাতাসে বারুদের গন্ধ। আর্তনাদ উঠেছিল একটা। একসঙ্গে বাতাস ভারী করা সে আর্তনাদ ডুবে গিয়েছিল বন্দুকের আওয়াজে। দশটা তাজা দেহ লুটিয়ে পড়েছিল বারাসাতের বুকে।

৪র্থ বক্তা : বাতাসে বারুদের গন্ধ। এ গন্ধ আমাদের সবাইয়ের চেনা। ওরা বেয়নেট বিঁধিয়ে দিচ্ছিল তাজা দেহের মধ্যে। বন্দুকের বাঁট দিয়ে থেঁতলে দিচ্ছিল মাথাগুলো। ওরা হত্যা করছিল সেই সব মানুষদের যারা বলছিল—

'আমি বিদ্রোহী – আমি টর্পেডো – আমি ভীম ভাসমান মাইন। আমি মানি না কো কোন বাধা – "

সকলে একসঙ্গে "বাতাসে বারুদের গন্ধ" বলতে থাকে। আস্তে আস্তে পর্দা খোলে। ওদের আওয়াজ মিলিয়ে যায়। একজন পুলিশ অফিসার ফুল শুঁকছে দেখা যায়।

অফিসার : ফুলের গন্ধ। আমাদের এই থানাটা – থানার বাইরে বাতাসটায় শুধু ফুলের গন্ধ। আঃ ফুলের মত জিনিস আর হয় না। ওমর খৈয়াম কিংবা আবুল ফজল-তানসেন কিংবা কালিদাস সবাই ভালবেসেছে ফুলকে। আহা কি সুবাস!

নেপথ্যে "বাতাসে বারুদের গন্ধ" সমবেত চিৎকার শোনা যায়।

বারুদের গন্ধ নেই। আমি বলছি বারুদের গন্ধ নেই। এখানকার বাতাসে বারুদের গন্ধ নেই। আমার এলাকায় দশটা লাশ পাওয়া গেছে। লাশগুলো এখনও বেওয়ারিশ। সকালের সংবাদপত্রে খবর বের করেছি। আসুক লোকে – দেখে যাক। বদমাইশ শয়তান ছেলেদের বাপেরা চিনে যাক তাদের আহাম্মক শয়তানদের [চিৎকার করে] নিজেরা এসে যাচাই করে যাক বাতাসে বারুদের গন্ধ আছে কিনা? আমি জানাচ্ছি, আমি চিৎকার করে জানাচ্ছি কোথাও বারুদের গন্ধ নেই [হাসি] আঃ ফুল কত সুন্দর। ফুলের গন্ধে ম-ম করছে জায়গাটা।

প্রবেশ করে এস. আই. চ্যাটার্জী।

চ্যাটার্জী : স্যার।

অফিসার : বল চ্যাটার্জী, কি হয়েছে বল।

চ্যাটার্জী : মানে আপনি কথা বলছেন, এখানে কেউ নেই, দৌড়ে দেখতে এলাম।

অফিসার : ভাবছ, পাগল হলাম বুঝি।

চ্যাটার্জী : না স্যার, মানে --

অফিসার : ভাবছ ফুলের গন্ধে প্রেম করছি।

চ্যাটার্জী : না স্যার, ইয়ে –

অফিসার : শাট আপ – ইয়ে মানে করবার জন্যে সীমান্তের এই থানায় তোমাকে নিয়ে এসেছি মনে করো না।

চ্যাটার্জী : আপনার অশেষ দয়া স্যার।

অফিসার : হ্যাঁ, কথাটা মনে রাখবে। ঐ অজ পাড়াগাঁয়ে ভুঁড়িমোটা ফতুয়াধারী জোতদারদের সেবা করতে করতে জীবন তো শেষ করে ফেলতে। লাভ বলতে তো দুমুঠো ধান আর বাগানের কলাটা মুলোটা।

চ্যাটার্জী : ফ্যাকড়া কি কম ছিল স্যার! জমির ধান ওটার সময় তো নাইবার

খাবার সময় পর্যন্ত পেতাম না। শালা ঐ চাষীগুলো—

অফিসার : চাষীগুলো নয়। বল শালা শুওরের দল ঐ লীডারগুলো! শালারা গরীবদের লোভ দেখিয়ে মাঠে ধান কাটতে পাঠায়।

চ্যাটার্জী : একি অন্যায় কথা বলুন তো স্যার! যার জমি সে ধান তুলবে না? তুলবে—

অফিসার : চাষীগুলো দেশটাকে মামার বাড়ি করে ফেলেছে। ভাবছে স্বাধীনতা পেয়েছে বলে যা খুশি তাই করবে। ভুলে গেছে ব্রিটিশ গেছে, আমরা তো যাই নি রে বাবা।

চ্যাটার্জী : এটাই তো বোঝাতে পারি না স্যার।

অফিসার : ডাণ্ডা দিয়ে বোঝাবে। না পারলে বেয়নেট ঢুকিয়ে দেবে। বাড়াবাড়ি করলে গুলি চালিয়ে বুক ঝাঁঝরা করে দেবে।

চ্যাটার্জী : ওদের দলে যে সব। ভয় লাগত স্যার।

অফিসার : ভয়। [হাসি] ঐ ন্যাংটা লোকগুলোকে তুমি ভয় করতে চ্যাটার্জী। বোগাস।

চ্যাটার্জী : আপনার আণ্ডারে থেকে ভয় কি জিনিস তা তো এখন বুঝতেই পারি না স্যার।

অফিসার : কোন কৈফিয়ৎ দেবার জন্য তৈরী থাকবে না।

চ্যাটার্জী : তাই তো করছি স্যার। আমার কোর্ট-এর ঝামেলা না করে—

অফিসার : খতম করবে। শালারা টঁ্যাফুঁ পর্যন্ত করবে না। সব সময় মনে রাখবে ওরা অস্ত্র নিয়ে তেড়ে এসেছিল তাই বাধ্য হয়ে—

চ্যাটার্জী : কত মারব বলুন!

অফিসার : দুদিন পরে দেখবে আন্দোলন শিকেয় তুলে সব ভেগেছে। শালা বারুদের গন্ধ! [হাসি] হাড় গোড় ভেঙে পাঁজরা ঝাঁঝরা করে দেবে।

চ্যাটার্জী : মারে বেশ কাজ হয় স্যার।

অফিসার : রিপোর্টে বলবে মৃদু গুলি চালনা করতে হয়েছে। বুঝতে পারছ? ডু য়্যু আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?

চ্যাটার্জী : ইয়েস স্যার, অফ কোর্স স্যার।

অফিসার : কি বুঝেছ সেটাই বল না।

চ্যাটার্জী : মৃদু গুলি চালনা করতে হয়েছে।

অফিসার : তোমার নস্যি নেওয়াটা ছাড় তো চ্যাটার্জী। একটা শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পার না।

চ্যাটার্জী : ওটা স্যার একটু এনার্জি আনবার জন্য।

অফিসার : রাসকেল। এনার্জি আনবার জন্য নস্যি! [হাসি] বোতল শেষ কর এনার্জি পাবে, গ্লাস কাজ করার মুড এনে দেবে। রক্ত দেখে

শিউরে উঠবে না। মনে হবে গঙ্গা বহতী স্থায় [হাসি] বুঝলে চ্যাটার্জী ও সব মেয়েদের নেশায় পুলিশের কাজ হয় না। এ সব কাজে গলায় ঢালতে হয়।

বাইরে আবার সুমন-সুমন ডাক শোনা যায়।

চ্যাটার্জী : অম্বা পাগলী স্যার। ওর ছেলে সুমন নাকি কারখানায় ধর্মঘট করেছিল। ধর্মঘট ভাঙ্গার দল নাকি ওর ছেলেকে শেষ করে কচুরি পানার মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছিল।

অফিসার : ঠিক করেছিল। শালারা দেশের প্রোডাকশন হ্যাম্পার করবে। শালারা দাবি জানাচ্ছে, গুষ্টির পিণ্ডি করছে।

চ্যাটার্জী : মাঝের থেকে কারখানা দেড়মাস বন্ধ থাকল। মজুরগুলো মাইনে পেল না। ছটা লাশ গুম্ হলো।

অফিসার : ধর্মঘট ভাঙতে একশ টাকার মস্তান যত পারবে রিক্রুট করবে। মনে রেখ, এখন আমাদের ক্ষমতা অনেক। মানুষকে ধরে আনা দূরের কথা, মেরে ফেললেও তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে না। দি নেশন ইজ অন মুভ্ [হাসি]—

চ্যাটার্জী : আপনি থাকলে আমি স্যার সব করতে প্রস্তুত।

অফিসার : দ্যাট্স লাইক এ গুড বয়। শালারা দাবি জানাবে। ধর্মঘট করবে। পুলিশ খুন করবে। জোতদারদের গলা কাটবে। আমরা কি সব রাঙামূলো হয়ে বসে থাকব। বারুদের গন্ধ? এইসব সংবাদপত্রগুলোকে এখনই শেষ করা উচিত। আমরা শাসন করবো আর সে শালারা খবরদারী করবে আমাদের ওপর। প্রত্যেকটি সাংবাদিকের হাত দুটো কেটে নেওয়া উচিত।

প্রবেশ করে সাংবাদিক।

সাংবাদিক : তা তো কেটেই নিয়েছেন অফিসার।

অফিসার : হু আর ইউ? হোয়াই ডু ইউ পোক ইয়োর নোজ হিয়ার?

সাংবাদিক : আমাদের কাজের জন্যই আসতে হয় অফিসার।

অফিসার : আমি জিজ্ঞাসা করছি আপনি কে?

সাংবাদিক : আমি একজন সাংবাদিক।

অফিসার : খবর যা পাবার তা তো আপনারা অফিসে বসেই পেয়ে যাচ্ছেন। এ ভাবে থানার মধ্যে—

সাংবাদিক : দশটা লাসের মালিক এ থানা। অনেকেই আসবে তাদের হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনের লাশ পাবার আশায়। ব্যাপারটার চাক্ষুষ—

চ্যাটার্জী : জানেন এই লাশগুলোকে সম্মানের সঙ্গে এই থানায় আনতে আমরা

কাল সারা রাত কেউ ঘুমোতে পারি নি ?

সাংবাদিক : আপনাদের তাহলে খুব কষ্ট করতে হচ্ছে।

অফিসার : কষ্ট ? আমরা কি আর করছি। কষ্ট করছেন আপনারা। কষ্ট করছেন দেশের বুকনি দেনেওয়ালা নেতারা।

সাংবাদিক : মানে—যারা মন্ত্রী হয়েছেন তাদের বলছেন ?

অফিসার : তারা তো নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাচ্ছেন না। তাদের পেছনে ছারপোকার মত যে গুটিকয় বিরোধী লেগে আছে তাদের বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে কেন আমি তো ভাবতেই পারি না।

সাংবাদিক : আপনাদের হাতে তো ক্ষমতা রয়েছে—ওদের সরিয়ে দিন।

অফিসার : সরকারের প্রতি আপনার আনুগত্য আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

সাংবাদিক : ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে কিছু নেই সত্যি। কিন্তু তাই বলে কথার কথা বললেও আপনারা অপরাধী করবেন ?

চ্যাটার্জী : স্যার। ব্যাপারটা গোলমেলে মনে হচ্ছে।

অফিসার : আপনি জানেন আপনার খুশিমত রিপোর্ট আপনি দিতে পারেন না।

সাংবাদিক : সেন্‌সর না করে রিপোর্ট আপনারা ছাড়বেন ভাবছেন কেন ?

চ্যাটার্জী : তাহলে আমাদের রিপোর্ট আপনারা ঠিক সময় পাবেন জেনেও থানায় মড়া দেখতে আসার কারণটা কি তা তো বোঝা যাচ্ছে না।

সংবাদিক : অনেক কথাই তো শুনতে পাচ্ছি। ছাপার অক্ষরে খবর দিতে না পারলেও সত্যি কথাটা জেনে রাখতে আপত্তি কি ?

অফিসার : তা তো জানবেনই। নিশ্চয়ই জানবেন। তবে বাড়াবাড়ি না করলেই ভাল।

সাংবাদিক : হাত পা যার বাঁধা সে যতই বাড়াবাড়ি করুক না কেন আপনাদের আশংকার কোন কারণ নেই।

অফিসার : আশংকা [হাসি]! আপনি বোধ হয় আমার নাম শোনেন নি। আমার জীবনে ঐ ব্যাপারটার কোন স্থান নেই জানবেন।

সাংবাদিক : শংকর এম্. এসসি. পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছিল। ওর ছাত্র কিরণ গত বছর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় ডিষ্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়েছে।

অফিসার : হঠাৎ আবোল তাবোল বকছেন মনে হচ্ছে।

সাংবাদিক : ওদের দু জনকে আপনার পুলিশ গত পরশু ওদের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে অ্যারেস্ট করেছে।

অফিসার : কি গো চ্যাটার্জী, শংকর, কিরণ এ সব নামে কাউকে—

চ্যাটার্জী : আমরা তো গত সাতদিন কাউকে অ্যারেস্ট করি নি স্যার। তা ছাড়া অ্যারেস্ট করলে আপনি জানতে পারবেন না তা কি হয় ?

সাংবাদিক : আপনাদের হাতে রয়েছে কালাকানুন। মিসার প্রয়োগে আপনারা মানুষের সঙ্গে ছাগল ভেড়ার চেয়ে খারাপ ব্যবহার করছেন। অমন কত শংকর কিরণ, বাচ্চুকে আপনারা কর্পূরের মত উবিয়ে দিচ্ছেন।

অফিসার : [চিৎকার] আপনি কোথায় দাঁড়িয়ে কথা বলছেন জানেন ?

সাংবাদিক : আমি একজন সাংবাদিক। আপনি কি আমাকে অ্যালাউ করছেন না ?

চ্যাটার্জী : আমাদের কাজের ব্যাঘাত ঘটালে আমরা আইনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হব।

সাংবাদিক : অফিসার, বিনা কারণে আমাকে অপমান করা হচ্ছে।

অফিসার : ভাল কথায় কাজ না হলে গলাধাক্কা দিয়ে –

সাংবাদিক : [চিৎকার] অফিসার ?

চ্যাটার্জী : চিৎকার করলে লকআপে পুরবো জানবেন।

বাইরে থেকে অম্বা সুমন—সুমন বলে ডাকতে ডাকতে ভেতরে ঢোকে।

অম্বা : সুমন – আমার সুমন কৈ ?

অফিসার : কে সুমন –! এখানে সুমনকে নিয়ে বসে আছি আমরা ?

অম্বা : তোমরা জান ? ওর মুখের ভাত ফেলে এসেছে।

চ্যাটার্জী }
অফিসার } সুমন নামে আমরা কাউকে চিনি না।

অম্বা : আমি তো তোমাদের পূজো করি। আমি তো তোমাদের কোন ক্ষতি করি নি। আমি তো তোমাদের রাজাদের ভালবাসি। আমি তো রাজাদের কথা শুনে চলি। তোমরা আমার সুমনকে ফিরিয়ে দাও।

সাংবাদিক : আপনার সুমনকে কে নিয়ে গেছে ? আপনি তাদের চেনেন ?

অফিসার : ডোণ্ট ইণ্টারফিয়ার। আপনি সরকারী কাজে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করবেন না।

অম্বা : আমার সুমনকে এরা নিয়ে এল। বললে যন্ত্র চালাতে হবে। সুমন নাকি যন্ত্র বন্ধ করে দিয়েছে।

চ্যাটার্জী : ধর্মঘট করে মজুর ক্ষেপিয়ে তোমার ছেলে দেশের ক্ষতি করছিল।

সাংবাদিক : তাই বুঝি শ্রমিকের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য ধর্মঘট ভাঙতে আপনারা সুমনকে –

অফিসার : কিপ কোয়ায়েট। আপনাকে অনেকক্ষণ সহ্য করেছি। শুনে রাখুন যন্ত্র চালাতে আমরা আছি। যন্ত্র বন্ধ করে যারা উৎপাদন ব্যাহত করবে তাদের আমরা –

সাংবাদিক : নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করবেন।

অফিসার : ইউ স্টুপিড [রিভলবার বার করে]—

চ্যাটার্জী : স্যার !

অফিসার : এই সাংবাদিককে ভেতরে নিয়ে যাও। উনি কতকগুলো মড়া শুয়োরের বাচ্চা দেখতে এসেছেন।

সাংবাদিক : তার আগে এই মহিলার—

অফিসার : আপনার অধিকারের বাইরে গেলে জীবন সংশয়। গো অ্যাটওয়ান্স।

চ্যাটার্জী : চলুন।

সাংবাদিক ও চ্যাটার্জী ভিতরে যায়।

অম্বা : আমার ছেলের বুকে ঐ নলটা ধরে ওকে নিয়ে গেল। দাও ফিরিয়ে দাও ওকে।

অফিসার : যন্ত্র বন্ধ থাকলে রাজ্যর চলে না। যন্ত্র চালাতে সুমনকে নিতে হয়েছে। যাও এখানে থেকে।

অম্বা : সুমন যে চিৎকার করে বলল, মা ওরা যন্ত্রটা চালিয়ে আমাদের রক্ত নিঙড়ে নিচ্ছে। বলল—মাগো ওরা আমাদের কঙ্কাল দিয়ে নিজেদের প্রাসাদ তৈরী করছে। বলল—মা এরা গরীবদের মাটির নিচে কবর দিচ্ছে।

অফিসার : যন্ত্র বন্ধ করে রাজ্যের ক্ষতি করছিল তোমার ছেলে। যন্ত্র কেমন করে চালাতে হয় তা আমরা জানি। তোমার ছেলে বাধা দিয়ে দেশকে ধ্বংস করতে চাইছিল।

অম্বা : সে যে আমার চোখের আলো, প্রাণের নিঃশ্বাস।

অফিসার : দেশের মধ্যে অন্ধকার আনছিল। দেশবাসীর নিঃশ্বাস বন্ধ করতে গিয়েছিল।

অম্বা : আমার সুমনকে আমি আগলে রাখবো। আমি দেখেছি তাকে ঐ পথ দিয়ে তোমরা টানতে টানতে নিয়ে গেছ। আমার দৃষ্টি পৌছল না। সুমনের চিৎকার শুনলাম—মা এদের কোনদিন ক্ষমা করো না।

অফিসার : দেশকে ভালবাসতে শেখ। দেশের সরকারের সেবা করতে নিজেকে নিয়োজিত কর।

অম্বা : পূজো তো কত দিলুম। সুমনের বাপ দেশের পূজোয় নিজেকে শেষ করল। সুমনের দাদা দেশের ভাল করতে গিয়ে তোমাদের হাতে মাটির তলায় দেহ রাখল। আমার শেষ সম্বল আমার আদরের ধন সুমন কোনদিন অন্যায় করেনি। ফিরিয়ে দাও—[পা ধরে] সুমনকে ফিরিয়ে দাও।

অফিসার : পা ছাড়ো। অত সহজে বরফ গলে না এখানে। আমরা তোমার সুমনকে চিনি না। আমরা তোমার সুমনকে কোনদিন দেখি নি। পা ছাড়ো, পা ছাড়্ হারামজাদী।

পা দিয়ে অম্বাকে ঠেলে ফেলে দেয়।

পাঁচ মিনিট সময় দিলাম। এর মধ্যে এখান থেকে না গেলে হাবিলদারের হাতে তুলে দেব। সারারাত তুই খাদ্য জোগাবি ঐ গাঁজাখোরটার।

অফিসার চলে যায়। সারা মঞ্চে আলো ছায়ার সৃষ্টি হয়। খুব ছোট বৃত্তের আলো অম্বার মুখে। নিতাই, সুমন,— এদের মুখটাই আলোকিত, দেহ অন্ধকার। সমস্ত মঞ্চে আলোছায়ার মায়া জাল।

সুমন : মা, তুমি এখানে কেন এলে ?

অম্বা : সুমন, আমি যে তোকে খুঁজে পাচ্ছি না বাবা।

নিতাই : আমি যদি কবর থেকে উঠে প্রতিবাদ না করতাম আমাকেও কি খুঁজে পেতে মা।

অম্বা : নিতাই, আমার সুমনকে ওরা নিয়ে চলে গেল। বাবা, আমার সুমন কি আমার নিতাই হবে বলতে চাস।

নিতাই : সবাই তোমার নিতাই সুমন মা। তুমি কত খুঁজবে এদের ? এরা কি তোমায় উত্তর দেবে ? এরা কি তোমার সুমনকে ফিরিয়ে দেবে মনে কর ?

অম্বা : সুমন যে খেতে বসেছিল নিতাই। ওর খাবার ঢাকা দিয়ে আমি যে পথে পথে ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। এরা ওকে নিয়ে এল। এখন বলছে সুমন-কে চিনি না।

সুমন : ওরা কাউকে চেনে না। ওদের বেয়নেট সব সুমনের বুকের পাঁজরা ভেদ করেছে। ওরা সুমনকে চেনে না।

নিতাই : ওরা সব নিতাই-এর মাথা বন্দুকের বাঁট দিয়ে দু ভাগ করে দিয়েছে। সব নিতাইকে ওরা শেষ করে শবের মেলা বসিয়েছে মা।

অম্বা : আমি সুমনকে খুঁজে খুঁজে সারা হচ্ছি। এরা বলছে আমি নাকি পাগল হয়ে গেছি। সকলে বলছে সুমনের মা অম্বা পাগলী হয়ে গেছে।

সুমন : ওদের অত্যাচারের কথা যে বলতে চাইছে তাকে ওরা লুকিয়ে খুন করছে কিংবা বলছে পাগল। তাই তোমাকে ওরা পাগল বলছে।

নিতাই : ওরা ভাবছে এইভাবে সত্যি কথা বলা বন্ধ করবে।

অম্বা : ওরা তো বলছে যন্ত্র চালাতে শুরু করলে সুমন আবার ফিরে আসবে।

নিতাই : কটা লোকের মুনাফা লোটবার জন্য যে যন্ত্র তা চলবে কি করে মা। ও মজুর পেশাই যন্ত্র।

সুমন : সুমনদের মেরে ফেলে কি সব যন্ত্র চালান যাবে বলতে চাও ? মা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সুমনকে মেরে ফেলবার মত অস্ত্র কি ওদের আছে ?

অম্বা : নিতাই বলেছিল মা তুমি নাকি তোমার ছেলেকে ভুলে থাকতে চাও ?

নিতাই : বলেছিলাম মা সেদিন কোন উত্তরই তুমি দাও নি।

অম্বা : আজ সুমনকে দেখে তোর বিশ্বাস হচ্ছে না নিতাই, যে তোর মা অন্যায়কে কোনদিন মেনে নেবে না। সন্তানকে আঁচলে বেঁধে রেখে অন্যায়কে

মেনে নেবার মত মা নিতাই-সুমনের মা নয়। তাকে এখনও বুঝতে পারিস নি বাবা। আজও কি তোর প্রশ্নের উত্তর তুই পাস নি?

নিতাই : সুমনকে খুঁজে বেড়াচ্ছ বলেই আমার মাকে চিনেছি মনে কর? আমার মার কথা আমি ভুলে যাবো মনে কর? পুলিশের মুখের সামনে, মন্ত্রীর মুখের সামনে, বাজারী পত্রিকার সম্পাদকের সামনে আমার মা চিৎকার করে বলেছিল —

অম্বা : আমার ছেলেকে শেষ করলেও তারা মরবে না। কটা নিতাইকে তোমরা মারবে, কটা নিতাইয়ের মাথা তোমরা গুঁড়ো করবে?

নেপথ্যে ঘোষণা।

নেপথ্যে : তোমার ছেলেকে কবরে শুয়ে পড়তে বল। তোমার ছেলেকে কবরে শুয়ে পড়তে বল। তোমার ছেলেকে কবরে শুয়ে পড়তে বল।

অম্বা : তুই সকলকে জানিয়ে দে নিতাই, তুই শুধু দুটো ভাত চেয়েছিলি বলে ওরা তোকে চীনের দালাল বলে —

নেপথ্যে : নিতাই ঘোষ যদি কবরে না যায় তাহলে আমাদের মন্ত্রীত্বের সংকট দেখা দেবে। ওকে শুয়ে পড়তে বল আমরা মাটি চাপা দিই।...ওকে শুয়ে পড়তে বল আমরা মাটি চাপা দিই।..ওকে শুয়ে পড়তে বল আমরা মাটি চাপা দিই।

অম্বা : নিতাই তোকে অকারণে ঐ রকম অত্যাচার করে শেষ করেছে বাবা। তুই চিৎকার করে বলে যা এরা কত নীচ কত শয়তান আর হিংস্র।

নেপথ্যে : নিতাই ঘোষ যদি মাটি চাপা দিতে বাধা দেয় তবে আমরা প্রচার করে দেব নিতাই হিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাসী। নিতাই ধ্বংস করতে চায় দেশটাকে। নিতাই সকলকে খুন করতে চায়।

শেষের বাক্য তিনবার নেপথ্যে বলবে।

অম্বা : তোমরা শোন দুটো খেতে চেয়েছে বলে আমার নিতাইকে ওরা খুন করেছে।

নেপথ্যে গুলির আওয়াজ।

সুমন : কত গুলি করবে তোমরা? কত সুমনকে তোমরা শেষ করবে? কত ধর্মঘট ভাঙ্গবে?

নিতাই : ভুখা মারবে কত লোককে? কত কাল ভুখা রাখবে মানুষকে? খাবার নিয়ে মুনাফার পাহাড় তোমরা কত কাল গড়বে?

দুজনে : [আবৃত্তি]

পৃথিবীতে যুদ্ধ শেষ।
বন্ধ সৈনিকের রক্ত ঢালা
ভেবেছ তোমার জয়, তোমার প্রাপ্য এ জয়মালা
জান না এখানে যুদ্ধ, শুরু দিনবদলের পালা।

সুমন ও নিতাই বেরিয়ে যায়। আলো স্বাভাবিক হয়।

অম্বা : সুমন — সুমনরে ফিরে আয় বাবা — সুমন আমার কাছে আয়।

প্রবেশ করে চ্যাটার্জী।

চ্যাটার্জী : তোমরা সকলে মিলে আমাদের পাগল করে দেবে ভেবেছ? আমাদের কি শান্তিতে থাকতে দেবে না তোমরা?

অম্বা : শান্তি সংসারে আছে, আমাকে একটু শান্তি দাও। তোমরা তো সব ব্যবস্থা কর। তোমরা রাজার শান্তির জন্য এত করছ, আমাকে একটু শান্তি তোমরা দিতে পার না?

চ্যাটার্জী : দশটা লাশ পর পর শুয়ে আছে! তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছ? আমরা যে শ্মশানের শান্তির মধ্যে বাস করছি তা কি দেখতে পারছো?

অম্বা : শ্মশানের শান্তি! কে করেছে শ্মশান? আমার সুমনকে আমার নিতাইকে খুন করে শ্মশান করল কে? সুমন — সুমন —

প্রস্থান।

চ্যাটার্জী : নিতাই ঘোষ। সেই ভুখা মিছিলের সামনে দাঁড়িয়ে যে ছেলেটা বুক চিতিয়ে বলল মার কত গুলি আছে তোমাদের। গুলি করে কত যৌবনকে — সব কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে! অম্বা পাগলী ওর ছেলেকে ডাকছে। সুমন কি কৈফিয়ৎ চাচ্ছে আমার কাছে? কেন কৈফিয়ৎ দেব? আমাদের তো এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা চুপ করে থাকলে পুলিশ দিয়ে আমাদের খুন করান হবে। লোকে জানবে, সংবাদে বলবে চণ্ডাল যুবকরা আমাকে খুন করেছে। আমি পারবো না — আমি কোন কৈফিয়ৎ দেব না।

চ্যাটার্জী চিৎকার করতে থাকে, প্রবেশ করে অফিসার।

অফিসার : চ্যাটার্জী — চ্যাটার্জী কিপ কোয়ায়েট! চ্যাটার্জী — আই সে কিপ কোয়ায়েট!

চ্যাটার্জী : স্যার! স্যার আমি যেন কার সঙ্গে কথা বলছিলাম!

অফিসার : কার সঙ্গে? এখানে তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

চ্যাটার্জী : কি জানি স্যার! মনে হল সুমন কি যেন বলছে, নিতাই ঘোষ আবার যেন কবরের ওপর দাঁড়িয়ে- উঠেছে।

অফিসার : ইউ স্টুপিড চ্যাটার্জী, উইল ইউ হোল্ড ইয়োর টাঙ্? উইল ইউ স্টপ?

চ্যাটার্জী : বিশ্বাস করুন স্যার। আমি লাশগুলোর সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। ঐ সাংবাদিকটা প্রত্যেকটি লাশ লক্ষ্য করে বলছিল — ঐ ছেলেটা ফার্স্ট বয় — ঐ ছেলেটা দোকানে কাজ করে ওর বিধবা মাকে —

অফিসার : চুপ কর।

চ্যাটার্জী : ঐ ছেলেটার বাপ অন্ধ। কলেজে অধ্যাপনা করত। পড়াশুনা করে করে প্রফেসার চোখ দুটো—

অফিসার : পাগলের প্রলাপ বন্ধ কর চ্যাটার্জী।

চ্যাটার্জী : ঐ ছেলেটার বাপ কাপড় নিয়ে ফেরি করে। ছেলেটা নাকি ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়ে—

অফিসার : তুমি চুপ না করলে আমি হাবিলদারকে ডেকে তোমাকে বেঁধে রাখতে বাধ্য হব।

চ্যাটার্জী : আমাদের পুলিশেরা প্রত্যেকের মুখ থেঁতলে দিয়েছে তবু—

অফিসার : চ্যাটার্জী এখনই তোমার মহাভারত বন্ধ কর।

প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে ধাক্কা দেয়।

চ্যাটার্জী : স্যার!

অফিসার : সেই রিপোর্টার কোথায়? আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না? রিপোর্টার কোথায়?

চ্যাটার্জী : লাশগুলো যেখানে আছে সেখানে—

অফিসার : ইডিয়ট! ওদের কাছে ঐ রকম একটা সাংঘাতিক লোককে রেখে এলে।

চ্যাটার্জী : বললে আমি এদের দেখব।

অফিসার : ওদের সার্চ করে যদি কিছু পায়! যদি সেগুলো লুকিয়ে রেখে আমাদের বিপদে ফেলে? তুমি কি নিজের গলায় ফাঁস লাগাতে চাও?

চ্যাটার্জী : আমাকে অর্ডার দিন স্যার। আপনার হুকুম মত কাজ করব।

অফিসার : গো অ্যাটওয়ান্স। ওকে লক্ষ্য রাখ্। সন্দেহজনক কিছু হলে হাত পা বেঁধে লক আপে ঢুকিয়ে রাখবে।

চ্যাটার্জী : তাই হবে স্যার।

চলে যায়।

অফিসার : শক্ত হাতে কাজ আরম্ভ করতে হলে এই সমস্ত দুর্বলচিত্ত অফিসার-গুলোকে আগে শ্যুট করা উচিত।

বাবুগো— বাবুগো বলতে বলতে প্রবেশ করে গাঁয়ের চাষী মনসুর মিঞা।

মনসুর : বাবুগো-বাবুগো—আমার কি সব্যনাশ করলে গো! দশকোশ দূর থে দু দিন ধরি আমার ছাওয়ালডারে খুঁজতে নেগেচি গো!

অফিসার : তুই কে বল তো মোছলা?

মনসুর : এরই মধ্যে ভুলে গ্যালে! সেই শশধর মহাজনির উঠোনে পিছমোড়া করি আমাদের মারলা। আমি কাঁদতি কাঁদতি আপনারে সব জানালাম। আপনি লাথি মেরি আমারে খেদাই দিলে।

অফিসার : আচ্ছা, তাহলে ঐ মেঠো নেতার বাপ ! তা আবার কি জমির ধান কাটবার মতলব আঁটলি না কি ?

মনসুর : আমার জোয়ান ছেলিডারে সে জন্য আপনারা শেষ করলেন।

অফিসার : তোর ছেলেকে মেরেছি তুই দেখেছিস ?

মনসুর : যা শোনলাম তাতে আমার মন বলছে আমার হানিফডারে আপনারা মেরি ফেলিছেন।

অফিসার : তোর ছেলে তো কৃষক সমিতি করে বেড়ায়। ছাখ কোন গাঁয়ে মহাজনের গলা কাটতে পরামর্শ দিচ্ছে। ঠিক সময়ে ফিরে আসবে।

মনসুর : গলা কাটে তো মহাজনরা কত্তা। আমাদির দোষ সবডায় আপনারা দেখতি পান। আমার ছেলি দুটো খেতি দিবার কথা বলে। আপনারা তারেই সাজা ছান।

অফিসার : তোর ছেলে তো দিবাক গাঁয়ের মহাজনকে জখম করে ফেরার হয়েছে। গলা কাটতে গিয়েছিল, পারে নি। লোকটা তবু বেঁচে গেল এই যা।

মনসুর : অমন মনগড়া কথা তো বেবাক আপনেরা বলেন। গরীবের জন্যি তো আপনারা নাই। তাই যা বলেন আমাদের মেনি নিতে হয়। আমার ছেলিডারে মেরি ফেলেছেন কি না সেডা বলেন না গো !

অফিসার : কটা লাশ পাওয়া গেছে রেল লাইনের ধারে। এর সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক ! পুলিশ কি খুন করতে আছে নাকি হারামজাদা ?

মনসুর : সমিতির লোকেরা বললে আপনারা তেঁতুলতলা থেকে আমার পোলাডারে ধরি নে এয়েচেন।

অফিসার : [আঘাত করে] হারামজাদা। যা খুশি তাই বলবি। তোর ছেলেকে ধরেছে গাঁয়ের যুবকেরা। তার সঙ্গে পুলিশের কি সম্বন্ধ আছে ?

মনসুর : আমার পোলাডারে য্যাখন গুণ্ডাগুলো মারতি মারতি নে গেল ত্যাখন আপনি ছেলেন শোনলাম। আপনাদির আস্কারা না পেলি বাইরের গুণ্ডাগুলো অত সাহস পায় কোথা থেকে ?

অফিসার : এটা তোর বাড়ির উঠোন নয় রে শুয়োরের বাচ্চা। থানার মধ্যে কথা বলছিস জানবি। এখেনে কথা বলতে হয় মাথা নিচু করে। গেঁয়ো ভূতের কথা শোনবার জন্যে আমাকে রাখা হয় নি। [চুল ধরে] চ্যাটার্জী—চ্যাটার্জী—শালা ভেবেছে থানায় বসে অফিসারের মাথায় ডাণ্ডা মেরে পার পাবে।

চ্যাটার্জী প্রবেশ করে।

যারে বেটা শুয়োর তোর ছেলের থেঁতলান লাশটা একটু ঘেঁটে আয়।

মনসুর : আপনেরা সে যা বলেন হুজুর। হানিভ্‌ডারে আমাকে পেতিই হবে।

হানিফভারে না পেলি ঘরশুদ্ধ সবাই উপুষি মরবে গো কত্তা। হানিফডারে আমাকে পেত্তিই হবে।

[চ্যাটার্জী ও মনময় ভেতরে চলে যায়। প্রবেশ করে শশাঙ্ক বাবু। মধ্য বয়স্ক শশাঙ্কবাবু বর্তমানে কাপড়ের ফেরী করে। পূর্ববংগে শিক্ষকতা করতেন।

শশাঙ্ক : মে আই কাম স্যার ?

অফিসার : কে ?

শশাঙ্ক : আজ্ঞে, আমি শশাঙ্ক চক্কোত্তি। আজ্ঞে ভেতরে আসনের অনুমতি মিলব ?

অফিসার : আসুন [শশাঙ্ক ভেতরে আসে] এখানে আপনার প্রয়োজন ?

শশাঙ্ক : আমার ছোট পোলাডা তো আপনাগো নজরে পড়ছে। তাই এলাম আর কি।

অফিসার : কি নাম ছেলের ?

শশাঙ্ক : কিরণ চক্কোত্তি। বয়স ১৭। বিনি পয়সায় কলকাতায় কলেজে পড়ে।

অফিসার : বিনি পয়সায় মানে।

শশাঙ্ক : ম্যাট্রিক পরীক্ষাতে জেলা থিকে জলপানি পাইল। তাই কলেজে মাইনে লাগে না।

অফিসার : আমার এখানে আছে কি করে জানলেন ?

শশাঙ্ক : আছে তো কই নাই। থাকতে পারে কইছি। মানে ওটার দেহটা থাকতে পারে আর কি।

অফিসার : কেন এ ভাবে বেওয়ারিশ মরার চান্স আছে নাকি ছেলের ?

শশাঙ্ক : আছে তো বটেই। আমার পোলা যে রাজনীতি করে। এখন তো আপনাগো কামই হচ্ছে ছাখ আর গুলি কর। পেটাও আর ছাল তুলে নাও।

অফিসার : হিংসায় মেতে ওরা পুলিশ খুন করছে তা জানেন ? কমুনিস্টরা হিংসায় বিশ্বাসী তা বোঝেন ? ওরা চালাকি করে দেশে গৃহযুদ্ধ বাঁধাচ্ছে তা জানেন ?

শশাঙ্ক : সবটা না শুনলেও কিছু শুনেছি বটে। তবে সেদিন ছাখলাম পুলিশের লোক একটা পুলিশেরে মেরে ফেলল। তারপর ছাখলাম এ্যারে ধরো অরে ধরো — মারো — কাটো — আর —

অফিসার : আর সেইজন্যে বুঝি ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে জজ ম্যাজিস্ট্রেট বানানো হচ্ছে।

শশাঙ্ক : হেইডা পাইবেন না। এককালে গাঁয়ে মাস্টারী করতাম। অহন কাপড়ের ফেরী করি। আমাগো স্বাধীন ছাশে লেখাপড়া শিখিয়ে পোলা মানুষ করণের কথা ভাবলে আপনাগো হাতে —

অফিসার : এতক্ষণ কথাগুলো শুনে মনে করেছিলাম তুমি শালা একটা নিরেট

বোকা। এখনি দেখছি শালা আমাদের অপমান করার জন্যই কথাগুলো বলছ।

শশাঙ্ক : দ্যাখেন লেখাপড়া শিখলে কিছু কওনের ইচ্ছা করে। আর দুটা কথা কইলে আপনাগো পুলিশ চারটে দাঁত ভাঙতে চায়। কি দরকার মশায়! বোবার শত্তুর নাই।

অফিসার : আপনার ছেলের পড়াশুনার খরচ আসে কোথা থেকে?

শশাঙ্ক : আমি কিছুই করি নাই মশায়। আমাদের পাড়ার শংকর ওরে লেখাপড়া শেখাত। শংকর তো শুনি বিরাট প্রফেসার মানুষ। ওর লগে ছেলেটা ভালই তৈরী হয়েছিল।

অফিসার : শংকর ব্যানার্জীর কথা বলছেন?

শশাঙ্ক : হ, অরেও নাকি আপনারা গুলি করে শ্যাষ করছেন?

অফিসার : কে! কে বলেছে আপনাকে? কি হলো কথা বলছেন না কেন?

জামা চেপে ধরে।

শশাঙ্ক : ছাড়েন মশায়। ছাইড়া দ্যান। বড় লাগে যে!

অফিসার : কে বলেছে শংকরকে আমরা মেরেছি! আবার চুপ করে আছেন?

ঝাঁকুন।

শশাঙ্ক : দ্যাখেন আবার এই বুড়াটারে মারলেন। এ কথা তো হক্কলে বলছে। শুধু শুধু আমারে দোষ দ্যান কেন।

অফিসার : আপনার ছেলেকে আইডেন্টিফাই করতে এসেছেন বললেন না?

শশাঙ্ক : আমারে যাইতে দিলেন কই। আমি তো ভাবি আমারে দ্যাখতে দিবেন না বুঝি।

অফিসার : কাম—কাম উইথ মি।

শশাঙ্ক : যামু, আপনার লগে? ছাড়েন না মশায়। বড় লাগে যে!

অফিসার : লাগছে? খুব লাগছে তাই না? এরপর বুঝতেই পারবেন না। সেই ব্যবস্থা করার আগে দুচোখ ভরে দেখিয়ে দিই লীলাক্ষেত্রটা।

শশাংককে ঘাড় ধরে ভিতরে নিয়ে যায়। মঞ্চে আলো ছায়ার সৃষ্টি হয়। প্রবেশ করে মনসুর। পেছনে হানিফকে দেখা যায়। আলো সুমন নিতাই এর সময় যেমন ছিল তেমনি।

হানিফ : বাপ চোখের জল ফেলি সারাটা জেবন তো কাটিয়ে গেলি। এখনও কাঁদবি?

মনসুর : হানিফ তোকে ওরা খুন করবে ভাবতি পারি লাই বাপ।

হানিফ : আমি তোদের জন্যি আটা নে রাতে ফেরছিলাম। কিষক সমিতির পান্নাবাবু জোর করে আটা দেল আমার বাচ্চার মুখ চেয়ি।

মনসুর : জানিস বাপ, তোর বাচ্চাটা—

হানিফ : আমাদের ঘরের কাছে আসতে আমাকে ওরা মারল। আমি চেংকার করতে ওরা আমার মুখটা চেপি ধরি নে গেল। দেখলাম পুলিশের গাড়ি।

মনসুর : গুণ্ডা দে তোদের খ্যাষ করছে বাপ। পুলুশ সাগায্যি না করলি এ সব করতি পারে ?

হানিফ : তুই সেই পুলিশের কাছে আমারে খুঁজতে এসেছিস বাপ ? এরা তোকেও কি ঘরি ফিরতি দেবে মনে করিস ?

মনসুর : মারে মারুক। আমার বেঁচি থেকি কি হবে বলতে পারিস হানিফ ?

হানিফ : কি বলিস বাপ !

মনসুর : ঘরে গে আমি কি বলব বলতি পারিস ? তোর পোলাডা ঘুরে ঘুরে বাপ বাপ বলি চেংকার করে। আমি তারে কি বলতে পারি বলবি ?

হানিফ : দশটা গাঁয়ে পুলিশের এ অত্যিচারের কথা বলবি নি বাপ ? সকলেরে জানাবি না সরকারের পোষা গুণ্ডাদের কথা ? কিষক সমিতির আর কাউরে যাতে পুলিশ নে যেতি না পারে, রাতের আঁধারে গুণ্ডারা আমার মত কাউরে নে যেতি না পারে তার ব্যবস্থা করবি না বাপ ?

মনসুর : বলব — বলব বাপ, বলব। নেশ্চয় বলব। তোরে সমিতি করতে নিষেধ করতাম। ভয় পেতাম বাপ। আজ বুঝেছি ভয় পেলি ওরা সব খ্যাষ করবে। আর ভয় পাব না বাপ। নেশ্চয় লড়ব - সকলরে সঙ্গে নে লড়ব।

হানিফ : বিবিরে বোঝায়ে বলিস, বাপ। ছেলিডারে আমার কথা বলতি দিবি না। চোকির জল ফেলি সামনের দিন গুলানরে ঝাপসা দেখিস না রে বাপ। বিবিরে এ কথা বলিস, চোখির জল ফেলতি মানা করিস।

চলে যায়।

মনসুর : তোর বিবিডারে বলব, তোর চার বছরের বাচ্চাটারে বলব। কিন্তুক কেমন করি বলব সেটা বলি দিতি পারিস না হানিফ ? তোর বিবিডা যখন আমাক শুদোবে আমি কি বলব — তোর হানিফ ঠিক ফেরে আসবে ? তোর চার বছরের বাচ্চাডা যখন, খেতি দাও — খেতি দাও বলে ঘরময় কেঁদি কেঁদি বেড়াবে ত্যাখন কি আমি বলব তোর বাপডা মরি গ্যাচে ? তোরা খেতি পাবি না — তোরা সব মরি যা — মরি যা। বলে যা হানিফ আমি কোনডা করব ?

কাঁদতে কাঁদতে চলে যায়। সাংবাদিক প্রবেশ করে। মঞ্চে সুমন ও নিতাই আসে। আলোছায়ার সৃষ্টি হবে। সুমন নিতাই নিজেদের হাতের টর্চে মুখ আলোকিত করে।

সুমন : আমার মা পাগল হয়ে গেছে সাংবাদিক।

নিতাই : আমার মা আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সাংবাদিক।

সাংবাদিক : আমি জানি। আমি দেখেছি। আমি সহ্য করতে পারছি না। আমাকে তোমরা ক্ষমা কর।

সুমন : অনুশোচনা।

সাংবাদিক : হ্যাঁ, প্রতিবাদ না করার অনুশোচনা।

নিতাই : দুঃখ।

সাংবাদিক : যৌবনকে শেষ করেছে। আমি দেখেছি।

সুমন : তোমার সংবাদ ছিল সুমন নাকি যন্ত্র বিকল করতে চেয়েছিল ?

নিতাই : তোমার সংবাদ ছিল নিতাই নাকি অস্ত্র নিয়ে পুলিশ খুন করতে চেয়েছিল ?

সাংবাদিক : আমি লিখেছি—লিখেছি—ভয়ে লিখেছি শাসকের চাপের কাছে—

সুমন : আমি তো অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছি।

নিতাই। আমি তো কবর থেকে উঠে প্রতিবাদ করেছি।

সাংবাদিক। সেই জন্যে সাহস পেয়েছি। আমিও প্রতিবাদ করতে এসেছি।

সুমন। অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হবে সাংবাদিক।

নিতাই। ভয়কে জয় করতে হবে। লোভকে বিসর্জন দিতে হবে।

সাংবাদিক। পারব—আমি পারব। পারতেই হবে। সকলের জন্যে—সমাজের জন্যে—আমার বংশধরদের জন্যে এ অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে হবে।

সুমন+নিতাই : আমরা জানি আমরা পরাজিত হব না। অত্যাচারী চিরদিন বেঁচে থাকতে পারবে না। আমরা অপেক্ষা করছি সেই দিনের, যেদিন পৃথিবীতে অত্যাচার থাকবে না, প্রভুত্ব থাকবে না, নিপীড়ন থাকবে না, আমরা মাটি চাপা পড়ব সেইদিন। সেদিন পৃথিবীতে শান্তি আসবে। আমরা প্রতিবাদ করছি—প্রতিবাদ করেছি—প্রতিবাদ করব।

> সুমন ও নিতাই চলে যায়। সাংবাদিক নিজ মনে কথা বলে। প্রবেশ করে অধ্যাপক প্রশান্ত সরকার। আলো স্বাভাবিক হয়।

প্রশান্ত। আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এলাম। খুব ডিস্টার্ব ফিল না করলে উত্তর পাব আশা করি।

সাংবাদিক। বলুন।

প্রশান্ত। এই শবের খেলা না করলে ভালো হতো নাকি ?

সাংবাদিক। আমি তো করি নি।

প্রশান্ত। অবশ্য এ রকম কথাই আপনারা বলে থাকেন। সরকারের ইচ্ছা না কি সব ! আর সবই নাকি নিমিত্ত মাত্র।

সাংবাদিক। আপনি ভুল করছেন। আমি এ থানার কেউ নই।

প্রশান্ত। সত্যি যদি তাই হয় তাহলে আমি অবশ্যই ভুল করছি। কিন্তু আপনি কে ?

সাংবাদিক : আমি একজন সাংবাদিক। আমার স্বাধীন প্রফেশন—

প্রশান্ত : এখানে এসেছেন কি থানা অফিসারের পারমিশন নিতে যে কোনটা ছাপব আর কোনটা ছাপব না ?

সাংবাদিক : ঠিক তার বিপরীত যদি কিছু থাকে তবে তাই করতে এসেছি জানবেন।

বাইরে অম্বার "সুমন সুমন" ডাক শোনা যায়।

প্রশান্ত : কবিগুরু আজ থেকে কত আগে যখন বিদেশীরাজ আমাদের ওপর প্রভুত্ব করত, তখন যে মাকে দেখেছিলেন, আজ স্বাধীন হয়েও সেই সন্তান-হারা মায়ের কান্না আমাদের শুনতে হচ্ছে। সেই সুমনকে আজও মায়েরা খুঁজছে।

সাংবাদিক : আপনি আমার কথা শুনুন। আপনি উত্তেজিত হবেন না।

প্রশান্ত : কতকগুলো লোক শুধু নিজের স্বার্থের জন্য সুমনকে হত্যা করেছে। যৌবনকে যাঁতা কলে পিষে তার রক্ত দিয়ে নিজের যুগকে স্নান করাচ্ছে। আর আপনারা রাজার ইচ্ছে তাল পাতায় ভরে শুধু রাজার জয়গান করছেন।

সাংবাদিক : আমিও আজ বেপরোয়া। আমিও সব বন্ধন কাটিয়ে সত্য লিখতে চাই।

প্রশান্ত : পারবেন সুমনের কথা লিখতে ? নিতাইয়ের কথা জানাতে ? পারবেন সন্তানহারা অম্বার কথা আজকের স্বাধীন মানুষকে জানাতে ? বলতে পারবেন পরাধীন নয়, স্বাধীন দেশেও আজ সুমনকে মারতে হয়। তার মাকে পাগলের মত রাস্তায় রাস্তায় ছেলের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে হয়।

সাংবাদিক : আপনি ?

প্রশান্ত : আমার নাম প্রশান্ত সরকার। আমি একজন অধ্যাপক। তবে কাকাতুয়া অধ্যাপক। ওরা যে বুলি শিখিয়েছে তাই কপচে গেছি। কারুকে মানুষ করতে পারি নি। ওদের বুলি দিয়ে কাউকে শেখান যায় না। মানুষ করা যায় না। কিন্তু আর নয়। এবার পাল্টাতে হবে। একা নয় সকলকে চাইছি। সকলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই ব্যবস্থাকে শেষ করতে চাইছি।

সাংবাদিক : আমি যে এসেছি মাস্টারমশাই। আরও অনেকে আসবে।

প্রবেশ করে শশাঙ্ক

শশাঙ্ক : হকলকে আসতে হইব। এমন অত্যাচার যারা করে তাদের ক্ষমা করতি মানুষ ভুলে যাবে। অতটুকু পোলা তারে এমন কইর‍্যা বন্দুকের বাঁট দিয়া থেঁতলেছে !

প্রবেশ করে অফিসার।

অফিসার : থানার কাজ হয়ে গেছে। আপনি চলে যান।

শশাঙ্ক : কারে কইত্যাছেন ?

অফিসার : আপনাকে বলছি।

শশাঙ্ক : যামু, যামু তো বটেই। আপনাগো এহানে রক্তের গন্ধ। এহানে থাকলে আমি শ্যাষ হইয়া যামু। তবে যাওনের আগে কইয়া যাই আপনাগো দিন শ্যাষ হইয়া আইসছে।

অফিসার : [চিৎকার] শশাঙ্কবাবু!

শশাঙ্ক : ধমকান কারে? দ্যাখলেন না আমার ঐ ছোট পোলাডা আপনারে ভয় পাইল না। আপনি ভাবেন ওর বাপ হইয়া আমি আপনারে ভয় পামু?

অফিসার : আমরা কিছুই জানি না। কটা লাশ কুড়িয়ে—

শশাঙ্ক : চুপ করেন। অমন একটা সোনার টুকরো পোলারে শ্যাষ কইরা দেশের কি ভাল করলেন? অরে কন ও হিংসায় বিশ্বাসী। ও যদি অন্যায় করে থাকে তবে আপনাগো জেলখানায় পুরলেন না ক্যান। আপনাগো আদালতে হাজির করলেন না ক্যান?

অফিসার : জবাব দিতে আমি বাধ্য নই।

প্রশান্ত : জবাব একদিন দিতেই হবে। আজ না হোক কাল। জবাব আদায় হবেই।

অফিসার : ইউ থার্ড পর্সেন শাট আপ।

প্রশান্ত : আই মাস্ট নট। আই অ্যাম নট এ ম্যাড ডগ লাইক ইউ?

অফিসার : আমাকে ফোর্স ডাকতে বাধ্য করবেন না।

সাংবাদিক : উনি একজন অধ্যাপক। ওনার সম্বন্ধে সমীহ করে কথা বলবেন।

অফিসার : এটা ওনার টোল নয়। এখানে সরকারী কাজকর্মে বাধা দিতে এলে—

প্রশান্ত : মিসায় চালান করবেন। তারপর থানায় নয়ত হাজতে শেষ করবেন। তা কি হলো? এ তো নাচছেন গলায় মুণ্ডমালা আর হাতে খাড়া নিয়ে থামাতে পেরেছেন মানুষকে? হাতের মুঠোয় রাখতে পেরেছেন আপনার শান্ত প্রজাদের?

অফিসার : এই বাপ আর কোনদিন তার ছেলেকে ঐ পথে পাঠাতে সাহস করবে? এই বাপ আর কোনদিন ছেলেকে সমাজ পালটানোর কথা ভাবতে বলবে?

শশাঙ্ক : অগো প্রয়োজনে ওরা ভাববো। মনে ভাববেন না আপনাগো রাইফেলের সামনে সব শ্যাষ হইয়া যাবে।

অফিসার : আই সে ক্লিয়ার আউট।

শশাঙ্ক : যামু তো বটে। আপনি কি ভাবেন আমার পোলার মত আমি একা একা আগায় যামু? যখন সবাই মিলে আসতে পারুম তখন আসুম।

অফিসার : এখুনি অ্যারেস্ট হবেন তা জানেন?

শশাঙ্ক : কেন জানুম না? সরকার আপনাগো হাতে সব তুলে দিছে তা জ

বেশ ভাল করেই জানি। তবে জানবেন আমার পোলাও সকলের ভাল করণের লাগি লড়াই করছে। বোকা! তাই একা একা এইয়েছে। আমরা যখন সবাই মিলে আমু তখন ঠেকাইতে পারবেন? ঠেকাইতে পারব আপনাগো কুত্তা সরকার?

চলে যায়।

অফিসার : শালা বুলি ছাড়তে শিখেছ। তিন দিন সময় দিলাম শোক ভুলতে। তারপর অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসবো। দেখবো বুড়োর বুলি কোথা থেকে বার হয়।

সাংবাদিক : আমাদের সামনেই কথাটা বলে ফেললেন।

অফিসার : কেন ভয় করতে হবে নাকি?

প্রশান্ত : ভয় পান বলেই তো অন্ধকারে কচি ছেলেগুলোর জীবন নিয়েছেন। জানাতে ভয় পাচ্ছেন বলেই তো মড়ার মেলা বসিয়ে বলছেন কটা লাশ কুড়িয়ে পাওয়া গেছে।

অফিসার : প্রফেসার দেখছি মড়া সম্বন্ধে বেশ অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছেন।

প্রশান্ত : গত পরশু রাতে আমার ছেলেকে আপনারা ধরে নিয়ে এসেছেন।

অফিসার : আজ তেরদিন আমরা কাউকে অ্যারেস্ট করিনি। চোর ছ্যাঁচড় থেকে শুরু করে একটা হকারও গত ১৩ দিনে অ্যারেস্ট করিনি। তা দেখে আসুন আপনার রত্নটি নিজেদের মধ্যে মারপিট করে শেষ হয়েছে কি না!

প্রশান্ত : কোন দরকার নেই। আমার ছেলে বেঁচে আছে এটাই জানব। ওর শ্রেণী সংগ্রামের আদর্শ সফল হবেই। সেই আশা আমি আজীবন বহন করে চলব।

সাংবাদিক : অত্যাচার যত হবে দেশের লোক তত বেশী—

অফিসার : এখানকার কোন কথায় নাক গলাতে যাবেন না।

সাংবাদিক : খবর আপনার কেনা নয়।

অফিসার : চ্যাটার্জী। চ্যাটার্জী॥ কাম—কুইক চ্যাটার্জী।

চ্যাটার্জী প্রবেশ করে

চ্যাটার্জী : এই সাংবাদিকটাকে গলাধাক্কা দিয়ে ভেতরে নিয়ে যাও।

সাংবাদিক : এটা সাংবাদিককে অপমান করা হচ্ছে।

অফিসার : চ্যাটার্জী। ওবে মাই অর্ডার।

চ্যাটার্জী : স্যার সাংবাদিককে এই ভাবে অপমান করলে—

অফিসার : হোয়াট তুমি আমার মুখের ওপর—

চ্যাটার্জী : আমাকে ক্ষমা করুন স্যার। আমি আর পারছি না। আমাকে ছেড়ে দিন।

অফিসার : তোমাকে কুকুরের মত গুলি করে শেষ করবো তা জান? তোমার

ছেলে মেয়ে তোমার বৌ—ইয়েস—ইয়েস তোমাদের সকলকে পথের ভিখিরী করে—।

চ্যাটার্জী : আপনার আদেশ মত কাজ করছি স্যার।

অফিসার : ওকে হ্যাণ্ডক্যাপ পরিয়ে চাবুক চালাতে বল।

সাংবাদিক : আমাকে আটকে রেখে কি সত্যি কথা বলা বন্ধ করতে পারবেন ?

অফিসার : চ্যাটার্জী !

চ্যাটার্জী : চলুন।

সাংবাদিককে নিয়ে চলে যায়।

প্রশান্ত : সমাজতন্ত্র ! কি সুন্দর ব্যবস্থা ! সাংবাদিকের গায়ে পড়েছে চাবুক।

অফিসার : [প্রশান্তের জামা ধরে] ইনকরিজিবল ! আমি সহ্য করতে পারছি না। চুপ করুন।

প্রশান্ত : ইথারে কান পাতুন। সকলেই আমার কথা বলছে।

অফিসার : প্রফেসর—!

প্রশান্ত : সকলে বলছে গণতন্ত্রের নামে ভাঁওতা দিচ্ছে। সমাজতন্ত্রকে কবরে পাঠাচ্ছে।

অফিসার : আমি ভাল করেই জানি। কেমন করে এই মুখ বন্ধ করতে হয়।

প্রফেসরকে ঠেলে মাটিতে ফেলে দেয়। বাইরে অম্বার ডাক শোনা যায়। "সুমন—সুমনরে ! সুমন।"

অফিসার : বাষ্টার্ড। ঐ পাগলীটা অনেকক্ষণ ধরে জ্বালাচ্ছে।

প্রশান্ত : বিভূতি বেঁধেছে যন্ত্র। শিবতরাই পায় না খাদ্য কিংবা রসদ। তবু মেনে নিতে হবে ? সুমনের মা কাঁদছে বঁটুকের নাতিকে পাওয়া যাচ্ছে না। নিতাইকে পুলিশ খুন করল। রাজা করছে সব। কিছু বলতে গেলে রাজার হাঁড়িকাঠে দিতে হবে গলা। আমরা কি চুপ করেই থাকব ? এস না সবাই ! এস উত্তরকূট—এস শিবতরাই—এস সকলে মিলে গলা মেশাই। বলি এ যন্ত্র গরীবের রক্ত নিংড়ে নিচ্ছে। এ যন্ত্র মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলছে।

প্রবেশ করে অম্বা

অম্বা : আবীর—আবীর মেখেছে সুমন। লাল টকটকে আবীর মেখে আমার ছেলে বিজয়ীর বেশ পরেছে।

প্রশান্ত : ঠিক বলেছ মা, ঐ আবীরে অবগাহন করবে সকলে।

অম্বা : আমার সুমন।

প্রশান্ত : সুমন নামে একটা ছেলেকে ওরা মেরেছে। কিন্তু এখন যে সব

ছেলেদের মন সুমন।

অম্বা : ওরা তো আসছে না। আমার নিতাইকে মাটি থেকে তুলে ফেলতে ওরা আসছে না কেন? আমার সুমনকে ওদের কাছে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ওরা আসছে না কেন?

প্রশান্ত : অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে মা। এই কাঁটা ছড়ান পথে সাবধানে পা ফেলতে হবে মা। ভাল করে দেখ ওদের ছায়া দেখতে পাবে। ভাল করে শোন ওদের পদধ্বনি শুনতে পাবে। লাখে লাখে ওরা আসছে—সবাই সুমন—সবাই—

এই সময় বাইরে থেকে মিছিল আসার মত আওয়াজ শোনা যাবে। রিভলবার হাতে প্রবেশ করে অফিসার।

অফিসার : আর এক মুহূর্ত আমি সহ্য করতে রাজী নই।

প্রশান্ত : অফিসার, ওকে খুন করার আগে আপনি আমাকে খুন করুন।

অফিসার : একজনকে নয়, দু'জনকে, দশটা নয়, বারটা লাশ দেখবে বারাসাতের মানুষ।

প্রশান্ত : লাখ কোটি মানুষকে হত্যা করতে পারবেন অফিসার? ঐ আসছে আসছে—অত্যাচারের মোকাবিলা করতে। কত গুলি আছে অফিসার? পারবেন মানুষের মন থেকে নিতাই, সুমনদের মুছে ফেলতে?

অফিসার ভয়ে আস্তে আস্তে পেছনে হটতে থাকে। নেপথ্যে মিছিলের আওয়াজ শোনা যায়।

অফিসার : চ্যাটার্জী এত শব্দ কেন! চ্যাটার্জী করা আসছে মিছিল করে? লাখ-লাখ মানুষ! আওয়াজ করছে। চ্যাটার্জি. ওরা আমাদের কাছে কৈফিয়ৎ চাইছে—ওদের আটকাও—ওদের—

সুমন+নিতাই+হাফিজ : আমরা করেছি প্রশ্ন।

নেপথ্যে সকলে : উত্তর মেলেনি আজও।

পর পর ৩ বার প্রশ্ন করে তিনবার বলা হবে। অফিসার আস্তে আস্তে পেছতে পেছতে 'না' বলতে থাকে। শেষকালে চিৎকার করে 'না' বলে ফ্রীজ হয়। নেপথ্যে কবিতা শোনা যায়। পর্দা পড়ে।

নেপথ্যে : কবিতা

মহা বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে
বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে
রণিবে না।

বিদ্রোহী রণক্লান্ত —
আমি সেই দিন হব শান্ত॥

নাটক : মন্থন

নাট্যকার : সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম : ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ পাটনায়। আদি নিবাস কলকাতার কালিঘাট। শিক্ষা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের স্নাতক পরে ইংরেজী সাহিত্যে স্নাতকোত্তর করেছেন। বৃত্তি : ডাক বিভাগের মৃত চিঠির সৎকার। ১৯৫২তে এল. টি. জির ইংরেজী গ্রুপে যোগদানের সূত্রে উৎপল দত্তের কাছে নাট্যচর্চায় হাতেখড়ি। এখনো উৎপল দত্তের সঙ্গেই পি. এল. টি-তেই নাট্যচর্চায় লিপ্ত। প্রথম উল্লেখ্যে নাট্যরচনা : জয় জয়ন্তী (গন্ধর্বে প্রকাশিত)। প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা আমরণ (থিয়েটার ক্যাম্প)। উল্লেখযোগ্য নির্দেশনা অগ্নিগর্ভ। এঁর চলতি নাটক বদনাম গন্ধর্ব-র প্রযোজনায় অভিনীত হচ্ছে। অভিনেতারূপে বাংলা থিয়েটারে বহু উল্লেখযোগ্য চরিত্রের স্রষ্টা। বিদেশ ভ্রমণ : ১৯৬৬তে পূর্ব জার্মানী গমন। ২ বৎসর অবস্থান ও বার্লিনার আনসাম্বল্-এ প্রযোজনাকর্মে শিক্ষাগ্রহণ। প্রকাশিত গ্রন্থ : ব্রেশ্‌ট ও তাঁর থিয়েটার (১৯৭৭)।

রচনাকাল : ১৯৭৭

চরিত্রলিপি : অনাদি। ললিত। হরি। মাস্টার মশাই। প্রিন্সিপ্যাল। ভাইস প্রিন্সিপ্যাল। মৃগাঙ্ক। অরিন্দম। বিনয়। বিষ্টু।

প্রথম অভিনয় : ৪ মে '৭৭ মাইম অ্যাকাদেমী।

প্রযোজনা : রূপান্তরী। অভিনয় শিল্পী : অনাদি দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। ললিত রথীন সরকার। হরি কমল রায়। মাস্টার মশাই সত্যব্রত দাশগুপ্ত। প্রিন্সিপ্যাল পার্থ মিত্র। ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মদন দেব। মৃগাঙ্ক কল্লোল মুখোপাধ্যায়। অরিন্দম কাশীনাথ চক্রবর্তী। বিনয় নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষ্টু প্রদীপ দেবনাথ। নেপথ্য শিল্পী : নির্দেশনা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত দেবাশিস দাশগুপ্ত। আলোকসম্পাত চিত্ত সরকার। মঞ্চস্থাপত্য সত্যব্রত দাশগুপ্ত।

রজনী : মোট ১২ বার যোগেশ মাইম অ্যাকাদেমীতেই। আনুমানিক দর্শক : ৩ হাজার।

অনুমোদন : অভিনয়ের জন্য সংলগ্ন ঠিকানায় অনুমতিগ্রহণ কাম্য। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫ মহিম হালদার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০২৬।

মন্থন

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

চঞ্চল : আপাততঃ ভারত মোটর ওয়ার্কস-এ অবস্থা কি ?

বিনয় : মালিক ধর্মঘট ভাঙতে না পেরে কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার তোড়জোড় করছেন। শুধু এই বিশেষ কারখানা নয়—অনেক কারখানাতেই এই অবস্থা চলছে। এই এলাকার সমস্ত মালিকেরা এক-জোট হয়ে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ব্যাপক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বেকারীর করাল ছায়া দেখে ছাত্ররা কি নীরব থাকতে পারে ?

মঞ্চের ডানদিকে কাগজের অফিস। নাটক যখন শুরু হচ্ছে মঞ্চের বেশির ভাগ অংশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। একটি স্পট এসে পড়ে "দৈনিক সন্দেশ" পত্রিকার রিপোর্টার চঞ্চল চৌধুরীর ওপর। সে একটা টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করছে। নেপথ্যে প্রচণ্ড সোরগোল।

চঞ্চল : হ্যালো দৈনিক সন্দেশ? এডিটরকে চাইছি—কে? আমি চঞ্চল কথা বলছি। হ্যালো! হ্যাঁ স্যার। আমি শরৎবাবুর বাজার আর রামমোহন স্ট্রীটের চৌমাথা থেকে ফোন করছি। এখানে একটা প্রচণ্ড দাঙ্গা চলছে। অ্যাঁ? হ্যাঁ স্যার ভারত মোটর ওয়ার্কস-এর শ্রমিকরা কারখানার অফিসের সামনে প্রচণ্ড বিক্ষোভ করছে। শ্লোগানে আকাশ বাতাস কাঁপছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছাত্ররা শ্রমিকদের এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। ও হ্যাঁ —ওরা কোম্পানির একটা ভ্যান আটকেছে। কিছুতেই···এক মিনিট স্যার ·· এইরে ভ্যান উল্টে পড়েছে···আগুন দিচ্ছে···অ্যাঁ? না। হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন? ভ্যান গেট থেকে বেরুতে যাচ্ছিল—আপনি জায়গা ফাঁকা রাখুন, আমি গিয়েই পুরো রিপোর্ট দিচ্ছি। [সোরগোল] পুলিশ এসে গেছে। তিন লরী। লাফিয়ে নামছে। হ্যালো এবার বোধ হয় লাঠি চার্জ হবে। অনেকে পালাচ্ছে। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছেড়েছে···হ্যালো আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসছি—

গোলমাল বাড়ে। নিষ্প্রদীপ। ডানদিকে কাগজের সম্পাদকের দপ্তর।

অনাদি : নমস্কার। আমাকে আপনারা অনেকেই চেনেন না। না চেনবারই কথা। কারণ আমি কেউকেটা কেউ নই। আমার নাম অনাদি সরখেল, নৃপতি সরখেলের ছোট ছেলে। জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলো ঘিঞ্জি শহরের ততোধিক ঘিঞ্জি সওদাগরী অফিসের ডেবিট, ক্রেডিট, লেজার, ব্যালান্স শীটের আড়ালে আমি অনাদি সরখেল একটা গোটা রক্তমাংসের মানুষ হারিয়ে গেছি। তিল তিল করে সারা জীবনের সঞ্চিত যৎসামান্য অর্থ দিয়ে কেনা, শ্রীনাথ-পুরের জনবিরল প্রান্তে এই ছোট্ট মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকু, আমার তিলোত্তমা শিল্প। এখানে বাস্তবিকই আমার দুশ্চিন্তার কোনো অবকাশ নেই। এখানে কেউ আমাকে ডেবিট ক্রেডিটের চুলচেরা হিসেব নিয়ে চোখ রাঙাবে না বা পাই পয়সার গরমিল নিয়ে বাকবিতণ্ডায় প্রবৃত্ত করতে পারবে না। আমি ইচ্ছেমত লোকের সঙ্গে মেলামেশা করবো, মনের মত ঘোরাফেরা করবো বা ইচ্ছে হলে সারাদিন চুপচাপ বসে লক্ষ্য করবো দূরে পাহাড়ের রং কেমন বদলায়। কিন্তু দাঁড়ান···এ ভদ্রলোক কে? এ দিকেই আসছেন···ও বাবা হাতে দোনলা বন্দুক। না জানি কি বিভ্রাটই ঘটে!

হরিসাধনের প্রবেশ।

হরি: নমস্কার। শুনলাম আপনি নতুন এসেছেন এতল্লাটে? আমি ঐ-ঈ-ঈ বাড়িটায় থাকি। স্টোনস্ থ্রো! আমার নাম হরিসাধন চক্রবর্তী। অনাদিবাবু তো আপনার নাম? আলাপ করে আনন্দ হলো।

অনাদি: ও আপনিই হরিসাধন বাবু? বড় আনন্দ হলো। সোজা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে আসুন। চা খাবেন, না কফি?

হরি: ধন্যবাদ। বেজায় ব্যস্ত। মরবার ফুরসৎ নেই। ডিষ্ট্রিকট্ ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। বন্দুক দেখেই বুঝতে পারছেন শিকারের শখ। শিকারীদের কমিটি মিটিং। ইদানীং এ তল্লাটে ফায়ার আর্মস ছেনতাই হচ্ছে। সব নকশালী কাণ্ড-কারখানা। কলকাতায় যেমন পুলিশের কাছ থেকে পিস্তল বন্দুক ছিনিয়ে নিচ্ছে – ইদানীং এদিকেও ওসব আকছার ঘটছে। তাই ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিটিং ডেকেছেন। এই তো পরশু রাত্রে কদমাদিহি গ্রামে জোতদার হারাণ মণ্ডলকে কে বা কারা খুন করে তার দুটি বন্দুক নিয়ে গেছে।

অনাদি: ও! তাই নাকি?

হরি: তা আপনার কাছে ও সব নেই তো?

অনাদি: কি সব?

হরি: ফায়ার আর্মস?

অনাদি: না। না। ও সব আমার কি হবে? ল্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়।

হরি: কিন্তু আপনার প্রাণটা তো আপনার মশাই। সেটাকে রক্ষা করতে ওটা দরকার হতে পারে। এ সব এলাকায় কখন কি হয়!

অনাদি: ও থেকেই বা কি না থেকেই বা কি? আপনিই তো বললেন জোতদার হারাণ মণ্ডলের দু দুটি বন্দুক ছিল। তবু তিনি কি আত্মরক্ষা করতে পারলেন?

হরি: না – তা – নয়। তবে বন্দুক থাকলে কিছুক্ষণ বীরের মত যুঝতে পারা [কাশি] যায় [কাশি]। ঐ সব ডেঞ্জারাস [কাশি] সমাজ বিরোধীদের এ ধরাধাম থেকে সরিয়ে ফেলতে [কাশি]—

অনাদি: তা ৩০ বছরের কংগ্রেসী সুশাসনে যে সমাজ তৈরি হয়েছে তার বিরোধিতা না করে উপায় আছে? ওরা তো ঠিকই করেছে।

হরি: কি [কাশি] বললেন? [কাশি]

অনাদি: বলছি যে স্বাধীনতার ৩০ বছর বাদে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই ৪০ লক্ষ বেকার কেন?

হরি: কে? কে বলেছে আপনাকে?

অনাদি: ললিতবাবু বলেছেন।

হরি : ও! তাই ত বলি! ললতে উকিল। ব্যাটা বটতলার মোক্তার। ওর কাজই হলো লোক ক্ষেপিয়ে বেড়ানো। ওর ঐ সব ছেঁদো কথায় আপনি বিশ্বাস করলেন নাকি ?

অনাদি : তা বিশ্বাস করলাম বৈকি। মানে বাধ্য হলাম। মানে বাধ্য হয়েই বিশ্বাস করলাম।

হরি : কেন ? কেন বাধ্য হলেন ?

অনাদি : কারণ কথাগুলো ওঁর নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের।

হরি : যাঃ।

অনাদি : যাঃ মানে ? আমি কি মিথ্যে কথা বলছি ? ইন্দিরা গান্ধী ৩০০ কোটি ডলার ঘুষ খেয়ে, কারখানা বন্ধ করে শ্রমিক কর্মচারী ছাঁটাই করে বেকারের সংখ্যা শুধু পশ্চিমবঙ্গেই ৪০ লক্ষে দাঁড় করিয়েছেন।

হরি : এটা কে বলেছে ?

অনাদি : ললিতবাবু বলেছেন। ও – না – এটা একজন সাহেব বলেছেন – নামটা আমি জেনে বলব – কাল।

হরি : ও ব্যাটা উকিলের বাচ্চা যে সাহেবদের চাপরাশি সেটা এ তল্লাটে সবাই জানে। তবে ব্যাটাকে আর বেশিদিন বাইরে রাখা নিরাপদ নয়। আজই ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে গিয়ে বলছি সব। যাক চলি – অলরেডি লেট। ও হাঁ যে কথাটা বলতে এসেছিলাম –

অনাদি : আরে বসুন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি কথা বলা যায় নাকি ? আপনার হাতে ওটা কি ? সেই থেকে ওটা উঁচু করে ধরে রেখেছেন।

হরি : আমার আবার একটু ডিস্‌পেপসিয়ার ধাত আছে – তা কবিরাজ মশাই বললেন – এটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জিনিসের সারাংশ ঘেঁটে তৈরী করেছেন। অগ্নিমান্দ্যে এ অমোঘ।

অনাদি : তাই নাকি ? কি নাম ?

হরি : দেবপিঙ্গল ক্ষুধা-ভাইটা বটিকা। এতে প্রচুর ভাইটামিন রয়েছে।

অনাদি : তাই নাকি ?

হরি : হ্যাঁ। সবকটা ভাইটামিনই এতে আছে – শুধু ভাইটামিন এক্‌স্ ছাড়া –

অনাদি : ভাইটামিন এক্‌স্ নেই ? তাহলে তো মহা সমস্যায় পড়লেন আপনি ? একে নকশালী উপদ্রব – তারপর ভাইটামিনের অভাব – আপনি তো প্রায় মরমর।

হরি : তা মশাই সব জিনিষ তো আর এ জগতে মনের মত হয় না।

অনাদি : তা যা বলেছেন। এই তো দেখুন না স্বাধীনতার পর ত্রিশ বছর হলো অথচ এখনও ৪০ লক্ষ বেকার ঘাড়ে চেপে রয়েছে অথচ –

হরি : আঃ। ও কথা আবার টানছেন কেন? সিরিয়াস্‌লি আলোচনা করুন না। ওটা তো আগেই আলোচনা হলো।

অনাদি : তা ঠিক।

হরি : তা এই বড়ি সকালে একটা আর রাত্রে শুতে যাবার আগে একটা। কবিরাজ মশায় বললেন এক মাসে আশ্চর্য ফল ফলবে। অনুপান এক চামচ থানকুনি পাতার রস আর আধ চামচ সোডিয়াম বাইকারবোনেট।

অনাদি : ও।

হরি : হ্যাঁ। কবিরাজ মশাই বললেন একমাসে এমন কাজ হবে যে আমার হুঙ্কারে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাবে। এই ওষুধ খাবার পর এক পেয়ালা করে ছাগলের দুধ খেতেই হবে অবশ্য অবশ্য। তবে ছাগলটি নীরোগ হওয়া চাই।

অনাদি : তা ছাগল জোগাড় হয়েছে?

হরি : হ্যাঁ। আমার ভাগ্নে বেঙ্গল ভেটারেনারী কলেজের ছাত্র। সে শিয়ালদা থেকে একটি নীরোগ ছাগল এনে দিয়েছে।

অনাদি : কিন্তু হরিবাবু ছাগল রাখবেন কোথায়? ভারী নোংরা জানোয়ার। তা ছাড়া শাকপাতা যা পায় সব মুড়িয়ে খেয়ে ফেলে যে।

হরি : কেন? বাগানের কোণে একটা ঘর করে দেব। খাসা থাকবে'খন। এতো মশাই কলকাতা শহর নয় যে উঠোন ছাড়া জায়গা নেই।

অনাদি : কোনখানে রাখবেন?

হরি : উত্তরদিকে আমার ঐ যে জামগাছটা আছে—ওর তলায় খোলা জায়গা আছে খানিকটা। সেখানে। রোদ পাবে—হাওয়া পাবে।

অনাদি : উত্তরদিকে? ঐ বেড়ার ধারে? কিন্তু ওখানে যে আমার সীজন ফ্লাওয়ারের বীজ পুঁতেছি। আমার অত সাধের ফুলগাছ সব একটিও যে আর আস্ত থাকবে না হরিবাবু।

হরি : কেন? কেন? মাঝখানে তো কাঁটাগাছের বেড়া রয়েছে।

অনাদি : না, না-না। তা হবে না। একি অন্যায় কথা? আপনি দক্ষিণ দিকে ছাগল রাখুন না।

হরি : তা কি করে হয়? দক্ষিণদিকে গোয়াল। আমার মূলতানী গাই রয়েছে তাছাড়া ওদিকে রিসেণ্টলি রসকদম্ব আমের চারা লাগিয়েছি।

অনাদি : তার মানে! একি অত্যাচার? নিজের গাছ সাবধানে বাঁচিয়ে আপনি আমার ফুলগাছের দিকে ছাগল লেলিয়ে দিচ্ছেন? আপনার কি ধারণা আমার চন্দ্রমল্লিকা আর ব্ল্যাকপ্রিন্স আপনার পেয়ারের ছাগল মুড়িয়ে খাবে আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো? তা তো হতে পারে না। আমার বেড়ার ধারে ছাগল রাখা চলবে না।

ললিতের প্রবেশ—নিচে ডান দিক থেকে।

হরি : আমার বাড়িতে যেখানে খুশি আমি ছাগল রাখবো, গণ্ডার রাখবো, আরশুলা রাখবো, তাতে কার কি আপত্তি থাকতে পারে ?

ললিত : পেনালে কোডের ২৮৯ ধারাটি ভুলে গেছ নাকি হে ?
"হুএভার নোইংলি অর নেগ্‌লিজেণ্টলি অমিটস টু টেক সাচ্‌ অর্ডার উইথ্‌ এনি এ্যানিম্যাল ইন হিজ পজেশন্‌ এ্যাজ্‌ ইজ্‌ সাফিসিয়েণ্ট টু গার্ড এগেনস্ট এনি প্রোবাবল্‌ ডেঞ্জার টু হিউম্যান লাইফ্‌ অর এনি প্রোবাবল্‌ ডেঞ্জার অফ গ্রিভাস হার্ট ফর্ম সার্চ্‌ এ্যানিম্যাল শ্যাল্‌ বি পানিসড্‌ উইথ ইম্‌প্রিজনমেণ্ট অফ্‌ আইদার ডেশক্রিপ্‌শন ফর এ টার্ম হুইচ্‌ মে একস্‌টেন্‌ড টু সিক্স মন্‌থ্‌স অর উইথ ফাইন হুইচ মে এক্সটেন্‌ড টু ওয়ান থাউজ্যাণ্ড রুপিস্‌ অর উইথ বোথ্‌।

হরি : হ্যাঁ হ্যাঁ ও সব আইনের কচকচি—তুমি এখানে কেন ?

ললিত : ঠিক সময় ঠিক জায়গায় এসে পড়াই তো আমার কাজ।

হরি : তাই তো বলি। নইলে অমন গড়গড় করে আইন আওড়াচ্ছে কোন্‌ শালা !

ললিত : হ্যা—বাবা। কি ? শালা ? শালা মানে ?

হরি : শালা মানে হলো পরের ব্যাপারে নাক গলানো ছাড়া কি আর তোমার কোন কাজ নেই।

ললিত : নাক গলানো নয়। তোমাদের মত সব বাপের সুপুত্তুরদের টিট করার জন্যই আমি মাটি ফুঁড়ে উদয় হই। এঁকে ভালমানুষ পেয়ে যা খুশি তাই করতে চাইছ ! প্রাক্তন পুলিশ অফিসারের মেজাজ দেখাচ্ছ !

অনাদি : আহা : ললিতদা—থাক না—

হরি : হ্যাঁ। তা ছাড়া নিরীহ ছাগল। হিউম্যান লাইফ বিপদাপন্ন করবে কি করে ?

ললিত : হুঁ। কিন্তু শিং রয়েছে গুঁতুতে পারে। যদি গুঁতিয়ে দেয় ?

হরি : যদি গুঁতোয় ? যদি ? যদির কথা নদীতে ফেলে দাও।

ললিত : পেয়েছি। ২৬৮ ধারা। পাবলিক্‌ নুইসেন্স—সেটা মনে আছে ? দুর্গন্ধ ! ছাগলের গায়ে বোঁটকা গন্ধ—

হরি : কেন থাকবে না ? কিন্তু এ তো বোকা পাঁঠা নয় যে বোঁটকা গন্ধ বেরুবে। ও সব আইনের ভয় দেখিও না। যখন পুলিশের চাকরী করতাম তখন তোমার মত বহু উকিলের নাড়ি আমি ছিঁড়ে দিয়েছি।

ললিত : তুমি তাহলে অনাদিবাবুর কথামত বাগানের দক্ষিণে ছাগল রাখবে না ? লক্ষ্মীছাড়া ছাগল।

অনাদি : আহাঃ ঝগড়াঝাঁটি থাক না।

হরি : এঁঃ। লক্ষ্মীছাড়া ছাগল? মোটেই লক্ষ্মীছাড়া ছাগল নয়। আমি নগদ করকরে টাকা খরচ করে কিনেছি।

অনাদি : কিন্তু ফুলের গাছগুলো নষ্ট করবে বলেই…কত কষ্ট করে ওগুলো লাগিয়েছি –

হরি : আহাঃ মাঝখানে বেড়া রয়েছে তো। তা ছাড়া ছাগল তো মশাই দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকবে।

ললিত : দড়ি ছিঁড়তে পারে না? তখন? বর্ধমানে যখন ছিলাম ঐ রকম দু দুটো ছাগলের কেস করে এসেছি।

হরি : বর্ধমানের ছাগল দড়ি ছিঁড়েছিল বলে এই শ্রীনাথপুরের ছাগলও দড়ি ছিঁড়বে এমন কোনও কথা নেই।

অনাদি : তবু সে ছাগল – মানুষ তো নয় হরিসাধনবাবু।

হরি : ছাগল ছাগলই হয়। ছাগল মানুষের মত হবে এ কোনদিন কেউ আশা করে? কোথায় কার ফুলগাচ আছে যদি খায়, সে জন্য পাড়াপড়শী কেউ ছাগল পুষবে না? ছাগদুগ্ধ খাবে না? গান্ধীজী নিয়মিত খেতেন – অতএব ওটি সুখাদ্য হতে বাধ্য নইলে গান্ধীজী খেতেই পারেন না।

ললিত : নইলে তোমার মত মস্তিক উর্বর হতেও পারে না।

হরি : হ্যাঁ। কি? কি?

অনাদি : আহা ছাগল আপনি পুষুন। ছাগদুগ্ধ নিয়মিত ভক্ষণ করুন – মানে পান করুন – তাতে আমার কোনও আপত্তির কারণ নেই। আমার আপত্তি শুধু ঐ উত্তর দিকটা নিয়ে। আমার ফুলগাছগুলো – তা ছাড়া দখিনা বাতাস দুর্গন্ধে ভরে উঠবে।

হরি : দেখুন মশাই – আমি মুদ্দোফরাস নই, ডোম নই বা পিশাচসিদ্ধ নই – ছাগল পুষছি বলে সত্যি সত্যি যে জায়গাটাকে নরককুণ্ড করে রাখবো এমন নয়। আমাকেও তো ভিটেয় বাস করতে হবে। আপনার যেমন নির্মল বাতাস দরকার আমারও তো তাই।

ললিত : না – তোমার দরকার বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত।

হরি : হ্যাঁ। কি?

ললিত : ছাগল। বেশ। তুমি ছাগল পোযো – আমার মক্কেল অনাদিবাবু – এই যে অনাদিবাবু তুমি বাঘ পোযো তো একটা। আর সে বাঘকে ঐ চন্দ্রমল্লিকার ঝাড়ের কাছে ছেড়ে রেখো। দেখি ঐ হরিসাধনের ছাগলের ঘাড়ে মাথা কদিন থাকে…

হরি : বাঘ পোযো, রাক্ষস, খোক্কোস যা খুশি পোযো – তাদের বাগানে রাখ কি ঘরে রাখ আমি টুঁ শব্দটি তুলবো না। কিন্তু যদি আমার কোনও হিঁয়া কা মাটি উঁহা হয়েছে – তাহলে আইন আছে, আদালত আছে…

হরিসাধন নিচে নামে।

ললিত: তাহলে এই কথা? ছাগল তুমি তাহলে উত্তর দিকেই রাখছ?

হরি: আলবাৎ। চোখ রাঙিয়ে আমার কচু করবে।

বিষ্টু কাপড় মেলে দিচ্ছে—ডানদিকের ব্যালকনি থেকে।

ললিত: বেশ।

হরি: চলি। দেখা হবে রণক্ষেত্রে অসিতে অসিতে।

হরির প্রস্থান।

অনাদি: যাক যাক। ও কথা যাক। যে কথা বলছিলেন সেটা বলুন।

ললিত: কি যেন প্রশ্ন ছিল?

অনাদি: দেশের আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ছে। এতে কার লাভ হচ্ছে?

ললিত: [কাগজ বার করে] এটা পড়ুন।

অনাদি: এটা কি?

ললিত: কি, সেটা তো লেখাই রয়েছে। পড়তে পারেন না?

অনাদি: না মানে…আপনি মুখে মুখে বলে দিলে কষ্ট করে আর…

ললিত: কেন? আপনিই তো খুঁচিয়ে ঘা করলেন—ভারত মোটর ওয়ার্কস-এ খুনোখুনি হচ্ছে বলে আপনিই তো চুলকে ঘা করলেন। পড়ুন—পড়লে নাড়ি ছেড়ে যাবে।

অনাদি: তা অমন জিনিষ না পড়াই তো ভালো।

ললিত: পড়ুন। '৬৯ সালে কত শ্রমিক বেকার হয়? পশ্চিমবঙ্গে?

অনাদি: ৪২,৯৬৭—

ললিত: আর '৭০ এ? কংগ্রেস আমলে?

অনাদি: ১,৭২,৮৭৫।

ললিত: '৭১ এ?

অনাদি: ২, ৪১, ০৭৬।

ললিত: '৭২ এ?

অনাদি: ৩,৮৪,২২৪ জন। ওরে বাবা। বাই লিপ্স এ্যাণ্ড বাউণ্ডস্ বেড়ে চলেছে। তাই বলছিলাম—এত বেকার তার ওপর আবার ধর্মঘট, খুনোখুনি করে—

ললিত: আস্তে। আস্তে। ধর্মঘট কি শ্রমিকরা স্ফূর্তি করার জন্যে করে? এসো স্ফূর্তি করে একটু ধর্মঘট করা যাক। নাকি বাঁচার তাগিদে?

অনাদি: বাঁচার জন্যেই করে যদ্দূর শুনেছি।

ললিত: তাহলে এবার পড়ুন।

অনাদি: আবার? এ সব পড়তে ভালো লাগে না যে—

ললিত: না লাগলেও পড়তে হবে। বাঁচার তাগিদে শ্রমিকরা ধর্মঘটে সামিল

হচ্ছে—আর আপনি ছোঁয়া বাঁচিয়ে—

সম্পাদকের ঘরে আলো জ্বলে। পিছনে বিরাটভাবে লেখা 'দৈনিক সন্দেশ'। সম্পাদক বসে লিখছেন।

চঞ্চল : আসতে পারি স্যার ?

সম্পাদক : এসো। এসো। রিপোর্টটা দিয়েছ ? তোমার জন্য জায়গা খালি রয়েছে।

চঞ্চল : হ্যাঁ স্যার। জমা দিয়েই তো এলাম।

সম্পাদক : বেশ। খবর বল।

চঞ্চল : আরো তিন জায়গায় দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছে।

সম্পাদক : দু দিনে এগারো জায়গায়। উঃ ভয়ঙ্কর অবস্থা !

চঞ্চল : মানে মানে মাস দুয়েক আগে যে রকম ঘটেছিল এবার তার চেয়ে ব্যাপক।

সম্পাদক : শুধু ব্যাপক নয়—মনে হচ্ছে ঘটনাগুলো অনেক বেশি সুপরিকল্পিত। এই যে ম্যাপটার দিকে দ্যাখ। আন্দোলন হয়েছে এখানে, এখানে, এখানে। লক্ষ্য করো চঞ্চল, ব্যাপারটার মধ্যে কি রকম একটা জ্যামিতিক ভঙ্গী রয়েছে।

চঞ্চল : হ্যাঁ সত্যিই তো।

সম্পাদক : নানা জায়গায় ঘটনা ক্রমশঃ এমনভাবে ছড়াচ্ছে যে মনে হচ্ছে বুঝি শহরটাকে ঘিরে ফেলতে চাইছে। এবং সময়গুলো লক্ষ্য করেছ ? পুলিশ যখন কোথাও ব্যস্ত—তখন আচমকা গণ্ডগোল শুরু হলো একেবারে উল্টো-দিকে।

চঞ্চল : সত্যিই। ভারত মোটর ওয়ার্কস-এ স্বচক্ষে যা দেখলাম তাতে সহজে মিটবে বলে মনে হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলুন তো ?

সম্পাদক : সেটা এত তাড়াতাড়ি বলা মুস্কিল। তা ছাড়া আমাদের কাগজের সেই প্রশ্নটাই তোলা উচিত। আমি চাইছি—একটা ক্রোড়পত্র—সাপ্লিমেন্ট বার করতে—ধর শিরোনামা থাকবে—'বিপ্লব ও হিংসা' বা 'শ্রমিকশ্রেণী ও হিংসাত্মক রাজনীতি'। কতকগুলো প্রশ্নের আকারে মূল সমস্যাটিকে তুলে ধরতে হবে। বর্তমান সমাজকে বাঁচাবার চেষ্টা কি অর্থহীন ? বাঁচানো সম্ভব ? নাকি রোম ও গ্রীসের মত আমরাও ইতিহাসের ডাস্টবিনে যাবো ?

চঞ্চল : সর্বনাশ। এ সব তো বিপজ্জনক রাজনৈতিক প্রশ্ন। নিজের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি নিয়ে কে আর মাথা ঘামাতে চায়।

সম্পাদক : অন্য কাগজগুলো সব ঢোঁক গিলছে। যতই অস্বস্তিকর হোক কাগজকে জনপ্রিয় করতে গেলে এ সব জটিল রাজনৈতিক প্রশ্নের জবাব দিয়েই এগুতে হবে।

চঞ্চল : তা আমাদের মালিক কি আপনার সঙ্গে একমত হবেন ?

সম্পাদক : ওঁর সঙ্গে বিশদভাবে আলোচনা এখনও করি নি। তবে মালিক যখন, তখন কাগজের বিক্রী বাড়লে উনি যে কোন রকম কাজ করতে রাজি হবেন। যাক, তুমি তাহলে কাজে লেগে যাও। দিন দশেক সময় নাও। তবে মনে রেখো আসল জায়গায় ঘা দেওয়ার বিপদ অনেক। উইস্ ইউ বেস্ট অফ্ লাক্ !

আলো নিভে যায়।

অনাদি : বলছিলাম কি আজ থাক না। কাল সকালে চা – টা খেয়ে –

ললিত : আঃ। বকবক করবেন না। সব গুলিয়ে যাবে। পড়ুন। ১৯৭৪ সালে ভারতীয় পুঁজিপতিরা মোট কত মুনাফা করেছিলেন ?

অনাদি : ১৭০০ কোটি টাকা।

ললিত : আর জরুরী অবস্থা জারী হবার পর ? ১৯৭৬-এ ?

অনাদি : ৩৬০০ কোটি।

ললিত : তাহলে জরুরী অবস্থায় পুঁজিপতিদের মুনাফা দু বছরে দ্বিগুণের বেশি হয়ে গেল ?

অনাদি : তাই তো ?

ললিত : তার মানে ইন্দিরা গান্ধী মিথ্যা বলেছিলেন – জরুরী অবস্থা জারী হয়েছিল দেশকে বাঁচাতে নয় পুঁজিপতির স্বার্থরক্ষার্থে – বড়লোককে আরও বড়লোক করতে এবং গরীবকে আরো গরীব করতে – অর্থাৎ 'গরীবী হটাও' পরিকল্পনাকে সার্থক করতে।

অনাদি : তাই তো দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা মোটামুটি।

ললিত : [ধমকে] মোটামুটি ? মোটামুটি মানে ?

অনাদি : না-না। পুরোপুরি।

ললিত : তাই বলুন। তাহলে ভারত মোটর ওয়ার্কস-এর মালিকও আর পাঁচটা মালিকের মত জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়ে, মুনাফা লুটে, শ্রমিক ছাঁটাই করে ইন্দিরা গান্ধীর 'গরীবী হটাও' পরিকল্পনাকে সার্থক করতে চেয়েছেন ? হ্যাঁ কি না বলুন।

অনাদি : হ্যাঁ। তাই তো দাঁড়াচ্ছে।

ললিত : তাহলে ইউনিয়ন যখন নেতৃত্ব দিয়ে ভারত মোটর ওয়ার্কস-এর মালিকের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে শ্রমিকের স্বার্থরক্ষা করছে তখন সে কি ঠিক করছে না ভুল করছে ?

অনাদি : ভুল করছে।

ললিত : কি ?

অনাদি : না, ঠিকই তো করছে। আপনি ধমকাবেন না। আমার সব গুলিয়ে যায়। আমি এ সব বুঝি না তো।

ললিত : কি ব্যাপার ? গোলমাল কিসের ?

অনাদি : চোর টোর হয় তো। কিংবা পকেটমার।

ললিত : চোর হলে তো চোর চোর বলতো। পকেটমার হলে—পকেট পকেট। এ তো ধর ধর বলছে। এ নিশ্চয়ই গোলমেলে গোলমাল।

অনাদি : গাড়ি চাপা দিয়েছে হয় তো।

ললিত : আহা তাহলে তো চাপা চাপা বলতো। নম্বর নিন নম্বর নিন বলতো। খালি ধর ধর বলছে।

অনাদি : দাঁড়ান দেখছি। [অনাদি জানলায় যায়] এ্যাই ! এ্যাই বিষ্টু ! কি হয়েছে রে ?

বিষ্টু : দেখুন না বাবু—এরা সব—

অনাদি : আয় এদিকে। শীগ্‌গির। ভেতরে আয়।

ললিত : ঐ যে বললাম। প্রতিটি আনাচে কানাচে আপনি গোপন শত্রুতার বীজ বপন করে চলেছেন।

অনাদি : গোপন শত্রুতা ? হাসালেন দেখছি। সবাই কি সর্বদা আমাকে খোঁচা দেওয়ার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে নাকি ? তাদের কাজকম্মো নেই, দায়িত্ব জ্ঞান নেই ?

ললিত : কাজকর্ম করলেই দায়িত্ব জ্ঞান আসে, তবে দায়িত্ব জ্ঞান থাকলেই এ সমাজে কাজকর্ম হয় না।

নেপথ্যে গোলমাল। বিষ্টু আসে—পিছনে মৃগাঙ্ক, অরিন্দম, বিনয় ও তন্দ্রা। তাদের হাতে পোষ্টার ও বালতিতে আঠা।

মনে রাখবেন। যাই ঘটুক না কেন, বাবা বাছা, বাবা বাছা।

অনাদি : কি রে ? কি হয়েছে ?

বিষ্টু : দেখুন না বাবু, দেওয়ালে সব কাগজ লাগাচ্ছিল এরা—তা আমি বলেছি বলে আমাকে যাচ্ছেতাই করছে। চড় মেরেছে।

বিনয় : এ্যাই। আবার মিথ্যে কথা। এবার সত্যিই এমন চড় কষাবো যে বদন বিগড়ে দেব।

অনাদি : দেখুন—ইয়ে—বাচ্চা ছেলে···ওকে ও ভাবে···

বিনয় : বাচ্চা ছেলে ? তা বাচ্চা ছেলে বাচ্চা ছেলের মতই থাকলে হয়। বুড়োদের মত কথাবার্তা বললে—

বিষ্টু : তাই বলে আপনি গায়ে হাত দেবেন ?

অরিন্দম : খুব অন্যায়। জানেন, আমাদের আঠার বালতিটা উল্টে দিচ্ছিল।

ললিত : [অনাদিকে] বাবা বাছা—বাবা বাছা।

মৃগাঙ্ক : কি ? কি বললেন ?

ললিত : আমি ? আমি এটা পড়ছিলাম।

অরিন্দম : তা যেই বালতিতে হাত দিয়েছে—

বিষ্টু : [কেঁদে] আপনি গাল দিলেন কেন ?

অনাদি : গালাগাল দেওয়াটা তোমার—আপনাদের উচিত হয়নি।

বিনয় : কি গালাগাল দিয়েছি বলুক। এ্যাই। বল্ কি বলেছি ?

অনাদি : [বিষ্টুকে] হ্যাঁ বল। কি গালাগাল দিয়েছেন উনি ? এই তো উকিলবাবু রয়েছেন। ওর সামনে বল। উনি সব মিটিয়ে দেবেন।

বিষ্টু : উনি [বিনয়কে] বলেছেন লেবড়ে দেব।

বিনয় : এ্যাই ? যাঃ !

বিষ্টু : আরও বলেছেন—খোমা উস্‌কে দেব।

অনাদি : কি দেব ?

বিষ্টু : খোমা। খোমা উস্‌কে দেব।

অনাদি : [ললিতকে] ললিতদা, এটা কি গালাগাল ?

ললিত : ১৯৭১ সালে ওটা ছিল গালাগাল এখন ওটা অভ্যর্থনা।

মৃগাঙ্ক : কি ? কি বললেন ?

ললিত : [অনাদিকে দেখিয়ে] আপনাকে নয় ওঁকে বলছিলাম।

বিনয় : আপনার ঐ ছেলেটাকে বলে দেবেন বেশি ইয়ে করলে—রাস্তায় বেরুনো বন্ধ করে দেব।

অনাদি : সে কি কথা ?

ললিত : আসলে ব্যাপারটা কি হয়েছিল ? দি ক্রুক্স অফ দি প্রবলেমটা কি ?

মৃগাঙ্ক : কথাটা ক্রুকস্ নয়—ক্রাক্স।

ললিত : যাক। যাক। সে কথা যাক। সমস্যাটা কি ?

মৃগাঙ্ক : আরে মশাই—আমরা ধর্মঘটী শ্রমিকদের জন্য পোস্টার লাগাচ্ছিলাম আপনার দেওয়ালে—

ললিত : ধর্মঘটী শ্রমিক ? কোন্ ধর্মঘট ?

বিনয় : আপনার কি এই শ্রীনাথপুরেই থাকা হয় নাকি শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে এসেছেন ?

ললিত : অধীনের মোকাম এই শ্রীনাথপুর—শ্বশুরবাড়ি অবশ্য এখানে নয়—কেন ?

মৃগাঙ্ক : গত তিন মাস এখানে ভারত মোটর ওয়ার্কস-এর ধর্মঘট নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে তোলপাড় হচ্ছে—আর আপনি আবার জিজ্ঞেস করছেন কোন্ ধর্মঘট ?

ললিত : না-না—সে জন্য নয়। আমি ঐ ভারত মোটর ওয়ার্কস-এর অনেক পেটিকেস টেস করতাম—তা ইউনিয়নের কিছু কেস হাতে নেবার পর

থেকেই মালিক কোম্পানীর ঐ সব পেটিকেস টেস দেওয়া বন্ধ করেছেন।

মৃগাঙ্ক : ও! তাই নাকি? আপনি ইউনিয়নের কেস করেন?

ললিত : হ্যাঁ। পেটি কেস। বড় বড় কেস হলে আচার্যি মশাইয়ের জন্য কাগজ-পত্তর সব গুছিয়ে দিই। অবশ্য পেটি কেস করি বলেই যে আমি পেটি লোক-তা নয়।

অরিন্দম : তা তো বটেই। পেটি লোককে ভারত মোটর-এর ইউনিয়ন আমল দেবে না। সেখানে আনুগত্যের একটা প্রশ্ন আছে।

ললিত : যাক। যাক। তা এখানে—ক্রুক্স—মানে ক্রাক্স অফ দি প্রবলেম-টা কি?

মৃগাঙ্ক : আর বলেন কেন? আমরা ধর্মঘটী শ্রমিকদের জন্যে পোস্টার লাগাচ্ছিলাম আপনার দেওয়ালে—

ললিত : আমার দেওয়াল মানে? আমার হাত, আমার চোখ বললে যেমন স্পষ্ট বোঝা যায় ব্যাপারটা—আমার দেওয়াল বললে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আমি উকিল লোক—আমার কাছে কথা বলার সময় ট্রাই টু বি এ্যাব্সোলিউট্‌লি স্পেসিফিক—নয় তো একটা শব্দ এদিক ওদিক হলে হিঁয়া কা মাটি উহা হয়ে যাবে। এক্সপার্টি ডিক্রী হয়ে যাবে—তখন বুঝবেন ঠেলা। কোনো ভাসা ভাসা আধো আধো কথা বললে পালাতে পথ পাবেন না। আমার নাম ললতে উকিল—হেঁ হেঁ বাবাঃ। কেস করি না তো করি না—করলে একেবারে সব পরশুরামের মত নিক্ষত্রিয় করে ছাড়বো।

মৃগাঙ্ক : সরি। আপনার দেওয়ালে বলতে—আমি বলতে চাইছিলাম এ বাড়ির দেওয়ালে।

ললিত : এই তো পথে আসুন। [অনাদিকে] কি? কি রকম বুঝছেন? তারপর?

মৃগাঙ্ক : দেওয়ালে পোস্টার লাগাচ্ছিলাম—তা ঐ একরত্তি ছেলে এসে বলে পোস্টার ছিঁড়ে দেব, বালতি উল্টে দেব।

ললিত : এক মিনিট। আবার আপনি ধানাই পানাই শুরু করেছেন। ঐ একরত্তি ছেলে এসে ঠিক কি কি বলেছিল? [ছেলেরা পরস্পর তাকায়] জবাব দিন। কি কি বলেছিল?

অরিন্দম : ঐ তো—ইয়ে—ঐ—

ললিত : তার মানে? একটু আগে বললেন যে বলেছে—পোস্টার ছিঁড়ে দেব। আবার এখন বলছেন·ঐ তো—ইয়ে—আপনার কথাবার্তা তো মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয় দেখছি—

অরিন্দম : আরে এ তো মহা জ্বালা হলো দেখছি—

মৃগাঙ্ক : আমি বলছি—বলেছিল দেওয়ালে পোস্টার লাগালে সব পোস্টার টান

মেরে ছিঁড়ে ফেলব।

অনাদি : অ্যাঁ? কি সর্বনাশ! এই সেদিন নতুন রং করলাম বাড়িটা। না-না। এ কি অন্যায় কথা! আমার বাড়ির দেওয়াল কি পোস্টার লাগাবার জায়গা? ও তো ঠিকই বলেছে।

বিষ্টু : বাইরে গিয়ে দেখুন না, দেওয়ালের কি অবস্থা।

অনাদি : অ্যাঁ? এ অত্যন্ত ইয়ে—অত্যন্ত ইয়ে—অত্যন্ত—

অরিন্দম : আপনি সামান্য একটা দেওয়ালের জন্যে এত হাঁউমাঁউ করছেন—আর ওদিকে ধর্মঘটী শ্রমিকের ছেলেমেয়েরা পথে দাঁড়াচ্ছে—

অনাদি : সামান্য দেওয়াল? সামান্য দেওয়াল মানে? আপনি জানেন ঐ দেওয়াল তুলতে আজকালকার বাজারে কত খরচ হয়েছে? আর শ্রমিকের ছেলেমেয়েরা রাস্তায় দাঁড়ালে আমি কি করব?

ললিত : অর্ডার। অর্ডার। সাক্ষীরা এত ভায়োলেণ্ট হয়ে উঠলে মামলা চালানো মুশকিল।

অনাদি : [চিৎকার] আপনি আমার দেওয়াল নষ্ট করবেন আর আমি দাঁত বার করে হাসবো?

ললিত : অর্ডার। অর্ডার। আপনারা নিজেদের মধ্যে কথা বলবেন না। যা বলার আদালতকে উদ্দেশ্য করে বলুন।

মৃগাঙ্ক : আহাঃ। এই সামান্য ব্যাপারে আপনি এত আপ্‌সেট হচ্ছেন কেন? ধর্মঘট মিটে গেলেই আবার ওগুলো তুলে ফেলবেন।

ললিত : আরে। এ তো দেখছি কেউ আদালতকে গেরাহ্যি করে না। আপনাদের প্রত্যেকটাকে ধরে কন্‌টেম্‌প্ট অফ কোর্ট-এর চার্জে ঝুলিয়ে দেওয়া যায় জানেন?

অরিন্দম : আঃ। আপনি থামুন তো। সেই থেকে অনবরত ডিসটার্ব করছেন।

অনাদি : ডিসটার্ব করছি মানে? আমার বাড়ির অমন সুন্দর দেওয়ালটা যে বেরঙা কদাকার হয়ে গেল, তার কি হবে?

অরিন্দম : দূর। আপনাকে ডিসটার্বের কথা কে বলেছে?

অনাদি : এই তো বললে ডিসটার্ব করছি।

ললিত : কেস তো ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠছে।

বিনয় : আপনার থুথু ফেলে ডুবে মরা উচিত।

অনাদি : ডুবে মরব কি ভেসে থাকব সেটা তোমাকে দেখতে হবে না হে ছোকরা। তুমি আমার দেওয়াল নোংরা করলে কেন? তার জবাব দাও।

মৃগাঙ্ক : আরে আপনি তো মহা ঝামেলা শুরু করলেন দেখছি। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে—

অনাদি : ঝামেলা? সামান্য ব্যাপার?

বিনয় : এটা নিয়ে এত চেঁচাচ্ছেন কেন ? জানেন শ্রমিক নেতারা আন্দোলন করছিলেন বলে ওদের মিসায় আটক করা হয়েছে। ওঁরা জেল খাটছেন—আর তাদের মুক্তির দাবিতে পোস্টার লাগানো হচ্ছে বলে আপনি চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করছেন ?

অনাদি : না ! তোমায় মাথায় তুলে নাচতে হবে। কে বলেছিল ওঁদের জেল খাটতে ? আমি বলেছিলাম ? জেলে যাওয়াতেই এই, না জানি বেরুলে কি কেলেঙ্কারী হবে।

মৃগাঙ্ক : আপনি তো মহা—ইয়ে লোক মশাই। পোস্টার কি শুধু আমরা লাগিয়েছি নাকি ? দালাল ইউনিয়নের লোকেরাও তো লাগিয়েছে। তাদের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে না ? মানুষকে জানাতে হবে না আসল ঘটনা।

অরিন্দম : আমাদের পোস্টার যদি নষ্ট হয় তাহলে কিন্তু···মনে থাকে যেন···

ললিত : অর্ডার ! অর্ডার !

অনাদি : আমি থানায় যাবো। পুলিশে ডায়েরী করবো।

বিনয় : কি ? কি করবেন ?

অনাদি : পুলিশে ডায়েরী করবো। নিরীহ, নির্দোষ গৃহস্থের ওপর এই উৎপাতের কোনো প্রতিকার হবে না ?

ললিত : কাঁদছেন কেন ?

অনাদি : এর কোনো বিচার হবে না ?

অরিন্দম : হবে। সময় এলেই হবে। ততক্ষণ ঐ পোস্টারগুলো রইল দেওয়ালে। একটু দেখাশুনো করবেন যেন কেউ হাত টাত না দেয়।

অনাদি : [ললিতকে] দেখেছেন ? দেখেছেন ? কথাবার্তার ছিরি দেখেছেন ? দেয়ালটা যে গেল সে ব্যাপারে কোনো কথা নেই উল্টে বলে কিনা ওদের পোস্টার আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

বিনয় : হবে বৈকি। দেওয়াল যদি বাঁচাতে চান তাহলে পোস্টার বাঁচান আগে। এই ? চল চল। দেরী হয়ে যাচ্ছে। অনেক পোস্টার রয়েছে। শেষ করতে হবে।

যুবকদের প্রস্থান

অনাদি : ঐ চললো বালতি হাতে আবার কার সর্বনাশ করতে।

ললিত : দেশের নাগরিক হিসেবে সম্পত্তির যে পবিত্র অধিকার আপনি অর্জন করেছেন কঠোর পরিশ্রম করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, সে অধিকারে যাতে কোনো অনধিকার হস্তক্ষেপ না হয়, সে জন্ত আমার পরামর্শ আপনার একান্ত প্রয়োজন।

অনাদি : আপনি থামুন তো দাদা। আমার বলে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল

আর আপনি অনর্গল বকে চলেছেন।

ললিত : আইন হলো এই বিপজ্জনক পৃথিবীর বুকে আপনার রক্ষাকবচ। শিবরাত্তিরের সলতে, অন্ধের যষ্ঠি, তুরুপের টেক্কা, ব্যারিকেড, —

অনাদি : বেশ তো বুঝলাম সব। কিন্তু অতঃ কিম্ ?

ললিত : সিচুয়েশন ভেরী গ্রিম্। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। আপনার এই এক চিলতে সম্পত্তি আপনাকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। আপনার চারদিকে গড়ে উঠেছে অসংখ্য দেওয়াল। দেওয়ালের পর দেওয়াল। তারপর দেওয়াল। আর সর্বত্র লেখা রয়েছে — অনাদি সরখেল নিপাত যাক। অনাদি সরখেল মুর্দাবাদ। কথাটা হাস্যকর মনে হলেও ব্যাপারটা কতকটা তাই। আর ব্যাপারটা কতকটা তাই বলেই কথাটা হাস্যকর নয়।

অনাদি : কিন্তু এ তো মহা মুস্কিলে পড়া গেল। এ ভাবে বাস করবো কি করে ? আজ দেয়াল ধরে টানছে — কাল হয় তো গোটা বাড়িটাই উপড়ে নিয়ে যাবে।

ললিত। যাক না। তাহলে তো ভালোই হয়। ওদের বিরুদ্ধে বাড়ি থেকে উচ্ছেদের মামলা, মানহানির মামলা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্তের মামলা··· ইত্যাদি সাত সাতটা মামলা ঠুকে দেব — দেখি কোথায় যায়। একটা জট ছাড়াতে না ছাড়াতে আরেকটা জট — একেবারে মাকড়শার জালের মত। উঃ কি আইডিয়া !

অনাদি : তাহলে এক কাজ করুন প্রাইভেট প্রোপার্টি ক্ষতিগ্রস্তের মামলাটাই আগে ঠুকে দিন।

ললিত : বেশ। ঠুকে দিচ্ছি। তার আগে ঠোকার খরচ কত লাগবে — সেটা একটু হিসেব করে নিই এক মিনিট।

অনাদি : ঠোকার খরচ মানে ?

ললিত : ঠোকা দিলেই তো ঠোকাঠুকি চলবে। বেশ কিছুদিন চলবে। অতএব কিছু খরচ হবে।

অনাদি : একটা মোটামুটি আইডিয়া দিন তো। কত আন্দাজ পড়বে ?

ললিত : তা লাখ দুয়েকের মতন।

অনাদি : লাখ দুয়েক ? ঠাট্টা হচ্ছে ?

ললিত : ঠাট্টা কেন ? কোর্ট ফি, স্ট্যাম্প ডিউটি, আমার ফি, আমার অ্যাসিস্‌টেন্টের ফি, আমার গাড়ি ভাড়া, আমার অ্যাসিস্‌টেন্টের গাড়ি ভাড়া, আমার টিফিন, আমার অ্যাসিস্‌টেন্টের টিফিন, আমার বাছাই সাক্ষীদের ফি, আমার ঘুষ, আমার অ্যাসিস্‌টেন্টের ঘুষ, আমার টিফিন, আমার ম্যাজিস্ট্রেটের টিফিন — ও না — আমার টিফিন তো ধরা হয়ে গেছে —

অনাদি। লাখ দুয়েকের অর্ধেক তো দেখছি আপনার আর আপনার অ্যাসিস্‌টেন্টের পেটেই যাবে। থাক ঠুকে দরকার নেই।

ললিত : বেশ। আপনাকে না হয় হাজার খানেক টাকা কনসেশন্ দেব'খন।

অনাদি : না কনসেশনে ঠোকার দরকার নেই।

ললিত। ঢুকে দিলে ভাল হতো—দরকার হলে আপনার বাড়ির সামনে মিলিটারি পোস্টিং করিয়ে দিতাম। কেউ আপনার বাড়ির ত্রিসীমানায় আসতে পথ পেত না।

অনাদি : নাঃ। আমি বাড়ি বেচে দিয়ে দেশত্যাগী হবো।

ললিত : সে ব্যাপারেও আমি হেল্প করতে পারি। তবে তাতে খরচ কম পড়বে—এই লাখ খানেক।

অনাদি : এঁঃ! আপনি পেয়েছেন কি? আমার টাকা কি উড়ো খৈ? লাখ ছাড়া মুখে কথা নেই যে—

ললি লাখ কথার এক কথা বলে দিয়েছি।

অনাদি : না। দরকার নেই। আমি কোর্টে গিয়ে বটতলার উকিলকে দিয়ে করাব পাচ টাকায় হবে যাবে

ললিত : ঠিক আছে। ঠিক আছে। আরো কিছু কনসেশন না হয়।

অনাদি : না। কনসেশন দরকার নেই। আমি মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করবো। একটু বাদেই ওঁর আসার কথা আছে। বাড়ি কিনলাম ২০ হাজারে—বাড়ি বিক্রী করতে কোর্ট খরচা হবে লাখখানেক। এমন উটকো কথা কেউ জীবনে শুনেছে কোনদিন?

ললিত : কংগ্রেসী সুশাসনে মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে আপনার। মামলা মোকদ্দমার ব্যাপারে কেউ কলেজের প্রোফেসরের সঙ্গে পরামর্শ করে—এমন উটকো কথাও কেউ শুনেছে কখনও? এ যেন মহাত্মা গান্ধীর ২৪ ঘণ্টা অবিরাম সাঁতার বা রবীন্দ্রনাথের সাইকেলে বিশ্বভ্রমণ। হাসি পায় বালকের—মানে আপনার চপলতা দেখে।

অনাদি : আপনার অতিরিক্ত চাপল্যও বয়সের ধর্ম নয়—আপনি দাদা—একটু ইয়ে হোন তো

মাস্টার মশাই ও চঞ্চলের প্রবেশ।

মাস্টার : সেকি? সকালবেলা কাকে ধমকাচ্ছেন—

ললিত : আর কাকে? ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো তো আছি একমাত্র আমি।

মাস্টার : আরে ললিতবাবু যে—ভালো তো?

ললিত : ভালো মানে?

মাস্টার : মানে···শরীরগতিক...মন···মেজাজ···পেট···

ললিত : তা পেট মানে কি শরীর নয়—নাকি শরীরে পেট নেই?

মাস্টার : তা বটে। ও, আলাপ করিয়ে দিই—আমার বিশেষ বন্ধু—বিশিষ্ট সাংবাদিক চঞ্চল চৌধুরী দৈনিক সন্দেশ

ললিত : [চমকে] দৈনিক সন্দেশ ! এ্যাই মশাই—আপনারা যে এইসব গাদা গাদা মিথ্যে ছাপেন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত—আপনার কি ধারণা লোকে সেগুলো বিশ্বাস করে ? আর লোকে যখন সেগুলো বিশ্বাস করে না—তখন সেগুলো ছাপেন কেন ?

চঞ্চল : [হেসে] মিথ্যে ? মিথ্যে মানে ?

ললিত : মিথ্যে মানে সত্যি নয়।

চঞ্চল : না-না—সে কথা বলছি না—আমি বলছি—কোন্‌গুলো মিথ্যে ?

ললিত : কাগজের ওপরে 'দৈনিক সন্দেশ' নাম আর তারিখটা ছাড়া সবই তো মিথ্যে।

চঞ্চল : আপনি তো বেশ ইন্টারেস্টিং লোক।

ললিত : ওটা তো আমার প্রশ্ন ছিল না। কীপ্ টু দি পয়েন্ট।

অনাদি : এ্যাই ! আর রক্ষে নেই আপনার। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা।

ললিত : ওটাও আমার প্রশ্ন ছিল না।

মাস্টার : ওটা উনি বলেন নি।

ললিত : প্রশ্নটা ওঁকেই করা হয়েছিল।

চঞ্চল : দেখুন আপনার প্রশ্নটা খুব জেনারেল, একটু স্পেসিফিক্ নাহলে মানে কি বলছি বুঝেতো পারছেন ?

ললিত : বিলক্ষণ। তাহলে ধরুন গত ৪ঠা জুলাই আপনাদের কাগজে লেখা হলো বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের ফলে সন্ধ্যায় প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হবে। দেখা গেল ৪ঠা জুলাই থেকে ১৪ই জুলাইয়ের মধ্যে বৃষ্টির নাম গন্ধ নেই—এবং পুনরায় ১৮ই জুলাই আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হলো—আকাশ পরিষ্কার থাকবে। সেদিন সন্ধ্যায় এমন প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হলো যে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে গেল আগামী ছ দিন। তাহলে দেখুন লোকে পয়সা খরচ করে মিথ্যে গলাধঃকরণ তো করলই উপরন্তু—ঐ মিথ্যের ফলে অপ্রস্তুত থাকার জন্য জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হলো।

চঞ্চল : দেখুন আবহাওয়া সম্বন্ধে আভাস দেওয়া যায়—কিন্তু হুবহু মিলবে এমন বলা কি সম্ভব ?

ললিত : ও। তাহলে গত ৩০শে জুন আপনাদের কাগজে লেখা হলো—'ভারত মোটর ওয়ার্কস কারখানার শ্রমিকরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্বার্থান্বেষী প্রচেষ্টার শিকার হয়েছেন। তাদের দাবি দাওয়ার নিষ্পত্তি হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। আন্দোলন বিপর্যস্ত। দলে দলে সবাই কাজে যোগ দিচ্ছেন। উক্ত কারখানায় ব্যাপক শ্রমিক ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা'—এটা বলা হয়েছে ৩০শে জুন। আর আজ ৪ঠা সেপ্টেম্বর। এখনও সেখানে ধর্মঘট অব্যাহত। মালিক এখনও একজনও শ্রমিককে ছাঁটাই করার সাহস পায়নি। বিভিন্ন বামপন্থী

রাজনৈতিক দল ঐ ধর্মঘটে থাকা সত্ত্বেও তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই ধর্মঘট পরিচালনা করায় মালিকের নাভিশ্বাস উঠেছে। বলুন এই মিথ্যা প্রচারগুলো বিক্রী করে কার আশীর্বাদ কুড়োচ্ছেন? বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি শ্রমিকদের বিভ্রান্ত করছে, না আপনাদের মিথ্যাপ্রচার? বলুন।

মাস্টার: আসলে পেট···বুঝলেন না? পেটের জন্যই তো সব। তাই তো বলছিলাম পেট একটা আলাদা সাবজেক্ট!

ললিত: আলাদা মানে?

মাস্টার: পেটের যাবতীয় সমস্যা যে সমাধান করতে পেরেছে সে তো মহা পুরুষ। কারণ জীবনযন্ত্রণা মানেই পেটের যন্ত্রণা, বেঁচে থাকার তাগিদ মানেই পেটের তাগিদ। বেকারী মানেই পেট, দারিদ্র্য মানেই পেট, শোষণ মানেই পেট, শাসন মানেই পেট, অশিক্ষা, কুসংস্কার, কালোবাজারী, চোরাকারবার, স্মাগলিং—সবই পেটের তাগিদে, পেটের যন্ত্রণায় এবং পেটের ধান্ধায়। নির্বাচন, জালভোট, রিগিং, বামপন্থী ফ্রন্ট, দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি—সবই কি পৈটিক নয়?

ললিত: [চঞ্চলকে] এটা বাঁচবে তো?

মাস্টার: দাদা, পেটে খেলে পিঠে সয়।

ললিত: যাক—কেন হঠাৎ আপনার এই আবির্ভাব? আর যখন হয়েছে তখন কেন একটা নিশ্চয়ই আছে?

মাস্টার: সময়াভাব। শুধু ছাত্তর ঠেঙিয়ে তো পেট চলে না দাদা—তাই সঙ্গে হোমিওপ্যাথির বাক্সটাও বয়ে বেড়াই।

ললিত: দেখেছেন? এই তো অবস্থা—শিক্ষক 'ছাত্র পড়িয়ে' না বলে বলছে—'ছাত্র ঠেঙিয়ে'। শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রের সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে—ঠ্যাঙানির। বুঝুন আমরা কোথায় নেমেছি?

মাস্টার: না-না। সে ঠ্যাঙানি নয়। আমি মানে—

ললিত: এরা নাকি মানুষ গড়ার কারিগর। আর কারিগর যখন, তখন মানুষ বা বাঁদর একটা কিছু তো গড়বেন।

চঞ্চল: আমায় বলছেন?

ললিত: হ্যাঁ। বলতে হলে আপনাকেই বলা উচিত। আর বলা যখন উচিত তখন আপনাকেই তো বলতে হবে—কারণ আপনি তো সন্দেশ।

মাস্টার: হঠাৎ কেন আপনার ধারণা হলো যে ওঁকে বললে কাজ হবে।

ললিত: উনি সন্দেশ বলে। [চঞ্চল হাসে] সন্দেশ মানেই পেট—কারণ পেট না থাকলে সন্দেশের কোনো মানে হয় না···কিংবা বলা যায়, সন্দেশের উৎপত্তিই পেট থেকে।

চঞ্চল: বাঃ!

ললিত : বাঃ কেন ? এবং ওঃ নয় কেন ?
মাস্টার : আপনি তো তখন থেকে সবাইকে জেরা করছেন—এবার আমি আপনাকে প্রশ্ন করব ?
ললিত : করুন। না করে যখন ছাড়বেন না তখন করুন।
মাস্টার : আপনি ওকালতি পড়েছিলেন কেন ?
ললিত : পেট চালাবার জন্যে—নাঃ কি যেন ভুল হচ্ছে। [চঞ্চল হাসে] হাসছেন কেন ?
মাস্টার : না-না ঠিকই হচ্ছে। ভুল হবে কেন ? বেঁচে থাকতে গেলে আগে পেট তারপর আসবে অন্য সব কথা। অন্নচিন্তা চমৎকারা। তারপর ?
ললিত : তারপর কি ? তারপর আপনি বলুন।
মাস্টার : আমিও তো তাই। ইংরেজ আমলে সাহেবরা আমাদের লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন কি মানুষ গড়তে ?
অনাদি : কি ললিতদা কিছু বলুন ?
ললিত : আপনি বলুন না। সব আমাকে বলতে হবে এমন কোনো কথা দিয়েছি ?
মাস্টার : বলুন।
ললিত : কি যেন কথা হচ্ছিল ?
মাস্টার : ইংরেজরা কি আমাদের লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন মানুষ গড়তে ? দেশ গড়তে ?
ললিত : আপনার কি মনে হয় ?
মাস্টার : আমার কি মনে হয় সেটা তো কথা নয়—ঘটনাটা কি ?
ললিত : ঘটনাটা হলো—ইংরেজরা এ দেশে এল। এল তো ? তো ?
অনাদি : ইংরেজ এল কি গেল সেটা তো উনি জিজ্ঞেস করেন নি ললিতদা।
ললিত : আঃ। গুলিয়ে দেবেন না—এল তো বটেই নইলে গেল কি করে ? আর গেল যখন তখন এসেছিল নিশ্চয়ই—কারণ না এলে তো যাওয়া যায় না।
মাস্টার : বেশ। ইংরেজরা এল। তারপর ?
ললিত : তারপর এল যখন তখন নিশ্চয়ই একটা কিছু উদ্দেশ্য ছিল।
অনাদি : তা তো বটেই।
ললিত : বটেই তো। এ তো আর বন্ধুর বাড়িতে আসা নয় যে এলাম, খেলাম, গল্পগুজব করে চলে গেলাম।
মাস্টার : বেশ তো। ধান ভানতে শিবের গীত না করে আসল কথায় আসুন।
ললিত : হ্যাঁ—হ্যাঁ ঐ এল একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। আর বিশেষ উদ্দেশ্য যখন ছিল তখন এল মানে একেবারে বাপের বেটার মত এল।
মাস্টার : [অন্যদিকে] আরে এটা বলে কি বলুন তো ?

ললিত : দেখুন! আপনি আমাকে ধমকাবেন না তো। আমি আপনার ছাত্র নই। [মাস্টারকে] আচ্ছা আপনার কি মনে হয় — ইংরেজদের পেট আছে? মানে…যখন এসেছিল তখন কি পেট ছিল?

মাস্টার : এটা উকিল না কোকিল?

ললিল : না-না — উকিল কোকিল হতে পারে — কিন্তু কোকিল কখনও উকিল হয় না — কোকিলকণ্ঠ উকিল অবশ্য মাঝে মাঝে দেখা যায়।

অনাদি : উঃ! দু মিনিট আপনার সঙ্গে কথা বললে মনে হয় বাপের নাম ভুলে গেছি।

মাস্টার : যাঃ বলেছেন। এই মুহূর্তে যা বলে পরমুহূর্তে ঠিক উল্টোটি বলে।

ললিত : আবার? ইংরেজ কেন এসেছিল? জবাব দিন।

মাস্টার : ঐ দেখেছেন?

ললিত : কথা হচ্ছে আমার আপনার মধ্যে উনি কি দেখবেন? উনি কি ইংরেজকে ডেকে এনেছিলেন যে উনি জানবেন ইংরেজ কি উদ্দেশ্যে এসেছিল?

মাস্টার : উঃ! তা বেশ তো আপনিই বলুন না কি উদ্দেশ্যে এসেছেন? আমরা শুনি।

ললিত : একটু নাক্স ভোমিকা দিন তো — ২০০ এক ডোজ।

মাস্টার : [অনাদিকে] ঐ দেখেছেন তো? আমি চলি —

ললিত : না-না। বলছি। বলছি। ওরা এসেছিল বাণিজ্য করতে। তারপর কবির ভাষায় — বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে।

মাস্টার : বেশ। তাহলে সেই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য তারা কি করল?

ললিত : তারা রেললাইন তৈরী করল দেশ জুড়ে, বাজার বন্দর তৈরী করল, স্কুল কলেজ করল — এখানকার লোককে ঢেলে সাজাতে —

মাস্টার : না — স্কুল-কলেজ তৈরী করল তাদের শাসন চালাবার পদ্ধতি পাকা করতে, মানুষ গড়তে নয়।

ললিত : উঃ। ভীষণ খিদে পেয়েছে দেখছি। সেই কখন খেয়েছি। তখন থেকে বকে বকে —

মাস্টার : কীপ টু দি পয়েন্ট।

ললিত : [অনাদিকে] কীপ টু দি পয়েন্ট।

অনাদি : আমি একটি কথাও বলিনি।

মাস্টার : আবার!

ললিত : [অনাদিকে] কথাবার্তা কানে যাচ্ছে না। কীপ টু দি পয়েন্ট।

অনাদি : কি যে সব হচ্ছে।

মাস্টার : তাহলে সেই যে শিক্ষা — ইংরেজ চালু করেছিল তা থেকে ইংরেজ

চেয়েছিল কিছু বশংবদ ভৃত্য সৃষ্টি করতে যারা ইংরেজের শাসনব্যবস্থাকে টিঁকিয়ে রাখতে সাহায্য করবে—অর্থাৎ আই. সি. এস, বি. সি. এস.। আমলা—আমলা—

ললিত : শামলা পরা আমলা। খায় গামলা গামলা। এ বেলা ও বেলা।

মাস্টার : তাহলে সেই যে শিক্ষা আমরা পেয়েছি—

ললিত : আপনি এখনও দেখছি সেই ব্রিটিশ আমলেই পড়ে রয়েছেন। স্বাধীন ভারতে ঢুকতে তো দেখছি আপনি রাত কাবার করে দেবেন মশাই।

অনাদি : আঃ থামুন তো দাদা। ব্যাপারটা আমার বেশ ইন্টারেস্টিং-ই তো লাগছে।

মাস্টার : সেই শিক্ষা আমাদের শিখিয়েছে শিক্ষার মূল কথা শিক্ষা নয় চাকরী। তাই আমাদের কাজ হলো শিক্ষা নয়—চাকরী জুটিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ বছর বছর কিছু গ্র্যাজুয়েট ম্যানুফ্যাকচার করা। অতএব হোমিওপ্যাথিক বাক্সটাও সঙ্গে রাখতে হয়। তবে শিক্ষক হিসাবে আমার মনে হয় ঐ স্কুল কলেজগুলো মূলশুদ্ধ উপড়ে না ফেললে—শিক্ষার কোন সুযোগ নেই। আর মূলশুদ্ধ উপড়ে ফেলতে হলে—

অনাদি : ইদানীং ছাত্ররা তো তাই করছে।

মাস্টার : বেশ করছে। ওরা যত তাড়াতাড়ি বোঝে যে শিক্ষাপ্রদানের নামে ওদের আপাদমস্তক ঠকানো হচ্ছে ততই মঙ্গল।

ললিত : আচ্ছা—বালতি হাতে যে সব ছেলেরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরছে ওরা আপনার ছেলে?

মাস্টার : আমার ছেলে মানে? আমার ছেলেরা বালতি হাতে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরবে কেন?

অনাদি : না—না—উনি—সে কথা—

মাস্টার : আমার ছেলেরা কি গোয়ালা? না মেথর?

ললিত : না—না—আমি বলছিলাম—বালতি হাতে যারা ঘুরছে—তারা কি আপনার ছাত্র?

মাস্টার : কি সব কথাবার্তা? আমার ছাত্ররা বালতি হাতে ঘুরবে কেন?

ললিত : আমারও তাই প্রশ্ন। ছাত্ররা বইখাতা নিয়ে ঘুরতে পারে, বড় জোর ঝাণ্ডা হাতে ঘুরতে পারে, বড় জোর মেয়েদের হাতে হাত দিয়ে ঘোরাঘুরি করতে পারে—তাই বলে বালতি—

অনাদি : তবে যাই বলুন ললিতদা—ইতিহাসের চাকা ঘুরবে কিন্তু ওদের হাতেই। সেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেও দেখেছি, লবণ আন্দোলনেও দেখেছি—আগস্ট বিপ্লবেও দেখেছি—

ললিত : ইতিহাসের চাকা আপনাকে ঘোরাতে হবে না। বলুন তো

[মাস্টারমশাইকে]-খুব তো মাস্টারী করছেন—ইতিহাসের মূল নিয়ম ক'টি ?

মাস্টার : ইতিহাসের নিয়ম মানে ?

ললিত : মানে ইতিহাসের নিয়ম।

মাস্টার : জানি না। আপনার কোনো কথা কি সোজাসুজি বলতে পারেন না ?

ললিত : তিনটি। তিনটি নিয়ম। প্রথম—ইতিহাসের কোনো নিয়ম নেই। লিখে নিন।

মাস্টার : তাহলে প্রথম নিয়ম অনুযায়ী বাকি নিয়মগুলো বাতিল হয়ে যাচ্ছে—তাই না ?

ললিত : কি ? ওঃ বাবাঃ। আপনি তো দেখছি মাস্টারী ছেড়ে একেবারে বিত্তেদিগ্‌গজ দার্শনিক হয়ে উঠেছেন। ইতিহাসের যদি কোনো নিয়ম না থাকে তাহলে প্রথম নিয়মটি ভ্রান্ত। এর ফলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় নিয়মটি কার্যকরী করা যাচ্ছে। দ্বিতীয় নিয়ম লিখে নিন পরিবর্তনের পরই আসে স্থিতাবস্থা—যার পুনরাবৃত্তি ঘটে স্থিতাবস্থায়—

মাস্টার : পরিবর্তনে হবে।

ললিত : জানি, জানি। স্থিতাবস্থা হলো সেই অবস্থা যেখানে সমাজে সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রাধান্য লাভ করে। অন্যপক্ষে, পরিবর্তন হলো সেই অবস্থা যখন সমাজের নিপীড়িত ও শোষিত অংশ তাদের অবশ্যম্ভাবী দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসে—হাততালি।

মাস্টার : মাঝে মাঝে আপনি দারুণ দারুণ কথা বলেন—আবার মাঝে মাঝে এমন সব ফিচ্‌লেমি করেন না মাইরী।

ললিত : ঐ তো। মাঝে মাঝে আসে আমার পরিবর্তন—তারপরেই আসে আমার স্থিতাবস্থা।

চঞ্চল : আচ্ছা দাদা—রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে আপনি কি বলেন—মানে ওখানকার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার ভাল জানা নেই তো।

ললিত : তাহলে লিখে নিন—রুশ বিপ্লব হলো রুশ জনগণের আদর্শ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

চঞ্চল : আর চীনের বিপ্লব ?

ললিত : ঐ তো। চীনা জনগণের আদর্শ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ—

মাস্টার : ধ্যাৎ। এ সব কি আবোল তাবোল হচ্ছে।

চঞ্চল : আঃ। একটু থামুন না। [ললিতকে] আচ্ছা কাগজে পত্তরে ইদানীং নানারকম পড়ছি তো—ভারতীয় বিপ্লব কি হবে ?

ললিত : হলে তখন দেখা যাবে'খন।

চঞ্চল : আচ্ছা, ভারতের বুকে আগামী দিনে যুদ্ধ কি অবশ্যম্ভাবী ?

ললিত : যুদ্ধ জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যার সমাধান করে—শিল্প বাণিজ্য প্রসারলাভ

করে এবং মহান শিল্পসংস্কৃতির অনুপ্রেরণা যোগায়—লিখে নিন।

মাস্টার : এই আবার ফক্কুড়ি করছে।

ললিত : যাঃ শালা। উকিল থেকে ক্রমশঃ দেখছি শিক্ষকে বৈপ্লবিক রূপান্তর হচ্ছে।

অনাদি : কিন্তু দাদা নিউক্লিয়ার ওয়ার-এর পর তো কোনও সমাধান উৎকর্ষ বা প্রেরণার সুযোগ থাকবে না।

ললিত : ইতিহাসের বিচার তো রাশিফল বিচার নয়।

মাস্টার : ও। তা অতীত কোথায় শেষ হয়েছে এবং বর্তমান কোথায় শুরু ?

ললিত : ১৯১৪ সালে। ইজ ছাট্ ক্লিয়ার ?

মাস্টার : আপনার কথা শুনে অসুস্থ বোধ করছি।

ললিত : দুটো অ্যাসপিরিন খেয়ে শুয়ে পড়ুন।

মাস্টার : আপনার ইতিহাস ব্যাখ্যা শুনে আমার মরতে ইচ্ছা করছে।

ললিত : তাহলে এক বোতল অ্যাসপিরিন। ওতে মৃত্যু সুনিশ্চিত ও বেদনাহীন হবে।

দ্বিতীয় ঘটনা

প্রিন্সিপ্যাল চেয়ারে আসীন। অরিন্দম, মৃগাঙ্ক, বিনয় প্রবেশ করে।

প্রিন্সিপ্যাল : তোমরা লেট্।

অরিন্দম : হ্যাঁ স্যার। দশ মিনিট। সরকারী পরিবহন ব্যবস্থার অচল অবস্থাই এর জন্য দায়ী। আমরা সময় মতই বেরিয়েছিলাম।

মৃগাঙ্ক সিগারেট ধরায়।

প্রিন্সিপ্যাল : একি ? তুমি আমার সামনে সিগারেট খাচ্ছ ? বিনা পারমিশনে ?

অরিন্দম : আপনিও তো আমাদের সামনে নস্যি নেন—বিনা পারমিশনে।

প্রিন্সিপ্যাল : আমার কথা আলাদা। আমি তোমাদের শিক্ষক। বয়োজ্যেষ্ঠ। ও দুটো কি এক ?

অরিন্দম : কেন ? আলাদা কেন ? বয়োজ্যেষ্ঠর নস্যি নেবার প্রয়োজন হতে পারে, আর বয়ঃকনিষ্ঠদের সিগারেট খাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে না ?

বিনয় : হ্যাঁ। আপনি আপনার বাবার সামনে চা খান নি কোনদিন ? আপনার বাবার সামনে আপনার চা খাওয়াটা যদি অপরাধ না হয়ে থাকে, আপনার সামনে আমাদের সিগারেট খাওয়াটা অপরাধ কেন হবে ?

প্রিন্সিপ্যাল : তবু—ইয়ে—একটা—ইয়ে—বয়সের—ইয়ে—

মৃগাঙ্ক : আঃ। এ সব কি আলোচনা হচ্ছে ? কাজের কথায় আসা যাক।

প্রিন্সিপ্যাল : কাজের কথা মানে ? আমি যেটা বললাম সেটা কি বাজে কথা ?

অরিন্দম : আপনার কথায় যুক্তি কোথায় ?

প্রিন্সিপ্যাল : সব জিনিষ তর্ক করে প্রমাণ করা যায় না। জীবনটা অঙ্ক নয়। [ছেলেরা হাসে] যাক, পুলিশ এই কলেজের ছাত্র হিসাবে তোমাদের নামে আমার কাছে এক অভিযোগ করেছে। এর আগেও, যদ্দুর আমার মনে পড়ে তোমরা এই সব ঝামেলায় জড়িয়েছিলে।

বিনয় : ঝামেলা ? ঝামেলা মানে ?

প্রিন্সিপ্যাল : গত মঙ্গলবার ভারত মোটর ওয়ার্কসের গেটের সামনে তোমরা বে-আইনী সমাবেশ ও বিক্ষোভের অপরাধে গ্রেপ্তার হয়েছিলে। জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকায় শ্রমিকদের ঐ সমাবেশ পুলিশ থেকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছিল। তাছাড়া আমিও তোমাদের এ সব বে-আইনী সমাবেশে যোগদান নিষিদ্ধ করেছিলাম নিশ্চয়ই মনে আছে।

মৃগাঙ্ক : স্যার, গত বুধবার রাত্রে রাত ছুটো থেকে তিনটের মধ্যে আমি আপনার অনুমতি ছাড়াই বিছানায় তিনবার এ-পাশ ও-পাশ করেছিলাম। আমার আবেদন এই অপরাধটিও বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হোক।

প্রিন্সিপ্যাল : মৃগাঙ্ক! তুমি এই কলেজের একজন কৃতী ছাত্র। তোমার কাছে আমি বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে আরো শ্রদ্ধা ও সম্মান আশা করেছিলাম। বিক্ষোভ ও সমাবেশের বিরুদ্ধে আমার কোনো বক্তব্য নেই—যদি অবশ্য সে-সব বিক্ষোভ ও সমাবেশ বে-আইনী না হয়। এ ব্যাপারে আমরা সব আবেদন সহানুভূতি সহকারে বিবেচনা করে থাকি।

বিনয় : আবেদন ?

অরিন্দম : সহানুভূতি ?

প্রিন্সিপ্যাল। হ্যাঁ। ছাত্ররা যখন পুলিশের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, আমরা কলেজের কর্তৃপক্ষরা ছাত্রদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই। এ সুযোগ ও নিরাপত্তা সর্বস্তরের মানুষের নেই। কিন্তু সুযোগ ও সুবিধার পাশাপাশি কিছু কর্তব্য ও দায়িত্বও থাকে।

মৃগাঙ্ক : ভারত মোটর ওয়ার্কসের শ্রমিকদের ওপর জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়ে মালিক ও সরকার একজোট হয়ে নানারকম তাণ্ডব চালাচ্ছেন—

সমাবেশের সেটাই ছিল উদ্দেশ্য।

অরিন্দম : আপনাদের সরকার।

প্রিন্সিপ্যাল : আমাদের সরকার মানে ?

বিনয় : মানে যে সরকারের আমলা আপনি — সেই কংগ্রেসী সরকার। শামলা পরা আমলা — খায় গামলা গামলা এবেলা ও-বেলা।

প্রিন্সিপ্যালের মাথা হেঁট।

মৃগাঙ্ক : তা আপনাদের বিরুদ্ধে লড়ব আপনাদের পারমিশন নিয়ে তা কি করে হয় ?

প্রিন্সিপ্যাল : তা সারা দেশে শ্রমিকরা ধর্মঘট করছে — তার জন্য আমি দায়ী ? পুলিশ যদি তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, বে-আইনী কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্যে তার দায়িত্ব কি আমার ? তাছাড়া তোমাদের সঙ্গে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আলোচনার জন্য তোমাদের এখানে ডাকি নি। আইন আইনই। সেগুলি মেনে চলতে হবে। তাছাড়া শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কি ? রাজনীতি না শিক্ষা ? তোমার নিজের ভাষায় বল।

মৃগাঙ্ক : আমার কথা আমার নিজের ভাষায় বলব না তো কি আপনার ভাষায় বলব ?

প্রিন্সিপ্যাল : তা বটে।

মৃগাঙ্ক : তা আপনি কি জানতে চান বলুন ? বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষার উদ্দেশ্য, নাকি আদর্শগতভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য ?

প্রিন্সিপ্যাল : আমি মনে করি এ কলেজের তুমি একজন চৌকোস ছাত্র এবং ভবিষ্যৎ জীবনে তোমার সম্ভাবনা প্রচুর। এখন পড়াশুনো উচ্ছন্নে দিয়ে নানান বিচিত্র সব সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছ। এর মধ্যে কয়েকটি হিংসাত্মক রাজনীতি প্রচার করে, কয়েকটি জনকল্যাণমূলক কি সব কাজকর্ম করে বলে শোনা যায় — এবং সব ক'টিরই পিছনে অযথা সময়ের অপব্যয় করছ।

মৃগাঙ্ক : জীবনটা তো ব্যয় করবার জন্যই স্যার।

প্রিন্সিপ্যাল : হুঁ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং জীবন এক জিনিষ নয়। এখানে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীদের তত্ত্বাবধানে যে শিক্ষার সুযোগ তুমি পাচ্ছ, সে সুযোগ বহু ছেলেমেয়ের আকাঙ্ক্ষার বস্তু, সেটা জান ?

অরিন্দম : সেটা জেনে আমার কি জ্ঞানবৃদ্ধি হলো ?

প্রিন্সিপ্যাল : তা এইসব জনকল্যাণমূলক কাজ পরীক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখা যেত না ?

মৃগাঙ্ক : যেত। কিন্তু যখন দেখি শতকরা ৯০ ভাগ ছেলেমেয়েরা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত তখন এ শিক্ষার অন্তঃসারশূন্যতা আরো বেশি করে বুঝতে

পারি। যখন দেখি এই পশ্চিমবঙ্গেই ৪০ লক্ষ রেজিস্টার্ড বেকার ফ্যা ফ্যা করে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে—তখন মনে হয় এ শিক্ষার বিলাসিতা আমার জন্য নয়। যখন দেখি কলকাতার পথে ঘাটে সর্বত্র শয়ে শয়ে মানুষ শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা মাথায় করে রাস্তায় পশুর মত জীবন কাটাচ্ছে আর চারপাশে গড়ে উঠছে অসংখ্য স্কাইস্ক্র্যাপার আর নিওন বাতির ঠাঁট তখন মনে হয় এ শিক্ষা অর্থহীন। যখন দেখি এক অশীতিপর বৃদ্ধা এক শীর্ণকায় অন্ধ বৃদ্ধের হাত ধরে খাবারের দোকানের সামনে নর্দমার ধারে বসে ফেলে দেওয়া শাল-পাতা চাটছে তখন মনে হয় ধ্বংস হয়ে যাক এ ভণ্ডামি। এ ভণ্ডামির বোঝা বয়ে বেড়িয়ে কি লাভ?

প্রিন্সিপ্যাল : তা হতে পারে। কিন্তু তোমাকে তো কেউ জোর করে গলায় গামছা দিয়ে কলেজে ঢোকায় নি। কিংবা পায়ে দড়ি বেঁধে কেউ আটকেও রাখে নি।

মৃগাঙ্ক : আমরা যেতে পারি স্যার?

প্রিন্সিপ্যাল : এস। [ছাত্রেরা প্রস্থানোদ্যত] ও হ্যাঁ—আর একটা কথা।

মৃগাঙ্ক : বলুন।

প্রিন্সিপ্যাল : ধর্মীয় ছুটিছাটা কিংবা ভ্যাকেশন, ব্যাংক হলিডে বা মহামারী ছাড়া—ছাত্রদের পনেরো দিনে হস্টেলের ২৮টি মিল-এর মধ্যে অন্ততঃ ২০টি খেতেই হবে। অবশ্য ব্রেকফাস্ট, সে ইচ্ছে করলে নাও খেতে পারে—কিন্তু তার উপস্থিত থাকা আবশ্যিক; কারণ তাতে বোঝা যাবে সে রাত্তিরে হস্টেলেই ছিল। ঠিক বলেছি?

মৃগাঙ্ক : আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রিন্সিপ্যাল : কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি তুমি গত পনেরো দিনে পাচদিন দুপুরের এবং দু দিন রাত্তিরের মিল খাও নি।

অরিন্দম : স্যার হস্টেলের খাবার মুখে তোলা যায় না।

বিনয় : এবং স্যার বলতে বাধ্য হচ্ছি এ আইনগুলো অতি বাজে। অখাদ্য।

প্রিন্সিপ্যাল : হ্যাঁ। এ্যাঁ—কোনটা অখাদ্য?—আইন না খাবার? কি বলতে চাও তুমি?

বিনয় : খাবার।

প্রিন্সিপ্যাল : হস্টেলে আমাদের কমপ্লেইন্ট বই রয়েছে। তাতে তোমাদের অভিযোগ লিখতে পার।

মৃগাঙ্ক : লিখে দেখেছি স্যার। ও গুলো সব কোন্ কমিটির কাছে যেন যায়—তারা আবার সেগুলো কোন্ হাইপাওয়ার কমিটির কাছে পাঠান—তারা আবার সেগুলো এডুকেশন মিনিস্ট্রিকে পাঠান। এইভাবে বছর ঘুরতে থাকে—পুরনো কমপ্লেইন্ট বইয়ের জায়গায় নতুন বই আসে—কিন্তু হস্টেলের খাবার

ভদ্রলোকের এক কথার মত যা ছিল তাই থাকে।

প্রিন্সিপ্যাল : হস্টেলে রান্না ও অন্যান্য কাজের লোকের সমস্যা। বাজেটে ঐ কাজের জন্য যা মাইনে বরাদ্দ তাতে ভাল রাঁধুনি পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু উপায় কি ?

অরিন্দম : স্যার ক্যাফেটেরিয়া সিস্টেম চালু করলে সবচেয়ে ভাল হয়। তাহলে ইচ্ছে মত, সাধ্যমত ও সময়মত খাওয়া যায়।

প্রিন্সিপ্যাল : তাতে এখানকার হস্টেলে যে পারিবারিক জীবনের বন্ধন রয়েছে তা ভেঙে যাবে।

বিনয় : আরেকটা কথা। প্রফেসরদের হস্টেলে খাবারের স্ট্যাণ্ডার্ড আমাদের চেয়ে অনেক ভাল কেন ?

প্রিন্সিপ্যাল : মিনিষ্ট্রি ওই হস্টেলের জন্য অনেক বেশি টাকা সাহায্য দেন। ওঁরা বেশি পড়াশুনো করেন। রোজগার করেন। [উঠে] আগামী মাসে তুমি হস্টেলে দুপুরে ও রাত্তিরের ৫৬টা মিল-এর মধ্যে কমপক্ষে ৫০টি খাবে। এই ৫০টির মধ্যে অন্ততঃ ২০টি দুপুরের এবং ৩০টি রাত্তিরের। বুঝেছ ?

মৃগাঙ্ক : স্যার। এ ব্যাপারে আপীল করা চলবে না ?

প্রিন্সিপ্যাল : চলবে। একমাত্র আমার কাছে।

চঞ্চলের প্রবেশ।

প্রিন্সিপ্যাল : কে ? কি চাই ?

চঞ্চল : আজ্ঞে, আমি এসেছিলাম — ইয়ে —

প্রিন্সিপ্যাল : না — না — ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে আমি কিছু করতে পারব না।

চঞ্চল : না — আমার কথাটা শুনুন —

প্রিন্সিপ্যাল : না। কোনো কথা শুনতে চাই না। কলেজে ভর্তির ব্যাপারটা সব স্টুডেন্ট কমিটির হাতে — ওখানে আমার নাক গলানো সম্ভব নয় — নাক কেটে দেবে। আপনি দয়া করে আসুন।

চঞ্চল : না-না — আমি সে জন্য —

প্রিন্সিপ্যাল : যে জন্যেই হোক — আমি পারবো না কিছু — বললে আমার চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাবে। আমি কাগজে কলমে কলেজের অধ্যক্ষ কিন্তু আসলে আমি অধ্যক্ষ নই।

চঞ্চল : আপনি এক মিনিট ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনুন —

প্রিন্সিপ্যাল : এ্যাদ্দিন শুনেছি আর শুনতে পারবো না — আপনি আসুন। আসলে বাইরে কলেজ বলে সাইন বোর্ড ঝোলানো থাকলেও এটা আসলে কলেজ নয় — যেমন আমি প্রিন্সিপ্যাল হলেও আসলে আমি প্রিন্সিপ্যাল নই, — আমি ইণ্টারেস্ট — আপনি আসুন তো।

চঞ্চল : উঃ। কি মুশকিলেই পড়লাম।

প্রিন্সিপ্যাল : মুশকিল তো হবেই। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে গেলে মুশকিল হবেই। ওরা ঘোড়া—আমি ঘাস। জানেন না? ভর্তি হতে গেলে ওদের কাছে যান—দক্ষিণা দিন—তারপর ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো আছি আমি—সই করে দেব।—তাছাড়া এটা কলেজ হলেও এখানে ক্লাশ হয় না—এখানে বোমা তৈরী হয়—জুয়া খেলা হয়,—প্রতিদিন সকাল থেকে কীসব রাজনৈতিক মিটিং হয়—তারপর ২টোর পর নিয়মিত মারামারি হয় দু দলে সকালের মিটিং-এর জের টেনে। তারপর যে যার বাড়ি চলে যায়—ও হ্যাঁ—ইতিমধ্যে দুপুরে অনেকে সিনেমা দেখতে যায়—এবং বাড়ি যাবার আগে ঐ সিনেমার সব কর্মকাণ্ড এখানে পুনরাবৃত্তি—এই রে—দেখুন তো বাইরে কেউ আড়ি পেতে শুনছে না তো?

চঞ্চল : আপনি যদি আমাকে দু মিনিট কথা বলতে দেন—

প্রিন্সিপ্যাল : না, দেব না। কারণ আপনাকে কথা বলতে দিলে—বিকেল নাগাদ আমাকে অনেক কথা শুনতে হবে ওদের কাছে—রাষ্ট্রভাষায়—মানে—ঐ ওদের ভাষায়—যার অর্ধেক শব্দের মানেই আমি পিতৃপুরুষে শুনিনি।

চঞ্চল : দেখুন আমি কিন্তু এসেছিলাম—

প্রিন্সিপ্যাল : আপনি তো ছেলের গার্জেন—বলুন তো—ফাণ্ডা কাকে বলে? এন্থ্যু? কিচাইন? [নীরবতা] জানেন না তো?

চঞ্চল : আমার ক্রমশঃ ধারণা হচ্ছে এই শ্রীনাথপুর জায়গাটা সত্যিই একটা ব্যতিক্রম।

প্রিন্সিপ্যাল : আসলে আমাদের ছাত্ররা এমনিতেই বেশ সুখে আছে। ভারতবর্ষে শিক্ষা জিনিষটার কোনো প্রয়োজন নেই। এখানে সবাই জন্ম থেকেই শিক্ষিত। আমাদের এডুকেশন দরকার নেই। দরকার ইরিগেশন—সেচব্যবস্থা। কথাটা আমার নয়—ইন্দিরা গান্ধীর ডেপুটি শিক্ষামন্ত্রীর—ডি. পি. যাদবের। খুবই ভাল কথা।

চঞ্চল : ভাল কথা হলেও কাগজে তো এ সব কথা ছাপা যাবে না।

প্রিন্সিপ্যাল : কাগজে? কাগজে মানে? কাগজে ছাপাতে যাবেন কেন? আর ছাপলেই বা পড়বে কে? জানেন না এখানে ১৯৬১ থেকে ৭১-এর মধ্যে অশিক্ষিতের সংখ্যা ১ কোটি ৪০ লক্ষ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৬৩ লক্ষে।

চঞ্চল : আমি কাগজের লোক—কাগজে ছাপবো না তো কি লিখে গলায় ঝুলিয়ে বেড়াব?

প্রিন্সিপ্যাল : আপনি কাগজের লোক? আগে বলবেন তো? যেটা আগে বলবার কথা সেটা পরে বলছেন—যেটা পরে বলা উচিত সেটা আগে বলছেন—

চঞ্চল : তখন থেকে তো সেটাই বলার চেষ্টা করছি—বলতে দিচ্ছেন কই ? অনর্গল নিজেই বলে চলেছেন।

প্রিন্সিপ্যাল : তা বলতে হবে না, না বললে হবে কি করে ? এই তো দেখুন না ১৯৬৭ সালে দশ দফা কর্মসূচী, ১৯৭৪-এ তেরো দফা, ১৯৭৫-এর ১লা জুলাই বিশ দফা—এর সঙ্গে সঞ্জয় গান্ধীর ৫ দফা যোগ করলে কত দাঁড়াল ? ২৫ দফা।

চঞ্চল : কি যে সব কথাবার্তা হচ্ছে না !

প্রিন্সিপ্যাল : যে হারে কর্মসূচীর দফা বাড়ছে সে ক্ষেত্রে অনর্গল কথা না বলে উপায় আছে ? আমরা জনগণকে খেতে দিতে পারি নি। মাথা গোঁজার জায়গা দিতে পারি নি, শিক্ষার সুযোগ দিতে পারিনি কিন্তু কথা বলার, প্রাণ খুলে কথা বলার সাহস জুগিয়েছি—তাই তো আমি অনর্গল কথা বলছি।

ইন্দিরা গান্ধী, রাজ্যসভা ২২।৭।৭৫।

চঞ্চল : আচ্ছা ? এই আমরা—মানে ? আমরা কারা ?

প্রিন্সিপ্যাল : আমরা যারা দেশকে ভালবাসি—দেশের কথা ভাবি—দশের কথা চিন্তা করি।

চঞ্চল : কিন্তু আপনারা যারা দেশকে ভালবাসেন—তারা—ঘটনায় দেখা যাচ্ছে ঠিক উল্টোটাই করেছেন।

প্রিন্সিপ্যাল : মানে ? আপনি কী আমাদের দেশপ্রেমে সন্দেহ প্রকাশ করছেন ?

চঞ্চল : দেশপ্রেমিকরা যা বলে সচরাচর তাই তো করে—নাকি ?

প্রিন্সিপ্যাল : তা তো বটেই।

চঞ্চল : তাই তো বলছি—আপনারা 'জনগণকে প্রাণ খুলে কথা বলার সাহস জুগিয়েছেন' বলছেন অথচ ২৬শে জুন '৭৫ দেশে জরুরী অবস্থা জারী করলেন এবং ব্যাপক গ্রেপ্তার করলেন বিরোধীদের ; এবং ২৬টি রাজনৈতিক দলকে বে-আইনী ঘোষণা করলেন। ঐ একই দিনে সেন্সর ব্যবস্থা চালু করে ঐ গ্রেপ্তার ধরপাকড়ের খবর প্রকাশ নিষিদ্ধ করলেন। ২৭শে জুন '৭৫ এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তির দ্বারা সংবিধানের ৩৫৯ (১) ধারার বলে উক্ত সংবিধানের ১৪, ২১ ও ২২ ধারা অনুযায়ী জনগণের অধিকারগুলি হরণ করলেন। ২০শে জুলাই পার্লামেন্টে কার্যবিবরণী সংক্রান্ত কোনো সংবাদ ছাপা নিষিদ্ধ হলো। ফলে ২৩ শে জুলাই বিরোধী পক্ষ পার্লামেন্ট থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করলেন। আরো শুনবেন ?

প্রিন্সিপ্যাল : আজ তাড়া আছে—তাছাড়া আমাদের মত বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীরা সকলেই—যাঁরা দেশকে ভালবাসেন তাঁরা সবাই এ ধরণের কার্যকলাপের তীব্র বিরোধিতা করেছেন এবং এখনও করেন।

চঞ্চল : কিন্তু আমার কাছে রিপোর্ট রয়েছে—তাঁরা উল্টোটাই করেছেন।

প্রিন্সিপ্যাল : হতেই পারে না। আপনি মশাই কাগুজে লোক, খুঁত ধরে কাত করা আপনাদের ধাত। সর্ষের মধ্যে ভূত খোঁজেন।

চঞ্চল : সে কি ? মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ম্যালকম আদি শেষিয়া বলেন—"জরুরী অবস্থার আগে দেশব্যাপী চিন্তাগত অবনতি দেখা দেয়।" "গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করা নিয়ে যারা বেশি অভিযোগ করছেন, তাঁরা হলেন এমন সব লোক যাঁরা ভারতবর্ষের জন্য কিছুই করেন নি।"

Aneye to India. Page 310,

এঁকে ৩ রা এপ্রিল '৭৬ পদ্মবিভূষণে অলঙ্কৃত করা হয়।

প্রিন্সিপ্যাল : কই—আমি তো জানি না।

চঞ্চল : বেশ। তাহলে রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জি. সি পাণ্ডে কর-জোড়ে গ্রেপ্তার, কারাদণ্ড ও ক্যাম্পাসে পুলিশী তাণ্ডবের পর সভায় সভাপতিত্ব করেন ; কিংবা শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরজিৎ সিংহ ৩ রা মার্চ '৭৬—"জরুরী অবস্থায় সমগ্র দেশব্যাপী নতুন শৃংখলাবোধের কথা উল্লেখ করেন।

Econ. Times 4. 3. 76.

কিংবা এস. এন. সেন ভি. সি. ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি ৫ই এপ্রিল '৭৬ গৌহাটিতে ছাত্রদের বিরুদ্ধে নৃশংস পুলিশী তাণ্ডবের পর ছাত্রদের শৃংখলা বজায় রাখা ও অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণের কথা বলেন।

Ibid-Page 310.

কিংবা আই. কে. সন্ধু ভি. সি. পাঞ্জাব পাতিয়ালায় বলেন—"জরুরী অবস্থা কোন অবস্থাতেই কোনভাবে সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করেনি।'

Tribune. 13. 12. 75.

কিংবা ডি. কে. বড়ুয়া বলেন—"আইন-শৃংখলা রক্ষার্থে পুলিশ বাহিনীর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে শান্তিরক্ষার ব্যাপারে কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়।"

Times of India. 13. 4. 76.

নেপথ্যে প্রচণ্ড কোলাহল।

চঞ্চল : কি ব্যাপার ? গোলমাল কিসের ?

প্রিন্সিপ্যাল : ঐ যে একটু আগে বললাম। দ্বি-প্রাহরিক দাঙ্গা। আপনি গোলমাল শুনে সচকিত হচ্ছেন তো ? আমিও আগে হতাম, আজকাল আর হই না। এ রকম পরিবেশে কোনো সুস্থ কাজ হতে পারে ?

ভাইস প্রিন্সিপ্যাল আসেন। উত্তেজিত।

ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল : স্যার—ওরা এসে গেছে।

প্রিন্সিপ্যাল : ওরা ? ওরা কারা ? আবার কে এল ? একটু আগে ছাত্ররা এসেছিল, তারপর ইনি এলেন—আবার এখন কারা ?

ভাইস প্রিন্সিপ্যাল : [কানে কানে কথা বলেন]

প্রিন্সিপ্যাল : [হেসে] ও। তাই বলুন। অবশেষে পুলিশ এসেছে—এবং ছাত্ররা ল্যাজ গুটিয়ে পালাচ্ছে। থ্যাঙ্ক্ গড্।

চঞ্চল : তার মানে ? কলেজ ক্যাম্পাসে—আপনি—আপনি পুলিশকে ঢুকতে দিলেন ? আপনি না বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ?

প্রিন্সিপ্যাল : বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী বলেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা বজায় রাখা আমার কর্তব্য।

চঞ্চল : সে কর্তব্য কি পালন করবেন ঐ ভাড়াটে খুনির সাহায্যে ?

প্রিন্সিপ্যাল : আইন শৃংখলা বজায় রাখার জন্যই মাইনে দিয়ে পুলিশ পোষা হয়।

চঞ্চল : আমার ক্রমশঃ ধারণা হচ্ছে এই শ্রীনাথপুর জায়গাটা ভারতবর্ষের একটা ব্যতিক্রম—কারণ মা সরস্বতীর সঙ্গে পুলিশের এত বন্ধুত্ব আর কোনো জায়গায় কোন শিক্ষাব্রতীর মাথায় আগে আসে নি।

প্রিন্সিপ্যাল : তা তো বটেই। জানেন না ? শোনেন নি ? বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস। বন্দুক যার হাতে, সেই বর্তমানে সবকিছুর ভাগ্য নির্ধারণ করবে।

নিষ্প্রদীপ।

তৃতীয় ঘটনা

ঘুরে কোলাহল। চঞ্চল ডানদিক থেকে প্রবেশ করতেই বোমা ফাটার শব্দ। চিৎকার। বিনয় দৌড়ে প্রবেশ করে। হাঁফাতে থাকে। যেদিক থেকে আসে সেদিকে ঘনঘন দেখে।

চঞ্চল : কি ব্যাপার ? কি হচ্ছে ওখানে ?

বিনয় : ভারত মোটর ওয়ার্কস-এ ধর্মঘট চলছে। কে একটা আচমকা বোমা ফাটালো। পুলিশ হাজির হবে এক্ষুণি আর ঝামেলা শুরু হবে।

চঞ্চল : তা তোমাকে—আপনাকে দেখে তো শ্রমিক বলে মনে হচ্ছে না।

বিনয় : তা বটে।

চঞ্চল : আপনি ?

বিনয় : ছাত্র।

চঞ্চল : তা আপনি এখানে ছুটোছুটি লাগিয়েছেন কেন ?

বিনয় : আমরা শ্রমিকদের আন্দোলনে যোগ দিয়েছি। শ্রমিক-ছাত্র ঐক্য গড়ে তুলতে আমরা এগিয়ে এসেছি। অন্য ছাত্ররা যোগ দিল বলে।

চঞ্চল : ইণ্টারেস্টিং। ব্যাপারটা কি একটু স্পষ্ট করে—

বিনয় : আপনি কে ? আপনার জেরা দেখছি পুলিশকেও হার মানায়।

চঞ্চল : যদিও অনন্ত জিজ্ঞাসা ভারতের ঐতিহ্যে নেই—তবু—পৃথিবীতে দুটি জীব আছে যাদের সে অধিকার জন্মগত।

বিনয় : আপনার স্ত্রী আছেন ?

চঞ্চল : তা আছেন। কেন বলুন তো ?

বিনয় : না মানে আপনি যে দেবভাষায় আমার সঙ্গে কথা বলছেন স্ত্রীর সঙ্গেও কি সেই ভাষাতেই কথোপকথন করেন ?

চঞ্চল : [হেসে] হ্যাঁ—মাতৃভাষাতেই তো মানে—আমার স্ত্রীও বাঙালী তাই —কেন বলুন তো ?

বিনয় : না মানে—অনন্ত জিজ্ঞাসা—ভারতের ঐতিহ্য—জন্মগত অধিকার ইত্যাদি। এ সব শোনার পর আপনার স্ত্রীর ফুলশয্যার পরই পালাবার কথা তাই জিজ্ঞেস করছিলাম আর কি ?

চঞ্চল জোরে হাসে। বিনয়ও।

চঞ্চল : আমার ক্রমশঃ ধারণা হচ্ছে—এই শ্রীনাথপুর ভারতবর্ষের ম্যাপে একটা ব্যতিক্রম।

বিনয় : সে আবার কি ?

চঞ্চল : গত কয়েক মাসে নানাভাবে এই শহরের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা বিপর্যস্ত —ছাত্র আন্দোলন, ধর্মঘট, পুলিশী তাণ্ডব, জিনিষপত্রের দাম, ছাঁটাই, বেকারী ইত্যাদি। তবু এখানকার মানুষ যে হাসতে ভুলে যায় নি সেটা দেখে গর্বে বুক ফুলে ওঠে।

বিনয় : শহরগুলো তো বর্তমানে আমাদের নয় ওদের। ভবিষ্যতে আমাদের হবে।

চঞ্চল : তা অবশ্য ঠিক। ঠিক এই রকমই হাসিখুশি মানুষের সঙ্গে আলাপ হলো এই তো দিনত্রয়েক আগে—চেনেন কিনা জানি না, ললিত—ললিত মিত্তির—ওকালতি করেন।

বিনয় : না। ঠিক চিনতে পারলাম না।

চঞ্চল : যাক আপনার সঙ্গে একদিন ভাল করে আলাপ করতে হবে। আসুন

না আমাদের কাগজের অফিসে—'দৈনিক সন্দেশে'। চেনেন নিশ্চয়ই ?

অরিন্দমের প্রবেশ।

বিনয় : হ্যাঁ। বাজারের কাছে তো ?

চঞ্চল : হ্যাঁ, হ্যাঁ। সোজা চলে আসবেন। এই আমার কার্ড।

বিনয় : আসব। আলাপ করিয়ে দিই আমার সহপাঠী অরিন্দম ঘোষ—চঞ্চল চৌধুরী—সাংবাদিক।

চঞ্চল : আপাততঃ ভারত মোটর ওয়ার্কস-এ অবস্থা কি ?

বিনয় : মালিক ধর্মঘট ভাঙতে না পেরে কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার তোড়-জোড় করছেন। শুধু এই বিশেষ কারখানা নয়—অনেক কারখানাতেই এই অবস্থা চলছে। এই এলাকার সমস্ত মালিকরা একজোট হয়ে শ্রমিক ছাঁটাইয়েব ব্যাপক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বেকারীর করাল ছায়া দেখে ছাত্ররা কি নীরব থাকতে পারে ?

চঞ্চল নোট বইতে লিখতে থাকেন।

চঞ্চল : শ্রমিকদের সঙ্গে এই ঐক্যের প্রস্তাব কি ছাত্র সংগঠন থেকে গৃহীত হয়েছে ?

অরিন্দম : আমাদের ইউনিয়ন আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন—তবে অনেক ছাত্র সংগঠন এখনও দ্বিধাগ্রস্ত।

চঞ্চল : ছাত্রদের এ ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষরা কি ভাবে নিয়েছেন ?

বিনয় : তারা সঙ্গে সঙ্গে স্বৈরাচার শুরু করেছেন—সাসপেনশন, কলেজ থেকে বহিষ্কার সবই শুরু হয়ে গেছে।

চঞ্চল : আপনাদের কলেজেও এ ঘটনা ঘটেছে ?

অরিন্দম : হ্যাঁ। আমাকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে—আমার কমরেড মৃগাঙ্ক রায়কে রাষ্টিকেট করা হয়েছে।

চঞ্চল : ও।

বিনয় : কিন্তু বিপ্লবী রাজনীতি অমন সংকীর্ণতার মধ্যে নিজেকে আটকে রাখে না। ছাত্ররা শুধু নিজেদের শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা নিয়ে মেতে থাকবে এবং বাইরের জগতের তাবত আলোড়ন দেখে চোখ বুজে থাকবে—এমন কথা বিপজ্জনক।

চঞ্চল : তা তো ঠিকই।

অরিন্দম : শ্রমিক ধর্মঘট করলে সরকার মালিক সবাই হাঁ হাঁ করে ওঠেন কিন্তু মালিক লক আউট করলে তারা চুপ করে থাকেন কেন ?

চঞ্চল : খুবই যুক্তিপূর্ণ কথা।

অরিন্দম : অনবরত কথার ফুলঝুরি আর আমাদের সহ্য হয় না। বলপ্রয়োগ

ছাড়া অন্য কোনো ভাষা তো ওরা বোঝে না অতএব ওই ভাষাতেই ওদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

নেপথ্যে কোলাহল।

চঞ্চল : কিন্তু এতে কতটা লাভ হবে সেটা অবশ্য বিবেচনা সাপেক্ষ। লাঠি চার্জ, ফাটা মাথা, ভাঙা হাত আর রক্তপাত। এ থেকে কি পাওয়া যাবে?

বিনয় : পাবো বৈকি। আমাদের ভয় করে বলেই তো লাঠি চালায়। এই পাশবিক অত্যাচারের পিছনে থাকে ওদের আইন শৃংখলা রক্ষার মেকি বুলি। হুঁ। আইন শৃংখলা। জাতীয় করণের কচকচিতে কান ঝালাপালা। করুক তো দেখি বিড়লার কারখানা জাতীয়করণ, টাটার কারখানায় হাত দিক দেখি—কত ক্ষমতা? ওদের দিন ঘনিয়ে এসেছে। [গোলমাল বাড়ে] চলি—এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়ানোটা নিরাপদ নয়।

সকলের প্রস্থান।

প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ দৃশ্যসজ্জা। মৃগাঙ্ক বসে খাচ্ছে। অনাদিবাবু পাশে বসে।

রেডিও : আজ পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে এক ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। পুলিশ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত এক সংবাদে প্রকাশ আনুমানিক দুই শতাধিক পুলিশ স্থানীয় কলেজের সামনে ছাত্রদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজপথের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের দীর্ঘ লড়াই চলে। ইঁট পাটকেল ও ক্র্যাকার নিয়ে বিক্ষোভকারীরা ক্রমান্বয়ে পুলিশকে আক্রমণ করতে থাকেন। বহু লোক আহত হন এবং সরকারী ও বেসরকারী সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি হয়।

রেডিও বন্ধ করা হয়।

মৃগাঙ্ক : শালা।

অনাদি : আর একটু কিছু দেব?

মৃগাঙ্ক : নাঃ। তিনদিন বাদে আজ পেট ভরে খেলাম। ভাগ্যিস—এস. বি. এখানে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলেন নয় তো আজও খালি পেটে থাকতে হতো।

অনাদি : এস. বি. মানে?

মৃগাঙ্ক : এস.বি.। এস.বি.। ঐ যে প্রোফেসর শশাঙ্ক বসু। যিনি আমাকে আপনার এখানে রেখে গেলেন।

অনাদি : ও। মাস্টারমশাই।

মৃগাঙ্ক : হ্যাঁ। আমরা ওকে এস.বি. বলি। একটা অসাধারণ লোক। টিচার হিসাবে যেমন ওঁর তুলনা নেই তেমনি মানুষ হিসাবেও। আমাদের তো উনি ছেলের মত ভালবাসেন। যেমন শাসন করেন তেমনি স্নেহ করেন। জানেন দু দিন যদি দেখা না হয় কেঁদে ফেলেন।

অনাদি : সত্যি ?

মৃগাঙ্ক : হ্যাঁ। তা যেই শুনলেন আমার নামে পুলিশের হুলিয়া বেরিয়েছে ব্যস—আর যাবে কোথায় ? ওঁর দৌড়োদৌড়ি শুরু হয়ে গেল। যেন যমে মানুষে টানাটানি। ওকি ? জানলাটা অমন হাট করে খুলে রেখেছেন কেন ? ওটা দিয়ে তো ঘরের যথা সর্বস্ব দেখা যায়। কেউ দেখে ফেলতে পারে।

অনাদি : না-না। ও পাশে কাঁটাগাছের জঙ্গল—কেউ ওপাশে নেই।

মৃগাঙ্ক : আপনার ভয় করছে না তো ?

অনাদি : না-ইয়ে-কি—কিসের ভয় ?

মৃগাঙ্ক : আমি যে এখানে রয়েছি—হাঙ্গামা হুজ্জুত হতে পারে তো। ভয়টয় করছে না তো ?

অনাদি : ভয় ? না-মানে—এসব অভিজ্ঞতা সত্যিই আমার জীবনে ঘটেনি। তবে আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে হঠাৎ যেন কেন মনে হচ্ছে অনেক কিছুই শেখা হয়নি। [নীরবতা। মৃগাঙ্ক অবাক হয়ে দেখে] তোমাদের জন্য সত্যই দুঃখ হয় ভাই—নাকি বাবা ? কি বলবো ?

মৃগাঙ্ক : দুঃখ ? হাঃ হাঃ হাঃ। দুঃখ কিসের ?

অনাদি : ঠিক বোঝাতে পারব না—তবে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমরা এই ভাবে দিতে দিতে শুকিয়ে ঝরে যাবে—কোন দাম পাবে না।

মৃগাঙ্ক : দাম ? ওঃ বাবাঃ। [নীরবতা] যাক। আপনার সঙ্গে আমার এইমাত্র কয়েক ঘণ্টার আলাপ—ভাল করে চিনিই না আপনাকে। আপনি কি করেন ?

অনাদি। কি করি না বলে—কি করতাম বললে বোধ হয় কথাটা ঠিক হবে।

মৃগাঙ্ক : মানে ?

অনাদি : এক কাজ করা যাক। তুমি চা খাবে ?

মৃগাঙ্ক : খেতে পারি। ভরা পেটে চা মন্দ লাগবে না।

অনাদি : তাহলে আমি চট করে দু কাপ চা বানিয়ে ফেলি। কি বল ? এই ত্যাখ—পারমিশন না নিয়েই তখন থেকে তুমি বলে চলেছি।

মৃগাঙ্ক : পারমিশনের কোনো দরকার নেই। বয়সে আমি আপনার ছেলের মত। স্বচ্ছন্দে তুমি বলতে পারেন। এস.বি. আমাদের তুই বলেন। সকলের সামনে ওঁকে এস.বি. বলি কিন্তু আড়ালে ওঁকে বাবার মত শ্রদ্ধা করি। আমার বাবা নেই তো।

অনাদি : নেই ? ঠিক আমার মত। আমারও বাবা মারা যান খুব ছোটবেলায়। মা-ই আমাকে মানুষ করেন। তাহলে চট করে চা-টা নিয়ে আসি—কি বল ? চাকরটা আবার কয়েকদিন হলো দেশে গেছে—স্বপাক পেট চলছে।

মৃগাঙ্ক : সিগারেট খেতে পারি ?

অনাদি : [বিব্রত] হ্যা—ইয়ে—নিশ্চয়ই।

মৃগাঙ্ক : এস.বি. বলেন—কেন খাবি না ? ইচ্ছে হলেই খাবি। তবে বেশি খাস্‌নি। ভাল খাওয়া দাওয়া করতে পারিস না। অসুখ বিসুখ করবে শেষকালে।

অনাদি : উনি ঠিকই বলেন। ওসব বেশি না খাওয়াই তো ভাল। পয়সা নষ্ট। শরীর নষ্ট। তুমি একটু বসো। আমি এলাম বলে।

মৃগাঙ্ক উঠে ঘরে পায়চারী করে। সিগারেট ধরায়। জানলায় যায়। একটু ফাঁক করে দেখে। অস্থির পায়চারী করে। বসে। রেডিওটায় চোখ পড়ে। খোলে। রবীন্দ্রসঙ্গীত : নিবিড় ঘন আঁধারে—অনাদির প্রবেশ। চা হাতে।

অনাদি : এই নাও। [মৃগাঙ্ক রেডিও বন্ধ করে চায়ের কাপ নেয়] কি ভাবছ ?

মৃগাঙ্ক : কই কিছু ভাবি নি তো ?

অনাদি : নিশ্চয় কিছু ভাবছ। মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। মার কথা মনে পড়েছে নিশ্চয়।

মৃগাঙ্ক : কি করে বুঝলেন ?

অনাদি : বয়স তো তোমার চেয়ে অনেক বেশি হে। সংসারী লোক তো ছিলাম একদিন। না হয় স্ত্রী মারা গেছেন। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে—

মৃগাঙ্ক : আপনার স্ত্রী মারা গেছেন ?

অনাদি : হ্যাঁ। তা প্রায় বছর পনেরো।

মৃগাঙ্ক : তাহলে নিশ্চয়ই খুব একা বোধ করেন ?

অনাদি : [হাসে] একা ? স্ত্রী মারা যাবার পর প্রথম প্রথম তাই মনে হতো —তারপর আস্তে আস্তে সব সয়ে গেল—[নীরবতা] জানো বাবা—আমার কি মনে হয় ?

মৃগাঙ্ক : বলুন।

অনাদি : পৃথিবীর সব মায়েরা এক।—সেই কতদিন আগে নৃপেন চাটুয্যের 'মা' উপন্যাসটা পড়েছিলাম—ম্যাক্‌সিম গোর্কীর লেখা 'মা'-এর অনুবাদ। উঃ। এখনো যেন প্রত্যেকটা কথা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

মৃগাঙ্ক : আপনি খুব পড়াশুনো করেন বুঝি ?

অনাদি : নাঃ—সময় পাইনি,—১৯ বছর বয়সে সংসারের চাপে চাকরীতে ঢুকেছি—। আপিসই সব রসকষ নিংড়ে নিয়েছে। তবে ইদানীং চেষ্টা করছি সেই অতীতের যতটা সম্ভব ক্ষতিপূরণ করতে। এই দ্যাখ—অনবরত নিজের কথাই বলে চলেছি।—বুড়ো হলে এই এক রোগ দেখা দেয়। যাবার সময় যত এগিয়ে আসে ততই কমিউনিকেট করার ইচ্ছা প্রবল হয়। তোমার কথা বল।

মৃগাঙ্ক : আমার ? আমার কোনো কথা নেই।

অনাদি : সে কি ? তোমাদেরই তো বলার কথা। কতটুকু বয়েস ?

মৃগাঙ্ক : তাই তো। কতটুকুই বা দেখেছি। আর জন্মেই তো দেখছি ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি। দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশবিভাগ, বেকারী, অনাহার, হত্যা—হত্যা আর হত্যা—

অনাদি : সত্যিই তো। তোমরা দধীচির মত যে মূল্য দিচ্ছ—তা বিফলে যাবে না—এটা আমি হলফ করে বলতে পারি। যাক ও কথা।—তোমার কথা বল। বাবা কি করতেন ?

মৃগাঙ্ক : কি ব্যাপার বলুন তো ? আমার নাড়ী নক্ষত্র জানতে চাইছেন কেন ? পুলিশে খবরটবর দেবেন নাকি ?

অনাদি : পুলিশে ? না-না। ছিঃ ছিঃ।

মৃগাঙ্ক : [তাকে অনেকক্ষণ দেখে] আপনাকে দেখলেই কেমন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়—[মাথা চুলকে] তবে কেন হয় তা জানি না।

অনাদি : তোমার বাবা কি করতেন ?

মৃগাঙ্ক : বাবা ? আমি তো তাঁকে কোনোদিন দেখিনি। তবে মার মুখে শুনেছি।

অনাদি : বেশ তো। সেই গল্পই বল। বললে তোমার মনটা হাল্কা হবে। আর আমার মনটাও ভরে উঠবে।

মৃগাঙ্ক হঠাৎ অনাদির হাত দুটো চেপে ধরে। অনাদি তাকে বুকে জড়ান।

অনাদি : কি হলো ? থাক থাক পরে শুনব। এখন থাক।

মৃগাঙ্ক : না, না বলছি। [নীরবতা] বাবা ছিলেন সূর্য সেনের মন্ত্রশিষ্য। ধরা পড়ে হাতে পায়ে বেড়ি পরে চলে গেলেন আন্দামানে। সেখানে বসে ফাঁসীর অপেক্ষায় দিন গুনছিলেন। এল ১৯৪৭ সাল। বাবা ঘরে ফিরলেন। কিন্তু বছরের পর বছর ঘোরে—দেশ নাকি স্বাধীন—অথচ মানুষের পেটে ভাত নেই, মাথায় ছাদ নেই, পরণে বস্ত্র নেই—পুনরায় নেমে পড়লেন—এবার কিন্তু লড়াইটা হয়ে উঠলো আরো ভয়াবহ। কারণ একদিন যাদের সঙ্গে ট্রিগারে হাত রেখে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বুক লক্ষ্য করে গর্জে উঠেছিল তাঁর আগ্নেয়াস্ত্র, আজ বাধ্য হলেন তাদের বুক টার্গেট করতে—কারণ আজ তারাই তো দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। গ্রেপ্তার হলেন ১৯৫১ সালে। তারপর একদিন সন্ধ্যায় বুলেটে ছিন্নভিন্ন তার দেহ ভেট এল মায়ের কাছে।

অনাদি : তুমি তো তোমার বাবার অসমাপ্ত কাজই করে চলেছ। এর চেয়ে বড় গৌরবের কথা আর কি হতে পারে ? ইয়োর ফাদার ডায়েড সো দ্যাট আদার মে লিভ। যাক তুমি শুয়ে পড়। নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত ?

মৃগাঙ্ক : যদি কেউ এসে পড়ে ?

অনাদি : কেউ আসবে না। আর যদি কেউ আসেই—আমি তো রইলাম।

মৃগাঙ্ক : আপনি ?

অনাদি : আমি বেঁচে থাকতে কেউ তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। যাই তোমার জন্য একটা চাদর নিয়ে আসি।

অনাদির প্রস্থান। মৃগাঙ্ক তার দেয়ালের দিকে লক্ষ করে। মাথা চুলকোয়। ওঠে। একটা ছবির দিকে চোখ পড়ে। অনাদির পুনঃপ্রবেশ।

অনাদি : ওটা আমার ছোটবেলার ছবি। মায়ের কোলে বসে। নাও শুয়ে পড়।

মৃগাঙ্ক : হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা আপনি আমাকে এত খাতির যত্ন করছেন কেন বলুন তো ?

অনাদি : কারণ বেশ টেনে ঘুম দিলে শরীর মন দুটোই চাঙ্গা হয়ে উঠবে। নাও শুয়ে পড়।

মৃগাঙ্ক শোয়। অনাদি হৃদয়ে আনন্দোচ্ছল। দরজায় করাঘাত। মৃগাঙ্ক বিদ্যুৎবেগে উঠে বসে। তারপর সে বাড়ির ভেতরে চলে যায়—অনাদি বাইরে যায়।

হরি : [নেপথ্যে] এই যে। কি করছেন ?

অনাদি : আপনি এত রাতে ? কি ব্যাপার ? হরিসাধনবাবু ?

হরি : এই বেড়াতে বেড়াতে এসে পড়লাম আর কি ?

অনাদি : বেড়াতে বেড়াতে ? এত রাতে ! আমার বাড়িতে ?

হরি : চলুন, চলুন। ভেতরে, কথা আছে।

অনাদি : দেখুন কাল সকালে হলে হয় না। একটু ব্যস্ত আছি।

হরি : [প্রায় ঠেলে] ব্যস্ত ? আপনি আবার ব্যস্ত কি মশাই ? কাজ কম্মো নেই। রিটায়ার্ড লোক, কাজের মধ্যে তো সকলে মর্নিং ওয়াক এবং বিকেলে ইভনিং ওয়াক আর রাত্তিরে নিদ্রা।

অনাদি : হ্যাঁ—তা তো ঠিকই। তবু মাঝে মাঝে…মানে…আমার আবার একা থাকতে ভীষণ ভাল লাগে…তখন…

মৃগাঙ্ক জানালার ভেতর দিয়ে দেখে আর ইশারা করে।

হরি : একা ? একাই তো থাকেন ?

অনাদি : [অন্যমনস্ক, মৃগাঙ্ককে দেখতে চেষ্টা করে] কি ?

হরি : কিসের কি ?

অনাদি : না বলছিলাম…কি যেন জিজ্ঞেস করছিলেন ?

হরি : বলছি—বাড়িতে কেউ অতিথি এসেছেন নাকি ? এই রকম চোঙা ফুলপ্যান্ট আপনি পরেন বলে তো মনে হয় না ? [মৃগাঙ্ককে কি যেন ইশারা করে] কি ? ওদিকে কি দেখছেন ?

অনাদি : কোন্‌দিকে ?

হরি : চোখের তারা আপনার বাঁই বাঁই করে ঘুরছে কেন ?

অনাদি : চোখের তারা ? ও তো আমি মাঝে মাঝে ঘোরাই। ডাক্তার বলেছেন বোঁ বোঁ করে ঘোরাতে। বলেন ওতে চোখে ভালো থাকে।

হরি : কি জানি বাবা—

অনাদি : হ্যাঁ। কি যেন বলছিলেন ?

হরি : বলছি বাড়িতে কেউ এসেছেন নাকি ? ফুলপ্যাণ্ট কার ?

অনাদি : আমার।

হরি : কি ?

অনাদি : না।

মৃগাঙ্ক হাসে।

হরি : হাসছেন কেন ?

অনাদি : কে ?

হরি : আপনি ?

অনাদি : আমি ? আমি হাসতে যাব কেন ? এত রাত্তিরে আপনি রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার আমার বাড়িতে এসেছেন—আমি ভয়ে কাঁদ কাঁদ।

হরি : কিন্তু আমি স্পষ্ট শুনলাম। খিলখিল হাসি। [মৃগাঙ্ক পুনরায় হাসে] ঐ আবার।

অনাদি : ও ? ঐটে ? ওটা তো—ইয়ে—

হরি : ইয়ে মানে ?

মৃগাঙ্ক ইশারা করে।

অনাদি : পেঁচা।

হরি : পেঁচা ? ঐ আবার।

অনাদি : আবার।

হরি : পেঁচা হাসছে ?

অনাদি : হ্যাঁ। মানে—আপনি যেমন ছাগল পোষেন—আমি পেঁচা পুষি—লক্ষ্মী পেঁচা—খুব পয়মন্ত—লক্ষ্মীর বাহন তো ?

মৃগাঙ্ক হাসে।

হরি : ঐ আবার।

অনাদি : হ্যাঁ। আপনি কথা বললেই হেসে জবাব দিচ্ছে।

হরি : ও। কিন্তু ওর হাসিটা অবিকল আপনার মত।

অনাদি : হবেই তো। আমার পেঁচা আমার মত হাসবে না তো কি আপনার মত হাসবে ?

মৃগাঙ্ক আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে হরিসাধনের পিছনে দাঁড়ান।

হরি : তা তো বটেই। থাক যে কথা বলতে এসেছিলাম—আপনি তো পেঁচা প্রসঙ্গ এনে, দিলেন বারোটা বাজিয়ে।

মৃগাঙ্ক হরিসাধনের কাঁধে হাত রাখে এবং তিনি তা সরিয়ে দেন অন্যমনস্কভাবে।

অনাদি : ঐ কথায় কথায় এসে পড়ল আর কি।

হরি : বলছিলাম কি যে ছাগল নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্কবিতর্ক করে মনটা খারাপ হয়ে গেল—হাজার হোক আপনি নেক্সট ডোর নেবার—পাশাপাশি গলাগলি—

হরিসাধন ঘুরে মৃগাঙ্ককে দেখেন এবং ছোট্ট আর্তনাদ।

আরে !

মৃগাঙ্ক : কি রে ?

অনাদি : ইয়ে—আলাপ করিয়ে দিই···হরিসাধন চক্রবর্তী···আমার প্রতিবেশী ···এবং···ইয়ে—

হরি : থাক, থাক। তোমাকে যেন কোথায় দেখেছি দেখেছি মনে হচ্ছে ··

অনাদি : থাক যে কথা হচ্ছিল। ছাগল বুঝলেন—ললিতদা ঠিকই বলেছেন—ছাগল একটা পাবলিক্ নুইসেন্স···

হরি : [অপলকনেত্রে দেখে] ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের ওখানে···আজ সকালেই কথা হচ্ছিল—তখন একটা ছবি···যেন দেখলাম···

অনাদি : কি ব্যাপার ? কি ব্যাপারে কথা হচ্ছিল ?

মৃগাঙ্ক : দেখুন···আমার সঙ্গে আপনার এখানে দেখা হয়েছে···কাউকে বলবেন না যেন। জানেন না—কি সমস্যায় পড়েছি।

হরি : হ্যাঁ···কিন্তু···মানে···তুমি তো সিটি কলেজের ছাত্র···তাই না ? তোমার নামে হুলিয়া জারী হয়েছে···তাই না ? ঐ পুলিশের সঙ্গে কি সব দাঙ্গা হাঙ্গামার ব্যাপারে—

অনাদি : এক মিনিট, হরিবাবু। আমি ব্যাপারটা আপনাকে বিশদভাবে—এ ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল—জানেন ? আমি [গলা খাদে নামিয়ে] আপনাকে সব বলছি—আসুন। আমার সঙ্গে। [হরিকে অনাদি টানতে টানতে নিয়ে যান] এখনে ঠিক প্রাণখুলে কথাবার্তা বলা মুশকিল। .

হরি ও অনাদির প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে অরিন্দম, বিনয় ও মাষ্টারমশায়ের অতি সন্তর্পণে প্রবেশ।

শশাঙ্ক : এই যে কেমন আছিস ?

মৃগাঙ্ক : ভালোই ছিলাম স্যার। তবে হঠাৎ এক উপদ্রব এসে পদ্মবনে মত্ত হস্তীর মত কাণ্ড শুরু করেছিল। তাকে অনাদিবাবু এক্ষুণি ভুলিয়ে ভালিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

শশাঙ্ক : কে ? কে ? নাম কি ?

মৃগাঙ্ক : কি হরি না কি যেন···হরিসাধন।

শশাঙ্ক : ও হরিসাধন চক্রবর্তী ? তাই বল। কোনো ভয় নেই। লোকটা অনর্গল কথায় কথায় ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট দেখায়। কিন্তু আসলে একটা

মৃগাঙ্ক : কিন্তু আমাকে যে এখানে দেখেছে সেটা যদি কাউকে বলে দেয় -- তাতে ক্ষতি –

অরিন্দম : তা ঠিক। কিন্তু অনাদিবাবু ওকে বাইরে থেকে বিদেয় করে দিলেই তো পারতেন, এ ঘরে না আনলেই তো হতো।

মৃগাঙ্ক : উনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন – কিন্তু হরিবাবু প্রায় সাঁজোয়া বাহিনীর মত বেগে প্রবেশ করলেন।

শশাঙ্ক : একটু ভেবে দেখি কি করা যায়। এদিককার আলোচনাটা সেরে ফেলি।

অরিন্দম : আমরা তাহলে এখন কি করব ?

বিনয় : হয় গিয়ে কলেজের কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ নয় তো এগিয়ে যাওয়া –

মৃগাঙ্ক : এগিয়ে যাওয়া ? এগিয়ে যাওয়া মানে ?

বিনয় : মানে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা।

অরিন্দম : তা ঠিক। দ্রুত পরিবর্তন সংগঠিত করতে হবে।

মৃগাঙ্ক : কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে পারবে ? এই সমাজ ব্যবস্থাটা হলো অক্টোপাশের মত, এক একটা শাখা দশটা প্রশাখার জন্ম দেয়।

বিনয় : সমস্যাটা অত্যন্ত স্পষ্ট – হয় ছাত্রদের দাবির স্বীকৃতি – নচেৎ নয়।

শশাঙ্ক : বিপ্লব হলো এক পদ্ধতি – যা ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে – এবং সেই চাপের ফলে শেষ পর্যন্ত সমাজ ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। দাবির ওপর দাবি। কিন্তু দাবি হলো মাধ্যম – লক্ষ্য নয়।

অরিন্দম : আমার মনে হয় এখানে বসে কিসে কি হবে ঠিক করা সম্ভব নয়। সংগ্রামের মাধ্যমে ছাত্ররা যা অর্জন করবেন সেটাই হবে ফলাফল।

শশাঙ্ক : ঠিক। আমাদের এখানে বসে ঠিক করতে হবে রণকৌশল।

বিনয় : ছাত্রদের সামনে আমাদের এটা স্পষ্ট করে তুলতে হবে যে কর্তৃপক্ষ ফাঁপা বেলুনের মত।

অরিন্দম : এক্সজাক্টলি। আমার ধারণা বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ শিক্ষা ব্যবস্থায় অধিষ্ঠিত নানা কর্তৃপক্ষদের আমলাতান্ত্রিক আচরণে বিক্ষুব্ধ ও হতাশাগ্রস্ত। কিন্তু তারা তাদের নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন নয়।

মৃগাঙ্ক : কি ভাবে তাদের আস্থাবান করে তুলবো ?

অরিন্দম : এই সমাজ ব্যবস্থাকে অচল করে দিয়ে। বাই ব্রিংগিং দি সিসটেম টু এ স্ট্যাণ্ডস্টিল। সরকারী ক্লাস বন্ধ করে ছাত্ররা নিজেরাই ক্লাস চালু করবে।

মৃগাঙ্ক+বিনয় : হিয়ার ! হিয়ার !

অরিন্দম : কর্তৃপক্ষদের দ্বারা নির্দিষ্ট পরীক্ষা ব্যবস্থা বয়কট করে। এটা অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত জায়গায় পরীক্ষার আর মাত্র তিন সপ্তাহ বাকি। সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় অর্থকরী দিক থেকে এটি হলো ভিত্তি। ভিত কেঁপে উঠলে বাড়ি ধ্বসে পড়ে। উপরন্তু বাইরের জগতের সঙ্গে এই পরীক্ষা ব্যবস্থা হলো যোগাযোগের নাড়ি।

মৃগাঙ্ক : কিন্তু অনেক ছাত্রছাত্রী হয় তো পরীক্ষায় বসতে চায়। তাদের বিরোধিতা করলে কর্তৃপক্ষ সেটাই একটা প্রচারে পরিণত করবে। তারা জনগণের সহানুভূতি পাবে।

বিনয় : 'সহানুভূতি' কথাটা ব্যবহার করো না। লেলিন এ কথাটা ঘৃণ্য মনে করতেন। পরীক্ষা ও ডিগ্রী হলো এ সমাজে ছাত্রদের কাছে জাতে ওঠার পাশ পোর্ট। এই সব ন্যাক্কারজনক মোহ ও ভীতি থেকে ছাত্রদের মুক্ত করার দায়িত্বও আমাদের।

মৃগাঙ্ক : কি ভাবে ? বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ?

বিনয় : দরকার হলে তাই করতে হবে।

মৃগাঙ্ক : আমরা জানি এই শিক্ষা ব্যবস্থাও এই অত্যাচারী সমাজ ব্যবস্থার একটি অংশ। আমি অনেককে বলেছি সমগ্রকে না বদলে অংশকে কি ভাবে পরিবর্তন করবো ?

অরিন্দম : ওদের বলো—আমাদের কোথাও না কোথাও শুরু করতে হবে—এবং শুরু করার সবচেয়ে উত্তম জায়গা হলো নিজের সদর দরজা।

বিনয় : অবশ্য শেষ পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণীর সমর্থনই সব কিছু নির্দিষ্ট করবে।

অরিন্দম : ঠিক। কিন্তু প্রথমে ওদের উদাহরণ দিতে হবে যে আমরা সংগ্রাম করতে প্রস্তুত।

শশাঙ্ক : গুজব শুনলাম যে ভাইস চ্যান্সেলার নাকি পুলিশী প্রহরায় কলেজের কাজ চালু করার চেষ্টা করবেন।

অরিন্দম : করুন। দেখা যাক।

মৃগাঙ্ক : অধ্যাপকদের মধ্যে ক জনকে আমরা পেতে পারি ?

শশাঙ্ক : উ—এখানে বড়জোর পাঁচ। তবে যদি এটা ছড়িয়ে পড়ে তাহলে দলে দলে অনেকে যোগ দেবে।

মৃগাঙ্ক : তাহলে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি !

অরিন্দম : এগোনো ছাড়া পথ নেই। লেনিন যদি মেনশেভিকদের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকতেন তাহলে কেরেন্‌স্কিরা গদীতে এখনও বহাল থাকতেন।

অনাদির প্রবেশ।

শশাঙ্ক : এই যে আসুন। আলাপ করিয়ে দিই—আমার ছাত্র অরিন্দম, বিনয়

—অনাদি সরখেল।

বিনয়+অরিন্দম : নমস্কার।

শশাঙ্ক : উনি গেছেন ?

অনাদি : কে ?

শশাঙ্ক : হরিসাধনবাবু ? চলে গেছেন ?

অনাদি : না। ওঁকে ভাঁড়ার ঘরে চাবি দিয়ে আটকে রেখেছি।

মৃগাঙ্ক : [চমকিত] সে কি ? আবার ও সব করতে গেলেন কেন ?

অনাদি : করতে বাধ্য হলাম। ওঁকে এখন ছেড়ে দিলে উনি পাড়ার সবাইকে ডেকে ডেকে বলবেন। এমন মুখরোচক খবর বেশিক্ষণ ওঁর পেটে থাকবে না। এবং আধ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ তার দলবল নিয়ে হাজির হবে।

সবাই অনাদিকে দেখে।

মৃগাঙ্ক : তা ঠিক। ওঁর মুখচোখ দেখেই মনে হলো উনি বলবেন।

অনাদি : তবে যতক্ষণ ভাঁড়ার ঘরে থাকবে ততক্ষণ তো নিশ্চিন্ত।

বিনয় : কিন্তু উপায় কি ? অনাদি অনন্তকাল তো ওঁকে ভাঁড়ার ঘরে আটকে রাখা যাবে না।

অনাদি : আহাঃ। ভাববার সময় তো পাওয়া গেল কিছুক্ষণ।

শশাঙ্ক : তা বটে।

অনাদি : আপনার সেই বাক্সটা কোথায় ?

শশাঙ্ক : কিসের বাক্স ?

অনাদি : হোমিওপ্যাথিক ওষুধের।

শশাঙ্ক : কেন ? কি হবে ?

অনাদি : ওকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে—তারপর পাঁজাকোলা করে রাস্তায় শুইয়ে দেওয়া যেত। যতক্ষণে ঘুম ভাঙবে ততক্ষণে একটা কিছু ব্যবস্থা করে ফেলা যেত।

অরিন্দম : ভাঁড়ার ঘরের চাবিটা কোথায় ?

অনাদি : আমার পকেটে। কেন ? ছেড়ে দেবে ভাবছ নাকি ?

অরিন্দম : না-না। ঐ চাবিটা দেখিয়ে ওঁকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলে হয় না ?

অনাদি : প্রতিজ্ঞা ! ও সব লোকের পেটে একটা কথা থাকে না। ইচ্ছে না থাকলেও নাম কেনবার জন্য সকলকে বলে বেড়াবে। ওঁর কথা ভুলে তোমরা নিজেদের কাজগুলো তাড়াতাড়ি সেরে ফেলো বাবা। আমি পাহারায় আছি।

নেপথ্যে হরির বিকট আর্তনাদ।

এই রে ! ব্যাটার মুখটা বাঁধতে ভুলে গেছি। যাই দেখি কি করা যায়।

অনাদির প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রিন্সিপ্যালের ঘর। তিনি লিখছেন। পাশে ভাইস্‌-প্রিন্সিপ্যাল। নেপথ্যে শব্দ।

প্রিন্সিপ্যাল : ও কিসের শব্দ ?

ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল : ওরা গাছ কাটছে।

প্রিন্সিপ্যাল : কেন ?

ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল : আজ্ঞে কেন তা আমার পক্ষে ঠিক বলা মুশকিল। তবে যদ্দুর কানাঘুষো শুনেছি ঐ গাছের ডালপালা দিয়ে ব্যারিকেড তৈরী করে পুলিশকে ঠেকাবে। অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক। আমরা—মানে আপনি অতি শীঘ্র সিদ্ধান্ত নিন।

• অনাদির বাড়ি •

রেডিও : হোম সেক্রেটারি আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেন যে ভবিষ্যতে পুলিশ-বাহিনী আরও কড়া ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য হবেন। বিরোধী পক্ষের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি স্বীকার করেন ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে ব্যবহৃত কাঁদানে গ্যাস মানুষের স্বাস্থ্যের স্থায়ী ক্ষতি করতে পারে। এ ব্যাপারে তিনি ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের এক ধ্বংসলোলুপ, উগ্রপন্থী অংশের ওপর দায়িত্ব চাপান যারা এইভাবে সম্প্রতি আইন শৃংখলা বিপর্যস্ত করতে উদ্যত হয়েছেন। আনুমানিক পঞ্চাশজন এম. পি. এক স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে অবিলম্বে সৈন্যবাহিনী তলবের আবেদন জানিয়ে বলেন এর ফলে ঐ উগ্রপন্থী সম্প্রদায়ের বুদ্ধির গোড়ায় খানিকটা হাওয়া লাগতে পারে। এই উগ্রপন্থীরা সমাজের প্রতি কোনো কর্তব্যই পালন করেন না, কিন্তু সমাজের কাছে তাদের দাবি-দাওয়ার শেষ নেই। সংবাদ শেষ হলো।

অনাদি : [ললিতকে] কি ভাবছেন ?

ললিত : কি ভাবব তাই ভাবছি।

অনাদি : মানে ?

ললিত : অবস্থা যে রকম শঙ্কাজনক তাতে অবিলম্বে আলোচনা করা উচিত কী করা হবে। অবশ্য আলোচনা করলেই যে কিছু করা যাবে এমনতরো বোধ হয় না।

• প্রিন্সিপ্যালের ঘর •

প্রিন্সিপ্যাল : এবার কি ওরা শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের পথ ছেড়ে দিয়ে সশস্ত্র

সংগ্রামের দিকে এগুচ্ছে ?

নেপথ্যে গোলমাল।

ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল : আজ্ঞে—ওই—শুনে তাই তো মনে হচ্ছে। পুলিশকে এটাও জানানো দরকার।

প্রিন্সিপ্যাল : আপনি ক্ষেপেছেন ? ইতিহাসের সামান্যতম জ্ঞান থাকলে এমন কথা উচ্চারণ করতে পারতেন না।

• সম্পাদকের ঘর •

সম্পাদক : শোন নিখিল—কান খুলে শোন। এটা বেশ ফলাও করে ছাপতে হবে। ফলাও করে—বুঝেছ ? তোমার পাশে কে হেঁড়ে গলায় চেঁচাচ্ছে বল তো ? অমন বাজখাঁই গলা কার ? মণিমোহন পাণ্ডে—এখানে ইন্দিরার দক্ষিণহস্ত সেটা জান ? নইলে রাতারাতি এলাকার সব রাজা-উজির কুপোকাৎ করে বাজার গরম করল কি করে ? হ্যাঁ তাই ছাপতে হবে। একটা সাজিয়ে গুছিয়ে স্টোরী তৈরী কর। টক ঝাল সব থাকবে তাতে—ছবি থাকবে ফ্রন্ট পেজ-এ—স্টোরী তিনের পাতায়। কত জায়গা চাও ? দু কলাম ? অ্যাঁ ? কি ? তা ইন্দিরা কবে ভরাডুবি হবে আমি কি করে জানব ? আমি কাগজের এডিটর—গণৎকার নই।

• প্রিন্সিপ্যালের ঘর •

প্রিন্সিপ্যাল : আপনি কি চান আমার মত বিবেকবান শিক্ষাব্রতী নিজেই নিজের কবর খুঁড়ুক ? [টেলিফোন বাজে। অস্ফুটকথা] কে ? কি ?

• সম্পাদকের ঘর •

সম্পাদক : শ্রীনাথপুরের কোন্ চাঞ্চল্যকর ঘটনা তুমি কাল পাঠকের পাতে দিচ্ছ শুনি ? [হাত তুলে] থাক। কাপড়ের দোকানে অগ্নিকাণ্ড ? না মতিউর রহমান স্ট্রীটের দুর্ঘটনা ? জীবনটা তো অগ্নিকাণ্ড বা দুর্ঘটনা নয় ? এ ছাড়া আর কিছু জোগাড় হয় নি ? তোমার কাছ থেকে আরো নতুন কিছু—কি ? স্টার ব্যাটারী ম্যানুফ্যাকচারিং-এ শ্রমিকদের সম্বন্ধে গরম খবর ?··· ওরা ধর্মঘট করছে ? [রেগে] আরে—ওখানে সেই লোকটা এখনও হেঁড়ে গলায় চেঁচাচ্ছে কেন ? ওটা কি চায় কি ? ওটা কে ? সেই ভোর পাঁচটা থেকে চেঁচাচ্ছে ? কি ? রাস্তার হকার ? হকারের ঐ রকম বাজখাঁই গলা ? তা ওকে বল হকারী না করে কলকাতায় গিয়ে বিশ্বরূপায় থিয়েটার করতে। ···হ্যাঁ যা বলছিলাম ব্যাটারী কোম্পানীর শ্রমিকরা ধর্মঘট করছে মানে ? —তুমি কি আজকাল কোনো খবরই রাখ না ? কাল সন্ধ্যের গণশক্তি

দেখেছ? ওরা ধর্মঘট করছে নয়, —ইতিমধ্যেই করেছে। ওই খবরটা এখন ইতিহাস। আমরা খবর ছাপি—ইতিহাস নয়। কালকের ফ্রন্ট পেজ—স্টোরী চাই—এবং গরমাগরম।

টেলিফোন রাখেন।

• অনাদির বাড়ি •

মৃগাঙ্ক : উচিত হচ্ছে এ এলাকার শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা। ওরা যদি ছাত্রদের এই সংগ্রামের সমর্থনে এগিয়ে আসেন তাহলে আমাদের শক্তি চতুর্গুণ হবে।

বিনয় : লেনিন বলেছেন সমাজ ব্যবস্থার সবচেয়ে দুর্বলতম অংশে প্রথম ফাটল ধরে। বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হলো এই মেকি, গণতান্ত্রিক, ফ্যাসিস্ত সমাজ ব্যবস্থার সবচেয়ে দুর্বলতম অংশ।

• প্রিন্সিপ্যালের ঘর •

ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল : রাইটার্স বিল্ডিং থেকে ট্রাঙ্ককল। ওঁরা জানতে চাইছেন —কি ধরণের ব্যবস্থা সবচেয়ে কার্যকরী হবে? সি আর পি, বি এস এফ, রেগুলার আর্মি নাকি এয়ার ফোর্স?

প্রিন্সিপ্যাল : এয়ার ফোর্স? এয়ার ফোর্স মানে? আপনি কি শ্রীনাথপুরটাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চান? হোপ্‌লেস্‌। শশাঙ্কবাবুকে ডেকে পাঠান। উনি আলাপ আলোচনায় বসুন ওদের সঙ্গে। এক্ষুণি।

ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল : [টেলিফোনে] হ্যালো। শশাঙ্কবাবুকে দিন। হ্যাঁ। বোস্‌? এক্ষুণি। এই মুহূর্তে চলে এস। প্রিন্সিপ্যাল ডাকছেন।—অ্যাঁ? না —তোমার টাকের দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে। টাক বাঁচিয়ে টুপ করে এসে পড়।

প্রিন্সিপ্যাল : কি গুখুরি করেই শিক্ষকতা করতে এসেছিলাম। এখন পৈতৃক প্রাণটুকু নিয়ে এ যাত্রা বাড়ি পৌঁছতে পারলে হয়। গতবার মনে আছে? উঃ! সেই ঘেরাও! দশ ঘণ্টা। পেচ্ছাব আটকে মরেছিলাম আর কি।

• অনাদির বাড়ি •

মৃগাঙ্ক : এডুকেশন মিনিষ্ট্রি থেকে একটা চিঠি এসেছে। তাঁরা ছাত্র কো-অর্ডিনেশন কমিটি থেকে তিনজনকে আলোচনার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

অরিন্দম : না। আলোচনা নিষ্ফল।

বিনয় : নো ডেলিগেশন, নো ডায়ালগ্‌স, নো ডীল্‌স।

অরিন্দম : সংগ্রামটাই আমাদের লক্ষ্য।

• প্রিন্সিপ্যালের ঘর •

ভাইস প্রিন্সিপ্যাল : শশাঙ্কবাবু, আপনার ভুঁড়ি আছে, টাক আছে, ভাল মাইনে পান। অল্প কথায় আপনি আমাদেরই একজন। তবু আমি দেখতে পাচ্ছি, ক্রমশঃ লক্ষ্য করছি, ওরা আপনার টিকিটি পর্যন্ত ছোঁয় না। কোথায় যেন কি এক ঘোর চক্রান্ত। আপনি ঘাসের মধ্যে সর্পের মত বিচরণ করছেন।

শশাঙ্ক : স্যার আমি সর্পদের মধ্যে ঘাসের মত মৃতবৎ পড়ে আছি।

প্রিন্সিপ্যাল : কিন্তু আপাততঃ আমাদের কি করা উচিত? হোয়াট ইজ টু বি ডান্?

ভাইস প্রিন্সিপ্যাল : সমস্যাটা হলো, আমরা কি ঐ সব তথাকথিত ছাত্র কো-অর্ডিনেশন কমিটি না কি, তার সঙ্গে আলোচনা করব? না যেমন মাটি আঁকড়ে পড়ে আছি তাই থাকব?

প্রিন্সিপ্যাল : ওদের সঙ্গে আলোচনা করা মানেই অবশ্য ওদের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া।

• অনাদির বাড়ি •

বিনয় : ছাত্ররাই একমাত্র বিপ্লবী শ্রেণী নয়, কিংবা বলা যায় কোনও শ্রেণীই নয়, তবু তারা বিপ্লবে ক্যাটালিস্ট হিসাবে কাজ করে।

অরিন্দম : ছাত্রদের এই মরণপণ সংগ্রামকে সমর্থন করার জন্য দেশের সমস্ত প্রগতিশীল মানুষের কাছে আবেদন করছি।

বিনয় : সমর্থনের দরকার নেই।

মৃগাঙ্ক : কিন্তু সমস্ত প্রগতিশীল মানুষের সমর্থন না পেলে কি আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব না?

বিনয় : বিচ্ছিন্ন! ও সব ভাববার সময় নেই। ব্যারিকেড তৈরী করে লড়াই চালাও পুলিশের সঙ্গে, স্টক এক্সচেঞ্জ পুড়িয়ে দাও।

• সম্পাদকের ঘর •

সম্পাদক : [টেলিফোনে] তর্ক করো না। তর্ক করো না নিখিল। ফ্রন্ট পেইজে দু কলাম ফাঁকা রাখ। [টেলিফোন রাখে] তুমি তাহলে কলেজে যাচ্ছ?

চঞ্চল : হ্যাঁ স্যার। আসার পথে দেখলাম কলেজটা একটা যুদ্ধক্ষেত্র। অতএব আপনার ফ্রন্ট পেইজ-স্টোরী মনে হয়, ওখানেই লুকিয়ে রয়েছে।

সম্পাদক : কিন্তু তুমি সারাদিন কোর্টে ছিলে। নিশ্চয়ই ক্লান্ত।

চঞ্চল : আমি ফ্রন্ট পেইজ-এর লোক। অষ্টম পৃষ্ঠা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা কম। ও পাতা কেউ পড়ে না।

• প্রিন্সিপ্যালের ঘর •

প্রিন্সিপ্যাল : আমরা একটা দাবি মেনে নিলে—ওরা তিনটে দাবি উপস্থিত করবে। শেষ পর্যন্ত পাছার কাপড়টি খুলে দিয়ে তবে রেহাই।

শশাঙ্ক : সে কি কথা? সেটা দিলে আর রইল কি?

প্রিন্সিপ্যাল : আমার সামনে একটা লিফ্‌লেট রয়েছে। এটি বিলি করেছেন স্টুডেন্টস্ কো-অর্ডিনেশন কমিটি। এখানে রয়েছে তিনটি উল্লেখযোগ্য কর্তব্যের কথা—১. ছাত্রদের প্রথম কর্তব্য হলো—এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে বানচাল করা, কারণ এই ব্যবস্থা তাদের শোষণ করে এবং সমাজ ব্যবস্থা থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে। ২. এই শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করার অধিকার ক্ষুণ্ণ করছে—অতএব এ ব্যবস্থা অচল। ৩ এমন এক ব্যবস্থা চালু করা, যা সমাজে ছাত্রদের যথার্থ দায়িত্ব পালনের পথ প্রশস্ত করবে। [নীরবতা] শশাঙ্কবাবু?

শশাঙ্ক : বলুন স্যার।

প্রিন্সিপ্যাল : আপনি কি এই লিফ্‌লেটের বক্তব্যের সঙ্গে একমত?

শশাঙ্ক : স্যার, আমার নিজের লেখা নয় এমন কোনো লেখার সঙ্গে আমি কোনো দিন একমত হতে পারি নি। আর যদি কখনও হয়ে থাকি তাহলে তার সংখ্যা হাতে গোণা যায়।

প্রিন্সিপ্যাল : আপনাকে ডেকে পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো—ছাত্রদের এবং আমাদের মধ্যে আপনি কি কোনো আপোষ করার ব্যবস্থা করতে পারেন?

শশাঙ্ক . ইঁদুর কি আর বিড়ালের নৈতিক দায়িত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে পারে স্যার?

ভাইস প্রিন্সিপ্যাল : স্যার, এ ধরণের আলাপ আলোচনায় কোনো লাভ হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু আইনকানুন এবং তার যথার্থ প্রয়োগ ছাড়া কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঠিকমত চলতে পারে না।

শশাঙ্ক : সে আইন কারা তৈরী করছে তার ওপর নির্ভর করে। সবচেয়ে ভাল আইনকানুন সচরাচর তারাই তৈরী করেন যাদের সে আইন মেনে চলতে হয়। আপনাদের বিচিত্র আইনকানুনের ফলেই ছাত্ররা আন্দোলনের পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।

প্রিন্সিপ্যাল : হুঁ। এ ধরণের উত্তেজিত আলোচনায় কাজ এগুবে বলে মনে হয় না। আমাদের অনেক ভুল হয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

[শশাঙ্ককে] তা আপনি কি এ্যাডভাইস্ করেন ?

শশাঙ্ক : এ্যাডভাইস্ স্যার ?

ভাইস প্রিন্সিপ্যাল : ওহোঃ। স্যার জিজ্ঞেস করছেন আমরা কী করব।

প্রিন্সিপ্যাল : আশু কর্তব্য কি ?

শশাঙ্ক : জানি না। তবে মনে হয়—আপনি অনির্দিষ্ট কালের জন্য কলেজ বন্ধ রেখে—পুনরায় খুলে দিন—তারপর আবার অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দিন। [নীরবতা] তারপর পুনরায় খুলে দিন।

প্রিন্সিপ্যাল : [চেঁচিয়ে] আপনি একটু সিরিয়াস্‌লি ভাবুন তো। সময় আমাদের বিপক্ষে যাচ্ছে। আমার মনে হয় ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করার ব্যাপারে সবচেয়ে যোগ্য লোক আপনি। ওরা আপনাকে সম্মান করে। ওদের কাছে গিয়ে বলুন এ কলেজের আইনকানুনের ব্যাপারে নানারকম সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আমরাও উপলব্ধি করি—বলুন এ ব্যাপারে এক তদন্ত কমিশন অবিলম্বে নিয়োগ করার চিঠি এডুকেশন মিনিষ্ট্রিতে পাঠান হবে। কিন্তু ছাত্রদেরও এই সংস্কারের ক্ষেত্রে ব্যাপক অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

শশাঙ্ক : তাহলে আপনারা চাইছেন—যে আমি গিয়ে ছাত্রদের এই আন্দোলন পরিত্যাগ করতে উপদেশ দিই ?

ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল : হ্যাঁ-হ্যাঁ। ওদের যুক্তির পথ গ্রহণ করতে বলুন। ব্যারিকেড সরিয়ে কলেজের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনতে বলুন—এবং আইনকানুন সম্বন্ধে আর একটু শ্রদ্ধার মনোভাব দেখাতে বলুন।

শশাঙ্ক : আর যদি আপনাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি ?

প্রিন্সিপ্যাল : [সভয়ে] তাহলে ধরে নেব যে আপনি ওদের সমর্থন করছেন। আপনি যদি ওদের হিংসার পথ পরিত্যাগ করতে সদুপদেশ না দেন তাহলে বুঝব আপনিও এই হিংসাত্মক কার্যকলাপ সমর্থন করছেন। ফলে এ কলেজের শিক্ষকের মর্যাদা থেকে আপনি বঞ্চিত হবেন। আপনাকে আমি সাসপেণ্ড করতে বাধ্য হব। এবং এ ব্যাপারে প্রতিবাদের ঝড় উঠবে জানি। সে ক্ষেত্রে এ কলেজের কর্তৃপক্ষরা, দেশের প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতারা, ব্যবসায়ীরা ইত্যাদিরা আমাকে সমর্থন করে সব প্রতিবাদের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দেবেন। ফলে আমার দ্বারা নির্বাচিত এক তদন্ত কমিশন আমার কাজ সম্বন্ধে তদন্ত করবেন। এবং সমর্থন করবেন। ফলে সব জায়গা থেকে আপনাকে পালিয়ে বেড়াতে হবে—ইউ উইল বি হাউণ্ডেড্ আউট, পার্সিকিউটেড।

শশাঙ্ক : এখন তাহলে আমি যেতে পারি, স্যার ?

প্রিন্সিপ্যাল : ইয়েস, ইউ মে গো নাও। কিন্তু যা বললাম মনে রাখবেন

ললিত : কিন্তু সংগ্রাম করতে গেলেও তো একটা প্রোগ্রাম দরকার। অবশ্য প্রোগ্রাম থাকলেই যে সংগ্রাম থাকবে এমন নয়।

অরিন্দম : প্রোগ্রাম মানেই বিভেদ সৃষ্টি। ফিদেল কাস্ত্রো যখন তাঁর অবশিষ্ট বারো জন সাথীকে নিয়ে বাতিস্তাকে উচ্ছেদ করতে অভিযানে বেরোন—তখন তাদের কোনো প্রোগ্রামের দরকার হয় নি। তাঁদের কাছে বিপ্লবটাই ছিল একমাত্র অভিজ্ঞতার পথ।

বিনয় : বিপ্লব এমন জিনিষ নয় যা নিয়ে বক্তৃতা দেওয়া যায়। বিপ্লব হলো করার জিনিষ—ক্রিয়া, অ্যাকশ্যান।

ললিত : কোন্ বিপ্লব ? তুমি কি এখানে যা ঘটছে—এই শিশুসুলভ বিশৃংখলার কথা বলছ ?

অরিন্দম : আপনি বৃদ্ধ। চিন্তা পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

শশাঙ্ক : না। অরিন্দম ওকে বলতে দাও। উনি তোমাদের লিগ্যাল এড-ভাইসার। ওঁর মতামত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া এখানে কোনো বক্তব্যের ব্যাপারে সেন্সরশিপ চলবে না।

ললিত : [উঠে দাঁড়ান। রহস্যময় হাসি] সেটা হবে মস্ত ভুল।

মৃগাঙ্ক : [সম্মানসূচক] আই এ্যাম সরি। বুঝতে পারলাম না। কোনটা মস্ত ভুল।

ললিত : সেনসরশিপ। [নীরবতা] কোনো চিন্তা বা মতাদর্শের কণ্ঠরুদ্ধ করার প্রচেষ্টাই হলো সেই চিন্তা বা মতাদর্শের প্রতি সবচেয়ে বড় সম্মান। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী—এই ছাত্রদের সংগ্রামকে যাঁরা ধ্বংস করার জন্য পুলিশী তাণ্ডবের বন্যায় ডুবিয়ে দিতে চাইছেন—সেটা কি আপনারা আপনাদের প্রতি এ সমাজের চরম শ্রদ্ধা ও সম্মানের নিদর্শন হিসাবে গণ্য করেন না ? এই সমাজ ব্যবস্থার ধারক ও বাহকরা আপনাদের ভয় করেন বলেই তো আপনাদের স্তব্ধ করতে আজ উদ্যত। প্রত্যেকবার মানুষ যখন মতামত প্রকাশের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন বা হত্যার আলিঙ্গনে লুটিয়ে পড়েন—পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব ততই উন্নত হয়—মানুষ হিসেবে তার সম্মান বাড়ে। এখানকার প্রতিটি ছাত্র যখন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবেন বা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবেন—বুঝতে হবে তাঁদের জয় পরিপূর্ণ হলো।

অনাদি : আপনি কি একটি কথাও সোজাসুজি বলতে পারেন না ?

শশাঙ্ক : অনাদিবাবু কিছু বলুন ?

অনাদি : আমি ? আমি কি বলব ? জানিই বা কতটুকু ?

ললিত : যতটুকু জানেন ততটুকুই বলুন না। যেটা জানেন না, সেটা কে আপনার কাছে শুনতে চেয়েছে মশাই ?

অনাদি : ব্যাপার হলো, আপনাদের সব কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে অতি শীঘ্র হয় তো আগামীকালই — কয়েক শো পুলিশ এ বাড়ি ঘেরাও করবে। এবং তারা নিশ্চয়ই গল্পগুজব করার জন্য আসবে না। সে ব্যাপারে আত্মরক্ষা সম্বন্ধে আপনারা কি ভেবেছেন?

অরিন্দম : ভাবনার দায়িত্ব কো-অর্ডিনেশন কমিটির। আমরা কমিটির নির্দেশেই এখানে আশ্রয় নিয়েছি। আপনার কি ভয় করছে?

অনাদি : ভয়ভীতির অভিজ্ঞতা আমার নেই। আর এখানে যা ঘটছে এ রকম অভিজ্ঞতা তো নয়ই। তবু সাধারণ বুদ্ধিতে যা মনে হয় তাই বললাম।

ললিত : অনাদিবাবু ঠিকই বলেছেন। যদ্দূর মনে হচ্ছে আমরা বর্তমানে ফ্রন্ট লাইনে দাঁড়িয়ে এবং তোপের মুখে —

বিনয় : তা তো বটেই। প্রথম নীতি — ফ্রন্ট লাইনে দ্বিধার কোনও স্থান নেই। দ্বিতীয় নীতি — বিপ্লবীরা সব সময়ই ফ্রন্ট লাইনে থাকে।

বিষ্টুর চকিত প্রবেশ।

বিষ্টু : আস্তে! পুলিশ! পুলিশ আসছে!

অনাদি : কোথায়? কোথায় দেখলি?

বিষ্টু : আমি রাস্তার মোড়ে মুদির দোকানে দাঁড়িয়েছিলাম — দেখি পুলিশ আসছে এদিকে, সঙ্গে হরিসাধনবাবু।

অনাদি : কি সর্বনাশ! বিষ্টু — তুই নিজের কাজে যা। জিজ্ঞেস করলে বলবি কিচ্ছু জানি না।

বিষ্টুর প্রস্থান।

ললিত : ভয়ের কিছু নেই। আমি দেখছি।

অনাদি : দেখছি? দেখছি মানে? আপনি…কি…কি করতে চাইছেন?

মৃগাঙ্ক : দেখুন — আপনি ঐ সব উল্টোপাল্টা বলবেন না। তাতে ঝামেলা বাড়বে। এমনিতেই আমাদের ঝামেলার শেষ নেই।

অনাদি : হ্যাঁ। যা বলেছ। জ্বলন্ত আগুনে আর ঘৃতাহুতি করবেন না তো। আমি এখানে থাকি — যা বলার আমারই বলা উচিত।

দরজায় করাঘাত। অনাদি দরজা খোলেন। হরিসাধনের প্রবেশ।

অনাদি : আরে? কি খবর? শিকারীদের কমিটি মিটিং নাকি?

হরি : হ্যাঁ। তা বলা যায়। তবে এবার বড় শিকার। ও, ইনি এখানকার লোকাল থানা থেকে আসছেন — আপনার সঙ্গে কী কথা আছে।

অনাদি : বলুন।

অফিসার : অনাদিবাবু — আপনি একজন সজ্জন ব্যক্তি, নির্বিরোধী মানুষ। এখানকার স্থানীয় লোকেদের মুখে প্রায়ই আপনার সুখ্যাতি শুনি। কিন্তু হঠাৎ শুনতে পেলাম আপনি নাকি ইদানীং সব অ্যান্টি-সোশ্যালদের সঙ্গে

মাখামাখি করছেন। কথাটা শুনে ঠিক নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। তাই চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জনের জন্যে সশরীরে চলে এলাম। কারণ আপনার মত সজ্জন যেচে নিজের পায়ে কুড়ুল মারবেন—

অনাদি : আপনি কি বলছেন, বুঝতে পারলাম না। আমার যা বয়েস সেটা কি অ্যান্টি-সোশ্যাল কাজকর্মের পক্ষে উপযুক্ত ? বয়সের একটা ধর্ম আছে তো ?

অফিসার : তাই তো জানতাম—আপনার যা বয়স তাতে সাধন-ভজন নিয়ে, পরকালের চিন্তা নিয়ে সময় কাটানো উচিত।

অনাদি : দেখুন ঠিক ঔচিত্যের কথা যদি বলেন তাহলে অনেক কথা এসে পড়ে। যা-যা হওয়া উচিত ছিল—তা কি হয়েছে ?

হরি : কি রকম ? কি রকম ?

অনাদি : এই পশ্চিমবঙ্গে ৪০ লক্ষ বেকারের কাজ পাওয়া উচিত ছিল—জেলের মধ্যে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড উচিত হয় নি—জিনিষপত্রের দাম ঊর্ধ্বমুখী না হয়ে অধোমুখী হওয়া উচিত ছিল। ইন্দিরাকে যাবজ্জীবন জেলে পোরা উচিত ছিল—বিনা বিচারে বছরের পর বছর হাজার হাজার লোককে জেলে আটকে রাখা উচিত হয় নি ইত্যাদি ইত্যাদি আরো অসংখ্য অনুচিত ঘটনা ঘটে চলেছে দিনের পর দিন···সে সব কথা যাক···আপনারা এখানে কেন ?

হরি : আরে ! আপনি আমাদের জেরা করছেন দেখছি ? জেরা করব আমরা, আপনি জবাব দেবেন।

অফিসার : আহ্। হরিসাধনবাবু, আপনি উত্তেজিত হবেন না। আমরা ওর কড়া নাড়লে উনি আমাদের জেরা করতে পারেন বৈকি। আমরা ওর বাড়িতে পদার্পণ করেছি—কেন করেছি সেটা উনি জিজ্ঞেস করতে পারেন বৈকি। সেই সঙ্গে ওঁকেও আমাদের প্রশ্ন করার অধিকার রয়েছে।

অনাদি : প্রশ্ন ? কি প্রশ্ন ?

অফিসার : মৃগাঙ্ক—মৃগাঙ্ক রায় নামে এখানকার সিটি কলেজের একটি ছাত্র—তার সঙ্গে আরো দুটি ছাত্র অরিন্দম মিত্র ও বিনয় ঘোষ—এদের নামে পুলিশের ওয়ারেণ্ট আছে।

অনাদি : কার নামে পুলিশের ওয়ারেণ্ট আছে কি না আছে তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ?

অফিসার : ওদেরকে আপনি শেল্‌টার দিয়েছেন।

ললিত : এ সব কী যে পাগলের মত—

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা।

অনাদি : চুপ করুন। কথা যা বলার আমিই বলব। [অফিসারকে] আপনারা কি চান ?

অফিসার : ছেলে তিনটিকে আমাদের—মানে পুলিশের হাতে হ্যাণ্ডওভার

করুন অনাদিবাবু।

অনাদি : এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ?

অফিসার : কনস্টেবল্ খুন, সরকারী সম্পত্তি নষ্ট এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ।

অনাদি : এদের নাম কি ?

অফিসার : বললাম যে—মৃগাঙ্ক রায়, অরিন্দম মিত্র ও বিনয় ঘোষ।

ললিত : অনেকদিন থেকে ভাবছি পুলিশের মানে আপনার বিরুদ্ধে একটা মামলা করা দরকার হয়ে পড়েছে।

অফিসার : ও সব কথায় কাজ এগুবে না ললিতবাবু। হ্যাঁ, যা বলছিলাম—আমরা চাই না আপনার বাড়িতে কোনো গণ্ডগোল হোক।

অনাদি : আমিও সেটা চাই না। মানে—চাইতে পারি না। তাছাড়া অরিন্দম মিত্র না কি আর বিনয় ঘোষকে আমি কোনদিন চোখে দেখি নি। যাদের কোনদিন দেখি নি, চিনি না তাদের আমার বাড়িতে খুঁজতে আসার কোনো মানে বুঝি না। আর মৃগাঙ্ক এসেছিল—চলে গেছে।

হরি : মিথ্যে কথা। ওরা তিনজনই এখানে আছে।

অনাদি : আপনি চুপ করুন। কথা হচ্ছে এঁর সঙ্গে, আপনি মাঝ থেকে ফোড়ন কাটছেন কেন ?

অফিসার : অনাদিবাবু—আমরা ছেলে তিনটিকে নিয়ে যেতে চাই। ওদের বিচার হবে। আদালতে ওদের উপস্থিত হতে হবে।

ললিত : নাঃ। আবার বহুদিন পরে দেখছি—চোগা-চাপকান চড়াতে হবে।

অফিসার : আই এ্যাম গোয়িং টু মেক্ এ্যান অ্যারেস্ট। [অনাদিকে] আপনি কি বাধা দেবেন ?

অনাদি : ও ভাবে কথাটা বললে যদি সুবিধে হয়, তাহলে তাই।

অফিসার : হ্যাঁ। ও ভাবেই বলছি। আইনশৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলাম—আপনি যদি কাজে বাধা দেন—তাহলে আইনের চোখে সেটা মারাত্মক অপরাধ অনাদিবাবু।

অনাদি : দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি আপনাকে খালি হাতেই ফিরে যেতে হবে।

হরি : কি ? এত বড় কথা ?

অনাদি : হ্যাঁ। অত্যন্ত ছোটকথা—ওভার মাই ডেড্ বডি। ইউ শ্যাল্ হ্যাব হোয়াট ইউ ওয়াণ্ট।

অফিসার : আমি দশ মাইল দূর থেকে শয়তান বদমায়েশদের গন্ধ পাই—ঐ ছেলে তিনটিকে আমি নিয়ে যাব অনাদিবাবু, প্রয়োজন হলে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে ছাই করে তা করা হবে।

ললিত : আরে ! এটা বলে কি ? দু পয়সার কর্মচারী—এটা বলে কি ?

অনাদি : যা প্রয়োজন হয় করুন—ইতিমধ্যে গেট আউট অফ্ মাই হাউস। ইউ আর স্ট্যাণ্ডিং অন্ মাই ডোর। গেট আউট অফ্ মাই হাউস এ্যাণ্ড মাই সাইট—

অফিসার : অল্ রাইট। কি বললেন মনে থাকে যেন। আসুন হরিসাধনবাবু।

হরি : বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি। দাঁড়াও দেখাচ্ছি।

দু জনের প্রস্থান।

• সম্পাদকের ঘর •

সম্পাদক : কলেজে কি হলো ?

চঞ্চল : স্যার—আমার ক্রমশঃ ধারণা হচ্ছে এই শ্রীনাথপুর জায়গাটা ভারতবর্ষের ম্যাপে একটা ব্যতিক্রম—নইলে আজ সমস্ত ভারতবর্ষের হেডলাইন নিউজ এই শ্রীনাথপুরেরই এক বাসিন্দা। অনাদি সরখেল। কলেজের ব্যাপারটা একটা ভাঁওতা। ওখানে পুলিশকে ব্যস্ত রাখাটা ওদের ট্যাক্‌ট। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে অনাদি সরখেলের বাড়ি—গেরিলা যুদ্ধের মত শত্রুপক্ষকে ভুল পথে চালিত করা।

সম্পাদক : বল কি হে ? ষাট বছরের এক বৃদ্ধ ছাত্র-সংগ্রামের নেতৃত্ব দিচ্ছে ?

চঞ্চল : হ্যাঁ স্যার। নইলে আর বলছি কি ? শ্রীনাথপুরের জনবিরল প্রান্তে একটি ছোট্ট বাড়ি আজ ভারত সরকারের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। বাইরে এক ব্যাটে-লিয়ন সশস্ত্র পুলিশ আর ভিতরে ছটি প্রাণী—তার মধ্যে রয়েছেন ঐ কলেজের অধ্যাপক শশাঙ্ক বসু ও উকিল ললিত মিত্তির।

সম্পাদক : তুমি কি এখন ঐখানেই চললে ?

চঞ্চল : আজ্ঞে হ্যাঁ। শ্রীনাথপুরকে অমর করে নিজে অমরত্ব চাই। তাছাড়া—আগামী কয়েকদিন আপনার ফ্রন্ট পেইজ স্টোরীর দুর্ভাবনা আর থাকছে না।

সম্পাদক : উইস ইউ বেস্ট অফ লাক্ এ্যাণ্ড বেস্ট অফ এভ্রিথিঙ্ক।

• অনাদির বাড়ি •

মৃগাঙ্ক : আমি বলতে পারি ?

শশাঙ্ক : বল।

মৃগাঙ্ক : আমার মনে হচ্ছে আমরা বাস্তব অবস্থা থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকছি। এ এলাকায় আমাদের কলেজের ছাত্ররাই প্রথম বিদ্রোহ করে। তারপর বিভিন্ন এলাকায় বাইশটি কলেজ আমাদের সমর্থনে এগিয়ে আসে। ঐ বাইশটির মধ্যে আঠারোটি শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করে। আমাদের কমরেডরা এখনও পর্যন্ত পুলিশের পথ রোধ করে কলেজ দখল করে বসে আছে। আমরা কয়েকজন পুলিশের হাত এড়িয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছি।

সব পরীক্ষা সাময়িকভাবে বানচাল হয়েছে। কিন্তু এখন কি? সমস্ত বছরটা কি আমরা এইভাবে বসে থাকবো? এতে আমাদের কি লাভের আশা?

ললিত: মৃগাঙ্ক ঠিকই বলেছে।

অরিন্দম: [রাগত] এ সবের মধ্যে আমি নেই। আমরা যখন শুরু করেছিলাম তখন কি লাভ করতে চেয়েছিলাম?

শশাঙ্ক: তোমার প্রস্তাবটা কি?

অরিন্দম: আপনি কি বলতে চান আমরা হাঁটু গেড়ে করজোড়ে গিয়ে প্রিন্সিপ্যালের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব? বলব যে তদন্ত কমিশন বসান?

ললিত: [অন্যদিকে] কিছু কিছু আছে যারা চায় যে আমরা এই মুহূর্তে জেলে, হাসপাতালে বা মর্গে যাই। এটা না হলে তাদের চোখে ঘুম নেই।

অরিন্দম: কি? কি বললেন?

ললিত: আমি একটি কথাও বলি নি।

মৃগাঙ্ক: কিন্তু হঠকারিতা অর্থহীন।

বিনয়: নো কম্‌প্রোমাইস্। নো সেল আউট।

শশাঙ্ক: আলোচনা মানেই আত্মসমর্পণ নয় অরিন্দম।

মৃগাঙ্ক: ঠিক। এতদিন পর্যন্ত আমরা আলোচনায় বসতে অস্বীকার করেছি। কর্তৃপক্ষ বারবার আলোচনায় বসতে অনুরোধ জানিয়েছেন—আমরা না করেছি। আন্দোলন যখন উর্ধ্বমুখী তখন এ মনোভাব সঠিক। কিন্তু যখন দেখছি আমাদের বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা সফল হতে চলেছে তখন—

অরিন্দম: [চেঁচিয়ে] আই ডিটেস্ট এম্পটি রেটোরিক। কোথায় বিচ্ছিন্ন? আইনজীবীরা, শিল্পীরা আমাদের সমর্থন করেন নি? আমাদের মা-বোনেরা পুলিশ প্রত্যাহারের আবেদন জানান নি কর্তৃপক্ষকে?

মৃগাঙ্ক: কিন্তু অধিকাংশ জায়গায় বিজ্ঞানের ছাত্ররা পরীক্ষায় বসতে রাজি।

অরিন্দম: তাদের গ্যাস, ইলেকট্রিসিটি, কেমিক্যালস্ সরবরাহ ব্যবস্থা বানচাল করা হোক।

মৃগাঙ্ক: মুশকিল হলো—তারা গ্যাস, ইলেকট্রিসিটি নিজেরা বানিয়ে নেবে।

অরিন্দম: যারা যারা আলোচনার পক্ষে তাদের অবিলম্বে কমিটি থেকে পদত্যাগ করা উচিত।

শশাঙ্ক: কেন?

বিনয়: কারণ তারা কমিটির পলিসিকে আর সমর্থনযোগ্য মনে করছেন না। তাই—

মৃগাঙ্ক: পলিসি অবস্থানুযায়ী সৃষ্টি হয়। ওটা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কোনো সম্পত্তি নয়।

অরিন্দম: কমিটির কাজ নেতৃত্ব দেওয়া, অনুসরণ নয়।

শশাঙ্ক : আমি প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে কথা বলেছি—উনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

বিনয় : কেন ?

শশাঙ্ক : ওরা ভুল হয়েছে স্বীকার করছেন এবং মুখ রক্ষার জন্য উদগ্রীব। ওঁরা বলছেন স্টুডেন্টস্ কো-অর্ডিনেশন কমিটি কলেজের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার পথ প্রশস্ত করলেই পুলিশ সরে যাবে।

ললিত : কোনো গ্রেপ্তার, কোনো এক্স্‌পালশন হবে না ?

শশাঙ্ক : না।

ললিত : তারা কথা দিয়েছেন। ওঁদের কথার দাম আছে।

অরিন্দম : স্যার, এর মধ্যে ওরা নিজেদের সন্তোষ খুঁজছেন এটা বুঝতে পারছেন না ? দীর্ঘকাল ধরে ছাত্রদের দ্বারা হিরো ওয়রশিপ পেয়ে এসেছেন, আজ হঠাৎ ছাত্ররা নিজেদের নতুন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করতে উঠে পড়ে লেগেছে, কথার ধূম্রজালে গা না ভাসিয়ে ছাত্ররা কাজে লেগেছে—হঠাৎ কর্তৃপক্ষরা এই ঝোড়ো হাওয়ায় ছিট্‌কে পড়েছেন ছেঁড়া কাগজের মত।

মৃগাঙ্ক : এ সবই সত্যি। তবু বলছি আলোচনা মানে আত্মসমর্পণ নয়।

অরিন্দম : প্রিন্সিপ্যাল আর তার চেলা চামুণ্ডারা কি চিজ জানো না ? ওঁরা এক মুহূর্তে আমাকে সাসপেণ্ড করেছেন—তোমাকে এক্স্‌পেল করেছেন। ভুলে গেছ ওদের চক্র কি ভাবে কাজ করে ? ইটস্ জাস্ট এ চিপ হোক্স্। ধাপ্পাবাজি।

নেপথ্যে মাইক্রোফোনে কণ্ঠস্বর।

কণ্ঠ : হ্যালো ! হ্যালো ! হ্যালো ! অনাদিবাবু। আপনার বাড়ি পুলিশ চারদিকে ঘেরাও করেছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণ না করলে আমরা যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হব। ওভার।

অরিন্দম : কি ? আলোচনায় বসবেন না ? [উচ্চস্বরে হাসতে থাকে] আলোচনা ? বারবার বলছি ও সব আলোচনার ধাপ্পাবাজিতে আপনারা ভুলতে পারেন, আমি এর মধ্যে নেই।

• প্রিন্সিপ্যালের ঘর •

ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল : আর কোনো আশা নেই। পুলিশ ব্যাপারটা টেক-আপ করছে।

প্রিন্সিপ্যাল : ভগবান ছেলেগুলোকে ক্ষমা করুন। ওরা জানে না ওরা কি করছে।

• অনাদির বাড়ি •

মৃগাঙ্ক : আমাদের অবিলম্বে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

অরিন্দম : সিদ্ধান্ত ? আমার সিদ্ধান্ত হলো—উই মাস্ট ফাইট টু ফিনিশ। সারা

পৃথিবীতে যুদ্ধ আর পুলিশী তাণ্ডবের বিরুদ্ধে অসংখ্য বিক্ষোভ আর আলোচনা হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধও চলেছে, পুলিশী তাণ্ডবও।

বিনয় : দেন উই মাস্ট গো ওন টু।

চঞ্চল : আমার ক্রমশঃ ধারণা হচ্ছে—এই শ্রীনাথপুর জায়গাটা ভারতবর্ষের ম্যাপে একটা ব্যতিক্রম। ·· কারণ ·· ঠিক আছে পরে বলব।

ললিত : কেন ? হোয়াই উই মাস্ট গো অন ?

অরিন্দম : কারণ সরকার চালানো একটা পেশা, টাকা রোজগার করা একটা পেশা। শোষণ গণহত্যা. সাম্রাজ্যবাদ—সব এক একটা পেশা। কিন্তু আলোচনা আর বিক্ষোভ হয় মাসে একটা দুটো। প্রধানতঃ রবিবার কি শনিবার বিকেলে। এতে সকলের সুবিধে হয়। সরকার তাই আলোচনা আর বিক্ষোভে খুবই আস্থাশীল।

শশাঙ্ক : ঠিক। বাট উই মাস্ট বি প্র্যাক্‌টিক্যাল।

ললিত : কারেক্‌ট্‌। যুদ্ধ, যুদ্ধ! ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার! আমরা যুদ্ধ করব কি করে ?

অরিন্দম : যুদ্ধ সর্বত্র। যুদ্ধ রয়েছে প্রতিটি মানুষের অন্তরে। উপরন্তু আমাদের রয়েছে [খাটের নিচে থেকে দুটি স্টেন বার করে]—অস্ত্র।

অনাদি : কি ?

অরিন্দম : তাই—আমরা এখানে দাঁড়িয়ে কলেজের ঐ সব ঘৃণ্য, নপুংসক কর্তৃপক্ষ যারা শাসকশ্রেণীর স্বার্থকে টিকিয়ে রাখতে আমাদের পিছনে লেলিয়ে দিয়েছেন সমগ্র পুলিশ বাহিনীকে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি এখানে দাঁড়িয়ে।

একটি ছুঁড়ে দেয় বিনয়কে।

বিনয় : হিয়ার! হিয়ার! নো সেল্‌ আউট।

মৃগাঙ্ক : ইনকিলাব জিন্দাবাদ, শ্রমিক ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ!

শশাঙ্ক : আর কয়েক মিনিটের মধ্যে এখানে যা ঘটতে যাচ্ছে তার তুলনা নেই।

অনাদি : তার মানে ?

শশাঙ্ক : মানে আর কয়েক মুহূর্ত বাদে আমরা দৈনন্দিনকে ঐতিহাসিকে উন্নীত করতে চলেছি—এবং আপনিও তার এক শরিক। এর চেয়ে বড় সম্মান আর কি হতে পারে ?

অনাদি : আমি এখানে এসেছিলাম সমস্ত কানাকানি, হানাহানির হাত থেকে মুক্তি পেতে—নিশ্চল শান্তির খোঁজে।

ললিত : তাই তো পাচ্ছেন। চিরশান্তি। বাংলা বোঝেন না ? "আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে করে যাব আশীর্বাদ তারপর হব ইতিহাস।" নিজের মাতৃ-

ভাষাটাও ভাল করে পড়েন নি। অবশ্য ভাল করে পড়লে যে মাতৃভাষাই পড়তে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

কণ্ঠ : হ্যালো। হ্যালো। হ্যালো। আর দশ মিনিট বাকি। এর মধ্যে যদি আপনারা আত্মসমর্পণ না করেন তাহলে আমরা গুলি চালাতে বাধ্য হব। ওভার।

মৃগাঙ্ক : গেট বিজি—গেট বিজি অল অফ ইউ। সমস্ত জিনিসপত্তর সরান দরজার মুখে, জানলার কাছে। ব্যারিকেড।

সবাই কাজে লাগে।

অরিন্দম : [ব্যারিকেড সাজানো শেষ হলে] এক মিনিট। এখানে যদি এখনও এমন কেউ থাকেন যিনি মনে করেন আমরা ভুল করছি তাহলে স্বচ্ছন্দে হাত তুলে বেরিয়ে যেতে পারেন। কারণ দ্বিধা নিয়ে লড়াই চলে না।

শশাঙ্ক : হঠাৎ তোমার এ কথা কেন মনে হলো, মাই বয় ?

অরিন্দম : হঠাৎ না স্যার। আলোচনা করতে গিয়ে দেখা গেল আমরা একমত নই। তাই, আসুন—ব্যাপারটা ভোটে ফেলা যাক।

বিনয় : আমি এ প্রস্তাব সমর্থন করছি।

মৃগাঙ্ক : আমি এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করছি।

অনাদি : [ললিতকে] এরা তিনটেতে মিলে তখন থেকে কি খুনসুটি লাগিয়েছে বলুন তো ? এ যেটা বলে হ্যাঁ—তো ও সেটা বলে না। আবার ও যেটা বলে হ্যাঁ—এ সেটা না। আমার তো মনে হয় পুলিশের দরকার নেই—এরা নিজেরাই খুনোখুনি করে না মরে।

ললিত : আপনি কি জেগে ঘুমোচ্ছেন না কি ঘুম থেকে জাগলেন ?

অনাদি : সে আবার কি ?

মৃগাঙ্ক : আমি আলোচনা সব সময় সমর্থন করি। আলোচনা মানে যুদ্ধ নয়—কিংবা যুদ্ধ মানে আলোচনা বন্ধ—দুটোই ভুল। কারণ আমার চোখে আলোচনাও একটা যুদ্ধ। তবে মরতেই যদি হয় তাহলে মৃত্যুটা হোক পাহাড়ের মত ভারী, পালকের মত হাল্কা নয়।

সকলে হাত মেলায়।

শশাঙ্ক : হিয়ার ! হিয়ার !

অনাদি : [ললিতকে] এদের একটা কথা যদি বোঝা যায়। এরা বাংলায় বলছে তো ?

ললিত : আঃ ! আপনার অত কথার দরকার কি মশাই ? আপনাকে মরতে বলা হয়েছে, চুপচাপ মুখ বুজে মরুন না—বাস চুকে গেল—তা নয়—

অরিন্দম : [অনাদিকে] এই যে। বুড়োদা। আপনি বরং ততক্ষণ ও ঘরে গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিন। এখানে থাকলেই তো প্যানপ্যান করবেন—তাতে

আমাদের কাজের যারপরনাই ব্যাঘাত হবে।

অনাদি : না আমি যাব না। আমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের হত্যা-কাণ্ড দেখব।

শশাঙ্ক : আপনি বরং ও ঘরে গিয়ে বসুন। দরকার হলে আমরা ডাকব'খন।

ললিত : দরকার হলে ডাকব। তার মানে এ নয় যে ডাকলেই দরকার হবে।

শশাঙ্ক : আপনি বরং একটু চায়ের ব্যবস্থা করুন। একটু ষ্টিমুলেণ্ট দরকার।

অরিন্দম : কি হলো? দাঁড়িয়ে রইলেন যে? যুদ্ধ চলছে। অফিসারের কথা না শুনলে কোর্ট মার্শাল হবে।

অনাদি : তোমার কথাবার্তাগুলো বাপু তেমন সুবিধের নয়।

প্রস্থান।

অরিন্দম : নাউ উই ওয়েট।

চঞ্চল : আমি গোড়া থেকেই সকলকে বলে আসছি এই শ্রীনাথপুর জায়গাটা ভারতবর্ষের ম্যাপে একটা ব্যাতিক্রম অথচ কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না।

ললিত : শালা।

শশাঙ্ক : কি হলো? ফ্রন্ট লাইনে দাঁড়িয়ে অমন ভদ্র ভাষায় কথা বলছেন কেন?

ললিত : না বলছি—আমার স্থিতাবস্থা আর পরিবর্তন ইদানীং এত দ্রুত ঘটছে যে আমি আছি কি নেই মাঝে মাঝে সেটাই বুঝতে পারি না। আপনার কি মনে হয়—আমি কি আছি?

শশাঙ্ক : আপনার থাকাটা তো আর আজকাল আপনার ওপর নির্ভর করছে না।

ললিত : কেন? আজকাল আমার গতিবিধি কে নিয়ন্ত্রণ করছেন? ইংরেজ?

শশাঙ্ক : না। ইংরেজ থাকলে তো সুবিধে হতো। কিন্তু ইংরেজ যাবার সময় নানা বন্ধু-বান্ধব রেখে গেছেন—তারাই আপাততঃ আপনার দেখাশুনো করছেন।

ললিত : তা ঠিক। [নীরবতা] কিন্তু সেদিন যে ঠিক হলো ইংরেজ এ দেশে এসেছিল একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে—বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে আসে নি?

শশাঙ্ক : ছ্যাৎ—আপনি মশাই কোনো জিনিসটা সোজাসুজি—

অরিন্দম : আমরা ভারত মোটর ওয়ার্কসে গিয়েছিলাম—শ্রমিকদের সঙ্গে আমাদের আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করতে।

মৃগাঙ্ক : ওরা কি বলল?

অরিন্দম : এটা কিছুতেই ওদের বোঝানো গেল না যে এই একটা স্ফুলিঙ্গ

থেকে দাবানল সৃষ্টি হতে পারে।

মৃগাঙ্ক : হুঁ। [নীরবতা] তা ওদের আন্দোলনে আমরা কি ভাবে সাহায্য করতে পারি সে সম্বন্ধে কিছু কথা হলো ?

বিনয় : হ্যাঁ। বললাম, আপনারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি শোষণ আর অত্যাচার সহ্য করছেন—তাই আমরা আপনাদের নেতৃত্ব দাবি করি—এবং আপনাদের আন্দোলনে মদত দিতে চাই।

চঞ্চল : আচ্ছা, এইভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে না মরলেই নয় ?

শশাঙ্ক : কি ?

চঞ্চল : আপনার সেই পেট সম্বন্ধে থিসিস-এর কথা বলছি। এখানে তো আমার পৈটিক কোনো যোগাযোগ নেই—তবে আমি খামোকা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরি কেন ?

শশাঙ্ক : ঐ যে বললাম একটু আগে—আর কয়েক মুহূর্ত বাদে আমরা দৈনন্দিনকে ঐতিহাসিকে উন্নীত করতে যাচ্ছি এবং আপনিও তার শরিক।

চঞ্চল : তা আপনার এই ঐতিহাসিকে বুঝি পেটের তাগিদ নেই ? না কি পেটের তাগিদ ঐতিহাসিক তাগিদ নয় ?

শশাঙ্ক : ধরেছেন ঠিকই। তবে এখানে ব্যাপারটা একটু জটিল হয়ে গেছে।

ললিত : কি রকম ? আবার জটিল হলো কেন ? আর হলোই যদি আমাদের বেলাতেই কেন ?

শশাঙ্ক : এখানে ওরা ওদের পেটের তাগিদে আপনাকে মারতে চাইছে আর আপনারা এবং অনাদিবাবু ঐতিহাসিক তাগিদে ওদের সেই পেটের তাগিদের মোকাবিলা করছেন। সাধারণতঃ এমন ঘটে না।

ললিত : ও। সাধারণতঃ এমনটা ঘটে না—কিংবা বলা যায় যা ঘটে তা সব সময় সাধারণ নয়। তাই তো ?

চঞ্চল : তা তো বটেই। বললাম না এই শ্রীনাথপুর জায়গাটা—যাকগে—

অরিন্দম : এই যে স্যার। আপনারা দুই বুড়োতে মিলে তখন থেকে কি বকবক করছেন বলুন তো ?

ললিত : বকবক করছি বলেই যে আমরা বুড়ো তা নয়। কিংবা বলা যায়—বুড়ো বলেই বকবক করছি।

সকলে একসঙ্গে হেসে ওঠে।

শশাঙ্ক : রেডিওটা চালাও তো দেখি কেউ ? একটু শোনা যাক।

অরিন্দম : স্যার, রেডিও আউট অফ অর্ডার। অনেকক্ষণ থেকে চলছে না, কি যে হয়েছে।

শশাঙ্ক : তাহলে তুই একটা গান ধর। বেশ ইয়ে গান—

ললিত : গান ? তার চেয়ে আপাততঃ বেশি দরকার ছিল মেশিনগান।

শশাঙ্ক : না-না—আমরা তো খুনী নরখাদক নই—যে মেশিনগান দরকার হবে—আমাদের দরকার মানুষের কণ্ঠস্বর—হাজার হাজার কণ্ঠের সমবেত সঙ্গীত। কই ধর—সেই যে সেইটা—ফরাসী বিপ্লবের গানটা—কিংবা ঐরকম একটা কিছু যাতে হাসতে হাসতে মরতে পারি।

অরিন্দম গান ধরে। বিনয় ও মৃগাঙ্ক গলা মেলায়।

শশাঙ্ক : কি হলো ললিতবাবু—আপনি কাঁদছেন ?

ললিত : না। ঐ চোখে কি যেন একটা পড়ল—

চশমা খোলে এবং চোখ মোছে।

শশাঙ্ক : অনাদিবাবু গেলেন কোথায় ? চা আনতে আসামে চলে গেলেন নাকি ? নাকি দার্জিলিংয়ে ?

আবার সবাই একসঙ্গে হেসে ওঠে।

ললিত : [অরিন্দমকে] এই যে খোকা। তোমার সঙ্গে আমার দু একটি প্রাইভেট টক আছে।

অরিন্দম : এখন প্রাইভেট টকের সময় নয়। যা বলার পাব্‌লিক্‌লি বলুন।

ললিত : ও। তা তোমরা কি জানতে বাবাজীবন যে শেষ পর্যন্ত এইরকম একটা কিছু ঘটবে ? নইলে আগ্নেয়াস্ত্র এল কেন এবং কোত্থেকে ?

অরিন্দম : ঠিক এ রকমই একটা কিছু ঘটবে এটা নিশ্চিত জানা ছিল না—কারণ আমি তো জ্যোতিষী নই। তবে এ রকম একটা কিছু ঘটলে তার মোকাবিলা করতে হবে তো। তা সেটা কি খালি হাতে করব ?

ললিত : তা ঠিক।

অরিন্দম : আর কোত্থেকে এল—সেটা আপনার না জানলেও চলবে।

ললিত : না—বলছিলাম—বে-আইনী নিশ্চয়ই। কারণ এটা তো আমেরিকা নয়—যে বন্দুক পিস্তল দোকানে কিনতে পাওয়া যায়।

অরিন্দম : ওরা যে সারা ভারতবর্ষে ১ লক্ষ ৮০ হাজার মানুষকে বিনা বিচারে জেলে আটকে রেখেছে—সেটা বে-আইনী নয় ? ৪০ লক্ষ লোকের পশ্চিমবঙ্গে কোনো অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা নেই তার পরেও এ সরকার বে-আইনীভাবে গদি দখল করে বসে আছে কেন ? রাজনীতি করার অপরাধে মৃগাঙ্ককে কলেজ থেকে বহিষ্কার করে আমাদের সাসপেণ্ড করে আলোচনার প্রস্তাব পাঠিয়ে এখানে পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ সেটা বে-আইনী নয় ? এসব এবং আরো অসংখ্য বে-আইনী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আমরা অস্ত্র তুলে নিলেই সেটা বে-আইনী ?

শশাঙ্ক : ওদের সঙ্গে যুক্তিতে পারবেন না ললিতবাবু। ভবিষ্যৎ যে ওদের। ওরা যে ভবিষ্যতের।

অরিন্দম : আপনার যদি ইচ্ছে হয় বা ভয় করে আপনি স্বচ্ছন্দে হাত তুলে

এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন।

ললিত : মোটেই না। মোটেই না। হাত তুলে এগুই আর ধাঁই করে গুলি চালাক। হাতও তুললাম, গুলিও খেলাম। আমাকে অত বোকা পেয়েছ না কি ?

অরিন্দম : তাহলে ওখানে হাতবোমা রয়েছে চুপ করে বাগিয়ে বসে থাকুন। সময় এলেই ছুঁড়বেন।

ললিত : হ্যাঁ। এ্যাঁ? বোমাও আছে নাকি? এ তো দেখছি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার। আচ্ছা—কামান নেই এক আধটা? সাবমেরিন?

অনাদিবাবুর প্রবেশ। হাতে থালায় কয়েক কাপ চা।

অনাদি : এই যে চা, নিন সবাই।

অনাদিবাবু সকলকে চা দেন। নিজেও নেন।

ললিত : এই যে। আপনি কি জানেন আপনি ইতিহাস হয়ে গেছেন ?

অনাদি : কি হয়ে গেছি ?

ললিত : ইতিহাস। ইতিহাস।

অনাদি : কেন ভূগোল হওয়া যায় না? ভূগোল আমার বেশি পছন্দ। নদী, পাহাড়, সরোবর—

ললিত : আসলে হওয়া উচিত ছিল আপনার নালা, তবে নেহাত সবাই মিলে ধরল আমাকে তাই আপনাকে ইতিহাস করে দিলাম—এই আর কি। নিন চা খেয়ে ওখানে হাতবোমা আছে চুপ করে বাগিয়ে বসে থাকুন। সময় এলেই ছুঁড়বেন।

শশাঙ্ক : আসুন—অনাদিবাবু এখানে বসুন।

অনাদি : ঠিক আছে, আপনারা বসুন। আমি চুপ করে এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসতে পারি না। ও হ্যাঁ—[কাছে গিয়ে] আপনার সঙ্গে আমার একটা বিরাট ঝগড়া আছে—

ললিত : হ্যাঁ, হ্যাঁ—ঝগড়া টগড়া যা আছে এই বেলা সেরে ফেলুন। একটু বাদেই তো কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান নিয়ে হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে—তখন সময় পাবেন না।

অনাদি : [শশাঙ্ককে] আপনি আমার হাতে এতগুলি ছেলের জীবনের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন—অথচ অনেক কিছু গোপন করে গেলেন।

শশাঙ্ক : সব একসঙ্গে জানলে আপনি হয়তো দায়িত্ব নিতেই রাজি হতেন না। ভয় পেতেন।

অনাদি : এবং আমার ধারণা আরো অনেক কিছু আপনি গোপন করে গেছেন যা আমি ক্রমশঃ জানতে পারব।

ললিত : এখনও বলে ক্রমশঃ জানতে পারব! আরে বলছি না আপনি

ইতিহাস? ইতিহাসের রাগ, দুঃখ, অভিমান, হতাশা, কান্না, বেদনা থাকতে নেই—কারণ সে পর্যবেক্ষক, অবজার্ভার। তার সংসার নেই—মা বাবা নেই সে শুধু ইতিহাস।

বলে কাঁদতে থাকেন।

কণ্ঠ: হ্যালো। হ্যালো। হ্যালো। টাইম আপ্। আর দশ সেকেণ্ডের মধ্যে আপনারা আত্মসমর্পণ না করলে আমরা গুলি চালাতে বাধ্য হব। ওভার।

অনাদি: [চিৎকার করে] অল রাইট। টাইম আপ। দিস সাইড অল্সো। আর দু সেকেণ্ডের মধ্যে আপনারা এখান থেকে চলে না গেলে আমরাও বেপরোয়া গুলি চালাতে বাধ্য হব। ইউ সোয়াইন। ওভার। এক—

দুই বলার আগেই বাইরে থেকে গুলির আঘাতে অনাদি ছিটকে এসে পড়েন ব্যারিকেডের ওপর।

মৃগাঙ্ক: টেক্ কভার্! ডোন্ট শুট্!

সবাই হুড়মুড়িয়ে নানান জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

শশাঙ্ক: অনাদিবাবু। অনাদিবাবু।

শশাঙ্ক তার মাথাটা তুলে ধরেন।

অনাদি: আমাকে একটু ধরে দাঁড় করান তো মাস্টারমশাই। ওদের একবার দেখিয়ে দিই। মরার আগে—একবার শেষবারের মত জ্বলে উঠি—

মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

ললিত: অনাদিবাবু সত্যিই ইতিহাস হয়ে গেলেন—নাকি ইতিহাসটাই অনাদিবাবুরা। না, তা তো হয় না। আমার ব্রেন হঠাৎ কেন জানি না ফেল করছে।

মৃগাঙ্ক: রেডি এভরি বডি। ওরা একসঙ্গে বাড়ির দিকে এগুচ্ছে।

অরিন্দম: কতটা দূরে?

মৃগাঙ্ক: প্রায় ২৫ গজ।

অরিন্দম: স্যার, আক্রমণ করব?

শশাঙ্ক: না। আরো এগোতে দাও। মরতে যখন হবেই তখন কয়েকটা মেরেই মরি। কি বলেন ললিতবাবু?

ললিত: আমার কথাবার্তা যুদ্ধক্ষেত্রে অচল—তার মানে এ নয় যে অচল বলেই সেগুলো আমার কথাবার্তা।

শশাঙ্ক: রেডি—১০, ৯, ৮, ৭, ৬, ৫, ৪, ৩, ২, ১।

অরিন্দম: ফায়ার।

অরিন্দম ও বিনয়ের স্টেন গর্জে ওঠে এবং বিনয় পরমুহূর্তেই লুটিয়ে পড়ে।

শশাঙ্ক: [বিনয়কে বুকে জড়িয়ে] একে একে নিভিছে দেউটি।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে এক বোমা এসে পড়ে এবং প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সব ছত্রভঙ্গ হয়।

গেরিলা স্কোয়াড

অমল রায়

পারি নি। কেন না আমাদের মধ্যে কোনো ঐক্য ছিল না। সোস্থালিস্টরা তখন কমিউনিস্টদের মনে করতো শত্রু তাই তারা কমিউনিস্টদের রুখতে মুসোলিনীর মধ্যে প্রগতিশীলতা আবিষ্কার করে ফ্যাশিস্তদের সঙ্গে হাত মেলায়।...ইতালি তখন অগ্নিগর্ভ—কারখানায় কারখানায় ধর্মঘট—শ্রমিক বিক্ষোভ। মালিক শ্রেণী তখন শ্রমিক বিপ্লবের ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। তবু বিপ্লব হলো না।...দেখা দিল প্রতিবিপ্লব। বড়লোকেরা আর কারখানা মালিকেরা মদত দিলো মুসোলিনীর ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীকে। আর এই কাউণ্টদের মত মধ্যবিত্তরা রাতারাতি ফ্যাশিস্ত বনে গেল।...

নাটক : গেরিলা স্কোয়াড

নাট্যকার : অমল রায়। জন্ম : ১৪ মার্চ ১৯৫০ কলকাতায়। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী, নাটকের ফর্ম নিয়ে নানান ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষায় উৎসাহী। এঁর প্রথম মঞ্চস্থ নাটক : হট্টমালায় হট্টগোল, রচনাকাল ১৯৭২, প্রযোজক রংমশাল, আন্দুল। প্রথম প্রকাশিত নাটক : দালাল, নাট্যপ্রসঙ্গ, শারদীয়া '৭২। প্রথম উল্লেখযোগ্য নাট্যরচনা ও প্রযোজনা : কেননা মানুষ, শৌভিক। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত একাঙ্ক : কেননা মানুষ নচিকেতা বন্দীশালার ডাক। মৃত্যু নেই গেব্রিয়েল পেরী যেখানেই অত্যাচার। লাসবিপনী ঝড় উঠুক ললাটলিখন। নো পাসারান বাস্তিল ভাঙছে পাতা নড়ার শব্দে। প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ : রাজকাহিনী বারাব্বাস। গ্রুপ থিয়েটারের ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় এঁর এ দেশেও নর্মান বেথুন একাঙ্ক প্রকাশিত হয়েছে। বৃত্তি : আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানে কেরানীগিরি।

রচনাকাল : ১৯৭৮

চরিত্রলিপি : জ্যাসেপ্পে নেগ্রী। উর্বানো লেৎসারো। কাউন্ট বেল্লিনি। বুফ্‌ফেল্লি। মিকেলে মোরেত্তি। লুইজি কানালি। পেপে। মার্গেরিতা।

প্রথম অভিনয় : এখনো প্রযোজিত হয় নি

অনুমোদন : অভিনয়ের জন্ম সংলগ্ন ঠিকানায় অনুমতিগ্রহণ কাম্য : তপন দাস ১ হরিচরণ চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলকাতা ৭০০০৫৭

এ্যালপাইন ভ্যালীর অরণ্য। মঞ্চের পর্দা খোলার আগে বোমারু বিমানের গর্জন এবং বোমাবর্ষণের ভয়ঙ্কর আওয়াজ। পর্দা খুললো। জ্যুসেপ্পে নেগ্রী ও বুফ্‌ফেল্লি মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে। বিমানগুলি ক্রমশঃ দূরে সরে যায়। হামাগুড়ি দিয়ে জ্যুসেপ্পে নেগ্রো সামনের দিকে এগিয়ে আসে।

জ্যুসেপ্পে : অল ক্লিয়ার ?

বুফ্‌ফেল্লি : মনে হচ্ছে। [উঠে দাঁড়ায়, ধুলোবালি ঝাড়ে] বাপরে ! কি ধুলো ! একেবারে ভূত সেজে গেছি। চেহারাখানা যা হয়েছে না ! কাছাকাছি একটা পড়লে অবশ্য আর দেখতে হতো না, একেবারে চিরকালের মতো ভূত হয়ে যেতাম !

জ্যুসেপ্পে : কাছাকাছিই একটা পড়েছে মনে হচ্ছে, আওয়াজটা বুকের ভেতর পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়েছে — ওহ ! এই শালার যুদ্ধ যে কতদিন চলবে কে জানে, কতদিন যে আর এইভাবে জঙ্গলে জঙ্গলে পালিয়ে বেড়াবো —

বুফ্‌ফেল্লি : আরে তুমি এখনও শুয়ে রয়েছো যে ! ওঠো ওঠো, এখন আর কিসের ভয় ?

জ্যুসেপ্পে : [উঠতে উঠতে] উহুহু, তাড়াতাড়ি শুতে গিয়ে কোমরের কাছটায় একটা আচমকা খিঁচ ধরে গেছে — সোজা হতে পারছি না। [বুফ্‌ফেল্লি জ্যুসেপ্পের কোমর ধরে সোজা করে দেয়] ওহ্‌হো পিঠের কাছে খচ্‌ করে উঠলো।

বুফ্‌ফেল্লি : এ বয়সে হাড় ভাঙলে আর জোড়া লাগবে না ! — বুঝেছো দাদু ?

জ্যুসেপ্পে : থাম ছোঁড়া, কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিস নি। উহ্‌হু — ব্যথাটা ক্রমশঃই বাড়ছে।

বুফ্‌ফেল্লি : কিন্তু মার্গেরিতা কোথায় গেলো ? [চেঁচিয়ে] মার্গেরিতা —

জ্যুসেপ্পে : ওদিকে কোথাও ঝাঁঝরা হয়ে পড়ে আছে কি না দেখগে যা।

বুফ্‌ফেল্লি : থামো, থামো ! এ সব অলক্ষুণে কথা কি না বললে নয় ?

জ্যুসেপ্পে : অলক্ষুণে কি করে ছোঁড়া ? যুদ্ধের সময়ে এই তো স্বাভাবিক। বেঁচে থাকাটাই এখানে আশ্চয্যি ! জীবন এখানে সরু সুতোয় ঝুলছে, যে কোনো সময় মেসিনগানের বুলেটে কিংবা বোমার স্প্লিন্টারে ছিঁড়ে যেতে পারে।

বুফ্‌ফেল্লি : কিন্তু সে তো একটু আগে আমাদের সঙ্গেই ছিল। এসো না দাদু একটু খুঁজে দেখি —

জ্যুসেপ্পে : তুই-ই যা বাপু — তোরই তো ওপর — কি যেন বলে — বিশেষ একটা আকর্ষণ আছে, সারাক্ষণই ওর কাছে ঘুরঘুর করিস, যদিও সে ছুঁড়ি তোকে

মোটেই পাত্তা দেয় না।

বুফ্‌ফেল্লি : তোমার ভীষণ ছোটো মন। নোংরা ঘাঁটা তোমার স্বভাব।

জ্যুসেপ্পে : ন্যাকা! আমি যেন কিছু টের পাই না? বুড়ো বলে কি ভেবেছিস আমার সব রসকষ মরে গেছে?

বুফ্‌ফেল্লি : না, তা মরবে কেন? তুমি যে রসের নাগর! —শালা বুড়ো ভাম কোথাকার!

জ্যুসেপ্পে : আহা রাগ করিস কেন? আমি কি কিছু অন্যায় বলেছি। আরে বাবা, ফ্যাশিস্ত কুত্তাদের তাড়া খেয়ে আমরা সবাই ঘর বাড়ি আত্মীয়স্বজন বৌ ছেলেমেয়ে ছেড়ে এই জঙ্গলে পালিয়ে এসেছি—কিন্তু তা বলে কি আমাদের স্নেহ-মমতা ভালোবাসা সব নষ্ট হয়ে গেছে, না তা যেতে পারে? বরং এখানে নতুন জায়গায় নতুন জলহাওয়ায় সেই ভালোবাসা নতুন করে বেড়ে উঠেছে, নতুন বাঁধনে জড়িয়ে নিয়েছে, ভালোবাসার মতো নতুন মানুষ খুঁজে নিয়েছে—ঐ জন্যেই বলছিলাম তুই যদি সে ছুঁড়ির দিকে ঢলেই থাকিস—

বুফ্‌ফেল্লি : বাজে বকো না, এ সব জিনিস কখনও একতরফা হয় না।

জ্যুসেপ্পে : কেন রে ছোঁড়া? এখনও বুঝি ঠিক সুবিধে করে উঠতে পারছিস না? হাঃ হাঃ হাঃ। অবশ্য মেয়েটার ধরণ-ধারণই কেমন অদ্ভুত! এত কম কথা বলে, কোনোদিন হাসতেও দেখি নি ওকে—সারাক্ষণই গোমড়া মুখে বসে বসে কি যেন ভাবে।

বুফ্‌ফেল্লি : কেন সেই থেকে এক কথা কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করছো?

জ্যুসেপ্পে : আচ্ছা বাবা, ঠিক আছে—তোর মার্গেরিতাকে তুই-ই খুঁজে নিয়ে আয়।

বুফ্‌ফেল্লি : যাবো না। গেলেই তো তুমি নোংরা নোংরা কথা বলবে।

জ্যুসেপ্পে : হাঃ হাঃ হাঃ—ঠাট্টাও বুঝিস না শালা? যা যা, খুঁজে ভাখ, এখনও টিকে আছে কিনা। কোমরটায় না লাগলে আমিও যেতাম।

বুফ্‌ফেল্লি : সে কথা আগে বললেই হতো? তা নয়, যত নোংরামী! [চেঁচিয়ে] মার্গেরিতা—সাড়া দাও। মার্গেরিতা—

প্রস্থান।

জ্যুসেপ্পে : [বিড়বিড় করে] এরই নাম যুদ্ধ। সব কিছু তছনছ করে দিয়েছে। ছিলাম নাবিক, জাহাজী সারেঙ। ঘর ছিল, বৌ ছেলেমেয়ে ছিল। আর এখন সব ছেড়েছুড়ে বনে-জঙ্গলে জন্তুর মতো লুকিয়ে আছি—ওহ্‌হো ব্যথাটা হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে উঠছে।

নেপথ্যে বুফ্‌ফেল্লি : এই তো এখানে মার্গেরিতা উপুড় হয়ে রয়েছে।

জ্যুসেপ্পে : [এগিয়ে গিয়ে] বেঁচে আছে তো?

নেপথ্যে বুফ্‌ফেল্লি : অজ্ঞান হয়ে গেছে।

জ্যাসেপ্পে : গেলো, মেয়েটাও বুঝি গেলো। গত চারদিনে বোমার ঘায়ে তিন-জন এখানে খসে গেছে — [মার্গেরিতাকে কোলে নিয়ে বুফ্‌ফেল্লি ঢোকে।] কি হয়েছে ? চোট লেগেছে কোথাও ?

বুফ্‌ফেল্লি : তেমন কিছু হয় নি বোধ হয়। বোমার আওয়াজে ভয়ের চোটে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

জ্যাসেপ্পে : বাপরে ! কি আওয়াজ ! আমারই বুকের মধ্যে কেমন করছিল ! আর এতো মেয়েমানুষ !

বুফ্‌ফেল্লি : ভাখো না একটু জলটল পাও কিনা — চোখে মুখে ছিটিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনি —

জ্যাসেপ্পে : জল ? জল এখানে পাবো কোথায় ?

বুফ্‌ফেল্লি : চোখের মাথা খেয়েছো ? সামনেই তো একটা পুকুর রয়েছে —

জ্যাসেপ্পে : উ হু হু — আবার ব্যথা, হাঁটলেই খচ করে উঠছে। তুই-ই যা না ভাই।

বুফ্‌ফেল্লি : শালা কুঁড়ের বাদশা ! এর কাছে ততক্ষণ বসো। আমি নিয়ে আসছি।

বুফ্‌ফেল্লি ছুটে বেরুতে গিয়ে প্রবেশোদ্যত বেল্‌লিনির সঙ্গে ধাক্কা খায়। কেতাদুরস্ত সাজে সজ্জিত বেল্‌লিনি ছিটকে পড়ে যায়।

জ্যাসেপ্পে : [চমকে ওঠে] কে রে, কে ? কোন শালা ? শত্তুর ?

বুফ্‌ফেল্লি : বুঝতে পারছি না। এই গভীর বনের মধ্যে এমন ধোপদুরস্ত জামা-কাপড় পরা — ওঠো — ওঠো তো চাঁদ — বদনখানা দেখি —

বেল্‌লিনি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়।

বেল্‌লিনি : [ভয়ে] তোমরা কারা ?

বুফ্‌ফেল্লি : আমাদের পরিচয় জেনে কি হবে ? আপনি কে ?

বেল্‌লিনি : না — মানে — কেউ না।

বুফ্‌ফেল্লি : কেউ না মানে ? কি মতলব ?

বেল্‌লিনি : আমি — আমি —

জ্যাসেপ্পে : জামা কাপড় দেখে মনে হচ্ছে — জমিদারের ব্যাটা !

বেল্‌লিনি : না ! — তোমরা এগিয়ে আসছো কেন ? মারবে নাকি ?

জ্যাসেপ্পে : ফ্যাশিস্ত পার্টির চাঁই —

বুফ্‌ফেল্লি : [চিৎকার করে] গুপ্তচর ? জার্মান স্পাই ?

বেল্‌লিনি : [আর্তনাদ] না। স্পাই নই, আমি — আমি পালিয়ে এসেছি।

জ্যাসেপ্পে : [উল্লাসে] পালিয়ে এসেছে ? আমাদের মতো ?

বুফ্‌ফেল্লি : থামো ! — কোথেকে পালিয়ে এসেছেন ? কেন ?

বেল্‌লিনি : আমাকে মিলিশিয়ারা, ফ্যাশিস্ত পার্টির মিলিশিয়ারা খুঁজছে, ওরা আমাকে পেলেই মেরে ফেলবে, দোহাই—তোমরা আমাকে এখানে থাকতে দাও—আমাকে বাঁচাও—

জ্যুসেপ্পে : কে বাঁচাবে মশাই আপনাকে ? আমরা ? আমাদেরই কে বাঁচায় ঠিক নেই। হাঃ হাঃ হাঃ [হাসতে গিয়ে আর্তনাদ করে ওঠে] আবার ব্যথাটা—

বুফ.ফেল্লি : মহাশয়ের নাম ? চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে খুবই বড় ঘরের লোক। রইস আদমী।

বেল্‌লিনি : আমাকে সবাই কাউন্ট বেল্‌লিনি বলে ডাকে।

জ্যাসেপ্পে : কাউন্ট ? ওরে বাপরে ! তবে তো বাবু আপনি মস্তবড় লোক। আমরা হলাম গিয়ে গতরে খাটা কালিঝুলিমাখা মজুর ! আমরা যে আপনাকে কি করে অভ্যর্থনা করবো হুজুর—গোস্তাকী মাপ করবেন সিনোর, আমাদের সঙ্গে আপনার বোধ হয় ঠিক বনবে না—

বেল্‌লিনি : [হেসে] কাউন্ট কাউন্টেসদের জমানা বহুদিন চলে গেছে ভাই ! এখন শুধু বংশের উপাধিটাই সার। তাই আমি মহান অভিজাত বংশীয় কাউন্ট বেল্‌লিনি জমিদারী খুইয়ে বর্তমানে সামান্য স্কুল মাস্টার—

জ্যুসেপ্পে : বলেন কি ? আপনি তো তাহলে এখন আমাদেরই লোক। হঠাৎ কাউন্ট কথাটা শুনেই মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল · অনেকদিনের রাগ তো ! আপনার বাপ ঠাকুর্দারা চাষীদের ওপর কম অত্যাচার করেছে !

বেল্‌লিনি : তোমাদের ইচ্ছে হলে আমাকে শুধু বেল্‌লিনিই বলতে পারো। এখন তুমিও যা, আমিও তাই। একই জাঁতাকলে পেষা হচ্ছে আমাদের দু জনকে—

জ্যুসেপ্পে : তা যা বলেছেন ! বেনিতো মুসোলিনীর জাঁতাকল ! রেহাই নেই। ফ্যাশিস্ত কুত্তাদের হামলা সবার ওপরেই নেমে আসছে ! কটা বছরের মধ্যেই সারা ইতালির নাভিশ্বাস উঠে গেছে ! [মার্গেরিতার গোঙানি শোনা যায়।] ঐ ছাখো—মার্গেরিতার বোধ হয় জ্ঞান ফিরে আসছে—

বুফ.ফেল্লি : এই যাঃ—জল আনা হয় নি। নিয়ে আসছি—

বেল্‌লিনি : আনতে হবে না, আমার কাছে আছে [ওয়াটার বটলটা দেয়] কি হয়েছে ?

বুফ.ফেল্লি : বোমার আওয়াজে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

[বুফ.ফেল্লি মার্গেরিতার চোখে মুখে জল ছিটোতে থাকে।

বেল্‌লিনি : আমার কাছে ব্রান্ডি আছে। এই নাও, আস্তে আস্তে মুখে ঢেলে দাও—

দেয়।

জ্যুসেপ্পে : কাউন্ট দেখছি পুরো সংসার ঘাড়ে নিয়েই পথে নেমেছেন। জল—ব্র্যাণ্ডি—

বেল্‌লিনি : খাবার দাবারও আছে দিন সাতেকের মতো, কোনোদিন বাড়ির বাইরে বেরোই নি কি না—কে জানে কখন কোথায় থাকতে হবে! তোমরা আমাকে এখানে থাকতে দেবে তো?

জ্যুসেপ্পে : থাকতে কে বারণ করেছে? মাথার ওপরে নীল আকাশ, পায়ের নীচে পাথুরে জমি আর চারপাশে গাছপালার ভিড়! এমন চমৎকার আশ্রয় আর কোথায় মিলবে বলুন? এ্যালপাইন ভ্যালীর এই জঙ্গলে আপনার আমার মতো কয়েক হাজার লোক আস্তানা গেড়েছে।

বুফ্‌ফেল্লি : [মার্গেরিতাকে সামান্য ঝাঁকুনি দিয়ে] মার্গেরিতা—এই মার্গেরিতা—ওঠো—উঠে বসো—কিচ্ছু হয় নি তোমার—

ধরে বসিয়ে দেয়।

এই তো আমরা রয়েছি—

মার্গেরিতা : আমি—আমি—বোধ হয়—আমার কি হয়েছিল?

বুফ্‌ফেল্লি : কিছু হয় নি তোমার! এখন কোনো কষ্ট হচ্ছে?

মার্গেরিতা : না, কষ্ট না। মাথাটা কেমন যেন—

বুফ্‌ফেল্লি : ও কিছু না। এক্ষুণি সেরে যাবে।

জ্যুসেপ্পে : বলি ও মেয়ে—এত অল্পতেই এমন ভেঙ্গে পড়লে চলে? আরো কত দুর্ভোগ যে আমাদের কপালে আছে, কে জানে—এই তো সবে শুরু!

বুফ্‌ফেল্লি : থাক, থাক দাদু! তোমায় আর জ্ঞান দিতে হবে না!

জ্যুসেপ্পে : কেন রে ছোঁড়া? শুধু তুই একাই ওর সঙ্গে কথা বলবি নাকি? আমাদের বুঝি ইচ্ছে করে না?

বুফ্‌ফেল্লি : সব তাতে তোমার নোংরামি!

জ্যুসেপ্পে : আহা—এত খেপছিস কেন? মৃত্যু এখানে সাপের মত পায়ে পায়ে জড়িয়ে আসে, যে কোনো সময়েই শেষ হতে পারি—তা এখন হাসি ঠাট্টা করবো না তো কি কবরে শুয়ে করবো?

বেল্‌লিনি : সে তো ঠিকই—

জ্যুসেপ্পে : তোর যদি মার্গেরিতার ওপর—উহুহু,আবার কোমরটা টনটন করে উঠল।

বুফ্‌ফেল্লি : ঠিক হয়েছে! যেমন আমার পেছনে লাগা!

মার্গেরিতা : আমার জন্যে তোদের খুব কষ্ট হলো—তাই না?

জ্যুসেপ্পে : না, না, আমাদের আর কষ্ট কি! তবে তোমার জন্যে এই ভদ্রলোকের কিছুটা খাবার জল আর ব্র্যাণ্ডি খরচ হয়েছে।

মার্গেরিতা : ধন্যবাদ। আপনাকে তো এই জঙ্গলে আগে কখনো—

জ্যুসেপ্পে : উনি এইমাত্র এসেছেন। তবে যে সে লোক নন। উনি একজন কাউণ্ট। কাউণ্ট কি যেন? বেল্‌লিনি!

বেল্‌লিনি : কাউণ্ট বলে আর আমায় লজ্জা দিচ্ছ কেন? আমিও তোমাদেরই মতো পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

জ্যুসেপ্পে : পালিয়ে আর যাবেন কোথায় সিনোর? যুদ্ধের আগুন এদিকেও ছড়িয়ে পড়লো বলে। দেখছেন না—জার্মান প্লেন ক দিন ধরে এ্যালপাইন ভ্যালীতেও হানা দিচ্ছে।

বেল্‌লিনি : মুসোলিনী এখন জার্মানদের হাতের পুতুল। তারা যা বলছে, মুসোলিনী তাই করছে।

জ্যুসেপ্পে : ইতালির এবার দফারফা! আমরা এ যুদ্ধ চাই নি, তবু জোর করে আমাদের মাথার ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে ফ্যাশিস্তরা। এই যুদ্ধে কত জনের প্রাণ গেলো, কত সংসার ছারখার হয়ে গেল।

মার্গেরিতা : তোমরা বরং একটু গল্প করো, আমি ততক্ষণ তোমাদের খাবারটা নিয়ে আসি—

জ্যুসেপ্পে : হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই করো, খিদের চোটে পেটের নাড়ীগুলো পর্যন্ত চনমন করছে।

বুফ্‌ফেল্লি : [মার্গেরিতাকে] আমি কি যাবো তোমার সঙ্গে?

মার্গেরিতা : না, দরকার নেই, আমি একাই যেতে পারবো।

বুফ্‌ফেল্লি : তুমি এমন ভাবে আমাকে এড়িয়ে চলো কেন?

মার্গেরিতা : হয়তো তুমি যা চাও, তা আমি দিতে পারি না বলেই।

প্রস্থান।

জ্যুসেপ্পে : কেমন হলো তো? পিরীতের ফানুস ফুটো করে দিলে তো?

বুফ্‌ফেল্লি : চুপ করো! বাজে বকো না! হ্যাঁ কি বলছিলেন যেন কাউণ্ট?

বেল্‌লিনি : বলছিলাম—তোমরা বোধ হয় জানো না—এ যুদ্ধে ইতালির পরাজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না। মুসোলিনীর ভরাডুবি হবেই, সেইসঙ্গে ইতালিরও।

জ্যুসেপ্পে : ঐ একটা লোক, ঐ একটা লোকের জন্যেই সারা দেশটার এই হাল! ঐ শয়তানের বাচ্চাটার জন্যেই আমাদের আজ বাড়ি-ঘর ছেড়ে বনে জঙ্গলে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। মুসোলিনী একটা ডাকাত, একটা খুনে, সারা ইতালিকে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে।

বেল্‌লিনি : আমার কাছে খবর আছে—রাশিয়ায় জার্মানরা বেদম মার খাচ্ছে, স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে জার্মান ফৌজ হারছে—লালফৌজ ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে—

বুক্‌ফেল্লি : সত্যি স্তালিন হচ্ছেন একজন নেতার মত নেতা। সারা দুনিয়ার ভাগ্য আজ স্তালিনের হাতে।

মার্গেরিতা খাবার নিয়ে ঢোকে।

জ্যুসেপ্পে : বাঃ, বাঃ, মার্গেরিতা কত কাজের মেয়ে হয়ে উঠেছে; বলতে না বলতেই খাবার এসে হাজির।

মার্গেরিতা : দিনকে দিন তুমি ভারী ফাজিল হয়ে উঠেছো দাদু! নাও, ধরো খেতে শুরু করো। [বেল্‌লিনিকে] নিন সিনোর, অনেক দূর থেকে এসেছেন, নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে।

বেল্‌লিনি : না—ইয়ে—মানে আমাকে কেন? আমার সঙ্গে খাবার রয়েছে।

জ্যুসেপ্পে : নিন সিনোর, নিন। মার্গেরিতার মত সুন্দরী মেয়ে যখন নিজে হাতে করে দিচ্ছে।

মার্গেরিতা : আঃ দাদু—কি হচ্ছে?

জ্যুসেপ্পে : আপনার ইচ্ছে হলে আপনিও আমাদের সংসারে চলে আসতে পারেন কাউণ্ট।

বেল্‌লিনি : বলছি না—কাউণ্ট বলে না ডেকে, বেল্‌লিনি বলে ডাকতে?

জ্যুসেপ্পে : ঠিক আছে সিনোর, আর ভুল হবে না।

মার্গেরিতা : [বুক্‌ফেল্লিকে] নাও, তুমিও ধরো—

বুক্‌ফেল্লি : না, থাক। খিদে নেই।

প্রস্থানোদ্যত।

জ্যুসেপ্পে : ওরে ছোঁড়া—কোথায় চললি?

বুক্‌ফেল্লি : দেখি—কোথায় যাওয়া যায়—

প্রস্থান।

জ্যুসেপ্পে : কেন ওর মনে কষ্ট দাও মার্গেরিতা?

মার্গেরিতা : কেউ যদি ইচ্ছে করে কষ্ট পেতে চায় তো আমি কি করতে পারি?

বেল্‌লিনি : ইয়ে—মানে এখনও তো তোমাদের পরিচয় ভালো করে জানতেই পারলাম না।

জ্যুসেপ্পে : আমাদের পরিচয় আর কি জানবেন সিনোর? আমরা কেউ নামজাদা লোক নই। নেহাতই খেটে খাওয়া মানুষ। আমার নাম জ্যুসেপ্পে নেগ্রী। নেপল্‌সের জাহাজী আদমী। আর ঐ যে চলে গেল ও হলো বুক্‌ফেল্লি। পার্মার স্টিল প্ল্যাণ্টের শ্রমিক ছিলো। আর এই যে সুন্দরী মেয়েকে দেখছেন—এর যে কোথায় বাড়ি, আগে কি করতো, কিছু জানি না, হাজার প্রশ্ন করেও জবাব মেলে নি।

বুফ্‌ফেল্লি দ্রুত ঢোকে।

বুফ্‌ফেল্লি : শুয়ে পড়ো—শুয়ে পড়ো—শিগ্‌গির—

জ্যুসেপ্পে : কেন—শোবো কেন ?

বুফ্‌ফেল্লি : আঃ—শুনতে পাচ্ছো না ? ঐ শোনো—জার্মান প্লেনগুলো ফিরে যাচ্ছে—

বেল্‌লিনি : কোথায় বোমা ফেলে এলো—কে জানে—

বুফ্‌ফেল্লি : শুয়ে পড়ো—শিগ্‌গির !

সবাই শুয়ে পড়ে। প্লেনের গর্জন বাড়তে বাড়তে চরম পর্যায়ে পৌঁছে আবার আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। সবাই উঠে পড়ে। উঠতে গিয়ে বেল্‌লিনির পকেট থেকে কি যেন পড়ে যায়।

মার্গেরিতা : কি যেন পড়ে গেল আপনার পকেট থেকে কাউন্ট ?

বুফ্‌ফেল্লি : আরে এ যে রিভলবার ! কার ?

বেল্‌লিনি : বাড়ি থেকে বেরুনোর সময় নিয়ে এসেছিলাম। কে জানে কখন কি দরকার হয়—

জ্যুসেপ্পে : দেখি-দেখি—বাঃ মালটা তো চমৎকার !

বেল্‌লিনি : ওটা তোমার কাছেই রাখতে পারো জ্যুসেপ্পে নেগ্রী, আমার কোনো আপত্তি নেই।

বুফ্‌ফেল্লি : হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা রেখে দাও, এখন যুদ্ধের সময়, কাজে লাগতে পারে।

জ্যুসেপ্পে : হাঃ হাঃ—ভালো বলেছিস বুফ্‌ফেল্লি ! হিটলার মুসোলিনীর রয়েছে লাখ লাখ রাইফেল-মেসিনগান, হাজার হাজার কামান-ট্যাংক-বোমারু বিমান ; আর ইতালির জনগণের হাতে রয়েছে শুধু একটা ছ ঘরার রিভলবার—হাঃ হাঃ হাঃ, তবু আমরা জিতবো—এই ক্ষুদে রিভলবারের নল থেকেই জন্ম নেবে নতুন ভবিষ্যৎ, নতুন পৃথিবী।

উর্বানো লেৎসারো ঢোকে।

উর্বানো : কি হে জ্যুসেপ্পে নেগ্রী—খুব গরম গরম বুলি ঝাড়ছো যে !

জ্যুসেপ্পে : তা ছাড়া আর কি করবো বলো ; সারা দেশে আগুন লেগেছে, আমরা সেই আগুনের তাত পোহাচ্ছি।

উর্বানো : হবে, হবে—সব হবে ! অত অস্থির হলে চলে !

জ্যুসেপ্পে : আর হয়েছে ! হবার আগেই বোধ হয় কবরে যেতে হবে !

বুফ্‌ফেল্লি : তারপর উর্বানো, তোমাদের এদিকে খবরটবর কি ?

উর্বানো : আর খবর ? কোন্‌দিন বোমা পড়ে খতম হবো তার ঠিক নেই—

বুফ্‌ফেল্লি : কেন ? কেন আমরা শুধু পড়ে পড়ে মার খাবো ? কেন এই ভাবে জন্তুর মতো পালিয়ে বেড়াব ?

জ্যুসেপ্পে : [উর্বানোর সঙ্গে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করে] তোমরা একটু যাও।

আমার অনেকদিনের পুরোনো দোস্ত উর্বানো লেৎসারোর সঙ্গে আমার কিছু কথাবার্তা আছে।

বুফ্‌ফেল্লি : তা কি এমন গোপনীয় কথাবার্তা যে আমরা শুনতে পারি না ?

জুসেপ্পে : তোর নাক টিপলে শালা এখনও দুধ বেরোয়, আর তুই আমাদের মতো দুই প্রাপ্তবয়স্ক প্রবীণ ব্যক্তির কথাবার্তা শুনতে চাইছিস কোন্‌ আক্কেলে ? যা, যা, কেটে পড়। আমরা এখন একটু বুড়ো বয়েসের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারী নিয়ে বাতচিত করবো! যা।

বুফ্‌ফেল্লি : শকুন তো, নোংরা ঘাঁটার স্বভাব যাবে কোথায় ?

তিনজনের প্রস্থান।

উর্বানো : বুফ্‌ফেল্লি ছেলেটা ভালো! আমাদের কাজে লাগবে।

জুসেপ্পে : তা ঠিক। তবে অল্প বয়েস, বড্ড মাথাগরম আর খামখেয়ালী।

উর্বানো : শোনো অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে একটা যোগাযোগ হয়েছে। আজই হয়তো আসবেন।

জুসেপ্পে : চমৎকার খবর! এতদিনে সত্যিই হয়তো পথ খুঁজে পাবো।

উর্বানো : তোমরা সবাই এখানে থেকো। আমিই সঙ্গে করে নিয়ে আসবো।

প্রস্থানোদ্যত।

জুসেপ্পে : আরে দাঁড়াও, তোমায় একটা জিনিস দেবো।

রিভলবারটা দেয়।

উর্বানো : বাঃ! চমৎকার জিনিসটা তো! কোত্থেকে পেলে ?

জুসেপ্পে : ঐ যে ভদ্রলোককে দেখলে—নতুন এসেছেন—তাঁর।

উর্বানো : ভালো ভালো! জঙ্গলের গোপন অস্ত্রাগারে এই ভাবেই অস্ত্রসংগ্রহ চলুক। তারপর ঘটবে একদিন অভাবিত ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ!

দু জনের প্রস্থান। অন্যদিক দিয়ে মার্গেরিতার পেছনে পেছনে বুফ্‌ফেল্লি ঢোকে।

বুফ্‌ফেল্লি : মার্গেরিতা দাঁড়াও, চলে যেও না—শোনো!

মার্গেরিতা : আমার কিছু শোনার নেই বুফ্‌ফেল্লি, রাত হতে চললো, তুমি শুতে যাও—

বুফ্‌ফেল্লি : তুমি কেন এমন করছো মার্গেরিতা ? আমি কি এমন অন্যায় কথা বলেছি ?

মার্গেরিতা : ন্যায়-অন্যায় বোধ তোমার লুপ্ত হয়ে গেছে বুফ্‌ফেল্লি।

বুফ্‌ফেল্লি : আমি তোমায় ভালোবাসি। এটা কি আমার অন্যায় ?

মার্গেরিতা : এক কথা কেন বারবার বলো ?

বুফ্‌ফেল্লি : আশ্চর্য! তোমার কি মন বলে কোনো পদার্থ নেই ? তুমি কি পাথর ?

মার্গেরিতা : আমার পক্ষে অসম্ভব—

বুফ্ফেল্লি : কেন ? তুমি কি অন্য কাউকে—

মার্গেরিতা : ধরো তাই। কারুর জন্যে আমি অপেক্ষা করে আছি।

বুফ্ফেল্লি : সে যদি না আসে ?

মার্গেরিতা : আসবে, তাকে আসতেই হবে।

জ্যুসেপ্পে ও বেল্লিনির প্রবেশ।

জ্যুসেপ্পে : এ কি রে বুফ্ফেল্লি—একটু আগেই তোদের ঝগড়া হলো, আর এখন ভাব হয়ে গেছে ? নাঃ, তোর কপাল খুলেছে দেখছি—হাঃ হাঃ হাঃ—

মার্গেরিতা চলে যায়

বুফ্ফেল্লি : [ঝাঁঝিয়ে] সব সময় অমন শেয়ালের মতো হেসো না, আমার ভালো লাগে না।

বেল্লিনি : বুঝলে জ্যুসেপ্পে নেগ্রী—লালফৌজ আর কিছুদিনের মধ্যেই বার্লিনের দোর গোড়ায় গিয়ে হাজির হবে। রোম যদিও এখনও জার্মানদের দখলে, তবু তার ওপর মিত্রপক্ষের চাপ ক্রমশঃই বাড়ছে—মুসোলিনীর নতুন রাজধানী লেকগার্দার ধারের সালোও খুব একটা নিরাপদ নয়।

জ্যুসেপ্পে : আমাদের সব দুর্দশার মূলে ঐ শয়তান—বেনিতো মুসোলিনী।

বুফ্ফেল্লি : এখন মুসোলিনীর ওপর এত রাগ কেন ? এককালে এই আমরাই তো তাকে মাথায় করে নেচেছি—ইল দুচে মুসোলিনী বলে শ্লোগান দিয়েছি—

জ্যুসেপ্পে : না! আমরা শ্রমিকরা দিই নি। প্রথম থেকেই আমরা মুসোলিনীকে মালিকের দালাল বলে মনে করতাম। ফ্যাশিস্তদের তাই সব চেয়ে রাগ ছিল আমাদের ওপর। ক্ষমতায় এসেই মুসোলিনী প্রথমেই শ্রমিক আন্দোলনের ওপর আঘাত হানে। কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি করে।

বেল্লিনি : কিন্তু তোমরা তে মুসোলিনীকে আটকাতেও পারো নি জ্যুসেপ্পে নেগ্রী—

জ্যুসেপ্পে : তা পারি নি। কেননা—আমাদের মধ্যে কোনো ঐক্য ছিল না। সোশ্যালিস্টরা তখন কমিউনিস্টদের মনে করতো শত্রু,তাই তারা কমিউনিস্টদের রুখতে মুসোলিনীর মধ্যে প্রগতিশীলতা আবিষ্কার করে ফ্যাশিস্তদের সঙ্গে হাত মেলায়। ১৯২৩ সালের কথা একবার ভাবো, সারা ইতালি তখন অগ্নিগর্ভ—কারখানায় কারখানায় ধর্মঘট শ্রমিক বিক্ষোভ! মালিকশ্রেণী তখন শ্রমিক বিপ্লবের ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। তবু বিপ্লব হলো না। ঠিক সময়ে কেউ এগিয়ে এসে ডাক দিলো না। দেখা দিল প্রতি-বিপ্লব। বড়লোকেরা আর কারখানা মালিকেরা মদত দিলো মুসোলিনীর ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীকে। আর এই কাউন্টদের মতো মধ্যবিত্তরা রাতারাতি ফ্যাশিস্ত বনে গেলো—১৯২৩ এর ৩০শে অক্টোবর মুসোলিনী বিনা বাধায় রোম দখল করলো।

বুফ্‌ফেল্লি : বাঃ, বাঃ, তুমি দেখছি ভালোই রাজনীতি বোঝো, কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক নেতা বনে গেছো।

জ্যুসেপ্পে। তুই আমাকে কি মনে করিস ছোঁড়া? আমি নেপল্‌সের নাবিকদের ইউনিয়নের সেক্রেটারি ছিলাম।

বুফ্‌ফেল্লি : তুমি সেক্রেটারি ছিলে, আর আমিও পার্মার স্টীল প্ল্যান্টে ইউনিয়ন করতাম — ইতালির শ্রমিক আন্দোলনের কম শক্তি ছিল না তবু আমরা কেউ মুসোলিনীর গায়ে আঁচড়টিও কাটতে পারি নি —

জ্যুসেপ্পে : তা পারি নি অবশ্য — কেননা, আমাদের মধ্যেও অনেকে তখন পার্লামেন্টের দরজা দিয়ে সরকারী ক্ষমতার আসনে চড়ে বসার দিবাস্বপ্ন দেখেছিল, তাই ফ্যাশিস্ত অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে দেশজোড়া সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায় নি। আর এই কাউণ্টদের মত মধ্যবিত্তরা তখন মুসোলিনীর নামে পাগল।

বেল্‌লিনি : হ্যাঁ তখন আমরা বুঝি নি মুসোলিনী মানেই যুদ্ধ, ফ্যাশিজ্‌ম মানেই স্বৈরতন্ত্র — ব্যক্তি স্বাধীনতার লোপ। আর তার মাশুল গুণতে হচ্ছে আজকে বাড়ি ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসে; স্কুলের টিচার্স রুমে বসে মুসোলিনীর বিরুদ্ধে সামান্য বেফাঁস কথা ফেলেছিলাম বলে আমার নামে হুলিয়া বেরিয়ে গেছে।

মা, মা বলে ডাকতে ডাকতে বছর ছ-সাতের একটি ছোট ছেলে ঢোকে।

জ্যুসেপ্পে : এটা অবার কে? এ চিড়িয়া আবার কোত্থেকে এলো?

ছেলেটি : আমার মা কোথায়? মা?

মার্গেরিতার প্রবেশ।

মার্গেরিতা : কি সুন্দর ফুটফুটে ছেলে! কে তুমি? তোমার নাম কি? কোত্থেকে এলে?

কাছে টেনে নেয়।

ছেলেটি : আমার মাকে দেখেছো তোমরা?

মার্গেরিতা : কে তোমার মা? কি নাম তোমার?

ছেলেটি : আমার নাম পেপে। আমার মা কোথায়?

বুফ্‌ফেল্লি : তোমার মা কোথায় — আমরা কি করে বলবো! তুমি এখানে এলে কি ক'রে?

পেপে : এরোপ্লেনে আসছিলো তো — মা বললে — ছোট্‌, ছুটে গিয়ে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়। আমি ছুটতে লাগলাম — তারপর কি আওয়াজ! আমি পড়ে গেলাম। তারপর চারিদিকে কত ধোঁয়া, আমি উঠে দেখি — মা নেই —

বেল্‌লিনি : একটু আগে যে প্লেনগুলো বোমা ফেলতে এসেছিল, সেগুলোর কথা বলছে —

মার্গেরিতা : সেই থেকে একা একা এই জঙ্গলে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে ? আহা, বেচারা !

পেপে : আমার মা কোথায় ?

জ্যুসেপ্পে : গেছে, নির্ঘাত ওর মা খতম ! বাজি ধরে বলতে পারি—

মার্গেরিতা : চুপ করো তুমি, বাচ্চাটাকে আর ভয় দেখিও না !

পেপে : আমার মা কই ? আমি মার কাছে যাবো—

মার্গেরিতা : যাবে বৈ কি সোনা—আমি ঠিক নিয়ে যাবো। এখন তুমি আমার সঙ্গে এসো কিছু খেয়ে নেবে চলো—আহা হা—মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেছে।

জ্যুসেপ্পে : মনে হচ্ছে আমাদের সংসারে আর একটি প্রাণীর সংখ্যা বাড়লো।

বুফ্‌ফেল্লি : কি দরকার আমাদের এই ভবঘুরে জীবনে বাচ্চাটাকে জড়িয়ে, আজ আছি, কাল নেই, কি হবে মায়া বাড়িয়ে ?

মার্গেরিতা : কি হবে না হবে আমি ভাববো। তোমাদের মাথা না ঘামালেও চলবে। দরকার হলে নিজে না খেয়েও এর মুখে খাবার জোটাবো, তোমাদের খাবার কম পড়বে না।

বুফ্‌ফেল্লি : খাওয়ার কথা বলছে কে ? আমি বলছি—এই বিপদের দিনে ছোটো একটা বাচ্চাকে বয়ে বেড়াবার দরকারটা কি ? আমরাই যেখানে যে কোনো সময় মরতে পারি—

মার্গেরিতা : আর এই বাচ্চাটাকে একা একা জঙ্গলের মধ্যে ছেড়ে দিলে ও বেঁচে থাকবে ? তোমাদের কি হৃদয় বলে কিছু নেই ?

বুফ্‌ফেল্লি : তোমার যে কত হৃদয় আছে তা আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি।

মার্গেরিতা : তুমি কি বুঝবে বুফ্‌ফেল্লি ? তুমি তো কখনও মা হও নি, তুমি তো কখনও ছেলে হারাও নি !

বুফ্‌ফেল্লি : মার্গেরিতা !

জ্যুসেপ্পে : তোরও তাহলে ঘর সংসার ছিলো ? তোরও ছেলে ছিলো ?

মার্গেরিতা : আমি মা হয়ে তার মৃত্যু নিজের চোখে দেখেছি।

বুফ্‌ফেল্লি : কারা মেরেছে তোমার ছেলেকে ? কেন মেরেছে ?

মার্গেরিতা : আমার স্বামীকে ধরতে এসেছিল ফ্যাশিস্ত মিলিশিয়ারা—তিনি আগে খবর পেয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। তখন আমার কাছ থেকে কথা বের করার জন্যে আমার পাঁচ বছরের বাচ্চাটার পেটে একটু একটু করে বেয়নেট ঢুকিয়ে—

সবাই : মার্গেরিতা !

মার্গেরিতা : ভুলে গিয়েছিলাম ! একেবারে ভুলতে চেয়েছিলাম ! এখন আবার এই একে দেখে—

বুফ্‌ফেল্লি : আশ্চর্য! আমরা কখনই ভাবতে পারি নি।

মার্গেরিতা : তাই দরকার হলে আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাবো, তবু একে ছাড়বো না।

পেপেসহ প্রস্থান।

বুফ্‌ফেল্লি : মার্গেরিতা, শোনো যেও না। আমি ভুল করেছি। ক্ষমা চাইছি—

বেল্লিনি : কতজনের বুকের ভেতরে কত কষ্ট যে জমা হয়ে আছে—কে তার হিসাব রাখে?

জ্যুসেপ্পে : কত বছর আমি বাড়ি ছাড়া। বৌ-ছেলে-মেয়েরা কি ভাবে আছে কে জানে! আদৌ বেঁচে আছে কিনা—

বুফ্‌ফেল্লি : আমার মা-বোনকে ধর্ষণ করেছিল জার্মান ফৌজ। মা লজ্জায় অপমানে আত্মহত্যা করেন। আর বোনটা হয়তো রোমে অথবা বার্লিনে জার্মান ফৌজের ব্যারাকে ব্যারাকে শকুনের খাদ্য হয়ে দিন কাটাচ্ছে—

বেল্লিনি : পুরো দেশটাই আজ কয়েদখানা! আমাদের সবার হাতে পায়ে শেকল পরানো।

বুফ্‌ফেল্লি : [চিৎকারে ফেটে পড়ে] কমিউনিস্ট পার্টি কি করছে? কমিউনিস্টরা কি মরে গেছে? আমাদের বুকফাটা কান্নায় ইতালির আকাশ যখন গুমরে গুমরে উঠছে, তখনও কেন কমিউনিস্ট পার্টি এগিয়ে আসছে না? কেন আমাদের পথ দেখাচ্ছে না?

দ্রুত মিকেলে মোরেত্তির প্রবেশ।

মিকেলে : তোমরা সবাই রয়েছো দেখছি—তোমাদের কাছেই এলাম!

জ্যুসেপ্পে : কি ব্যাপার মিকেলে মোরেত্তি? হঠাৎ এই রাত্তিরে অসময়ে?

মিকেলে : উর্বানো কিছু বলে গেছে?

জ্যুসেপ্পে : হ্যাঁ—তিনি কি—

মিকেলে : লুইজি কানালি জঙ্গলে এসেছেন। উর্বানো নিয়ে আসছে।

বুফ্‌ফেল্লি : কে? কে এসেছেন?

মিকেলে : কমরেড লুইজি কানালি। আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট নেতা—

বুফ্‌ফেল্লি : [উল্লাসে] সত্যি? সত্যি বলছো? আমার আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করছে! পার্টি তাহলে এখনও বেঁচে আছে? এখনও লড়ে যাচ্ছে?

মিকেলে : পার্টি বেঁচে থাকবে না কেন? আমরাই তো পার্টি!

বুফ্‌ফেল্লি : আর কোনো চিন্তা নেই। পার্টি আমাদের পথ দেখাক। আমরা কিছু করতে চাই!

জ্যুসেপ্পে : হবে, হবে, অস্থির হোস নি বুফ্‌ফেল্লি, সব হবে—

বেল্লিনি : যদিও আমি কমিউনিস্ট নই, তবু আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকবো। কেননা কিছু একটা হোক এবার, এইভাবে আর পড়ে পড়ে মার খেতে ইচ্ছে

করছে না—

মিকেলে : ঐ যে—উনি এসে পড়েছেন—আসুন, আসুন কমরেড।

লুইজি কানালি ও উর্বানোর প্রবেশ।

জ্যুসেপ্পে [হাত বাড়িয়ে দেয়] আমরা আপনারই অপেক্ষায় ছিলাম কমরেড।

লুইজি : ধন্যবাদ, ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে।

সবাই লুইজিকে ঘিরে বসে।

উর্বানো : কি গো বুফ্ফেল্লি ? তুমি তো পার্মায় ইউনিয়ন করতে—তুমি কিছু বলো—

বুফ্ফেল্লি : আমি আর কি বলবো ? কমরেড এসেছেন, তার কাছ থেকেই শুনবো—

লুইজি : আমি তাহলে আলোচনা শুরু করছি কমরেডস্। হাতে আমাদের বেশি সময় নেই—আজ রাতেই আরো কয়েকটা জায়গায় কমরেডদের নিয়ে বসতে হবে।

জ্যুসেপ্পে : আপনি শুরু করুন কমরেড। এই তোমরা সবাই চুপ করো।

লুইজি : কমরেডস্। পৃথিবীতে কখনও শাসকশ্রেণী স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দেয় না। তাকে বলপূর্বক উৎখাত করতে হয়। ফ্যাসীবাদও আপনা আপনি শেষ হবে না, যদি না ফ্যাশিস্তদের বন্দুকের বিরুদ্ধে পাল্টা বন্দুক ধরা যায়। সশস্ত্র যুদ্ধ ছাড়া ফ্যাসীবাদকে উৎখাত করা যাবে না।

বুফ্ফেল্লি : আমি সম্পূর্ণ একমত। এখন আমাদের কি করতে বলেন ?

লুইজি : মিত্রপক্ষের সেনাবাহিনী, বিশেষতঃ কমরেড স্তালিনের নেতৃত্বাধীন সোভিয়েত লালফৌজ আমাদের সবচেয়ে বড় ভরসা। বাইরে থেকে তাঁরা যেমন আক্রমণ করে ফ্যাশিস্ত সেনাবাহিনীকে বিপর্যস্ত করছেন, তেমনি ফ্যাশিস্ত শাসনের ভেতরে দাঁড়িয়ে গেরিলা কায়দায় আক্রমণ চালিয়ে জার্মান আর ইতালির ফৌজকে আমাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে হবে—এইভাবে যদি ভেতর আর বাইরে থেকে যুগপৎ সাঁড়াশী আক্রমণ চালানো যায়—

মার্গেরিতার প্রবেশ।

মার্গেরিতা : পেপে ঘুমিয়ে পড়েছে, রাত হলো, তোমার শোবে না ? [লুইজিকে দেখে চমকে ওঠে] কে ?

লুইজি : [ছুটে যায়] জিয়ান্না, জিয়ান্না—তুমি !

কেঁদে ফেলে।

মার্গেরিতা : [জড়িয়ে ধরে] তুমি—সত্যিই তুমি—এতদিন পরে ?

বুফ্ফেল্লি : মার্গেরিতা—তুমি কমরেড লুইজিকে চেনো ?

লুইজি : জিয়ান্না—আমার জিয়ান্না—কেঁদো না, শান্ত হও !

জ্যুসেপ্পে : কমরেড লুইজি, কাকে আপনি জিয়ান্না বলছেন ?

লুইজি : [মার্গেরিতার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়] ইনি আমার স্ত্রী জুসিপ্‌পিয়ানা—

বেল্‌লিনি : এর নাম মার্গেরিতা নয় ?

বুফ্‌ফেল্লি : তুমি আমাকে কিছু বলো নি মার্গেরিতা !

জ্যুসেপ্পে : এরই নাম যুদ্ধ মহাশয়, এরই নাম যুদ্ধ ! যুদ্ধই একদিকে সাজানো সংসার ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে সবাইকে আলাদা করে দেয়, আবার যুদ্ধই একদিন সব শেষে সকলকে একসঙ্গে জড়ো করে সব অঙ্ক মিলিয়ে দেয়, ভাঙ্গা সংসার আবার জোড়া লাগিয়ে দেয় !

বেল্‌লিনি : যান কমরেড, আপনারা একটু নিভৃতে গিয়ে কথাবার্তা বলুন। এ যেন এক রূপকথার গল্প। দীর্ঘ যুগ বাদে আবার পুনর্মিলন !

লুইজি : [সলজ্জ] আপনারা কিছু মনে করবেন না। আমি এক্ষুণি আসছি। এসো জিয়ান্না।

লুইজি ও মার্গেরিতার প্রস্থান।

বেল্‌লিনি : আশ্চর্য, অদ্ভুত ! এমন কাণ্ড যে ঘটতে পারে ভাবাই যায় না !

জ্যুসেপ্পে : সবই ভালো হলো ! শুধু বুফ্‌ফেল্লির কথা ভাবলেই আমার বুকটা দুঃখে ফেটে যাচ্ছে ! আহা বেচারা !

বুফ্‌ফেল্লি : আর একটা কথা বললে খুন করে ফেলবো। বুড়ো বলে রেয়াত করবো না।

জ্যুসেপ্পে : আহা খেপে যাচ্ছিস কেন ? সত্যিই তো মার্গেরিতাকে তুই—

বুফ্‌ফেল্লি : বুফ্‌ফেল্লিকে তুমি আজও চিনলে না দাদু, আজো চিনলে না—

ছুটে প্রস্থান।

উর্বানো : বাদ দাও এ সব বাজে আলোচনা। শোনো জ্যুসেপ্পে, কমরেড কানালির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। উনি বলেছেন—আমাদের এই জঙ্গলে কয়েকটা গেরিলা স্কোয়াড গড়ে তুলতে হবে। কোনো জানান না দিয়ে একেবারে চুপিসারে হঠাৎ আক্রমণ করতে হবে।

মিকেলে : আমরা ওদের রাতের ঘুম কেড়ে নেবো। যেখানে পারবো, যখন পারবো, ওদের খতম করবো। আমরা কখনই সামনাসামনি লড়বো না, ওরা যখন অপ্রস্তুত থাকবে, তখনই পেছন থেকে আক্রমণ করবো।

জ্যুসেপ্পে : ঠিক বলেছো, মাথার ঘায়ে পাগলা কুকুরের মতো তখন ওরা দৌড়াদৌড়ি শুরু করবে। ওরা আমাদের কিছুতেই নাগাল পাবে না। বিশাল জনসমুদ্রে মাছের মত আমরা মিশে থাকবো, আর সুযোগ পেলেই ওদের শেষ করবো, ওরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই আঘাত হেনে দ্রুত আমরা সরে যাবো।

বেল্‌লিনি : কিন্তু অস্ত্র ? অস্ত্র পাবে কোথায় ?

উর্বানো : আপনি বোধ হয় জানেন না—ভবিষ্যতে এই ধরণের একটা প্রয়োজন

আসতে পারে ভেবে আমরা আগে থেকেই এই জঙ্গলে একটা গোপন অস্ত্রাগার গড়ে তুলেছি।

মিকেলে: অস্ত্র যা পেয়েছি, তা অবশ্য নেহাতই সেকেলে, তবে অ্যাকশান শুরু করার পক্ষে যথেষ্ট।

উর্বানো: তা ছাড়া শত্রুর অস্ত্রই গেরিলাদের অস্ত্র। আমরা শুধু ওদের মারবোই না, ওদের অস্ত্রও দখল করে নেবো। ওদের অস্ত্র ভাণ্ডারই আমাদের প্রয়োজন মেটাবে।

জ্যুসেপ্পে: আপনার রিভলবারটিও ঐ অস্ত্রাগারেই জমা পড়েছে কাউন্ট।

বেল্‌লিনি: জ্যুসেপ্পে নেগ্রী, আমাকে শুধু বেল্‌লিনি বলতে কি তোমার জিভে আটকাচ্ছে? কাউন্ট, কাউন্ট বলে আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছো কেন?

জ্যুসেপ্পে: আর বলবো না সিনোর। আমরা বিশ্বাস করি আপনি আমাদেরই লোক।

লুইজি ঢোকে।

লুইজি: অসমাপ্ত আলোচনাটা শেষ করে ফেলি এইবার।

জ্যুসেপ্পে: আপনি এত তাড়াতাড়ি চলে এলেন যে? এতদিন বাদে দেখা?

লুইজি: কমরেড, এখন যুদ্ধ চলছে। সময় বড় কম! হ্যাঁ, যা বলছিলাম— গেরিলা স্কোয়াডে—

জ্যুসেপ্পে: তবু আপনি মেয়েটার কাছে আর কিছুক্ষণ থাকলে পারতেন। ও বড় দুঃখী কমরেড!

লুইজি: ইতালির দুঃখের চেয়ে নিশ্চয়ই ওর দুঃখ বড় নয়। যাক সে কথা— গেরিলা যুদ্ধ শুরু করতে হলে—

মার্গেরিতার প্রবেশ।

মার্গেরিতা: লুইজি, আমার একটা কথাও তুমি শুনলে না।

লুইজি: ও সব কথা এখন থাক জিয়ান্না। পরে শুনবো। এখন ভীষণ ব্যস্ত।

মার্গেরিতা: না থাকবে না, শুনতে তোমাকে হবেই। আমি তোমার স্ত্রী। আমার এতগুলো দিন কি ভাবে দুঃখকষ্টে কেটেছে— কিছুই শুনবে না তুমি?

লুইজি: জিয়ান্না, তুমি এখন যাও। তোমার সব কথা আমি শুনবো, এখনও তার সময় হয় নি। এখন আমি বড় ব্যস্ত। একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং ভীষণ জরুরী কাজের দায়িত্ব নিয়ে আমি এসেছি। নষ্ট করার মতো এক মুহূর্ত সময় নেই আমার, এখানকার কথাবার্তা সেরে এক্ষুণি আমায় চলে যেতে হবে।

জ্যুসেপ্পে: না না, সে কি কথা! এতদিন বাদে দেখা হলো— এক্ষুণি চলে যাবেন? সে হয় না। আপনি বরং মার্গেরিতার সঙ্গেই কথা বলুন কমরেড, আমরা অপেক্ষা করছি।

বেল্‌জিনি : হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভালো, আমরা বরং একটু ঘুরে আসছি—

মার্গেরিতা ও লুইজি বাদে সবার প্রস্থান।

মার্গেরিতা : তুমি এইভাবে সবার সামনে আমাকে অপমান করলে কেন ?

লুইজি : আমি ভীষণ ক্লান্ত জিয়ান্না। তিন দিন ধরে ঘুমোবারও সময় পাই নি। সারা জঙ্গল চষে বেড়াতে হয়েছে। এ সব কথা এখন থাক।

মার্গেরিতা : কটা বছরের মধ্যে তুমি এমনভাবে দূরে সরে গেছো কেন ? তোমার কি হয়েছে ?

লুইজি : কিচ্ছু হয় নি আমার। দোহাই, এবার থামো।

মার্গেরিতা : লুইজি, আমি আবার ঘর বাঁধতে চাই, আবার আগের মতো— বিশ্বাস করো, এই যুদ্ধ, এই কুৎসিত রাজনীতির কূটকচালি আমার আর সহ্য হচ্ছে না—

লুইজি : জিয়ান্না, আমার কাজ আছে, আমি চললাম।

প্রস্থানোদ্যত।

মার্গেরিতা : [পথ আটকায়] না, যাবে না। তোমাকে বলতেই হবে— আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছো কেন ?

লুইজি : জিয়ান্না।

মার্গেরিতা : ভালো করে তাকাও আমার দিকে, এই ছাখো—আমি তোমার স্ত্রী, তোমার ভালোবাসার জিয়ান্না—

লুইজি : কোনো ভালোবাসাই টিঁকবে না জিয়ান্না, যতদিন না মুসোলিনীর দল কবরে যায়—

মার্গেরিতা : কতকাল—কত দীর্ঘ সময় বাদে তোমাকে ফিরে পেয়েছি—তবু কেন তুমি আর সেই আগের তুমি নেই ?

লুইজি : ইতালিই কি আগের ইতালি আছে ? নিজেকে প্রশ্ন করো—তুমি তো মা হয়ে নিজের ছেলের মৃত্যু দেখেছো—

মার্গেরিতা : লুইজি !

লুইজি : তবু কেন ক্রোধ আর ঘৃণায় তোমার মনের আকাশ বিষিয়ে উঠছে না ? এতবড় যুদ্ধ চোখের সামনে দেখছো, তবু এখনও ঐ সব বস্তাপচা ঘর গেরস্থালীর মেয়েলী আবেগগুলো ছাড়তে পারো নি কেন ?

মার্গেরিতা : আমি বিশ্বাস করি—যুদ্ধক্ষেত্রেও ভালোবাসা যায়, কামানের গর্জনেও প্রেম নিবিড় হয়ে আসে। না হয় আমাদের মাথার ওপরে মাঝে-মাঝেই বোমারু বিমান গর্জন করে ওঠে, না হয় আমাদের তলার মাটিতে রক্তের দাগ, তবু তো এখানে ফুল ফোটে, পাখিরা গান গায়—

লুইজি : জিয়ান্না, আমার বুকের মধ্যে শুধু শৃংখলিত ইতালি সমুদ্রের মত ফুঁসছে। আগে যুদ্ধ, আগে ফ্যাসীবাদের বিনাশ। তারপর অন্য সব কাজ—

ঘর-সংসার—সবকিছু।

মার্গেরিতা: তবু আমার দিকে একবার তাকাও—[এগিয়ে যায়] আমি তোমার সেই জিয়ান্না—যাকে তুমি বুকের ভেতর চেপে ধরে আদর করে ডাকতে চড়ুইপাখি—আমি সেই—

লুইজি: [ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়] সরে যাও। সময় নেই। এখন শয়নে স্বপনে একটাই চিন্তা—ফৌজগঠন—লাল ফৌজ—অ্যাকশান—গেরিলা অ্যাকশান—

দ্রুত প্রস্থান।

মার্গেরিতা: [ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে] ও তো এমন ছিল না, ও এমন বদলে গেল কেন? যুদ্ধ কি মানুষকে এমন করে বদলে দেয়? ভালোবাসার থেকে কর্তব্যকে এমন করে বড় করে তোলে? ও আর মানুষ নেই, ও একটা মেশিন, প্রেম নেই, প্রীতি নেই, হৃদয় নেই, শুধু কাজ আর কাজ! এক রোখা ঘোড়ার মত শুধু ছুটে চলেছে, ছুটেই চলেছে—

বুফ্‌ফেল্লির প্রবেশ।

বুফ্‌ফেল্লি: জিয়ান্না—তুমি কাঁদছো!

মার্গেরিতা: [ছুটে যায়] তুমি আমায় বাঁচাও বুফ্‌ফেল্লি, তুমি আমাকে উদ্ধার করো।

বুফ্‌ফেল্লি: কি হয়েছে? এমন করছো কেন? তোমার আর কিসের দুঃখ? কমরেড লুইজিকে আবার ফিরে পেয়েছো—তুমি তো তাঁরই প্রতীক্ষায় এতকাল আশার আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিলে।

মার্গেরিতা: সে আগুন নিভে গেছে, পড়ে আছে একরাশ পোড়া ছাই! যার জন্যে আমি অপেক্ষা করছিলাম—আজ বুঝলাম—সে কোনোদিন ভাবে নি, কখনও নয়। বুফ্‌ফেল্লি, তুমি আমাকে নাও, আমাকে সুখী হতে দাও—

বুফ্‌ফেল্লি: তা হয় না। কখনই না। তুমি পরস্ত্রী। আমি যদি ঘুণাক্ষরেও আগে জানতাম, তবে কখনই তোমার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করতাম না।

মার্গেরিতা: তুমি বোধ হয় আমার এতদিনের অবহেলার প্রতিশোধ নিচ্ছ বুফ্‌ফেল্লি?

বুফ্‌ফেল্লি: তা নয় জিয়ান্না—বলতে পারো এতদিনের ভুল এবার সংশোধন করছি!

মার্গেরিতা: তোমরা সব পুরুষেরা সমান। আমাদের আবেগ, আমাদের ভালোবাসার কোনো মূল্যই নেই তোমাদের কাছে।

বুফ্‌ফেল্লি: তোমার মাথার ঠিক নেই জিয়ান্না, তুমি শান্ত হও।

মার্গেরিতা: আমাকে জিয়ান্না বলে ডেকো না বুফ্‌ফেল্লি, আমি তোমার মার্গেরিতা—

বুফ্‌ফেল্লি : তুমি আমাদের নেতা কমরেড লুইজি কানালির স্ত্রী কমরেড জুসিপ্‌পিয়ানা—

মার্গেরিতা : আমি ভুল করেছি বুফ্‌ফেল্লি। আমি ভুল লোকের জন্যে এতকাল পথ চেয়ে বসেছিলাম—ভুল ভালোবাসার মোহে তোমাকে কষ্ট দিয়েছি এতদিন।

বুফ্‌ফেল্লি : মার্গেরিতা—

মার্গেরিতা : সে লোকের হৃদয়ে আমার জন্যে একটুও জায়গা নেই বুফ্‌ফেল্লি, তার সমস্ত বুক জুড়ে বসে আছে শুধু কমিউনিস্ট পার্টি।

বুফ্‌ফেল্লি : ঠিক সেই জন্যেই আমি কমরেড লুইজিকে এত শ্রদ্ধা করি, আর সেই জন্যেই তাঁর কোনো অসম্মান করতে আমার বিবেকে বাধে।

মার্গেরিতা : বুফ্‌ফেল্লি, দোহাই আমাকে তুমি ফিরিয়ে দিও না এমন করে।

বুফ্‌ফেল্লি : কমরেড লুইজি কানালির স্ত্রীর দিকে লোভের দৃষ্টিতে তাকানো আমি অপরাধ বলে মনে করি।

মার্গেরিতা : তুমি ভুল করছো বুফ্‌ফেল্লি। আমি অত্যন্ত সাধারণ একটা মেয়ে, বিপ্লব-টিপ্লবের চেয়ে ঘরসংসার বাঁধার স্বপ্ন আমাকে অনেক বেশি টানে। লুইজি কোনোদিন আমাকে সেই সংসার সেই গৃহস্থালীর সুখ দেয় নি—একটা প্রচণ্ড উল্কার মত চারপাশের সব কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সে শুধু চিরকাল ছুটে গেছে। বিশ্বাস করো, ওর সঙ্গে তাল রেখে ছুটতে গিয়ে চিরটাকাল আমি শুধু হাঁপিয়ে উঠেছি। আজ আমাকে তুমি বাঁচাও বুফ্‌ফেল্লি, আমাকে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে দাও।

বুফ্‌ফেল্লি : মার্গেরিতা, তোমার ছেলেকে ফ্যাশিস্তরা খুন করেছে।

মার্গেরিতা : চুপ করো, থামো! তুমিও দেখছি লুইজির মতো কথা বলছো—

বুফ্‌ফেল্লি : কমরেড জিয়ান্না, আমাকে ভুল বুঝো না। তোমার আর আমার মধ্যে বন্ধুত্ব আর কমরেডশিপ ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্কই আজ হতে পারে না।

মার্গেরিতা : চুপ করো, মূর্খ, ভীরু, কাপুরুষ কোথাকার—

ছুটে প্রস্থান।

বুফ্‌ফেল্লি : যে কথাটা মুখ ফুটে কোনদিন তোমাকে বলবো না, কিন্তু মনে মনে পুষে রাখবো আজীবন—আমি তোমাকে এখনও ভালোবাসি মার্গেরিতা, আগের মতন সুতীব্র সেই ভালোবাসা! তবু কমরেড লুইজি আমার নেতা, তিনি আমাদের হতাশ বুকে স্বপ্নের জ্যোৎস্না ছড়িয়ে দিয়েছেন, প্রাণ থাকতে তাঁর বিশ্বাসের অমর্যাদা করতে পারবো না।

লুইজি, উর্বানো, মিকেলি ও বেল্‌লিনির প্রবেশ।

লুইজি : কমরেড বুফ্‌ফেল্লি—তোমাকেই খুঁজছিলাম। এদের সবার সঙ্গেই

কথা হয়ে গেছে। এখন শুধু তোমার মতামত নেওয়াটা বাকি—

বুফ.ফেল্লি : কি ব্যাপার, কমরেড? আপনি যা বলবেন আমি তাই করতে প্রস্তুত।

লুইজি : শোনো, আজ রাতেই কিছুক্ষণের মধ্যে এ্যালপাইন পাস্ দিয়ে জার্মান ও ইতালীয়ান আর্মির একটা বড় কনভয় দক্ষিণ দিকে যাবে। আজকেই আমাদের ঐ কনভয়টাকে ধ্বংস করতে হবে। এই কাজের দায়িত্ব নিয়েই আমি এখানে এসেছি কমরেড।

বুফ ফেল্লি : আমি প্রস্তুত। তাহলে আজই আমাদের স্কোয়াডের প্রথম অ্যাকশন হোক!

উর্বানো : আজকের অ্যাকশন করার মত আর্মস্ অ্যামুনিশান আমাদের যথেষ্ট আছে, অনেক দিন ধরেই আস্তে আস্তে আমরা জমিয়েছি।

লুইজি : তা ছাড়া আগামী তিন দিনের মধ্যেই আমাদের হাতে আরো বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র আসবে। খোদ রোমে তেরো নম্বর ইতালীয়ান গ্যারিসান বিদ্রোহ করে আমাদের দিকে চলে এসেছে, তাদের বাড়তি রাইফেলগুলো আমরা পাচ্ছি। এখানে আমরা একটা গেরিলা ওয়ারফেয়ার শেখার জন্যে ট্রেনিং সেণ্টার খুলবো, কেন্দ্রীয় কমিটির একজন অভিজ্ঞ কমরেড কয়েকদিনের মধ্যেই এই কাজের দায়িত্ব নিয়ে জঙ্গলে এসে পড়ছেন। ইতিমধ্যে সারা জঙ্গল জুড়ে যত বেশি পারা যায়, স্কোয়াড তৈরী করতে হবে। পরে এই স্কোয়াড-গুলো থেকেই গড়ে উঠবে আমাদের পার্টিজান আর্মি।

বুফ.ফেল্লি : পার্টিজান আর্মি? লাল ফৌজ? এ যে আমার কতদিনের স্বপ্ন কমরেড লুইজি, কতদিন আমি ঘুমের ঘোরে লালফৌজের কুচকাওয়াজের শব্দ শুনেছি—

লুইজি : তোমার সেই স্বপ্ন এবার সফল হতে চলেছে কমরেড।

উর্বানো : চলুন কমরেড লুইজি, আমাদের গোপন অস্ত্রাগার থেকে আপনি আর আমি রাইফেল আর গ্রেনেডগুলো নিয়ে আসি। সময় তো আর বেশি নেই। ওরা ততক্ষণ এখানেই অপেক্ষা করুক।

লুইজি ও উর্বানোর প্রস্থান।

মিকেলে : তোমাকে যেন একটু চিন্তিত দেখাচ্ছে—বুফ.ফেল্লি—

বুফ.ফেল্লি : হ্যাঁ মিকেলে—মনটা কিছুতেই স্থির হচ্ছে না।

মিকেলে : কেন, হলোটা কি?

বুফ.ফেল্লি : কমরেড লুইজির সঙ্গে মার্গেরিতার বোধ হয় ঠিক বনিবনা হয় নি।

বেল্লিনি : সে কি কথা! লুইজির মতো মহান মানুষকেও তার ভালো লাগলো না?

মিকেলে : মেয়েদের মন যে কী চায়, কার সাধ্য, তা বোঝে?

বেল্লিনি : না, না, এ তো ঠিক কথা নয়! আরেকটু বাদেই আমরা রক্তের অক্ষরে ইতালির নতুন ইতিহাস রচনা করতে চলেছি, এই সময় যদি কমরেড লুইজির স্ত্রী মিছিমিছি ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে কষ্ট পান, সেটা মোটেই ভাল দেখায় না। যাই, আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলি।

প্রস্থান।

মিকেলে : যাই বলো না কেন, কমরেড লুইজি একজন সাচ্চা কমিউনিস্ট। তাঁর আত্মত্যাগের কোনো তুলনাই হয় না।

বুফ্ফেল্লি : জানি। অথচ জিয়ান্না যে কেন তাঁকে—

নাচতে নাচতে জ্যুসেপ্পে ও পেপে ঢোকে।

জ্যুসেপ্পে : হুপ হুপ হুপ! আমি ল্যাজ কাটা এক বাঁদর! ছোট্ট খোকা পেপে সোনায় করবো আমি আদর! হুপ হুপ হুপ।

পেপে : [আনন্দে হাততালি দিয়ে] আবার, আবার করো।

জ্যুসেপ্পে আবার নাচে।

বুফ্ফেল্লি : বাঃ দাদু, তুমি দেখছি সত্যি-সত্যিই বাঁদর হয়ে গেছো! তাই না পেপেবাবু?

জ্যুসেপ্পে : আর বলিস কেন? ছোঁড়া এক ঘুম ঘুমিয়ে উঠে মার্গেরিতাকে খুঁজে না পেয়ে আমায় নিয়ে পড়েছে। ওঃ বুড়ো হাড়ে কি এত ধকল সহ্য হয়?

পেপে : বুফ্ফেল্লিকাকু, আমায় ঐ লাল ফুলটা পেরে দেবে?

বুফ্ফেল্লি : নিশ্চয়ই দেবো পেপেবাবু, সকাল হোক, সকাল হলেই পেরে দেবো।

পেপে : না। এক্ষুণি দাও। চলো, চলো না।

হাত ধরে টানে।

বুফ্ফেল্লি : দেখছো কাণ্ড! ছোঁড়া আমার মত কাঠখোট্টা মানুষকেও বশ করেছে। এই একটু আগেই আমি ওকে থাকতে দিতে চাই নি। আর এখন!

জ্যুসেপ্পে : সত্যি বাচ্চাটা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যেন আমাদের পালিয়ে বেড়ানোর কষ্টও ভুলিয়ে দিয়েছে।

মিকেলে : এরাই তো আমাদের ভবিষ্যৎ জ্যুসেপ্পে। এদেরই হাসিমাখা মুখে নতুন ইতালি উঁকি মারছে।

মার্গেরিতা ও বেল্লিনি ঢোকে।

বেল্লিনি : কি আশ্চর্য কাণ্ড। জিয়ান্না একা একা ঐ ঝর্ণাটার ধারে বসে কাঁদছিলো। জোর করে ধরে নিয়ে এলাম।

জ্যুসেপ্পে : তোমার আবার কিসের দুঃখ? ছেলে পেয়েছো, স্বামী পেয়েছো।

পেপে ও বুফ্কোল্লর প্রবেশ।

পেপে : মাসী, মাসী—ত্যাখো কি সুন্দর লাল ফুল! বুফ্ফেল্লি কাকু পেরে দিয়েছে।

জ্যুসেপ্পে : কিগো পেপেবাবু, লাল ফুল পেয়ে তুমি দেখছি আমাকে আর চিনতেই পারো না — হাঃ হাঃ হাঃ।

মিকেলে : [হঠাৎ চিৎকার] জ্যুসেপ্পে নেত্রী সাবধান !

জ্যুসেপ্পে : কি হলো ?

সবাই চমকে ওঠে।

দূরে প্লেনের আওয়াজ শোনা যায়।

মিকেলে : ঐ ছাখো ঝাঁকে ঝাঁকে প্লেন —

বেল্‌লিনি : ওরে বাব্বা ! এত প্লেন — অজস্র, অগুস্তি — আগে কখনো দেখিনি —

প্লেনের আওয়াজ বাড়ে।

জ্যুসেপ্পে : নিশ্চয়ই মিলিটারী কনভয়ের রাস্তা পরিষ্কার করতে এসেছে। কমরেড লুইজি ঠিক খবরই এনেছেন।

বুফ্‌ফেল্লি : শুয়ে পড়ো, প্রত্যেকে শুয়ে পড়ো। জিয়ান্না — পেপেকে কাছে রাখো।

ওরা প্রত্যেকে শুয়ে পড়ে। প্লেনের গর্জন ক্রমশঃ চরম বিন্দুতে পৌঁছায়। তারপর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণের শব্দ, অন্ধকার মঞ্চ ধোঁয়ায় ভরে যায়। হঠাৎ পেপে উঠে দাঁড়িয়ে "মা — মার কাছে যাবো" বলে ছুটতে শুরু করে।

মার্গেরিতা : [উঠে পড়ে] পেপে — পেপে — যাস নি —

পেপের পেছনে পেছনে সেও ছুটে যায়।

অন্যেরা : জিয়ান্না — মার্গেরিতা — যেও না সাবধান —

পরপর কয়েকটা বিস্ফোরণের শব্দ।

বুফ্‌ফেল্লি : জিয়ান্না — জিয়ান্না — কোথায় তুমি ?

ছুটে বেরিয়ে যায়। প্লেনের শব্দ দূরে সরে যায়।

বেল্‌লিনি : পেপের বোধ হয় এই বোমার আওয়াজে নিজের মার কথা মনে পড়ে গিয়েছে।

মিকেলে : এত প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ যখন — তখন নিশ্চয়ই এবার মিলিটারী কনভয় আসছে।

জ্যুসেপ্পে : উঠে পড়ো — আর হাত গুটিয়ে বসে থাকার সময় নেই। হয় এসপার, নয় ওসপার।

পেপের রক্তাক্ত মৃতদেহ নিয়ে মার্গেরিতা ঢোকে। পেছনে বুফ্‌ফেল্লি।

সবাই : [চিৎকার করে] পেপে !

একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা।

বুফ্‌ফেল্লি : স্প্লিণ্টারগুলো বুকটাকে একেবারে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে।

মার্গেরিতা : [এগিয়ে এসে হিমশীতল কণ্ঠে] এই শিশুটা কার কী ক্ষতি করেছিল ? কি শত্রুতা করেছিল সে মুসোলিনীর ? সে তো কোন রাজনীতি বুঝতো না, তবু কেন তাকে মরতে হলো ?

উর্বানো ও লুইজি অনেকগুলি গ্রেনেড ও রাইফেল নিয়ে ঢোকে।

লুইজি : আমরা ঠিক সময়েই এসে পড়েছি। কনভয় জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ঐ জন্যই দু পাশের রাস্তা সাফ করার জন্যে এলোপাথারি বম্বিং করে গেল। তোমাদের নিশ্চয়ই কারুর কিছু হয় নি? [পেপেকে দেখে চিৎকার করে ওঠে।] কী! মারা গেছে!

নীরবতা।

উর্বানো : ফুলের মত সুন্দর বাচ্চাটা!

লুইজি মার্গেরিতার কাছে এগিয়ে যায়।

লুইজি : তোমাকে যে কি বলে সান্ত্বনা দেবো—

মার্গেরিতা : [বিচিত্র হেসে] সান্ত্বনা? কোনো সান্ত্বনার প্রয়োজন নেই লুইজি।

লুইজি : ওকে আমার কাছে দাও। এইখানে নামিয়ে রাখি। সময় আমাদের বড় কম জিয়ান্না, ভালো করে শোক প্রকাশেরও সময় নেই।

মার্গেরিতা : তোমরা বিরাট মানুষ, তোমাদের সময়ের অনেক দাম। কিন্তু আমি সামান্য নারী, যুদ্ধ বুঝি না, রাজনীতি বুঝি না, শুধু বুঝি—আমার স্নেহ মমতা আর ভালবাসায় বেড়ে ওঠা একটা জীবন্ত প্রাণের জন্যে বুক-জোড়া আকুলতাকে। আমার যথেষ্ট সময় আছে লুইজি! তোমরা তোমাদের কাজ করো। আমি আমার এই মরা ছেলেটাকে বুকে নিয়ে সারা রাত জেগে বসে থাকবো।

লুইজি : প্রতিশোধ নেবে না জিয়ান্না?

মার্গেরিতা : কি?

লুইজি : তোমার দু দুটো ছেলেকে যারা মেরেছে, কনভয় নিয়ে তারা আসছে। প্রতিশোধ নেবে না পুত্র হত্যার!

মার্গেরিতা : লুইজি!

লুইজি : পেপেকে আমার হাতে দাও মার্গেরিতা। ওকে এই পাথরের ওপর শুইয়ে রাখি। আজকের অ্যাকশানটা সফল হলে কাল ভোরবেলায় ঝর্ণাতলার শিশির ভেজা নরম মাটিতে ওকে চিরকালের মত শুইয়ে রাখবো, আর ওর কবরের ওপর পুঁতে দেবো লাল গোলাপের একটা চারা। [মার্গেরিতার কাছ থেকে পেপেকে নিয়ে শুইয়ে রাখে] উর্বানো অস্ত্রগুলো বিলি করে দাও। শুনুন কমরেডস্, যতক্ষণ না আমি নির্দেশ দিচ্ছি ততক্ষণ কেউ একটা গুলিও ছুঁড়বেন না। আগে ওদের ভেতরে ঢুকতে দিন, রাইফেলের রেঞ্জের মধ্যে আসুক, তারপর অ্যাকশান। কভারেজ হিসেবে প্রত্যেকে ছড়ানো ছিটানো পাথরের চাঁইগুলো ব্যবহার করবেন। বেল্লিনি—আপনি বাঁদিকে থাকবেন, জ্যাসেপ্পে—তুমি ডানদিকে, বুফ্ফেল্লি-গ্রেনেডের থলিটা তোমার কাছে থাকবে, মিকেলে—তুমি আমার পাশে থাকো—সবাই একটু ছাড়িয়ে যান

—অনেকটা অর্ধবৃত্তের আকারে—সময় হয়ে এলো—গেট রেডি—পজিশান নিন। ওদের গাড়ির আওয়াজ দূর থেকে কানে আসছে—

মার্গেরিতা : আমাকে একটা রাইফেল দেবে না লুইজি ?

লুইজি : জিয়ান্না ! তুমি !

মার্গেরিতা : যদিও আগে কখনও ছুঁড়িনি, তবু বিশ্বাস করো—এখন আমার হাত একটুও কাঁপবে না।

লুইজি : এটাই তো আমি মনেপ্রাণে চেয়ে ছিলাম জিয়ান্না, যুদ্ধের আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, কোথায় পালাবে ? সবাইকেই ব্যারিকেডে আসতে হবে, হয় আজ, নয় কাল। উর্বানো ওকে রাইফেল দাও। বুফ্ফেল্লি, রাইফেল ছুঁড়তে শিখিয়ে দাও তাড়াতাড়ি জিয়ান্নাকে—কুইক, সময় নেই।

মার্গেরিতা : আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ লুইজি। তোমার এই মহানুভবতার জন্যে ধন্যবাদ !

লুইজি : মহানুভবতা বলছো কাকে ? জিয়ান্না, এখন তোমার আর আমার পথ এক হয়ে গেছে, আর আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদের কোনো দেওয়াল রইলো না।

মার্গেরিতা : তবু বোধ হয় কিছু কিছু দেওয়াল রয়ে যায় লুইজি, যা কোনদিন ভাঙ্গে না।

লুইজি : যদি থাকেও তবু তাতে আমার ভয় নেই ; ঘরের বাঁধন ছিঁড়ে যারা পথে নামতে জানে, কোনো দেওয়ালই তাদের পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, শেষ পর্যন্ত সব দেওয়ালই একে একে ভেঙ্গে যাবে।—বুফ্ফেল্লি—

বুফ্ফেল্লি : এসো জিয়ান্না—রাইফেলটা ভালো করে ধরো—কি ভাবে ছুঁড়তে হয়—দেখে নাও।

লুইজি : ওরা কিন্তু ক্রমশঃই কাছে এসে পড়েছে। কমরেডস্, ট্রিগারে আঙুল রেখে নিঃশব্দে অপেক্ষা করুন, একটা গুলিও যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়, প্রতিটা শয়তানের বুক যেন আমাদের বুলেটে ছিন্নভিন্ন হয়। হুঁসিয়ার কমরেডস্ !

সবাই বন্দুক উচিয়ে পজিশন নেয়।

জ্যুসেপ্পে : এমনি করেই গড়ে ওঠে গেরিলা স্কোয়াড—

উর্বানো : দীর্ঘদিনের অত্যাচার উৎপীড়ন বঞ্চনা আর লাঞ্ছনায়।

বেল্লিনি : প্রত্যেকটি বুকে যখন জমা হয় ঘৃণার বারুদ—

মিকেলে : মার খেতে খেতে প্রত্যেকটি শরীর যখন ইস্পাত হয়ে যায়—

বুফ্ফেল্লি : প্রতিটি রক্তকণায় জ্বলে ওঠে যখন ক্রোধের আগুন—

মার্গেরিতা : প্রতিকারহীন আঁধারে তখন গেরিলার বন্দুক গর্জে ওঠে, জন্ম নেয় গেরিলা স্কোয়াড।

লুইজি : ফা-য়া-র !

সবাই আক্রমণের ভঙ্গিতে স্থির।

ফেরার

চিত্তরঞ্জন দাস

বিলাস: ঐ কালো বেঁটে পুরুত, ঐ বদমাসটা আমাদের ঠিক চিনতে পেরেছিল।

মঙ্গল: চিনতে পেরেছিলো তো কী? আমরা কি খুনি আসামী? জেল ভাঙ্গা দাগী কয়েদী? নাকি ওর ঘরের তাবত সম্পত্তি চুরি করে ফেরার হচ্ছিলাম?

বিলাস: আমাদের জাতটা তার চেয়েও খারাপ মঙ্গলা। আমাদের মুখ দেখলে ওদের অমঙ্গল হয়। আমাদের স্পর্শ ওদের দেহে লাগলে ওদের চান করতে হয়।

যাদব: খামু, পুরুত ঠাকুর দু পায়ে হাঁটে না? মুখ দিয়ে কথা বলে না? হাসে না? কাঁদে না? তেষ্টা পেলে পানি খায় না?

নাটক : ফেরার

নাট্যকার : চিররঞ্জন দাস। জন্ম : ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯। বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের দর্শনে বিশ্বাসী। মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে অধ্যয়ন এবং তখন থেকেই নাট্যরচনা, পরিচালনা ও অভিনয়ের হাতেখড়ি। প্রথম নাটক— 'অর্জন না বিসর্জন' কলেজ পত্রিকায় প্রকাশিত। নব পর্যায়ের গণনাট্য সংঘের অন্যতম পুনর্গঠক ও পুরোধা। 'গণনাট্য' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন; 'নতুন থিয়েটার' এ্যানথোলজিও সম্পাদনা করেন। বর্তমানে গণনাট্য সংঘের সীমান্তিক শাখার নাট্য-পরিচালক। কলকাতা বেতারে ও লক্ষ্মৌ-দিল্লীর টি. ভি. তে এঁর একাধিক নাটক অভিনীত হয়েছে। পঞ্চাশখানার উপর নাটক ও নাটিকা রচনা করেছেন। প্রায় সবই প্রকাশিত —বিভিন্ন পত্রিকায় ও নাট্য গ্রন্থে। এঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতি পায়—'ভিয়েৎনাম', 'মৃত্যুহীন', 'সন্ত্রাস', 'সমুদ্রের স্বাদ' 'পশ্চিম স্বর্গ', 'জুলিয়াস ফুচিক', 'অক্টোবর বিপ্লব', 'কম্বোডিয়া', 'পালাবদল', 'গফুর আমিনা সংবাদ', 'আমিনা কাহিনী', 'তুমি আমি সবাই', 'পথে নামার সময়', 'জেহাদ', বিবসনা বৃহন্নলা' এবং 'ফ্রীডম রোড'। হিন্দী, উড়িয়া, অসমীয়া ও ইংরেজীতেও এঁর কতকগুলি নাটক অনূদিত, প্রকাশিত ও অভিনীত হয়েছে। চাকুরীজীবী। ফ্রীডম রোড গ্রুপ থিয়েটারের আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

রচনাকাল : মে, ১৯৭৮

চরিত্রলিপি : কনকী। ভরত। মঙ্গল। যাদব। বিলাস। রতন। গোকুল। ফেকু। রাজাবাবু। বিষেণ। অর্জুন।

অনুমোদন : এই নাটক অভিনয়ের জন্য অবশ্যই নাট্যকারের অনুমোদন লাগবে

সংলগ্ন ঠিকানা : বি-এ / ১৪২ সল্ট লেক কলকাতা ৭০০০৬৪

প্রথম দৃশ্য

চারদিকে পাহাড় ঘেরা সমতল প্রাঙ্গন। অপরাহ্ণ বেলা. ম্লান সূর্যের সিঁদুরে আলোয় প্রাঙ্গনের শুকনো গুল্মে আবীরের রঙে চকিত যৌবনোচ্ছ্বাস। বহু দূরে বেলা শেষের পাখীকুলের নীড় ফেরার কূজনে বোঝা যায় প্রাঙ্গনটি নির্জন জনমানব শূন্য। সভ্য-জগতের থেকে যোগচ্ছিন্ন। আকস্মিক দর্শনে মনে হয় এই পাহাড়ী প্রান্তর চিরকালের জন্ম মানব জগতের সাথে বিচ্ছিন্ন. কেমন যেন একটা অলৌকিক পরিবেশ সিঁদুরে দীপ্ত সূর্যশিখাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে।

সেই প্রাগৈতিহাসিক পরিবেশে নিতান্ত আগন্তুকের মত প্রবেশ করল চারজন পুরুষ এবং একজন নারী। পাঁচটি জাগ্রত যৌবন। প্রাঙ্গনে প্রবেশ করে তারা হাঁপাচ্ছে, পদসঞ্চার ক্লান্ত, বিস্রস্ত যৌবন তেজে যেন অসীম শ্রান্তির সংকোচ কাঁটা বিঁধোচ্ছে। পাঁচজন শ্লথ চরণে এসে প্রাঙ্গনের পাঁচটি কোণে দাঁড়াল। টান টান হয়ে নূতন পরিবেশে শ্বাস নিল। যে নারী সে শ্বাস নিতে গিয়ে অতর্কিতে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো প্রাঙ্গনে—অস্ফুট গোঙানিতে ভেসে উঠল তার বিপর্যস্ত কণ্ঠস্বর।

কনকী : আঁহা বাপরে পারছি না. পারছি না ! আমি আর পারছি না বিশ্বাস কর তোরা। উঃ মাগো—আমার পা আর এক কদমও নড়ছে না, বুকে বাতাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, তেষ্টায় ফেটে যাচ্ছে বুকের ছাতি।

ভরত : আর একটুখানি. একটুখানি পা চালা কনকী—

কনকী : একটুখানি একটুখানি করে তো সমস্ত দক্ষিণের উৎরাইটা পেরিয়ে এলাম রে ভরত ! আমি আর নড়তে পারছি না বিশ্বাস কর !

ভরত : তবু বলছি যত কষ্টই হোক আর কয়েক কদম এগিয়ে চল। আর কয়েক কদম না গিয়ে উপায় নেই।

কনকী : তার চেয়ে বল না কেন যমের বাড়ি যেতে। সেটা কোন্ পাহাড়ের চূড়োয় তার নিশেন লাগিয়ে দে না চটপট।

মঙ্গল : [এগিয়ে এসে ভরতকে] একটু অপেক্ষা করলেই তো হয় ভরত। সবাই একদণ্ড বুক টান করে বিশ্রাম নিক।

ভরত : জায়গাটা বিলকুল ফাঁকা, নির্জন প্রান্তর—

যাদব : নির্জন তো বেবাক সব জায়গাই। তুই কি মনে করিস এখানে কোন জনমনিষ্যি থাকে ?

ভরত : কিন্তু এমন একটা জায়গা—চেয়ে দেখ চারদিকে—চেয়ে দেখ—

মঙ্গল : নিরেট পাহাড়—শুকনো গাছ আর ধূ ধূ প্রান্তর।

ভরত : সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে কি না। সূর্য পারে ডুবতে চলেছে তো।

যাদব : তাতে হলো কি ?

ভরত : রুনকী একটা সোমত্ত মেয়েমানুষ আমাদের সাথে আছে, সেটা ভেবেছিস ?

যাদব : মেয়েমানুষটাও তো চারজন পুরুষ আছে বলেই আমাদের সাথে এসেছে।

ভরত : কিন্তু রুনকী যে আর এক কদমও চলতে পারছে না।

মঙ্গল : বলিস তো ওকে কাঁধে নিয়ে আমি এগোই। অন্ধকার নামবার আগেই রাত কাটাবার মত একটা আস্তানা তো চাই।

রুনকী : আমি এখান থেকে এক কদম নড়তে পারবো না।

মঙ্গল : নড়তে কে বলেছে তোকে ? নড়বো তো আমরা। তুই উঠবি আমার কাঁধে।

রুনকী : কোথায় যাবি ?

মঙ্গল : যেখানে হোক, যে কোন চুলোয়।

বিলাস : হ্যাঁ রাত কাটাবার মত একটা আস্তানা তো চাই। এ ভাবে পথের মাঝে পড়ে থেকে ঐ শয়তানের খপ্পরে পড়ব নাকি ?

ভরত : রুনকী, রুনকীরে, পারবি উঠতে ? রুনকী—একবার চেষ্টা কর—

রুনকী : আমার পা জোড়া পাথরের মতো ভারী হয়ে গেছেরে ভরত, বিশ্বাস কর।

যাদব : [রুষ্ট] আগেই বলেছিলাম মেয়েমানুষ সাথে রাখিস না, পায়ে পায়ে বাগড়া।

ভরত : কিন্তু মেয়েমানুষটা সাথে ছিল বলেই আমরা একবার সাক্ষাৎ মরণের হাত থেকে বেঁচে গেছি কি না ?

যাদব : কি আমার বাঁচা রে ! শুয়ারগুলো ঘাড় ধাক্কা দিয়ে, লাথি মেরে মেরে নামিয়েছে বাস থেকে। থু থু ছিটিয়েছে সারা অঙ্গে।

বিলাস : ঐ কালো বেঁটে পুরুত, ঐ বদমাশটা আমাদের ঠিক চিনতে পেরেছিল।

মঙ্গল : চিনতে পেরেছিল তো কী ? আমরা কি খুনি আসামী ? জেল ভাঙ্গা দাগী কয়েদী ? নাকি ওর ঘরের তাবত সম্পত্তি চুরি করে ফেরার হচ্ছিলাম ?

বিলাস : আমাদের জাতটা তার চেয়েও খারাপ মঙ্গলা। আমাদের মুখ দেখলে ওদের অমঙ্গল হয়। আমাদের স্পর্শ ওদের দেহে লাগলে ওদের চান করতে হয়।

যাদব : থাম্, পুরুত ঠাকুর দু পায়ে হাঁটে না ? মুখ দিয়ে কথা বলে না ? হাসে না ? কাঁদে না ? তেষ্টা পেলে পানি খায় না ?

রুনকী : পানি—। তেষ্টায় আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে যাদব—আমি আর পারছি না ?

বিলাস : এই নাও—আবার গোঁ ধরল ভরতের বৌটা। নাঃ, ওকে নিয়ে আর পারা গেল না।

যাদব : ছিঁচ কাঁদুনি থামা রুনকী। পথে হাজার কষ্ট হবে, তা তুই আগেই জানতিস।

ভরত : [ধমকে] যাদব।

যাদব : গলা চড়াবার দরকার নেই ভরত। কথাটা আমি মিথ্যে বলি নি।

ভরত : কিন্তু এমন বেঘোর বিপদে সবাই পড়ব তা কি আসার আগে জানতাম? জানতাম এমন জনমানুষহীন শুকনো পাথুরে মরুভূমিতে ফের ঐ শয়তানের খপ্পরে পড়ব?

যাদব : নয় কেন?

মঙ্গল : সিঁড়ি বেয়ে দেবতাদের স্বর্গে এসেছিস নাকি ভরত? গেল মাসে হালুদ গাঁয়ের ফকিরচাঁদের কথা ভুলে গেছিস? ভুলে গেছিস পরশু সাঁঝে রেওয়ায় বংশী মুদ্দফরাসের আর তার মেয়ে যমুনার হাল?

ভরত : কিন্তু এটা হালুদ বা রেওয়া নয় মঙ্গলা?

যাদব : কী আর কেমন তা আমরা কেউ জানি না।

মঙ্গল : জানোয়ারগুলোর চেহারা যে এক, তার প্রমাণ পেলাম তো ঐ বাসের মধ্যেই। ওদের চরিত্রে তোর কোন সন্দেহ আছে নাকি?

ভরত : আমি সে কথা বলতে চাই নি মঙ্গলা।

বিলাস : এ্যাই—সূর্যের আলো কমে আসছে রে। বনপাখীরা দল বেঁধে সব বাসায় ফিরছে। অচেনা, গা ছমছমে জায়গা—চারদিকের হাল দেখে আমার কিন্তু একটুও ভালো ঠেকছে না। ভরত, যা করবার তাড়াতাড়ি কর।

রুনকী : [উঠতে গিয়ে ধপাস করে পড়ে যায়] উঃ—মাগো—

মঙ্গল : [রুনকীকে তুলে ধরে] রুনকী—কি হলো?

রুনকী : মাথাটা ঘুরে উঠল কেমন। শরীরটা বড্ড দুর্বল লাগছে।

ভরত : [তীব্র ভাবে] তোদের ব্যাপার কী? মাথার উপর বেঘোর বিপদ। তোরা কি রাতটা এখানে থাকবি ঠিক করেছিস?

মঙ্গল : [আরও তীব্র ভাবে] কাছাকাছি তোর শ্বশুর বাড়ি আছে না কি রে ভরত? জামাইকে তোয়াজ করতে তোর শাশুড়ী ঠাকরুণ গরম দুধের বাটি হাতে এদিকে হেঁটে আসছে নাকি?

ভরত : মঙ্গল, ফালতু কথা ছেড়ে কাজের কথায় আয়। এখানে থাকবি না হাঁটবি, চটপট সে কথা বল?

যাদব : [বিলাসকে] বাপের বিদ্যে ভুলে গেছিস শালা? ভ্যাবলার মত দাঁড়িয়ে না থেকে কাছাকাছি পানি কোথায় আছে আঁচ করতে পারছিস না?

বিলাস : পানি? কি করব? চেষ্টা তো করছি কিন্তু বাঁ নাকটা সর্দিতে একদম

জাম হয়ে আছে। এত চেষ্টা করছি, বাতাস টানছি, কিন্তু কোন গন্ধই মালুম করতে পারছি না।

যাদব : ব্যাটা ঢ্যামনা।

বিলাস : তুই তাহলে বনো শুয়োর। আমার বদলে তুই শালা নাক টেনে পানির হদিশ জানান দে না কেন ?

মঙ্গল : আমার কাঁধে উঠবি রুনকী ? ওঠ না—ওঠ। লাজ কি ? উঠে পড় চটপট।

রুনকী : থাক। দরকার নেই কিছু।

ভরত : রুনকী—

মঙ্গল : গোঁসা করছিস কেন ? ঝুট ঝামেলায় মাথা সবারই বিগড়ে যায়। এতে যদি তুই গোঁসা করে—

রুনকী : কোন দিকে যাবি চল, আমি হেঁটেই যেতে পারব।

মঙ্গল : [আহত স্বরে] রুনকী—ঠাট্টা বুঝিস না বুঝি ?

রুনকী : [অভিমানে] আমি তোদের পথের বোঝা—সেটা বোঝার বুদ্ধি আমার ঘটে নেই বুঝি মঙ্গলা ?

মঙ্গল : লাও ঠেলা। কথায় বলে মেয়েমানুষের বুদ্ধি, কোদাল মারলেও তাতে —ভরত—নে সাঙ্গাত তুই তোর বৌকে সামলা।

ভরত : গড়বড় করছিস কেন রে রুনকী ? সুয্যি ডুববে শিগ্গীর। আঁধার বড় দুশমন। এই নির্জন প্রান্তরে রাতের আঁধারে পড়ে থেকে সাপের ছোবল খেতে চাস ? নাকি রাজা সাহেবের শিকার হতে চাস ?

রুনকী শুধু হাউ হাউ করে কাঁদে।

আহা, কাঁদবার কি হলো ? ফালতু ঝঞ্ঝাট বাধাচ্ছিস ? মাথার পরে কত বড় বিপদ। কোথায় মনটাকে শক্ত করবি—তা না—থেকে থেকে শুধু সবার মেজাজ বিগড়ে দিচ্ছিস।

বিলাস : [দূর থেকে ছুটে এসে] হেই—ভরত মঙ্গলা যাদব—সাবধান—সাবধান—

ভরত মঙ্গল যাদব : কি হলো বিলাস ! কি হলো ?

বিলাস : সাবধান। পায়ের শব্দ শুনছিস ? পায়ের শব্দ ?

মঙ্গল : শব্দ ? কই কোথায় ?

বিলাস : ঐ দক্ষিণপানে। শুনতে পাচ্ছিস ? ঠক্-ঠক্-ঠক্—এগিয়ে আসছে—পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে এদিকে—

যাদব : বুনো শুয়োর বোধ হয়।

বিলাস : এবার আমিই তোকে বলব ঢ্যামনা খচ্চর। আরে বেকুব, শুয়োর নয় —শুয়োরের বাচ্চা।

মঙ্গল : মানুষ বলতে চাস তুই ?

বিলাস : নিশ্চয়। আমার কোন সন্দেহ নেই একচুল। ঐ শব্দ ভারী পায়ের না হয়ে যায় না। মানুষ আসছে কেউ জানোয়ারে চেপে।

ভরত : হেই আড়ালে চল চটপট! একদম দেরী করিস না তোরা।

যাদব : আড়াল তো সেই চড়াই পেরিয়ে পাহাড়ের সীমানায় –

ভরত : এ্যাঁ? তাহলে ঐ বড় গাছটায় যদি সবাই চটপট উঠে পড়ে পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকি ?

বিলাস : মানুষ! মানুষের পায়ের শব্দ রে মঙ্গল। আমার নাকের সর্দি সাফ হয়ে গেছে। আমি মানুষের গায়ের গন্ধ পেয়েছি। ঠিক মানুষের গায়ের গন্ধ।

মঙ্গল : ভরত, তুই রুনকীকে নিয়ে ঐ বড় পাথরের আড়ালে চলে যা – শিগ্‌গীর –

ভরত : কিন্তু তোরা ? তোরা কি করবি ? তোরা যাবি কোথায় ?

মঙ্গল : আমাদের কথা ভাবিস না। দরকার পড়লে ঐ খাদে নেমে পাথরের খাঁজে চুপচাপ শুয়ে থাকব গা ঢাকা দিয়ে।

যাদব : তারপর ?

মঙ্গল : পরের কথা পরে। কাজটা আগে করা চাই।

যাদব : যদি ওরা সত্যিই দুশমন হয় ? আমাদের তল্লাস করে ?

মঙ্গল : যেই হোক, আমাদের সাড়া না পেলে, আমরা কেউ আগে ভাগে সাড়া দেব না।

বিলাস : হেই – ওই দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে রে! আমার সন্দেহ ঠিক। দু জন মানুষ খচ্চরে চেপে আসছে। আসছে ঠিক চড়াই বেয়ে এই দিক পানে। হুঁশিয়ার।

যাদব : ভরত রুনকীকে তোল।

ভরত : রুনকী, রুনকীরে – যেতে পারবি ? আমার কথা শুনছিস রুনকী ?

রুনকী : পারব রে পারব। তোকে সাদি করেছি জনমটা তো তোর সাথেই চিরকাল বাঁধা। যেথায় বলবি সেথায় যাব রে। [যেতে গিয়ে ফিরে] মঙ্গলা – যাদব – খুব সাবধানে থাকিস রে তোরা। ঝগড়া গালমন্দ যাই হোক তোরাই তো আমার স্বজন। আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তোদের জ্যান্ত মুখগুলো যেন আবার দেখতে পাই রে।

যাদব মঙ্গল বিলাস : আচ্ছা আচ্ছা! ভাবিস না কিছু। তুই যা।

মঞ্চের দুই কোণ দিয়ে যথাক্রমে ভরত ও রুনকী এবং মঙ্গল, যাদব ও বিলাস বেরিয়ে যায়। কয়েকটি দণ্ড নিস্তব্ধতা। পাখীর কূজনে এবং তার সাথে ঠকা ঠক খচ্চরের পায়ের শব্দ দূর থেকে নিকটবর্তী হয়। দুজন প্রবেশ করে। একজন মধ্য বয়স্ক জোয়ান, অপরজন প্রায় বৃদ্ধ। মধ্য-বয়স্কের নাম রতন, বৃদ্ধের নাম গোকুল।

রতন : তুই তাহলে এখান থেকেই ফিরবি বুড়া ? ঠিক এখান থেকেই ?

গোকুল : হ্যাঁ দেড়খানা চড়াই পেরিয়ে এলাম। পুরো দমে খচ্চর ছুটলেও তো ঘর পৌছুতে এক ঘণ্টা পেরিয়ে যাবে রে চৌকিদার।

রতন : ধুত্তোর। সব কথার পিছনে একখানা করে ফালতু ছিপি আঁটিস কেন অ্যাঁ ? ঘর ঘর—ঘর ছাড়া বিশ্বসংসারে অন্য কোন কথা তোর মনে আসে না রে ?

গোকুল : বুড়িটা বেঁচে আছে কিনা। জন্তু জানোয়ারের দেশ— পদে পদে বিপদ। ঘর ছেড়ে বেরুলেই বুড়ি হা পিত্যেশ করে পথ চেয়ে থাকে—বুড়ির মনটা বড় দুর্বল কিনা।

রতন : থাম। রাজাবাবু যতক্ষণ আছে এই অঞ্চলে, ঘরবাসার হা পিত্যেশ কক্ষণও করবি না। কাজকর্মে ঢিলে দেখলে শুনেছি রাজাবাবু আপন বাপরেও কখনও রেহাই দেয় না।

গোকুল : হ্যাঁগো চৌকিদার—কথাটা যা শুনলাম তা ঠিক ?

রতন : কি শুনেছিস বুড়া কর্তা ? কোন কথাটা ?

গোকুল : এই পাহাড়ী তল্লাটটা নাকি রাজাবাবু ভাড়া দেবে ?

রতন : [হেসে] তোর বাপরে দেবে নাকি বুড়াকত্তা ? রাজাবাবুর ক্ষিদে মেটাবার কড়ি আছে তোর বাপের ?

গোকুল : ঠাট্টা করিস পিছে। কথাটা শুনলাম পাঁচ কানে—সত্যি কিনা তাই বল ?

রতন : কোন শালার মাথায় দুটোর বদলে পাঁচটা কান গজিয়েছে শুনি ? খবরটা তোকে চালান করল কোন মরদ ?

গোকুল : এ্যাই দেখ দেখ। পুলিশের মত জেরা শুরু করলি যে ? আরে রাজা উজীর বড় মানুষের কথা তো সব সময় গালগল্প হয়ে বাতাসে বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। ধর না কেন বাতাস থেকেই শুনেছি।

রতন : হুঁ। কথাটা ঠিক বটে। শুনেছি আমিও—সত্যি মিথ্যে জানি না। কিন্তু বুড়া, রাজার ঘরের গোপন কথা নিয়ে বেশি কথা চালাচালি করিস না। ঘাড়ে মাথাটা আস্ত থাকবে না রে বাপ।

গোকুল : অ্যাই রাম রাম। দীন দরিদ্র চাকর-বাকর আমরা, জাহাজের খবরে কাজ কি ? তাহলে আমি এখন ফিরি চৌকিদার ?

রতন : ফিরবি ? এখনই ?

গোকুল : রাতের আগেই তো বাসায় ফিরতে হবে।

রতন : আর শালা আমি রাতের আগেই সরকারের ডেরায় না পৌছুলে কি বাঘের পেটে যাব রে খচ্চর ?

গোকুল : তো ফিরে চল—যেখান থেকে এসেছিলি, চল।

রতন : আর রাজাবাবুকে জবাবটা দেব কি? তোর বুড়ির সাথে রাতের আঁধারে জমিয়ে পিরীত করছিলাম, তাই বলব?

গোকুল : তাহলে দেরী করিস না। চটপট তুই খচ্চর চালা চৌকিদার। আমি চলি।

রতন : দাঁড়া। [হঠাৎ পথ থেকে একটি গামছা তুলে নিয়ে] আরে! এটা কোত্থেকে এল? মানুষ এসেছিল নাকি এখানে? অ্যাঁ! বড় তাজ্জব ব্যাপার!

গোকুল : কি জানি নজরে তো পড়ে নি—এই মরা খোঁয়াড়ে কে আসবে?

রতন : [অনুসন্ধানীর মত] দেখছিস, এখানে ঘাসগুলো কেমন দুমড়ে থেবড়ে গেছে? দলসমেত কেউ ছিল বোধ হয়।

গোকুল : কোন কাঠকাটা? বন থেকে কাঠ চোরাই করতে এসেছিল বলছিস?

রতন : মালুম পাচ্ছি না। শিকারীও হতে পারে। এখানে তো জন্তু জানোয়ার কম না।

গোকুল : [চমকে] তাহলে বাঘের পেটেই গেছে রে! গতিক ভালো না। ডেরায় রওনা দে রে চৌকিদার, দেরী করিস না।

রতন : ভিরমি খাচ্ছিস কেন বুড়ো? জঙ্গল পাহারায় থেকে জানোয়ারের কথায় ডর পাস? বন্দুক আছে না আমার সাথে?

গোকুল : আছে। বন্দুক তো মারবি সামনে কিন্তু যদি ঝাঁপ দেয় পিছন থেকে?

রতন : ঐ খাদের নিচ থেকে ঝাঁপ দেবে বলছিস? [হেসে] শালা বুড়া তোর মাথার বুদ্ধি বিলকুল ঢিলে হয়ে গেছে। [একটা চাঁপা ফুল মাটি থেকে তুলে নিয়ে] কাঠচাঁপা ফুল! [চারদিকে তাকিয়ে] না, আশে পাশে কোথাও চাঁপা ফুলের গাছ তো নেই। [ঘ্রাণ নিয়ে] হুঁ, যা মনে ভেবেছি তাই। ফুলের বাসি সুরভির সাথে যেন কেমন নেবুতেলের গন্ধ পাচ্ছি। সোমত্ত মেয়ে মানুষের চুলের খোঁপায় গোঁজা ছিল রে বুড়া · এই পথে নিশ্চয় ছেলে মেয়ে দুই-ই এসেছিল!

গোকুল : হা ভগমান! তুই সব বুঝে গেলি একটা ফুল নাকে শুঁকে?

রতন : [গর্বের হাসি] রাজাবাবু তো এই শ্রীমুখ খানা দেখে চৌকিদারের কাজ দেয় নি! দিয়েছে এই মাথার বুদ্ধিটা বিবেচনা করে।

গোকুল : [চিন্তিত] সোমত্ত মেয়েছেলে—এই পাহাড়ী জঙ্গলে—খুব তাজ্জব ব্যাপার!

রতন : তোর বুড়িটা না নির্ঘাৎ। পাকাচুলের খোঁপার ফুল গোঁজার বয়স তোর বুড়ির চলে গেছে রে।

গোকুল : ঠাট্টা মারিস না। আমার চিন্তা হচ্ছে অন্য কারণে—

রতন : আরে রাজাবাবু শিকার ধরতে এসেছে এই প্রান্তরে।

গোকুল : [চিন্তিত] তাই তো ভাবছি আরও বেশি করে।

রতন : সোমত্ত পুরুষ্টু বাঘিনী হলে তো রাজাবাবু নিশ্চিন্তেই খাবে। শালা বড় লোকের বরাত আর কাকে বলে। বুড়া, সন্দেহ যখন হয়েছে আশপাশটা একটু তল্লাস করতেই হয়।

গোকুল : ডেরায় ফিরবি না? সূর্য ডুবলেই যদি টুপ করে সন্ধ্যা নামে?

ফেকু ঢোকে। চোখ ঘোর লাল. লম্বা লম্বা হেঁচকি তুলে সে সটান এসে থমকে যায়।

ফেকু : এই যে বাবা রাজার খচ্চর চৌকিদার সাহেব। আরে বুড়া ঠাকুর, তুইও এখানে আছিস? ভালোই হলো, পথ ভেঙ্গে নেশাটা মাটি করতে হলো না। রাজাবাবুর কাছে খবর এসেছে—কি খবর? এঁ্যা হ্যাঁ, তাই তো, কি খবর? ও মনে পড়েছে, পাঁচটা কাঠি গোপনে গোপনে ঢুকেছে এই প্রান্তরে।

রতন : তাই নাকি? তাহলে আমার সন্দেহ ঠিক?

ফেকু : হুঁ। কি যেন—হ্যাঁ হাড়—হাড় বদমাস। বুহুলিয়া গাঁ থেকে ফেরার মনে হয়।

রতন : চেহারার আঁচ কি বল তো ফেকু?

ফেকু : [ভেংচি কেটে] আঁচ কি বল তো! আমি কি হাতে ফটোক নিয়ে ঢুঁ মেরে বেড়াচ্ছি যে তোকে চেহারার ফটোক দেব? কি যেন হ্যাঁ—জোয়ান বয়স—চারটে মেয়ে সাথে। একটা—না ধ্যুস! হ্যাঁ চারটে মরদ একটা মেয়ে। মাটি কাটার জমিন চষার কাজ করে।

রতন : তা আসলি কাজটা কী আমাদের সেই কথা বল।

ফেকু : [ভেংচে] তুই চৌকিদার না হয়ে ঢ্যামনা জাত খচ্চর হয়ে জন্মালে পারতিস রে রতন। রাজাবাবু ঢুঁড়ছে বদমাস অচ্ছুৎ হরিজন শুয়োরগুলোকে। ঢুঁড়ছে কি জমিদার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পচাই আর হরিণের মাংস খাওয়াতে—এঁ্যা?

রতন : তাহলে গোল হয়েছে জব্বর?

ফেকু [হেঁচকি তুলে] মাথাটা এতক্ষণে তোর সাফা হয়েছে রে চৌকিদার। বুহুলিয়া গাঁয়ে রাজাবাবুর খোদ পুরুত ঠাকুরের কুয়ো কেটেছিল ঐ শুয়ার-গুলো। বিশটা মজুর আট দিন—এঁ্যা কি যেন হ্যাঁ—বারোটা দিন পাথর কেটে কেটে পানি বের করেছে। তো শালারা এমন বজ্জাত যে, হঠাৎ উল্টো-পাল্টা দাবি জানাল।

গোকুল : কেন, কেন?

ফেকু : ঐ তো মজা। বলে, হ্যাঁ কি যেন—হ্যাঁ ভগবানরে তুমি পেরাণ মন ঢেলে পুজো দাও ঠাকুর—কিন্তুক আমাদের তেষ্টার এক ফোঁটা পানি নেই গাঁয়ে—এই গরমে পানির জন্য সবাই মরতে চলেছে। এই কুয়ো কেটেছি আমরা—কুয়োর পানি খেতে দিতে হবে আমাদেরও।

রতন : এঁ্যা—বলিস কি ফেকু !

ফেকু : তবে আর বলছি কি ! রাজাবাবু শুনে তো একেবারে আগুন ! দু জন চৌকিদারকে কুয়ো পাহারায় রেখেছিল। তো শয়তানরাও তো জাত-শয়তান, চুপি চুপি রাতের আঁধারে কুয়ো থেকে পানি চুরি করে নিয়ে গেছে।

গোকুল : সর্বনাশ !

ফেকু : তাই নিয়ে জব্বর গোল। [চুপি চুপি] তিনটে খুন হয়ে গেছে। ওরাও লাশ ফেলেছে একটা চৌকিদারের। অবস্থা এখন চরমে।

রতন : [উরুতে চাপড় দিয়ে] আমি বর্ণহিন্দু। হারামীগুলোকে পেলে আমি জ্যান্ত কাঁচা খেয়ে ফেলব।

ফেকু : [ফিক ফিক হেসে] বর্ণহিন্দু হয়ে কাঁচা খাবি ঐ নীচু হরিজনগুলোকে ? তুই তো শালা নীচু জাতেরও অধম রে ! হ্যারে, তুই কি আমার জাত ভাই নাকি ? কি যেন—হ্যাঁ—সঙ সেজে দাঁড়িয়ে থাকতে রাজাবাবু আমাকে এখানে পাঠায় নি। চটপট পশ্চিমের চড়াইটা তোকে আগলাতে বলেছে।

রতন : ঠিক আছে। আমি চললাম, চললাম ঠাকুর।

রতন ছুটে বেরিয়ে যায়। ঠাকুরও অন্যদিক দিয়ে প্রস্থান করতে উদ্যত হয়।

ফেকু : আরে আরে তুই চললি কোথায় বুড়া ? কোথায় চললি ?

গোকুল : দুশমনদের নজরে রাখতে হবে কি না ?

ফেকু : দাঁড়া—দাঁড়া বাপ। বড় তেষ্টা পেয়েছে। একটু আগুন দিতে পারিস ? বুকটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল একদম।

গোকুল : তেষ্টায় বুক কাঠ হয়ে গেল তো আগুন জেলে কি বুকটা এবার ছাই করবি ?

ফেকু : পাচটা শয়তান বুঝলি না বুড়া। পাকা জাত শয়তান, খুনেও বলতে পারিস। শালাদের জানে ধরতে হবে তো। [গাঁজার কল্কে বের করে] দু-একটা জব্বর টান না দিলে বুকে সাহস পাব কি করে—এঁ্যা ?

গোকুল : তা আগুন কি আমি সাথে করে নিয়ে এসেছি ?

ফেকু : এঁ্যা—কি যেন—আনিস নি ? যাঃ শালা ! কপালটা আমার চিরকাল সত্যিই খারাপ দেখছি। কোথায় ভাবলাম একটু খানি—

দূরে কোথায় যেন হেই বলে একটা তীব্র গলার শব্দ শোনা যায়। ফেকু ও গোকুল সচেতন হয়ে ওঠে।

ফেকু : চৌকিদারের গলা—হ্যাঁ চৌকিদারের গলা—

গোকুল : উঁহু—শব্দটা এল যেন উত্তরের চড়াই থেকে—

ফেকু : তার মানে রাজাবাবুর সাগরেদ এঁ্যা—যা বাব্বাঃ। উল্টে আমার ঘাড়ে বোঝা এল না কি ? বুড়া, আমি চললাম। [ফিরে এসে] আগুন চেয়েছিলাম তোর কাছে। খবরদার এটা যেন রাজাবাবু জানতে না পারে, আমি ডিউটিতে

আছি কিনা।

কেষ্টু ছু:ট বেরিয়ে যায়। গোকুল এক দণ্ড সেদিকে তাকিয়ে থেকে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই বেরিয়ে গেল। কয়েকটা দণ্ড নিস্তব্ধ। পাখীর অশান্ত কুজন। যাদব, মঙ্গল আর 'বলাস নিঃশব্দে প্রবেশ করে।

যাদব : তাহলে ?

মঙ্গল : টের পেয়েছে ওরা। পিছনে কেউ লেগেছে।

বিলাস : এখানে আর থাকা ঠিক না। শুনলিই তো পাহাড়ের পথগুলো ওরা ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে। এখানে দেরী করলে ওদের খপ্পরেই পড়তে হবে নির্ঘাৎ। যা করবি চটপট কর তোরা—

যাদব : শালা জায়গাটা এমন অচেনা অজানা—

মঙ্গল : বুড়ুলিয়া গাঁ তো তোর চেনা ছিল রে ? সেখান থেকে বেরুতে দুটো দিন দুটো রাত কি খাবি খেতে হয়েছিল ভুলে গেছিস নাকি ?

বিলাস : হ্যাঁ ভোলাকে ওরা খুন করেছে—। দেহখানা টুকরো টুকরো করে কেটে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখেছিল। ভোলার বৌয়ের ইজ্জত নিয়েছিল—

যাদব : ক্যাংলার ঘরে আগুন দিয়ে ওর বৌ বিমলাকে লোপাট করে নিয়ে গেছে। ওরা পারে না কী ?

ভরত প্রবেশ করে শুকনো মুখে।

শুনেছিস সব ? শুনেছিস ভরত ?

ভরত : শুনেছি। শুনেই মনটা বড় আনচান করে উঠল—

যাদব : রুনকী কোথায় ?

ভরত : ওখানে মাটিতে শুয়ে এ পাশ ও পাশ করে গোঙাচ্ছে।

মঙ্গল : আমার কাঁধে ওকে তুলে দে। চটপট নেমে চল এখান থেকে—

বিলাস : বললি ভালো। কিন্তু যাবি কোথায় ? আমি স্পষ্ট দুশমনের গায়ের গন্ধ পাচ্ছি। কাছাকাছি ওরা চারদিক ঘিরে ফেলেছে।

যাদব : হ্যাঁ চৌকিদার গেছে পশ্চিমদিকে।

বিলাস : বুড়া ঠাকুর রয়েছে ঐ পানে--পিছনে রাজাবাবুর দল। যাওয়ার সব দিক বন্ধ রে মঙ্গলা।

মঙ্গল : [দৃঢ়] খাদের নিচে ঐ বিরাট জঙ্গলের পথটা তো আমাদের কাছে খোলা আছে নাকি ! বিলাস ?

বিলাস : [ভীত] আই বাপ্ তুই পাগল না মানুষ ? বলছিস কি তুই মঙ্গলা ? এই ভীষণ খাড়াই ঢাল বেয়ে নামবি নিচে ? মরণের সাধ জেগেছে ? মরতে চাস বুঝি ? সবাইকে মারতে চাস ?

মঙ্গল : [বিলাসের গলা চেপে ধরে] এই খানে প্যান প্যান করে আকাশের দেবতারে ডাকলে তোর জানটা জ্যান্ত থাকবে ভেবেছিস নাকি শালা !

যাদব : অসম্ভব।
বিলাস : ঠিক কথা।
মঙ্গল : কি ?
যাদব : সাথে রুনকী, একটা অবলা মেয়েমানুষ—এই খাড়াই ঢাল বেয়ে—
বিলাস : মঙ্গলাটা নির্ঘাৎ পাগল হয়ে গেছে রে যাদব ! ওর মাথার ঠিক নেই।
ভরত : ঐ মরণ খাদের ঢাল বেয়ে রুনকী নামবে নিচে ?
মঙ্গল : [যাদব ও বিলাসকে] আমার কাঁধ আর এই শক্ত হাত দু খানা রয়েছে মেয়েমানুষকে সোহাগ করতে ? তোর বুকের ধুকধুকানি কাঁপছে কি না সেইটা বল যাদব ?
যাদব : চেল্লাস নি। চার জন আড়কাঠি চৌকিদারের বর্শার ঘা থেকে তোর চাচা রঘুকে বাঁচিয়েছিল কে ? তুই না আমি ?
মঙ্গল : তাহলে দোনো মোনো করছিস কেন ? বুকের বাঁধন আলগা হয়ে গেছে ?
যাদব : আমি বলি, যা থাকে কপালে, চড়াই ভেঙ্গে ঐ পাহাড়টা ডিঙিয়ে যাই।
বিলাস : কি বলছিস তুই ? ওদের নজর এড়িয়ে এতটা পথ বেয়ে ওঠা খুব সহজ হবে ?
যাদব : হবে না। কিন্তু ওরা পিছু তাড়ালে আমরা থাকব উপরে। তাতে আমাদের সুবিধা হবে।
বিলাস : সুবিধা ?
যাদব : হ্যাঁ সুবিধা।

স্খলিত চরণে গোঙাতে গোঙাতে রুনকী এসে মাঝ মঞ্চে ধপাস করে পড়ে যায়

রুনকী : আমি—আমি আর পারছি না রে—বুকের কলজেটা ফেটে যাচ্ছে। উঃ মাগো—
ভরত : বিলাস, যা হোক কিছু একটা কর।
বিলাস : কি করব ? গন্ধ শুঁকছি তো দম নিয়ে। আশেপাশে কোথাও পানির চিহ্ন নেই। আমি বরং এই উৎরাই দিয়ে কয়েক কদম একটু এগিয়ে দেখি।
ভরত : একা যাবি ?
বিলাস : নিশান পেলে পানি আনতে ক জন লাগে রে ?
ভরত : না থাক। তোর গিয়ে কাজ নেই।
বিলাস : রুনকীর তো দু ফোঁটা পানি চাই নাকি ? ভাবছিস কেন ? এইটা তো আমার সাথেই রয়েছে। [কোমর থেকে একটা গুপ্তি খুলে] এটা দিয়ে গাছ কাটা যায়, মাটি কাটা যায় আবার দরকার হলে শয়তান দুশমনও কাটা যায়। ভাবিস না কিছু তোরা, রুনকীর জন্ম পানি আমি ঠিক নিয়ে আসব।

শিস দিতে দিতে বিলাস বেরিয়ে যায়।

মঙ্গল : ওকে পাথরের আড়ালে নিয়ে যা ভরত। চলতে ফিরতে যে কেউ ঘাড়ে এসে পড়তে পারে। তখন বিপদ হবে।

ভরত : চল রুনকী—ও পাশে চল।

রুনকী : না, আমি যাব না—যাব না—আমাকে রেহাই দে তোরা।

মঙ্গল : ঝামেলা এলে এখানে মরতে হবে নির্ঘাৎ—জায়গাটা ভীষণ খারাপ।

রুনকী : [তীব্রভাবে] মরি মরব এইখানেই মরব। আমি এখান থেকে যাব না—যাব না—যাব না—

যাদব : [বিরক্তভাবে] আগেই বলেছিলাম মেয়েছেলে উৎপাতের বোঝা বাড়ায়।

রুনকী : যাদব!

যাদব : ওহ্ মানে লাগলো বুঝি? মানে লাগলে নীচু হরিজন জাতে জন্মে ছিলি কেন? পুরুত রাজা উজীরের আঁতুর ঘরে চোখ মেলতে পারিস নি? ওদের মান নিয়ে বাঁচতে পারিস নি?

রুনকী : আমি আমার নিজের জন্যে বলেছি ভেবেছিস? নিজের জন্য কাতর হয়েছি?

যাদব : তবে কার জন্যে রে? আমার বাপের জন্য নাকি?

রুনকী : [কান্নাপ্লুত অথচ তীব্রভাবে] তোর বাপের জন্য করার ভাগ্য কি আমার ছিল রে যাদব? আমি—আমি নিজের কথা ভাবি না। আমি ভাবছি আর একজনের কথা, যে জন আমার কাঁপনে কাঁপে, হাসিতে হাসে, আমার কান্নায় গুমরে গুমরে কাঁদে। আমি—আমার পেটে যে ভরতের নতুন বংশধর আসছে রে যাদব! আমি যে মা হতে চলেছি!

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল রুনকী। সবাই স্তম্ভিত। কাছাকাছি কারও কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

মঙ্গল : [চকিতে] যাদব!

যাদব : ভরত—

ভরত : ঝটপট আড়াল যা। তোর একার জন্য সবাই বিপদে পড়বে নাকি? রুনকী—

রুনকী : [কান্না ভেজা গলায়] আমি পারব না—পারব না।

মঙ্গল : ভরত—

ভরত : রুনকী—তোর পেটের ছেলের দিব্বি। ঝটপট চলে আয় পাথরের আড়ালে।

রুনকী উঠতে চেষ্টা করে। দ্রুত দৌড়ে ওরা তিনজন পুরুষ বেরিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করে পাথরের আড়ালে। কিন্তু রুনকী উঠতে পারে না অনেক চেষ্টা করেও। গোকুলের প্রবেশ।

গোকুল : ছিল তো কোমরে বাঁধা—কোথায় যে হারালাম দিকগতিক কিছুই আর ঠিক থাকে না। বয়েসটা যে বাড়ছে, পদে পদে মালুম হচ্ছে এখন।

[রুনকী তখন উঠে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। ওকে দেখে] কে ? কে তুই ? [রুনকী নীরব] আঃ মলো.যা ! বোবা নাকি ? কথা বলতে পারিস না ? জি:জ্ঞস করছি কে তুই ? জবাব দে।

রুনকী : [ভয়ে ভয়ে] আ – আমি – রুনকী গো ঠাকুর মশায়।

গোকুল : [ভেংচে] রুনকী গো ঠাকুর মশাই ! আরে মেয়েছেলে যখন রুনকী – ঝুমকি – টুমকি নাম তো যা হোক একটা থাকবেই। আমি জিজ্ঞেস করছি তোর পরিচয়টা কি ?

রুনকী : রু···রুনকী গো ঠাকুর মশাই। সত্যি বলছি দেবতার দিব্যি। আমি রুনকী।

গোকুল : আবার এক কথা। নির্জন নিরালা প্রান্তর, জন্তু জানোয়ার চার পাশে। তা এখানে এলি কোত্থেকে তুই ?

রুনকী : ইয়ে – পথ হারিয়ে ফেললাম কিনা –

গোকুল : [ভেংচে] পথ হারিয়ে ফেললাম ! পথ কোনটা ছিল শুনি ? আসছিলি কোত্থেকে ?

রুনকী : উই পাহাড়ের ওপারে, বাস চলা বড় সড়ক থেকে।

গোকুল : বড় সড়ক থেকে ? বলি সড়কটা এল কোন গাঁ থেকে ? বাস যেখানে সে গাঁয়ের নামটা কি ?

রুনকী : আমি – আমি বাপের ঘর যাচ্ছি বাবুমশায়।

গোকুল : ধ্যুৎ ? এ হাবা মেয়েছেলের সাথে কথা বলবে কে ? বলি যেখান থেকে আসছিস সে জায়গাটার একটা নাম আছে নাকি ?

রুনকী : অ্যাঁ – হ্যাঁ – মানে –

গোকুল : মানে ?

রুনকী : [ভড়কে গিয়ে] আমি বুদ্বুলিয়া গাঁ থেকে আসি নি বিশ্বাস কর বাবুমশায়।

গোকুল : [থমকে] বুদ্বুলিয়া !

রুনকী : হ্যাঁ।

গোকুল : বুদ্বুলিয়া থেকে এসেছিস তুই ?

রুনকী : বুদ্বুলিয়া আমার বাবার বাড়ি সে কথা তোমায় কি আমি কখনও বলেছি অ্যাঁ ?

গোকুল : [গম্ভীর] তুই একা না তোর সাথে আর কেউ আছে ?

রুনকী : কে থাকবে আর ? আমার কেউ নাই।

গোকুল এই নির্জন অচেনা পাহাড়ের পথে তুই একা এসেছিস বলতে চাস ?

রুনকী : হ্যাঁ।

গোকুল কি জাত তুই ? কথা বলছিস না কেন ? কি জাত তুই ?

রুনকী : [ভীত] আমি—আমি—

গোকুল : বল।

রুনকী : আমি—

গোকুল : বুহুলিয়া থেকে পাঁচজন শয়তান রাজাবাবুর নজর এড়িয়ে পালিয়েছে। চারটে পুরুষ একটা মেয়ে। একি ! তুই থরথর করে কাঁপছিস কেন এমন? এ্যাই—এ্যাই মেয়ে ?

রুনকী : শরীরটা ভালো নেই। পেটে আমার বাচ্চা, হঠাৎ বড় মোচড় দিল।

গোকুল : হা ভগবান। তা পেটে বাচ্চা নিয়ে এই নরকে ছুটে এসেছিস কেন ? মরবার আর জায়গা পেলি না ?

রুনকী : গরীব মানুষ কি স্বর্গে মরে গো বাবু ? গরীবের মরণ তো পথে ঘাটে ঝোপে জঙ্গলে সর্বত্র।

গোকুল : [স্থির দৃষ্টিতে] আর বাকি চার জন কোথায় ?

রুনকী : অ্যাঁ ?

গোকুল : ঐ চার জন কোথায় ? তোকে ফেলে পালিয়েছে নাকি ?

রুনকী : আমার সাথে কেউ ছিল না। আমি একা, সত্যি বলছি—বিশ্বাস করুন।

গোকুল : [গম্ভীর] তাহলে চৌকিদারকে ডাকি ? রাজাবাবুর কাছে নিয়ে যাক তোকে। সেখানেই জবাব দিস।

মঙ্গল ছুটে ঢোকে।

মঙ্গল : তাহলে তুইও বাঁচবি না বুড়া। এই সড়কির অর্ধেকটা তোর বুক পিঠ এফোর ওফোর করে খোলা বাতাসের স্বাদ নেবে। সে কথা মনে রাখিস।

ভরত : [মঙ্গলকে ধরে ফেলে] মঙ্গল হাত নামা—নামা শিগ্গীর !

যাদব : শেষ করে দি আড়কাঠিরে। বাধা দিস না ভরত।

ভরত : খবর্দার ওর গায়ে অস্ত্র ছোঁয়াবি না কেউ। ও আড়কাঠি না।

মঙ্গল যাদব : নয় ? বুঝলি কিসে ?

ভরত : আমার মন বলছে। এই বুড়ার চালচলন, হাবভাব, কথাবার্তায় আমার মন বলছে—ও ঠিক দুশমন নয়।

মঙ্গল : কিন্তু আমরা তো ওর হাতে ধরা পড়ে গেছি। এখনই বুড়া ডাকবে চৌকিদারকে—চৌকিদার ডাকবে কেউকে, কেউ ডাকবে রাজাবাবুকে !

যাদব : হ্যাঁ—তারপর বুহুলিয়ায় যা হয়েছে এখানেও তাই হবে। ধরে বেঁধে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে। মরার আগে অন্ততঃ একটা দুশমনের জান তো খতম করি।

ভরত : না।

মঙ্গল : [জোরে] ভরত। সরে যা সামনে থেকে।

ভরত : না। ওর গা তোরা কেউ ছুঁতে পারবি না। ওকে মারতে হলে আগে আমাকে মারতে হবে।

গোকুল : আহ্ বিবাদ করিস পরে। এই মেয়েটার শরীরটা ভালো মনে হচ্ছে না, পোয়াতি কিনা অ্যাঁ—?

ভরত : হ্যাঁ ঠাকুর।

গোকুল : তা এই নিরেট পাথুরে বনে নিজেদের মাঝে বিবাদ করলেই কি ওর শরীরটা ঠিক হয়ে যাবে?

রুনকী : একটু—একটু পানি খাওয়াতে পার ঠাকুর? বুকখানা ফেটে যাচ্ছে তেষ্টায়—

গোকুল : মরেছে! জল এই মরা পাথরের দেশে পাবি কোথায়?

রুনকী : তেষ্টা পেলে তোমাদের পানি খেতে হয় না ঠাকুর?

গোকুল : ভগবানের জীব জল ছাড়া বাঁচে কখনও? তা কি জাত তোরা? [সবাই নীরব] কি জাত? [সবাই নীরবে নিজেদের মধ্যে চোখ চাওয়া চায়ি করে] হুঁ! বুঝেছি! তাহলে তোরাই সেই বুড়ুলিয়ার অচ্ছুৎ ফেরার?

মঙ্গল : [রূঢ় উত্তেজিত] হ্যাঁ ফেরার, তাতে হলো কি?

গোকুল : হবে আবার কি? মরবি, মরতে হবে তোদের। [চারদিকে তাকিয়ে] মরণের ফাঁদ চারদিকে পড়েছে সেটা বুঝতে পারিস না বোকার দল! পালা—শিগ্গীর পালা এখান থেকে, একদণ্ড আর দেরী করিস না।

ভরত : কোথায় পালাব ঠাকুর? কোন পথে যাবো?

গোকুল : বুড়ুলিয়া থেকে যখন ফেরার হয়েছিলি তখন কি পথ আমি বাতলে দিয়েছিলাম?

যাদব : বুড়ুলিয়া থেকে না পালিয়ে আমাদের উপায় ছিল না ঠাকুর।

মঙ্গল : কাঠ ফালা করার মত আমাদের কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে শেষ করত। বুনো শুয়োর পোড়ানোর মত দগদগে আগুনে ঢাকঢোল বাজিয়ে আমাদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারত।

গোকুল : কিন্তু এই বিরাট ভীষণ পাহাড়ী তল্লাট—মরণ ফাঁদ—এখান থেকে বেরুতে গেলেও তো—

রুনকী : ঠাকুর, তোমার ডেরা কদ্দুর গো?

গোকুল : কেন? ডেরার খবরে কি দরকার তোর?

রুনকী : গেরস্ত মানুষ। আবাস যখন আছে, তখন কি জান বাঁচাবার মত দু ফোঁটা পানি মিলবে না সেখানে?

গোকুল : মুশকিল হলো। আমি যে বর্ণহিন্দু—ব্রাহ্মণ।

ভরত : গরু—ঘোড়া—পশুদের তো রোজ পানি খেতে দাও ঠাকুর? জাতে আমরা কি তার চেয়েও অধম? ওদের মুখে পানি দিলে পাপ হয় না।

আমরা কি তার চেয়েও পাপী ঠাকুর ?

গোকুল : [ভীত] লোক জানাজানি হলে আমার জাত যাবে—একঘরে হয়ে যাবো।

ভরত : তোমার জাত আমরা মারব না ঠাকুর, বিশ্বাস কর।

গোকুল : কিন্তু রাজাবাবু যদি মারে ?

মঙ্গল : রাজাবাবু জানবে কিসে ?

গোকুল : অন্নদাতার নিন্দে করতে নেই। দেবতার যদি চারটে চোখ থাকে রাজাবাবুর আছে আটটা। ওর চোখকে কিছুতেই ফাঁকি দেয়া যায় না।

মঙ্গল : ডর পাচ্ছ ঠাকুর ?

গোকুল : তোর মত জোয়ান বয়স থাকলে ডর পেতাম না।

যাদব : তাহলে রাজাবাবুর হাতে আমাদের তুলে দাও না কেন ? পাচটা মানুষের জানের বদলে অন্নদাতাকে খুশি কর। ডাক রাজাবাবুকে, ডাক—

গোকুল : মানুষ হয়ে মানুষ খুন করা যে পাপ। ও পাপ কাজ আমি করব কি করে ?

রুনকী : ঠাকুর—আর্তকে পানি না দেয়া, আশ্রয় না দেয়া কি পুণ্যের কাজ ? দেবতা কি সে কাজে খুশি হয় ? বল ঠাকুর ?

মঙ্গল : ঠাকুর—

গোকুল : [দ্বিধান্বিত] মুশকিল হলো দেখছি—

ভরত : মুশকিল কিসে ? অচ্ছুৎ বলে কি আমরা মানুষ না ?

গোকুল : দেখ, এই পাহাড় বনবাদারে দু যুগ থেকেও আমি কোনদিন নিজের হাতে একটা প্রাণী হত্যা করি নি। নীচ জাত বলে যা হচ্ছে চারদিকে —সে সবও আমি মন দিয়ে মানতে পারি না। কিন্তু, অন্নদাতা রাজামানুষ, বিশ্বাসে রেখেছে আমায় পাহারায়। তার সাথে আমি বেইমানি করি কি করে ?

মঙ্গল : আর হরিজন বলে দুনিয়ার সব পাপের মালিক হলাম আমরা ? ঐ রাজাবাবুর মত মানুষেরা যখন বিনে খরচায় আমাদের দিয়ে বনবাদার সাফ করিয়ে চাষের আবাদ করায় তখন সেই আবাদ ভোগ করার সময় মনে থাকে না যে আমরা নীচজাত ? আমাদের দিয়ে যখন জনম জনম বেগার খাটিয়ে মাঠে চাষ করায়, ফসল তোলে গোলায়, তখন মনে থাকে না যে আমরা অচ্ছুৎ ?

যাদব : বেগার-খাটা আমাদের সোমত্ত মেয়েগুলোকে নিয়ে যখন রাতের আঁধারে কুত্তার মত ফুর্তি করে, তখন মন জাগে না যে নরম মাগীগুলো জাতে ?

রুনকী : ঠাকুর—

ভরত : ঠাকুর—

গোকুল : [যেন সম্বিৎ পেয়েছে এমনভাবে] শোন। ওই নিচে ঢালু উৎরাই দেখছিস—ঐ পাথরের পাশ দিয়ে, বুনো ঝোপ ঠেলে তোরা সোজা নেমে যা। সাবধান, ওখানে বিষমণি ভয়ঙ্কর সব সাপ আছে। সামনে নজর রেখে পথ চলবি। এদিকে হাঁটা পথে বন্দুক হাতে চৌকিদার পাহারায়। ওখানে যদি যেতে পারিস—পাবি আমার ডেরা—জল পাবি, রাতটা কাটাতে পারবি—সকাল হলে কাক জানাজানির আগে আবার তোদের নিশানা মত বেরিয়ে পড়তে পারবি। যা—

যাদব : [সোল্লাসে] মঙ্গলা—

ভরত : রুনকী—

রুনকী : বিলাসটা গেছে পানির খোঁজে। আমরা চলে গেলে ও আমাদের নিশান পাবে কি করে ?

গোকুল : আমাকে ফিরতে হবে এক্ষুণি—[দূরে একটা কণ্ঠস্বর] হুঁ, চৌকিদার আসছে মনে হয়। একদণ্ড আব এখানে দেরী করলে কেউ আর জানে বাঁচবি না। তখন পাপপুণ্যের কথা বলে আমাকে দুষতে পারবি না বলে দিলাম।

মঙ্গল : ভরত—

ভরত : যাদব—

যাদব : তাহলে ?

রুনকী : বিলাস যে এখনও ফিরল না। স্বার্থপরের মত ওকে ফেলে আমরা চলে যাব রে ?

গোকুল : [রেগে] তাহলে মর। মর তোরা এখানে।

সবাই : না।

এক অসীম সাহসে বাঁচার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ওরা ঘুরে দাঁড়ায়। মঙ্গল এক ঝটকায় কাঁধে তুলে নেয় রুনকীকে। ওরা সবাই এগোয়—পাথরের পাশেই নীচে উৎরাইয়ে।

গোকুল : [চাপাস্বরে নির্দেশের মত] খুব চুপচাপ যাবি। চড়াইয়ের মাথায় শকুনের চোখ পাহারায়। যদি জানে বেঁচে পৌছুস, ঘোরাপথে আমি ফিরলে ভগবান দেখা করাবেন তোদের সাথে নির্ঘাৎ।

ওরা চারজন বেরিয়ে যায়। গোকুল উৎকণ্ঠিত। দৌড়তে দৌড়তে প্রবেশ করে ফেকু।

ফেকু : [আনন্দে ঢোল বাজাবার ভঙ্গি] ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং ঠাকুর—বুড়া ঠাকুর রে! তুমি এখনও এখানে আছ ? কি বলে যেন হ্যাঁ—জব্বর খবর রে!

গোকুল : [শঙ্কিত] গোলমাল কিছু হয়েছে রে ফেকু ?

ফেকু : গোলমাল কেন হবে রে বুড়া ? ডামাডোল হয়েছে—ড্যাং-ড্যাং—আগুন দিলি না—ঐ ওখানে নিচে চকমকি পাথরে পাথর মেরে আগুন বানালাম, দিলাম ঠেসে আগুন কল্কেয়—মারলাম ভোম্ ভোলানাথ বলে

ছুটো জব্বর টান—কি যেন হ্যাঁ—চোখ খুলে চেয়ে দেখি ড্যাং—ড্যাং—সামনে স্বয়ং ভোলানাথ দাঁড়িয়ে—

গোকুল : নেশা করে কি উল্টোপাল্টা বকছিস ? দাঁড়া, রাজাবাবুকে এবার বলতেই হবে। যখন তখন কাজের মাঝে তুই—

ফেকু : তুই আর বলবি কিরে বুড়া ? রাজাবাবু সবকিছু জেনে গেছে। এমন জব্বর কাজ করেছি, রাজাবাবু পচাই আর শুয়োরের মাংস আমার জন্য সাজিয়ে রেখেছে।

গোকুল : ফেকু—

ফেকু : অ্যাঁ—ফেকু এখন রাজারে বুড়া—রাজা। জলজ্যান্ত ফেরার অচ্ছুৎ দুশমন একখানা পাকড়ে ফেলেছি।

গোকুল : বলিস কি ?

ফেকু : তবে আর বলছি কি ? ড্যাং—ড্যাং—ড্যাং—কি যেন হ্যাঁ—ঐ উৎরাইয়ের পাশে নিচু খাদের ডোবা থেকে নারকেল মালায় করে পানি নিচ্ছিল—

গোকুল : [উৎকণ্ঠিত] অ্যাঁ !

ফেকু : হ্যাঁ। চুপিচুপি গিয়ে ধরলাম পিছন থেকে। পাকাল মাছের মত পিছলে যেতে চায় শালা। ধরলাম শেষে চেপে। ধ্বস্তাধস্তি হলো খানিক। একবার ও উপরে, একবার আমি। কোমরে ছিল দড়ি—কষে বাঁধলাম শালাকে—তারপর শিঙা তুলে দিলাম একখান ফুঁ। ফুঁ বাজল পাহাড়ে—পাহাড়ে। পাহাড়ে আছাড় খেল, ছুটে গেল খোলা বাতাসে, পশ্চিম কোণা থেকে এল জবাব—মারলাম ফুঁ। দুশমন ধরেছি—ফেরার দুশমন। আহা রাজাবাবু আমাকে পচাই আর শুয়োরের মাংসের জব্বর ভোজ দেবে রে বুড়া।

গোকুল : তুই ? তুই ধরিয়ে দিলি লোকটাকে ?

ফেকু : তো পূজা করব ? ওকি পূজার দেবতা ?

গোকুল : কিন্তু লোকটা তো তোর ক্ষতি করে নি ফেকু, তাহলে কেন তুই—

ফেকু : অ্যাঁ ! করে নি ! কি বলছিস বুড়া ? ও রাজাবাবুকে চটিয়েছে সেটা প্রথম দোষ, আর শালা রাজাবাবুর জমিদারীর ঐ ডোবার পানি ছুঁয়ে—পানি অপবিত্র করেছে সেটা সবচেয়ে বড় দোষ। ঐ দেখ তুই চৌকিদার ওকে ঢালু পথে নিয়ে আসছে। হাই ড্যাং ডা ডা—ড্যাং—ড্যাং—ডা—ডা—

দূরে একটা আর্ত চিৎকার শোনা যায়, শিঙার শব্দ ভেসে আসে আরো তীব্র ভাবে। গোকুল সেই আওয়াজ লক্ষ্য করে। রতন, বিষেণ চৌকিদার চাবুক মারতে মারতে নিয়ে ঢোকে বিলাসকে, বিলাসের হাত বাঁধা। শরীর সম্পূর্ণ এলিয়ে পড়েছে। দেহের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতচিহ্ন। মাথা একপাশে হেলানো। রতন, চৌকিদার তাকে বাঁধা অবস্থায় হেঁচড়ে টেনে নিয়ে চলেছে। আর পিছনে বিষেণ সমানে বিলাসকে মারছে চাবুক। উঃ আঃ করে সে শুধু শব্দ করছে।

ফেকু : ঐ এসে গেছে ! এসে গেছে বুড়া ! রাজার শিকার এসে গেছে ।

বিষেণ : শালা ফেকু চেল্লাচিস এখানে গাঁজা খেয়ে, রাজাবাবুর কাছে খবর গেছে ? নাকি নেশার ধোঁয়ায় বেবাক ভুলে গেছিস ?

ফেকু : আকাশে জোর বাতাস আছে কিনা । বাতাসে বাতাসে রাজাবাবুর কানে আসলি খবর ঠিক পৌছে গেছে । আরে খচ্চর, তোর হাতে জোর নাই ? বজ্জাত শুয়োরটা এখনও জ্যান্ত আছে যে । ঘা লাগাতে বুকে কাঁটা বিঁধছে নাকি ?

রতন : তুই থাম । বেশি পালোয়ানি দেখাস না । সময় মত বন্দুক নিয়ে না এলে ওর গুপ্তির ঘায়ে শুকনো পাথর মাটিতে জনম শোধের চুমু খেতিস বাঞ্চোৎ ।

ফেকু : [তীব্রভাবে] ও ! দেখা আছে । ওর হাতের গুপ্তি আমি কেড়ে নিয়ে ওর ঠ্যাঙে কোপ লাগাই নি ? শালা আমার গলা টিপে খুন করতে আসে নি ?

রতন : বেশি কথা বলিস না ফেকু । ওর দল ছিল আশেপাশে, আমরা না এলে ওর দল তোকে ছাড়ত ? শুকনো পাহাড়ে তাজা রক্তের ঝরণা বানাত না ?

ফেকু : [উত্তেজিত] শুনলি বুড়া শুনলি ? আড়কাঠিগুলা ভেবেছে আমি এখনও নেশা করে ভোম্ ভোলানাথ হয়ে আছি । সব জড় বুদ্ধি, কাণ্ডজ্ঞান কিছুই নাই । শয়তানটাকে আমি ধরেছি, রাজাবাবু আমায় বকশিস দেবে, আমার সুনাম হবে । তাই ঐ খাসীগুলা চায় না রাজাবাবু আমাকে পেয়ার করুক । শোনরে শোন কুত্তার বাচ্চা, তোদের ষড়, জান থাকতে আমি কিছুতেই পূরণ করতে দেব না । [বিলাসের কাছে ছুটে গিয়ে ক্ষিপ্তভাবে তাকে নাড়া দিয়ে] হ্যাঁরে অচ্ছুৎ দুশমনের বাচ্চা, এক বাপের বেটা হবি তো চিৎকার করে একবার জানান দে, কে তোকে পাকড়েছিল ? তোর পায়ে গুপ্তি কুপিয়ে তোকে দড়ি দিয়ে বেঁধেছিল কে ? তোকে মাটিতে ফেলে আওয়াজ মেরে ঐ কুত্তার বাচ্চাগুলোকে ডেকেছিল কে ? মুখ খোল শয়তান । [বিলাস শুধু উঃ আঃ করে] ওঃ ! আচ্ছা মুখে কথা চেপে ঐ খচ্চরগুলোকে তুই রাজাবাবুর বকশিস খাওয়াবি ভেবেছিস ? ভেবেছিস ওরা তোকে রাজাবাবুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দেবে ? আঃ – হ্যাঁ – এই না নীচ জাত তুই ! – মর – মর । বড় কষ্টের মরণ হোক তোর । [রতন ও বিষেণকে] এই পাহাড় জঙ্গলের আঁটঘাট আমার নখদর্পণে – চরণ চালাবি তোরা ? গোলকধাঁধায় ঘুরিয়ে গাড্ডায় ফেলব তোদের – স্বর্গের হাজার দেবতাকে ডেকেও পার পাবি না । আমি লক্ষণের ব্যাটা ফেকু, হ্যাঁ ।

বিষেণ : নেশাটা শালার মাথায় জব্বর নাচন লাগিয়েছে । পুরো পাগল হয়ে

গেছে। চল্ চলরে রতন। ওর নাচন কদ্দুর যায়, সময় মতই দেখা যাবে।

রতন : ঠিক কথা। তুই হারামীটাকে একটু খোঁচা দে বিষেণ। আমি টানছি —হর হর মহাদেব।

বিষেণ আবার চাবুক চালায় বিলাসকে। বিলাস অস্পষ্টভাবে গোঙায়। রতন বিলাসের দড়ি বাঁধা দেহটাকে টানে। টেনে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

ফেকু : [যেন জ্বলে উঠল] দেখলি, দেখলি তো বুড়া ঠাকুর ? দেখলি তো সব ? ওদের আমি ছাড়ব না ! রাজাবাবুর কাছে আমি ঠিক—

গোকুল : [থমকে] নিরীহ সরল জোয়ানটাকে তুই জল্লাদের হাতে তুলে দিলি কেন ফেকু ?

ফেকু : ওরা বেইমান ! বেগারের নিয়ম মানে না।

গোকুল : তোর বাপ লক্ষণও তো বেগার ছিল।

ফেকু : হাঁ ছিল। কিন্তু বাপের দুষ্ট পাপ আমার গায়ে নেই। রাজাবাবু আমাকে বেগার রাখে নি। আমাকে আরও বড় স্বাধীন কাজ দিয়েছে।

গোকুল : কিন্তু লোকটা তো তোর ক্ষতি করে নি কিছু ?

ফেকু : তোর করেছিল বুড়া ! তুই নিষ্ঠাবান বামুন ঠাকুর। উঁচু-জাত। তোর ব্যবহারের পানিটা তো নষ্ট করেছিল। বামুনের পুণ্য যে নষ্ট করেছে, রাজাবাবুর নিয়ম যে লঙ্ঘন করেছে—এই দুনিয়ায় সেই নীচ পাপীর বাঁচার অধিকার নেই।

হঠাৎ মঙ্গল ও যাদবকে এককোণে যমদূতের মত দেখা যায়। তারা দুজন উদ্যত সড়কি নিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে ভয়ঙ্কর মূর্তিতে।

মঙ্গল : এই দুনিয়ায় তোর মত নীচ বেইমান আড়কাঠি মানুষেরও বাঁচার কোন অধিকার নেই রে ফেকু। তোর কালও শেষ হয়ে এল এবার।

যাদব : তোর বাপ লক্ষণের নাম চটপট মনে কর। বেশি সময় তুই হাতে পাবি না।

ফেকু : [হঠাৎ ওদের সশস্ত্র অবস্থায় দেখে ভীষণ ভীত] এ্যাই তোরা— তোরা আমাকে—

মঙ্গল : হ্যাঁ বিলাসের সাথে বেইমানির প্রতিশোধ। মুখের পানি কেড়ে বিলাসকে যমের দুয়ারে পাঠিয়েছিস তুই। তোর সাথে শেষ লেনদেনটুকু হওয়া দরকার।

গোকুল : [আর্তস্বরে] মানুষ হত্যা পাপ। ওকে জানে মারিস না তোরা। মারিস না মঙ্গল—

যাদব : চুপ যাও ঠাকুর।

মঙ্গল : বিলাসকে যখন আধমরা করে জ্যান্ত শরীরটা জল্লাদের হাতে দিতে চললো, কই তখন তো ওদের একবারও বারণ কর নি তুমি ? দুনিয়াতে

. বেইমানের শেষ রাখতে নেই।

যাদব : বাপের নাম জপেছিস ফেকু ? এবার দু পা এগিয়ে হাঁটু মুড়ে ঘাড়টা নিচু কর বাপ।

ফেকু : আমি—আমাকে—বিশ্বাস কর তোরা—বিলাসকে আমি—

মঙ্গল : হুঁসিয়ার। চালাকি করে লাভ নেই। বিলাস যে ভুল করেছে সে ভুল আমরা করব না ফেকু। পালাবার তোর কোন পথ নেই। চৌকিদাররা অনেক দূর চলে গেছে। চড়াই-উৎরাইয়ের দুটো মুখই আমরা আটকে রেখেছি—যাবি কোথায় ?

যাদব : [হিংস্রভাবে] মঙ্গলা—

মঙ্গল [তদ্রূপ] হ্যাঁ—

যাদব সূর্য পাটে গেছে।

মঙ্গল : মার কোপ।

দুজনেই একত্রে দুদিক থেকে অস্ত্র উদ্যত করে ফেকুর দিকে এগিয়ে আসে। ফেকু গুঙরে ওঠে। গোকুল ওঃ ভগবান বলে ভীষণ এক আর্তনাদ করে চোখ বোঁজে। মঙ্গল—যাদব-হাতের গুপ্তি সজোরে ফেকুর পিঠে বসাতে যায়। আর ঠিক সেই সময় কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে বেজে ওঠে শিঙা। আর সাথে প্রচণ্ড শব্দে একটি বন্দুকের গুলি। একটি সেকেণ্ডের জন্য মঙ্গল যাদব থমকায়। পলকে দৃষ্টি বিনিময় হয়। তারপর ফেকুকে কোন আঘাত না করেই বিদ্যুৎ গতিতে উভয়ে চালু খাদের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। হুড়মুড় করে প্রবেশ করে রাজাবাবু, রতন ও বিষেণ। গোকুল ঠাকুর তখনও মুখ ঢেকে আতঙ্কে কাঁপছে, ফেকু মৃতবৎ মাটিতে পড়ে আছে।

রাজা [গম্ভীরভাবে] যাঃ শিকারগুলো হাতের মুঠো থেকে পালাল ?

রতন : হ্যাঁ, সরকার। তবে বেশিদূর যেতে পারে নি। চড়াইয়ের পথটা এগিয়ে দেখব ?

রাজা : চড়াইয়ের শেষ মুখে আমার পাহারা আছে না ?

বিষেণ : সরকার, আমিই ছিলাম। ঐ বেসরমকে নিয়ে আসার জন্য পাহারা ছেড়ে এসেছি।

রাজা : ঠিক বুঝেছিস যে চড়াইয়ের পথে গেছে ওরা ?

রতন : আমার অনুমান সরকার—ওদিক থেকেই একটা আওয়াজ পেলাম কিনা।

রাজা : [গোকুলকে] এখন চোখ খোলো ঠাকুর। অ্যাঁ—বলির পাঁঠার মত কাঁপছিস যে ! ওঠ্ ওঠ্—[ফেকুকে লাথি মেরে] এ্যাই ছুঁচো—এখনও ভিড়মি খেয়ে আছিস কেন ? তুই মরিস নি বুঝলি গর্দভ ?

বিষেণ : ওঠ রে ফেকু—ওঠ—ওঠ—

রতন : তোর শরীর থেকে জান যায় নাই। বেঁচে গেছিস তুই। —রাজাবাবু তোকে জীবন দিয়েছে।

ফেকু : [যেন সম্বিত পেয়েছে] আমি মরি নি এঁ্যা ? সত্যি ? হ্যাঁ। তাই তো আমি মরি নি। [হঠাৎ রাজাবাবুকে সামনে দেখে] রাজবাবু — রাজাবাবুরে — তুমি আমার প্রাণ দিয়েছ — তুমিই আমারে ঐ খুনে জল্লাদের হাত থেকে বাঁচিয়েছ বাপ। তোমার দণ্ডে আমার জীবন সমর্পণ করলাম রাজাবাবু। রাখলে রাখ, মারলে মারো, আমি একটু প্রতিবাদ করব না।

রাজা : ওঠ ব্যাটা — উঠে সোজা হয়ে দাঁড়া, দাঁড়া।

অন্ধকার যেন ঘনিয়ে এসেছে। কাছাকাছি কোথা থেকে যেন মঙ্গল ও যাদবের অস্পষ্ট কণ্ঠ ভেসে আসে।

রাজা : [সচকিত] শুনেছিস ? শুনেছিস ঐ আওয়াজ ?

বিষেণ রতন : হ্যাঁ সরকার।

রাজা : সন্ধ্যা নেমে আসছে। আসুক অন্ধকার — যত ঘনই হোক ওই বজ্জাত ফেরারগুলোকে ধরা চাই-ই চাই। [একটা টর্চ লাইট ওদের হাতে দিয়ে] বাতির আলো জেলে বনজঙ্গলের আঁধার লোপাট করবি। খানাখন্দ, ঝোপঝাড়, গিরিখাত যেন কিছুই বাকি না থাকে। আমার ডুলি পিছনে আসছে। রাত ভোর হওয়ার আগেই ঐ অচ্ছুৎ হারামীগুলোকে আমি চাই যা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সেই পাহাড়ে ঘেরা স্বল্প প্রাঙ্গনের একেবারে নিচের সমতল ভূমি। চারদিক ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল। মাঝখানে কিছু স্থান পরিস্কার। ধরা যেতে পারে এটাই গোকুল ঠাকুরের আস্তানার উঠোন। আশেপাশে বড় বড় কিছু পাথরের খণ্ড। উঠোনের একেবারে শেষ কোণায় একটি পাহাড় কাটা সোপান দেখতে অনেকটা বেদীর মত। তার দুপাশ দিয়ে পাহাড়ে ওঠার দুটি সরু পথ চলে গেছে। রাজাবাবুকে দেখা গেল সেই পরিস্কার উঠোনের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকতে।

রাজা : [গম্ভীরস্বরে] ঠাকুর — ঠাকুর —

হন্তদন্ত হয়ে গোকুল প্রবেশ করে।

গোকুল : [বাধ্য ক্রীতদাসের মত] সরকার — ডাকছিলেন আমাকে ?

রাজা : রাত এখন কত হলো ঠাকুর ?

গোকুল : [আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছু হিসাব করে] আজ্ঞে সরকার —

আকাশের চেহারা দেখে মনে হয় ভোর হতে আর এক প্রহর বাকি আছে।

রাজা : [উদ্বিগ্ন] মাত্র এক প্রহর বাকি ?

গোকুল : হ্যাঁ সরকার।

রাজা : বিষেণ, রতন, অর্জুন কারও কোন পাত্তা নেই এখনও।

গোকুল : জঙ্গলগুলো গভীর, পাহাড়গুলো এলোমেলো। এই বিরাট জায়গা তল্লাস করতে সময় তো কিছুটা লাগবেই সরকার।

রাজা : তার জন্য সন্ধ্যে থেকে তিন প্রহর ? এতো সময় লাগবে তুই বলিস বুড়া ? পাহাড় জঙ্গলগুলোর সীমানা কি সারা দুনিয়া জুড়ে ?

গোকুল : [বিব্রত] সরকার এই জঙ্গল সর্বনাশী জঙ্গল কি না ? পায়ে পায়ে কত বিপদ ! বিষধর সাপ আছে, বুনো শুয়োর আছে, আছে বাঘ, তারপর সময়টা অমাবস্যার কালো রাত কি না ?

রাজা : [তিক্ত] রাতের আঁধারকে লাথি মারার জন্য ওদের হাতে বিজলী বাতিও আছে কি না ? সাপ, বুনো শুয়োর, বাঘের হাত থেকে বাঁচার জন্য তিনটে বন্দুক আছে কি না ? [উত্তেজিত] কিন্তু দণ্ড দণ্ড করে প্রহর এগোচ্ছে, মনটা উদ্বেগে উথাল পাথাল হচ্ছে, অথচ পাহাড়ের কোনো দিক থেকে একটা শিঙার আওয়াজও শুনলাম না। উল্লুকগুলো দঙ্গল বেঁধে নেশা করে কোথাও পড়ে আছে, না কি শটান বজ্জাত দুশমনের হাতে জান দিয়েছে ঠাকুর ?

গোকুল : [আমতা আমতা করে] শয়তানরা পুরুষ তিনজন, একজন মেয়ে। তার উপর মেয়েটার খুব অসুখ –

রাজা : অসুখ ? অসুখ তুই জানলি কি করে ঠাকুর ?

গোকুল : [হতচকিত ও ভীত] ইয়ে মানে – সরকার ফেকুই বলেছিল আমায় –

রাজা : ফেকু তো মাগীটাকে চোখেই দেখে নি বলছিল।

গোকুল : সরকার, ও তবে মিছে বলছে। একটা বদমাশকে ধরেছে ও নিজে। ঐ বদমাশটার সাথেই তো ছিল মেয়েটা।

রাজা : হুঁ, ফেকু তো সে কথা আমাকে বলে নি কখনও।

গোকুল : [ভীতভাবে] ফেকুকে ডেকে আপনি শুধান সরকার।

রাজা : শুধাবার দরকার নেই ঠাকুর। আমি জানি বদমাশটা একাই গেছিল জল আনতে। মাগীটা ছিল দূরে তিনটে মরদের সাথে।

গোকুল : সরকার –

রাজা : তুই কি করে জানলি ঠাকুর যে মাগীটার অসুখ ছিল ?

গোকুল : আমাকে সন্দেহ করছেন সরকার ?

রাজা : জবাবটা তুই দিস নি ঠাকুর। জবাবটাই আমার আগে শোনা চাই।

গোকুল : আমার মনে হলো তাই –

রাজা : কিসে মনে হল ঠাকুর ?

গোকুল : ইয়ে আন্দাজ আর কি সরকার।

রাজা : আন্দাজ ?

গোকুল : হ্যাঁ। চার–চারটে জোয়ান মরদ। জোয়ান মরদ কেউ দু ফোঁটা জলের জন্য মাথায় অমন বিপদ নিয়ে পথের মধ্যে বসে পড়তে পারে ? বিশেষ করে আপনার লোকজন যখন পিছনে ওদের তাড়া করেছে ?

রাজা : জবাবটা বড় ভাল দিলি রে ঠাকুর। হ্যাঁ ঠিক কথা ! জোয়ান মরদ কেন বসবে পথের মাঝে ? বসতে পারে মাগীটা –

গোকুল : অসুখ বিসুখ কিছু না করলে বিটি মানুষটাও মরণ জেনে কেন পথের মাঝে বসবে সরকার ? কেন একজন জোয়ানকে জল আনতে নিচে পাঠাবে ?

রাজা : হ্যাঁ তোর কথাটার বেশ যুক্তি আছে বটে, আলবাৎ যুক্তি আছে। কিন্তু, ফেকুকে তুই কি বলেছিস ?

গোকুল : কি বলেছিলাম সরকার ?

রাজা : স্মরণ করতে পারিস না ?

গোকুল : [ভীতভাবে] ন্-না, সরকার।

রাজা : [মুখে চুকচুক করে] আহা বয়স হয়েছে। বুড়া হয়ে গেছিস, অত কথা তোর মনে থাকবে কেন ? বিলাসটাকে ফেকু ধরেছে বলে তুই ফেকুকে গাল পারিস নি ?

গোকুল : [ভীত বিভ্রান্ত] ইয়ে – মানে – সরকার –

রাজা : [কড়া স্বরে] বিলাসকে যখন ওরা খুন করতে এল তুই চুপচাপ মাটির পুতুলের মত একপাশে দাঁড়িয়ে থেকে মজা দেখছিলি কিনা ঠাকুর ?

গোকুল : [সাফাই গাওয়ার মত] সরকার আমাকে মিছে সন্দেহ করবেন না। আমি ব্রাহ্মণ পুরুত। আমি জীব হত্যা কোন দিন করি নি তাই –

রাজা : তুই এই জঙ্গলের পাহারাদার তো বটে ? জীবহত্যা না করে এই জঙ্গলে শুধু ভগবানের নাম জপ করে বেঁচে আছিস নাকি ?

গোকুল : কিন্তু বুনো জন্তু আর মানুষ –

রাজা : [দপ করে জ্বলে উঠে] মানুষ ? মানুষ কোনগুলো রে ঠাকুর ? ঐ অচ্ছুৎ, অস্পৃশ্য, নীচ, বেগার ভাগাড়ের শয়তান শকুনগুলো মানুষ ? তুই ঠাকুর না বেনামদার বেগার তাই আমার সন্দ হচ্ছে ?

গোকুল : [প্রার্থনার মত] আমি আপনার সাথে বেইমানি করি নি সরকার। আঠারোটা বছর আমি আপনার জমিদারীতে কাজ করছি – কোন কাজে জীবনে কখনও ভুলচুক হয়নি। আমি – আমি – সরকার বিশ্বাস করুন –

রাজা : [ম্লান হেসে] হ্যাঁ হ্যাঁ বিশ্বাস করলাম।

গোকুল : রতন, বিষেণ, সবাইকে শুধান –

রাজা : হ্যাঁ হ্যাঁ শুধোলাম।

গোকুল : আমি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ –

রাজা : হ্যাঁ বুঝলাম। কিন্তু ওরা যদি উল্টো কথা বলে? বেগার মাগীটার অসুখ ছিল তা চোখে না দেখেও বুঝলি কি করে, সে কথাটা আমাকে প্রমাণ দিয়ে বুঝোতে পারিস, তো তোকে এই পাহাড়টাই বিলকুল বখশিস দেব রে বুড়া!

হঠাৎ দূরে কোথায় অস্পষ্ট একটা শিঙার শব্দ শোনা যায়। ফেকু ছুটে প্রবেশ করে।

ফেকু : সরকার – সরকার –

রাজা : কোন্ প্রান্তর থেকে শিঙার আওয়াজ আসছে আঁচ করতে পারছিস কিছু?

ফেকু : [শোনার ভঙ্গি করে] উত্তর দিক থেকে সরকার।

রাজা : নেশার ভানে উল্টোপাল্টা বকছিস না তো ফেকু?

ফেকু : ভগবানের দিব্যি সরকার। সাতদিন আমি গাঁজার কল্কেও ছুঁই নি। গাঁজার গন্ধ পেলে আমার কেমন বমি আসে। গাঁজা আমি ছেড়ে দিয়েছি। বিশ্বাস না হয় ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করুন সরকার।

রাজা : খচ্চর বদমাশটা ডেরায় বাঁধা আছে রে ফেকু?

ফেকু : হাঁ সরকার। সারা শরীর দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে।

রাজা : হালটা কি রকম?

ফেকু : মরার মত উবুর হয়ে পড়ে আছে সরকার। জান আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না।

রাজা : শ্বাস নিচ্ছে না? বুক ওঠা নামা করছে না?

ফেকু : নাকে হাত লাগিয়ে ছিলাম। মালুম হচ্ছে না সরকার।

রাজা : তুই সাতদিন নেশা করিস নি, তাই না ফেকু?

ফেকু : হ্যাঁ সরকার। মা কালীর দিব্যি!

রাজা : নেশা করবি আজ?

ফেকু : এ্যাঁ?

রাজা : হ্যাঁ, আজ তাকে জব্বর নেশা করতে হবে রে ফেকু। একটানে তোকে মাটির কল্কেটা ফাটাতে হবে।

ফেকু : সরকার –

রাজা : হ্যাঁ, কিংবা এক হাড়ি পচাই। প্রাণ ঢেলে জব্বর নেশা কর তুই। আজ তোকে একটা খুব বড় কাজ করতে হবে।

ফেকু : সরকার?

রাজা : এক প্রহর পরে যখন ঐ উঁচু পাহাড়ের কোণে সূর্যঠাকুর ঝিলমিল করে

নিচে উঠবে—সেই সময় ঐ ম্লেচ্ছ, পাপী শয়তানটাকে এই বেদীর উপর দাঁড় করিয়ে গা থেকে ওর চামড়া তুলে নিতে হবে ফেকু।

ফেকু : [সভয়ে] সরকার—কি বলছেন ?

রাজা : হ্যাঁ, গোকুল ঠাকুর থাকবে তোর পাশে। দুনিয়া থেকে নীচু অচ্ছুৎ বজ্জাত পাপী তাপী খতমের মন্ত্র পড়বে তোর পাশ থেকে, আমি দেখব তোর হাতের অস্ত্রের কারিগরি কতখানি পাকা হয়েছে! আস্ত শুয়োরের ভোজ তোকে দেব রে ফেকু।

ফেকু : [অবনত] জী সরকার। আমি নিশ্চয় খেল দেখাব, জরুর দেখাব। বাপকা ব্যাটা সিপাইকা ঘোড়া। আমিও লক্ষণ রামের ব্যাটা ফেকুরাম আছি হ্যাঁ। জরুর দেখব খেল—বঢ়িয়া খেল।

আবার শিঙার ফুঁ শোনা যায়।

রাজা : [উদগ্রাবভাবে] হ্যাঁ উত্তর দিক থেকেই শব্দটা আসছে। ঐ ফেরার দলের সাথে রুনকী মাগীটা নাচে। রুমকী! ওকে আমার চাই-ই চাই। চল ফেকু আমার সঙ্গে। শিগগীর চল।

রাজাবাবু ও ফেকু বেরিয়ে যায়। তাদের গন্তব্যের দিকে তাকিয়ে বিভ্রান্ত গোকুল একদণ্ড মাত্র ঈশ্বরের নাম করে বেরিয়ে যায় অন্য পাশ দিয়ে। আর তক্ষুণি সতর্কপায়ে প্রবেশ করে মঙ্গল ও যাদব। হাতে উদ্যত সড়কি ও টাঙ্গি।

মঙ্গল : আঃ নিশানটা হারিয়ে ফেললাম রে যাদব! হঠাৎ চোখের সামনে আঁধারটা পার হয়ে ঘনিয়ে আসতে কেমন যেন—

যাদব : বেইমান আড়কাঠির ঘাড়ে টাঙ্গির কোপ বসাবার সময় আঁধার তোর চোখে ঘনায় নি মঙ্গলা—

মঙ্গল : শিঙা বেজে উঠল—গুলির শব্দ শুনলাম।

যাদব : টাঙ্গির একটা কোপ মারতে কতখানি সময় লাগত ?

মঙ্গল : গুলির শব্দটা শুনে ধাঁই করে রুনকীর কথা মনে এল, ভাবলাম—রুনকীর যদি কোন বিপদ হয়ে থাকে ?

যাদব : [হতাশ] আঃ ? আমিও তো সেই বেকুবের ফাঁদেই পা দিলাম রে মঙ্গলা। নইলে তোর টাঙ্গিটা হয়ত আসল কিন্তু আমার সড়কির ফলাটা ওর বুকে বিঁধল না কেন ? একসাথে দু জনেই বুদ্ধু হলাম। নাকি বুকে মায়া লাগছিল আমাদের ?

মঙ্গল : ভরত, রুনকী এখনও বেঁচে আছে রে যাদব।

যাদব : কি জানি—আঁন্ধারে একটা দণ্ডে ওদের কোথায় হারিয়ে ফেললাম।

মঙ্গল : আমি কিন্তু উত্তর দিক থেকে এইমাত্র একটা শিঙার আওয়াজ শুনেছি।

যাদব : তাহলে ওরা দুশমনের ফাঁদে পড়েছে বলছিস ?

মঙ্গল : ফাঁদে তো সবাই পড়ে আছি যাদব। বিলাসকে ওরা জোর করে ধরে নিয়ে গেল চোখের সামনে। কিছুই করতে পারলাম না।

যাদব : মঙ্গলা—

মঙ্গল : ওর জানটা এখন আছে কিনা জানি না। রুনকী পোয়াতি এই দুর্গম অরণ্যে একা ভরতের সাথে সাপ বাঘের পেটে না গেলেও ঐ জানোয়ার সরকারের জালে পড়তে বাকি থাকবে কিছু?

যাদব : তুই এক্ষুণি শিঙার শব্দ শুনেছিস বললি না?

মঙ্গল : বলেছি—

যাদব : তা হলে ওরা এখনও জানে মরেনি কেমন?

মঙ্গল : [উজ্জ্বল মুখে] ঠিক তাই। যাবি যাদব?

যাদব : কোথায়? ভরত, রুনকীর খোঁজে?

মঙ্গল : না। শকুনগুলো ওদের খোঁজেই আছে। এটাই মোক্ষম সুযোগ যাদব। যা কিছু করতে হয়—এই বেলা।

যাদব : মঙ্গলা কি বলছিস?

মঙ্গল : [রহস্য করে] চেয়ে দেখ, পাহাড়ী ঐ উঠোনটা কেমন সাফ রয়েছে। দু দিক উঠে গেছে সরু পাহাড়ী চড়াই পথ। তাহলে ঐ দূরের ডেরাটাই নির্ঘাৎ গোকুল ঠাকুরের।

যাদব : [চাপা উত্তেজনায়] বিলাস ওখানেই আছে বলছিস?

মঙ্গল : রাতারাতি চালান দেবে কোথায়? বেঁচে থাকলেও ওখানেই, আর মরণ হলেও ওখানেই। বিলাসের জন্য মনটা আমার আকুল হয়ে উঠছে রে!

যাদব : ডরাস না রে মঙ্গলা। সাঁঝের ভুল বারবার হবে না। বাঘ হোক, মানুষ হোক, আর শয়তান সরকারই হোক—ভালো রে আমরা ভালো—বাধা পেলে সটান লাশ পড়বে এই পাথুরে মাটিতে।

মঙ্গল : শোন রে স্যাঙাৎ, যাচ্ছিস দুশমনের শক্ত ঘাঁটিতে, মাথা কিন্তু একদম গরম করবি না। একটু ভুল চুক হবে তো শুধু নিজেদের জানই যাবে না, বিলাসেরও ফেরত আসার পথ বন্ধ হয়ে যাবে চিরকাল।

যাদব : [চঞ্চল] হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জানি। চল—

মঙ্গল : শোন, আমি যাব এ পথে—তুই যাবি ওমুখো নিচে দিয়ে ঘোরা পথে। বাঘের মত সবসময় চোখ জেলে রাখবি। হাঁটবি শিকারী বন-বেড়ালের মত পা টিপে টিপে। পায়ের শব্দ কি গায়ের গন্ধ টের পাবে না দুনিয়ার কেউ। হুঁশিয়ার যাদব—

যাদব : মঙ্গলা—

মঙ্গল : কসম।

যাদব : কসম।

উভয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে দুপথে বেরিয়ে যায়। নিস্তব্ধতা। দু একটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ। সে আওয়াজও নীরব হয়। উপরের পথ দিয়ে রাজাবাবু ও ফেকু প্রবেশ করে।

ফেকু: আকাশ ফুঁড়ে কোথা থেকে যে ওরা শিঙা বাজাল, তাই একদম মালুম পেলাম না সরকার। গাছের বাদুর হয়ত মাথার উপরে ঝটপট করে ডানা নেড়েছিল। শব্দ হয়েছিল পাতায়—ঘুম চোখে ভেবেছে দুশমন।

রাজা: থাম। উপর থেকে মানুষের গলার চাপা শব্দ স্পষ্ট শুনেছি।

ফেকু: [আশ্চর্য হয়ে] এখানে সরকার? ঠিক—ঠিক এখানে?

রাজা: হ্যাঁ এখানে! একটা মরদের ফিসফিসে চাপা গলা। কাউকে যেন কিছু বলছিল।

ফেকু: [কাঁপতে কাঁপতে] এঁ্যা তাহলে—তাহলে নির্ঘাৎ অপদেবতা সরকার।

রাজা: [চাপা রাগে] ফেকু—

ফেকু: [ভীতভাবে] সরকার। গেল মাসে একটা অচ্ছুৎ জবাই হয়েছিল এখানে। অপমৃত্যু হুজুর—

রাজা: সেই অচ্ছুতটাই অপদেবতা হয়ে তোর ঘাড়ে এখানে এসে ভর করেছে তাই না ফেকু?

ফেকু: ওদের কিছু বিশ্বাস নেই। ওরা সব পারে হুজুর। ওর—ওরা—

রাজা: রাজাবাবুও সব পারে রে ফেকু। স্বর্গ নরকের সব দেবতা অপদেবতা সবাইকে এখানে এনে নাচাতে পারে। কাঁদতে পারে আবার দরকার হলে নিজের লাটে বেগারও বানাতে পারে, বুঝলি?

ফেকু: জী সরকার। কিন্তু—

রাজা: কোন কিন্তু নেই রে ফেকু। রাজাবাবু দুশমন আর বিটিমাগী এই দুটোরই গন্ধ ঠিক পায় বুঝলি?

ফেকু: জী সরকার।

রাজা: রুনকী—রুনকী-টা বড় দজ্জাল হয়েছে, তাই না রে?

ফেকু: হ্যাঁ সরকার, তাই তো শুনেছি। খুব দজ্জাল—খুব পাজি—

রাজা: দুটো বছর ওকে খাঁচায় পোরার চেষ্টা করছি—কিন্তু মুঠোয় ধরার মত নাগালই পাই না—

ফেকু: নাগাল পেতেন হুজুর কিন্তু ভরত ব্যাটা যে ওকে সাদী করে নিল।

রাজা: দু দুটো লাশ পড়ল। আট খানা অচ্ছুৎ ঘর আমি আগুনে জ্বালিয়ে ছারখার করে দিলাম, ছয় জনের হাতের আঙুল কেটে নিলাম—

ফেকু: রুনকী আপনার ভালবাসার কদর বোঝে না সরকার। আপনি রুনকী-কে কত ভালবাসেন, রুনকী যদি আপনার সেই ভালবাসার দর বুঝত—

রাজা: চোপ! ভালবাসা? আমি বর্ণশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, পাঁচটা জোতের মালিক,

আমি ভালবাসা দেব ঐ অস্পৃশ্য নীচ বেগার মাগীটাকে ? ফের এ কথা তোর জিভে এলে জিভখানা আর মুখে আস্ত থাকবে না ফেকু।

ফেকু: অপরাধ হয়ে গেছে, ক্ষমা করে নিন সরকার। আর কখনো মুখে আসবে না।

রাজা: [রহস্য করে] এই পাহাড়টা কার তল্লাট রে ফেকু ?

ফেকু আপনার সরকার।

রাজা এই বনের মালিকটাকে রে ফেকু ?

ফেকু আপনি সরকার।

রাজা: রেওয়া—বুহুলিয়া কার তালুকদারী রে ফেকু ?

ফেকু: আপনার সরকার।

রাজা: তুই কার গোলাম রে ফেকু ?

ফেকু: আপনার সরকার।

রাজা রেওয়া—বুহুলিয়া—এই পাহাড়—জঙ্গল কার বেগার রে ফেকু ?

ফেকু: আপনার—আপনার সরকার।

রাজা: তাহলে এই বজ্জাত রুনকীর মনিবও আমি। কি ঠিক কিনা ফেকু ?

ফেকু: জী—কিন্তু—

রাজা: কিন্তু ?

ফেকু: কিন্তু রুনকী—রুনকীর মরদ ভরত ওদের সর্দার। মঙ্গল যাদব আপনার বেগার ফিরিয়ে দিয়েছে। ওরা আপনার কানুন মানে না—ওরা বেইমান।

রাজা: ঠিক—! তাই তো আমি পাহাড় বন চষে বেড়াচ্ছি। বেইমানির শাস্তি আমি দেবই। নিজের হাতে ওদের গায়ের চামড়া টেনে তুলব। আর রুনকী; রুনকীর জন্যে অনেক ঝঞ্ঝাট হয়েছে। রুনকীর সাথে একটু চরম খেলা খেলব। ওর শরীরের মালিক আমি, ওর সতীত্ব লুট করব। মারব, ছিঁড়ব, তারপর—তারপর ওকে ঐ পাথরের বেদীর পরে দাঁড় করিয়ে—

ফেকু: [হতভম্বভাবে] জী—জী সরকার। রুনকীর বড় দেমাক। ওর মরণ হওয়ারই দরকার।

রাজা: রতন, বিষাণ, অর্জুন পাকা শিকারী, কিন্তু বড় বেশি সময় নিচ্ছে। রাতে কাকপক্ষী সব ঘুমিয়ে থাকে—রাত থাকতে থাকতেই সব কাজ চুপচাপ চুকে গেলেই ভালো ছিল কিনা বল ?

ফেকু: আমি এগিয়ে দেখব সরকার ?

রাজা: তুই এগিয়ে দেখবি ? [হেসে] তুই না অপদেবতার ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিস এখানে ?

ফেকু: ইয়ে না মানে—বিলাসকে তো আমিই ধরেছি সরকার।

রাজা: [যেন মনে পড়েছে] বিলাস !

গোকুল ঠাকুর ছুটতে ছুটতে প্রবেশ করে।

গোকুল : রাজাবাবু—ফেকু—রাজাবাবু—সর্বনাশ হয়ে গেছে—বিলাস—

ফেকু : বিলাসের কি হয়েছে রে বুড়া? কি হয়েছে?

রাজা : মরেছে বুঝি?

গোকুল : জানি না রাজাবাবু। ডেরা থেকে বিলাস—বিলাস পালিয়েছে।

ফেকু : [স্তম্ভিত] সে কি ঠাকুর! বিলাসটা পালিয়েছে? অ্যাঁ?

রাজা : আধমরা লাশটা পালিয়েছে? ওর পা বাঁধা ছিল না?

গোকুল : ছিল হুজুর।

রাজা : হাত বাঁধা ছিল না?

গোকুল : ছিল হুজুর।

ফেকু : আলবাৎ আমি নিজের হাতে ওকে বেঁধেছি সরকার।

রাজা : ঠিক ঠিক। তবু সেই হাত-পা-দেহ—সবকিছুর বাঁধন নিশ্চিত খুলে আধমরা অচ্ছুৎ বেগারটা অচেনা অজানা জায়গা থেকে আপনা আপনি পালাল? বিলাসটা তাহলে মন্ত্র তন্ত্র জানে—কি বলিস অ্যাঁ?

ফেকু : [আর্তচিৎকার] অপদেবতা সরকার। আগেই বলেছিলাম এখানে অপদেবতা আছে। অপদেবতাই হয়ত—

রাজা : [গর্জে] থাম ফেকু। একদম চেল্লাস না। ঠাকুর তুই কি বলিস?

গোকুল : [বিচলিত] আমি—আমি কি করে বলব হুজুর—আমি তো আপনার সাথে সাথেই ছিলাম। আপনার সাথে এক্ষুণি ফিরেছি ঐ পাহাড় থেকে—

রাজা : তোর বাড়িটা কোথায় ঠাকুর? তোর বৌ?

গোকুল : ঘরে ঘুমোচ্ছে হুজুর।

রাজা : অ্যাঁ? [হেসে] বন জঙ্গলে এত লড়াই চলছে তবু তোর বুড়িটা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে? বুড়িটা কুম্ভকর্ণের নিজের বোন নিশ্চয়ই?

গোকুল : ইয়ে ওর শরীর ভাল না হুজুর। বয়স হয়েছে। তাছাড়া কানেও শুনতে পায় না একদম।

রাজা : হুঁ।

ফেকু : [চিৎকার করে] সরকার—সরকার—

রাজা : কি হয়েছে ফেকু?

ফেকু : আমি গন্ধ পেয়েছি সরকার। দুশমন, দুশমন এসে নিয়ে গেছে বিলাসকে।

রাজা : দুশমন! দুশমনদের খুঁজছে তো বিষেণ, অর্জুন, রতন—

ফেকু : সে তো রুনকী আর ভরতকে। কিন্তু যাদব আর মঙ্গলা—

রাজা : [চমকে উঠে] মঙ্গল? হ্যাঁ-হ্যাঁ ঠিক। ওদের কথা তো আমি বেমালুম ভুলেই গেছিলাম। সাবাস ফেকু, তোর মাথায় বুদ্ধি আছে। তাহলে ওরাই—

ফেকু : জী সরকার। ওদের পালাবার পথ ঐ একটাই। যদি ঐ চড়াই দিয়ে এক্ষুণি ওঠা যায়—

রাজা : উঠতেই হবে ফেকু। রাজাবাবুর খোলা চোখের সামনে থেকে রাজাবাবুরই মুখের খাবার নিশ্চিন্তে পালাবে তা তো হতে পারে না। ঠাকুর তুই তোর ডেরার চারপাশটা সাবধানে নজর রাখিস। আমরা এগোচ্ছি। চল ফেকু—

ফেকু শিঙায় ফুঁ দেয়। তারপর রাজাবাবু ও সে দ্রুত ডানদিকের উঁচু পথ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

গোকুল : হা ভগবান। জাতবর্ণের নামে তোমার একি বিচার? এ তুমি কি বিধান নির্দেশ করেছ ঐ নিরীহ বেচারাদের ভাগ্যে? কেন ওদের বাঁচার ঠাঁই না দিয়ে তুমি জগৎ সংসারে পাঠিয়েছিলে দয়াময়? আমি যে পারছি না—কিছুতেই মনকে বুঝিয়ে পারছি না—তোমার বিধান মেনে নিতে। আমায় তুমি ক্ষমা কর—ক্ষমা কর—ক্ষমা কর প্রভু।

গোকুল ঠাকুর পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। কুকুরের দু-একটা ডাক। সন্তর্পণে এসে ঢোকে যাদব ও মঙ্গল। মঙ্গলের কাঁধে আহত ক্ষত বিক্ষত বিলাসের দেহ।

যাদব : এইখানেই থাম একটু। একটু জিরিয়ে নে মঙ্গলা।

মঙ্গল : একেবারে দুশমনের বুকের পরে? বলছিস কি যাদব? আর কয়েক কদম এগিয়ে চল।

যাদব : ভয় নেই রে। ওরা টের পেয়ে আমাদের ধরতে ছুটেছে এই পাহাড়ী পথে। পাহাড় ঠেঙ্গিয়ে ফিরতে সময় লাগবে রে মঙ্গলা। ততক্ষণ প্রাণ ভরে বুকে শ্বাস নেব।

মঙ্গল বিলাসের দেহটা মাটিতে নামায়। বিলাস দেহের ক্ষতের যন্ত্রণায় 'আঃ' 'উঃ' করে।

মঙ্গল : ঠাকুরের এই আস্তানা একটুও নিশ্চিন্তের নয়। রাজাবাবুও এখানে দলবল নিয়ে ডেরা বেঁধেছে। যে কোন সময় হামলা করতে পারে।

যাদব : আচ্ছা ওরা এখানে আসবে ঠাকুর কি তা জানত না ভাবছিস?

মঙ্গল : মানুষটা ভীতু কিন্তু খারাপ নয়। জানলে নির্ঘাৎ এখানে আমাদের আসতে বলত না।

যাদব : ঠাকুর রাজাবাবুর নোকর। রাজার নোকরকে তুই বিশ্বাস করিস মঙ্গলা?

মঙ্গলা : নোকর তো তুইও ছিলি—আমিও ছিলাম।

যাদব : ছিলাম, কিন্তু রাজাবাবুর জুলুম, অন্যায় আমরা মুখ বুঁজে মেনে নিই নি। আমাদের ঘরের মা-বিটি-বৌদের বজ্জাত রাজাবাবুর পায়ে তুলে দিই নি—বিদেশে পাঠিয়ে বেশ্যার নোকরি নিতে দিই নি। আর তাই তো রাজাবাবু—

মঙ্গল : আর কিছু না রে যাদব ?

যাদব : আর—আর কি ?

মঙ্গল : যে জমিন আমরা চষেছি যুগ যুগ—তার ন্যায্য দখল চেয়েছি—যে জঙ্গল সাফ করেছি, যে পথের মাটি কেটেছি সেই মেহনতের ন্যায্য মজুরি চেয়েছি।

যাদব : ঠিক—

মঙ্গল : রাজাবাবুর তাতে গোঁসা হয়েছে। থাবা মেরে আমাদের কাজ কেড়ে নিয়েছে। পাওনা মজুরি দেয় নি। পিছনে চৌকিদার গুণ্ডা লাগিয়েছে। তবু যখন আমরা মান বেচে ওর পায়ে মাথা নামাই নি তখন আমাদের ঘর বাড়িতে আগুন দিয়েছে, গ্রাম ছাড়া করেছে। ঠিক কি না বল ?

যাদব : [অসহায়ের মত] কিন্তু মঙ্গলারে—একটা কথা আমি কিছুতেই মালুম করতে পারছি না। রেওয়া বুহুলিয়ায় তো হাজার হাজার আমাদের স্বজন-স্বজাতি, রাজাবাবুকে সবাই ঘৃণা করে কিন্তু আমাদেরই উপর রাজাবাবুর গোঁসা হল কেন ? আমাদের শির নেওয়ার জন্য বনজঙ্গল পাহাড় তোলপাড় করে এমন পাগল হয়ে উঠছে কেন ?

মঙ্গল : তুই মানুষ না রে যাদব—জাবনাকাটা খাটি গরু বটে। আরে বোকা এত কথা বুঝেছিস, আর এই ছোট্ট কথাটাই বুঝলি না ?

যাদব : আমার মাথাটা না হয় একটু খাটোই আছে, যা বলবি খুলে বল।

মঙ্গল : আমরা রাজাবাবুর তাবৎ অত্যাচার অপমান, নীচ জাতের জন্ম,—জনমের ভাগ্যের লিখন বলে মেনে নিয়েছি কি নিই নি ?

যাদব : নিই নি।

মঙ্গল : রেওয়া বুহুলিয়া তাবৎ অচ্ছুৎ জাতের গাঁও থেকে রাজাবাবু সোমত্ত মেয়েদের লুট করে নিয়ে যায় কিনা ?

যাদব : হ্যাঁ যায়। আর সেই জন্যেই তো আমি—

মঙ্গল : ব্যাস্ ব্যাস্। ঐ মেয়েমানুষ বিক্রি করে রাজাবাবুর মোটা টাকা আয় হয় কিনা ?

যাদব : হয়। ওদের ভিন দেশের বাজারে বিক্রি করে।

মঙ্গল : কেন করে ?

যাদব : আমাদের মা-বোনদের বেবুশ্যে বানায়।

মঙ্গল : আমরা চারজনে ঐ কাজে বাঁধা দিয়েছিলাম ?

যাদব : দিয়েছিলাম।

মঙ্গল : বিনি মাগনার জনম জনম ভোর বেগার খাটতে আমরা গররাজি হয়েছিলাম ?

যাদব : হ্যাঁ হয়েছিলাম।

মঙ্গল : বুদ্ধুলিয়ার আমাদের স্বজন স্বজাতেরা আমাদের কথা হক্ কথা বলে মেনে নিয়েছিল তো ?

যাদব : হ্যাঁ।

মঙ্গল : তাহলে আমরা চার জনই ছিলাম রাজাবাবুর আসল দুশমন ? আমাদের চটপট দুনিয়া থেকে বিদায় করতে পারলে—বুদ্ধুলিয়ার বাকি হাবা লোকগুলোকে কব্জা করতে কিছু অসুবিধা হবে ? আমরা না থাকলে রাজাবাবুর বন্দুকের মুখে লোকগুলো গর্জন করে ওঠার সাহস পাবে ?

যাদব : [চাপা জিঘাংসায়] আহ্ ভগবান ! শালা শুয়োরটার মাথায় এত ষড়। এত ছল্ চাতুরী। উফ্ একবার যদি সামনে পেতাম শক্ত হাতে ওর মাথাটা বন মোরগের মত টেনে ছিঁড়ে দু টুকরো করতাম।

মঙ্গল : রাজাবাবু তো একটা না যাদব। ভরত বলে, শুনিস নি, গাঁয়ে গাঁয়ে এমন বহু রাজাবাবু আছে ?

যাদব : ভরত ! ভরতের কি হাল হলো কে জানে ? বেঁচে আছে কি না মরেছে—[বিলাস আবার আবার যন্ত্রণায় আঃ উঃ করে] মরবে ছুঁচো ! হাতে ধারালো অস্ত্র ছিল—ফেকুর হাতে ধরা পরার আগে বুকে বসাতে পারিস নি ? এখন নেড়ী কুত্তার মত ঘা খেয়ে কুঁই কুঁই করছিস ? স্বজনের মান ডুবিয়েছিস রে শালা।

মঙ্গল : আহ্ যাদব। আশপাশে কেউ ঘুরছে, চেঁচাস না বেশি। [বিলাসকে] উঠতে পারবি—দাঁড়াতে পারবি একটু বিলাস ? বিলাস—

বিলাস কোন কথা বলে না। শুধু গোঙায় যন্ত্রণায়।

যাদব : উঠবে কি করে ? ও এখন আমাদের ঘাড়ে চেপে মরণ ফাঁদে আমাদের মরণ নাচন দেখে মনে মনে মজা লুটবে না ? ফেলে দিয়ে গা বাঁচা মঙ্গল—মড়া টেনে লাভ নেই।

মঙ্গল : যাদব ! ও আমাদের সঙ্গী, বন্ধু ?

যাদব : বন্ধু তো ধরা পড়ে আমাদের বিপদে ফেলল কেন ?

মঙ্গল : ও রুনকীর জন্য পানি আনতে এসেছিল এই নিচে।

যাদব : [সতৃষ্ণ] পানি ?

মঙ্গল : তেষ্টার এক ফোঁটা পানি ওকে নিতে দেয়নি ওরা। দিয়েছে অপমান, দিয়েছে চাবুক। বিলাসের অপমান তোর আমার সবার অপমান। বিলাসের গায়ে প্রত্যেকটা চাবুকের ঘা তোর আমার পাঁজরের উপর বেজন্মা রাজাবাবুর শয়তানীর ঘা।

উপরের পথে এক ঝিলিক টর্চের আলো পড়ল।

হেই—হুঁসিয়ার যাদব। ওরা ফিরছে, বাতির আলোর ঝলক আমি দেখেছি। সাবধান—

যাদব: এঁ্যা—কি করবি?

মঙ্গল: আমি বিলাসকে কাঁধে নিচ্ছি। মরলে মরুক আমাদের সাথে। সামনে এগো—তাড়াতাড়ি—

যাদব: কোথায়?

মঙ্গল: যে দিকে চোখ যায় শিগ্‌গীর—পা চালা—

বিলাসকে এক ঝটকায় কাঁধে তুলে মঙ্গল ও যাদব একপাশ দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায়। টর্চের আলো ফেলে ফেলে রাজাবাবু ও ফেকু প্রবেশ করে।

রাজা: [বিরক্ত ও ক্রোধে] নাঃ ফালতু ঘোরাই সার হলো। কোথাও ব্যাটাদের কোন নিশানই পেলাম না।

ফেকু: জী সরকার, বদমাশরা বড় ধড়িবাজ। বড় চালাকির খেলা খেলছে।

রাজা: কার সাথে খেলছে রে ফেকু? আমি এই এলাকার রাজাবাবু। এই বনের বাঘ-শুয়োর আর ঠাকুর অচ্ছুৎ আমার ভয়ে এক ডোবার জল খায় না?

ফেকু: জরুর খায় সরকার।

রাজা: [শ্লেষসহ] তুই ব্যাটা নিজেও জাতে অচ্ছুৎ, মনটাও পড়ে আছে ঠিক সেই রকম। ভেবেছিস ঐ অস্পৃশ্য শুয়োরগুলো চালাকির খেলা দেখিয়ে আমার মুঠোর বাইরে চলে যাবে? [হাসে] এই পাহাড়, পাহাড়ের ওপারে সব জমিন, সব গাঁও, তাবৎ মানুষ আর মাথার উপর এই আকাশ, তামাম দুনিয়া—আমার নোকর রে ফেকু। আমি আঙুল নাড়লে গাঁও আস্ত থাকে, আমি আঙুল নাড়লেই চোখের পলকে সব গাঁও ছাই হয়ে মিশে যায় জমিনের সাথে।

ফেকু: [ভীতভাবে] জী-জী সরকার।

রাজা: হ্যাঁ, তবেই তু ঠিক বলেছিস। ওরা পাকা খেলুড়ে। পাকা শয়তান। খেলতে ভালবাসে। তা খেলুড়ের সাথে রাজাবাবুও খেলতে ভালবাসে। কিন্তু জালের দড়ি তো আমার হাতে আছে নাকি রে ফেকু?

ফেকু: ঠিক সরকার, ওরা ধরা পড়বেই।

রাজা: তা আমিও জানি। কিন্তু ভাবছি পাহাড়ের সব পথ ঘেরা, ওরা পালাচ্ছে কি ভাবে? চোখের সামনে নিজের ডেরা থেকে আধমরা বিলাসটাকে হাওয়া করল কি ভাবে?

ফেকু: দেবতা—দেবতা ওদের সাথে আছে হুজুর।

রাজা: [ফেকুর গালে চড় বসিয়ে] থাম। দেবতা! দেবতাকে আমি রোজ পুজো দিই না? মানত করি না? গাঁয়ে দেবতার আমি মন্দির বানাই নি? ঐ অস্পৃশ্য নীচ মানুষগুলো বেইমান হয়ে গেছে বলে কি দেবতাও আমার সাথে বেইমানি করছে বলতে চাস? আরে বুদ্ধু—দেবতা বানিয়েছি আমি, ঠাকুর পুরুতও বানিয়েছি আমি, কার বুকের পাটা এমন শক্ত যে আমার

তৈরী কানুন ভাঙে ?

গোকুল প্রবেশ করে।

ফেকু : কিছু বলবি ঠাকুর ?

গোকুল : হ্যাঁ—রাত তো শেষ হতে চলেছে, কিছু বাদেই আঁধার কেটে আলো ফুটবে। সারাদিন, সারারাত পাহাড়ের তল্লাট চষে জেগেই কাটালেন, এখন যদি একটু বিশ্রাম না নেন তাহলে কাল শরীরটা একদম অচল হয়ে পড়বে তাই—

রাজা : ঠাকুর রাজাবাবুর শরীরটা তুই তাজা করতে চাস, তাই না ?

গোকুল : হ্যাঁ হুজুর।

রাজা : খুব ভালো, খুব ভালো! রাজাবাবু যৌবন থেকে তিরিশ বছর তো রাতের শেষ প্রহর জেগেই কাটিয়েছে। তবু তার শরীর মন এখনও তাজা আছে কেন জানিস ? [গোকুল নিশ্চুপ] ঐ অচ্ছুৎ রুনকী মেয়েটাকে দেখেছ ঠাকুর ? রাতের ক্লান্তি রুনকীর দেহের গরম তাপে নেশার মত কেটে যাবে। আলো ফোটার আগে রুনকীর দিশা তুই দিতে পারিস ঠাকুর ? পারিস দিতে ?

গোকুল ঠাকুর কোন জবাব দিতে না পেরে চুপ করে যায়। শিঙার শব্দ জেগে ওঠে। কোলাহল। দৌড়তে দৌড়েতে বিষেণ প্রবেশ করে।

বিষেণ : রাজাবাবু—রাজাবাবু—

রাজা : বিষেণ! কি খবর ?

বিষেণ : ধরেছি হুজুর—দুটাকে ধরেছি।

ফেকু : [স্তম্ভিত] অ্যাঁই—

রাজা : ধরেছিস ? —জ্যান্ত না মরা ?

বিষেণ : জ্যান্ত হুজুর। তবে—

রাজা : তবে ?

বিষেণ : মরদটার পায়ে গুলি চালিয়েছিলাম। অন্ধকারে নিশান ভুল হয়ে লেগেছে ওর দুই চোখের মাঝখানে ঠিক কপালের উপর। কোন সাড়াশব্দ নেই—জানি না এখনও ঠিক—

রাজা : [উদ্বিগ্ন] রুনকী ? রুনকীর খবর বল আগে!

বিষেণ : ওকে ধরতে পারতাম না হুজুর ··আমাদের হদিশ পেয়ে পালাচ্ছিল নিচের খাদের পথে। অর্জুন ফেলেছিল বিজলী বাতির আলো। কিন্তু এমন চোখ কানা আঁধার যে, আলো তিন হাত যেতে না যেতেই মিইয়ে যায়। খাদের পথে ওদের পায়ের আওয়াজ শুনে আওয়াজে দুরুম দুরুম করে মারলাম দু খানা গুলি। পাহাড় বন আকাশ ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ভরত। ছুটে গেলাম খাদের দিকে।

রাজা : তারপর—তারপর ?

বিষেণ : রুনকী এগিয়ে গিয়েছিল বেশ কয়েক কদম। পিছনে মরদের মরণ-চিৎকার শুনে আবার ফিরে এল। কি বলব সরকার, মেয়েমানুষের মন তো বড় কোমল। ভরত ছিল ওর নিজের মরদ। মরদের ছটপটানি দেখে ওটা যেন বর্শার খোঁচা খাওয়া জ্যান্ত-বাঘিনী হয়ে গেল। মরদকে ফেলে, বন্দুক তোয়াক্কা না করে ধেয়ে এল আমাদের দিকে। গায়ে ক্ষ্যাপা হাতির জোর সরকার। এক ঝটকায় অর্জুনকে ফেলে দিল মাটিতে। আমার হাত থেকে বন্দুক কাড়তে এল। বুক ফাটিয়ে চেঁচিয়ে গাল পারল, শাপ দিল। কি বলব সরকার মেয়ে মানুষের অমন রূপ আমি কখনও—

রাজা : [ব্যাস্ত] রুনকী এখন কোথায় সে কথা আগে বল ?

বিষেণ : বেঁধে ফেলেছি সরকার ! ঐ অর্জুন ওকে সামাল দিয়ে নিয়ে আসছে।

রাজা : ফেকু—

ফেকু : আমি যাচ্ছি সরকার। কিছু ভাববেন না।

ফেকু ছুটে বেরিয়ে যায়।

রাজা : খুব বড় কাজ করেছিস বিষেণ। বিশ টাকা ইনাম পাবি তুই।

বিষেণ : [গদগদ] সরকারের দয়া।

রাজা : হাড়িয়া খাবি বিষেণ ? খাবি হাড়িয়া ?

বিষেণ : সরকার—

রাজা : খা-না। খা। বড় কাজ করেছিস। বাঘিনী ধরেছিস, কম করেও তিন হাজারী জিনিষ। কষ্ট হয়েছে অনেক। একটু ফুর্তি করে মন মেজাজটা ঠিক করে নে।

বিষেণ : আপনার হুকুম সরকার।

রাজা : ঠাকুর—

গোকুল : আমার ডেরায় আছে হুজুর—এনে দেব ?

বিষেণ : [অপরাধীর মত] রাম রাম। থাক থাক সরকার। একই নোকরী করলেও ঠাকুর তো ঠাকুর। আমার চেয়ে বড়জাত। ঠাকুরের হাতে হাড়িয়া খেলে যে মহাপাপ হবে হুজুর। আমিই ডেরা থেকে নিয়ে নিচ্ছি। আপনি চিন্তা করবেন না হুজুর।

বিষেণ একদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। উপর থেকে ফেকু টানতে টানতে আহত মৃত প্রায় ভরতকে নিয়ে আসে। পিছনে দড়িতে আবদ্ধ রুনকী অর্জুনের কাঁধে। অর্জুন ও লখাই প্রবেশ করে। ওদের দেখতে দেখতে রাজাবাবু একসময় হো হো করে হেসে উঠে উৎকট ক্রূর আনন্দে।

রাজা : বুড়ুলিয়া থেকে এতদূর চড়াই পেরিয়ে এই পাহাড় বনে মরদের সাথে রাতের মিঠে হাওয়া খাচ্ছিলি নাকি রুনকী ? হ্যাঁ—এই পাহাড়টার জল-

বাতাস খুব ভালো। শরীর ভালো হয়, মনও দরাজ হয়। এই পাহাড়ের বাতাস খেলে যৌবন খুব চাঙ্গা হয়। [রুনকী চুপ] তা আমাকে আগে বললেই পারতিস। এত কষ্ট তোকে করতে হতো না। লক্ষ্ণৌর বাজারে যাওয়ার আগে শরীরটা আর একটু ভালো হলে তোর দাম আর নাম দুটোই একটু বাড়তো রে রুনকী। রুনকী। [রুনকী নিশ্চুপ] আহা, এখন মুখ খোল, কথা বল। রাজাবাবুর নিয়ম ভাঙ্গলি, এত পাহাড় পথ ভাঙ্গলি, দুদিন ধরে পাহাড় পেরিয়ে পালাতে চাইলি ভিন দেশে, কিন্তু ঘুরে ফিরে সেই রাজাবাবুর এই মুঠোটার মধ্যে এসে পড়লি কিনা — বল —

ফেকু : [চুপি চুপি] সরকার, ওর বড্ড কষ্ট এক ফোঁটা পানি পড়েনি মুখে সারাদিন —

রাজা : তোর কাছে চেয়েছিল নাকি ফেকু ? পানি চেয়েছিল ?

ফেকু : ইয়ে সরকার, বিলাস তো ওরই জন্যে পানি চুরি করতে গিয়েছিল কিনা।

রাজা : বিলাস ! [হঠাৎ দপ করে জ্বলে ওঠে] ঐ শুয়োরটা মরা গতর নিয়ে পালিয়েছে। মঙ্গল যাদব এখনও ধরা পড়েনি। আমার বুকে এখনও তিন-খানা কাঁটা সবসময় খচখচ করে খোঁচা দিচ্ছে বাঞ্চোৎ। আমার দুনিয়া-দারীতে বজ্জাৎ বেগাররা আমার নিয়ম ভেঙ্গে আমার মুঠো থেকে পালায় ? আমার অহঙ্কারকে কলা দেখিয়ে আমাকে বুদ্ধু বানাতে সাহস করে দজ্জাল অচ্ছুৎরা ?

অর্জুন : সরকার একটা কথা বলব ?

রাজা : দজ্জাল ফেরারদের সম্পর্কে কিছু বলবি অর্জুন ?

অর্জুন : হ্যাঁ সরকার।

রাজা : বল কি বলবি তুই ?

অর্জুন : [তোয়াজের সুরে] ইয়ে — হুজুর — আপনি ক্ষমতাবান। অনেক বড় মানুষ। আপনার কথায় দুনিয়া ওঠে বসে। দুনিয়া আপনার নোকর। ঐ বেচালদের জন্য আপনি এত ভাবছেন কেন ? বুদুলিয়ায় ওদের স্বজন স্বজাতি আছে তো ? ওদের ধরে ধরে কোতল করুন। ঘরবাড়ি আগুনে পুড়িয়ে ছার-কার করে দিন — তিনজনের বদলে তিরিশজন পাপের ফল ভোগ করুক !

রাজা : [খুশি হয়ে] তোর মাথাটা খুব সাফ রে অর্জুন। খাঁটি কথা বলেছিস তুই। তিন টাকা ইনাম পাবি তুই। যাঃ একটু হাড়িয়া খেয়ে ফুর্তি করে নে।

অর্জুন : সরকারের দয়া।

রাজা : [রুনকীর দিকে ফিরে] রুনকী, তোর শরীরে তো জান আছে এখনও ? শুনলি তো অর্জুনের কথা ? তোর বাপ ভাইদের জান যাবে এবার। মঙ্গলা, যাদব, বিলাসের স্বজন কেউ বাদ যাবে না। একটার জন্য দশটার

যাবে—বুঝলি ? হ্যাঁ, তুই কথা বলিস, কি, না বলিস কিছুই যাবে আসবে না। তোর নিয়তি তো ঠিক হয়েই আছে। এমন দজ্জাল বাঘিনীর মত তোর তাগৎ—বাজারে তোর চড়া দাম উঠবে রে রুনকী! ফুর্তি যারা কিনতে আসবে তারা বলবে হ্যাঁ বুতুলিয়ার রাজাবাবু একখানা জব্বর জিনিস দিয়েছিল বটে। [ফেকু এসে রাজাবাবুর কানে কানে কি যেন বলে] ঠিক—ঠিক বাত। বুকের মাঝে প্রাণটা যখন ধুকধুক করছে এখনও—জান আছে যতক্ষণ ততক্ষণ রাজাবাবুর কানুন ভাঙ্গার স্বাদটা ওদের দিয়ে দিতে হবে! [ফেকুকে] ভরত ব্যাটাকে ওখানে পাথরের উপরে তুলে রুনকীর চোখের সামনে ওর গায়ের চামড়া তোকে টেনে টেনে তুলতে হবে ফেকু। ঠাকুর—

গোকুল : হুজুর কি করতে হবে বলুন ?

রাজা : মুখে কথা নেই, ঘোর লেগে গেল নাকি ঠাকুর ? নীচ অচ্ছুৎ কুজাতের জন্য মনে কষ্ট হচ্ছে নাকি অ্যাঁ ?

গোকুল : ন্ না—হুজুর। কষ্ট হবে কেন ?

রাজা : তুই কেমন ঠাকুর রে ? সৎ-উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ—নীচু পাতকের শোকে মনে মনে কাঁদছিস ? এই বেচালগুলো বেঁচে থাকলে তোর বর্ণ-হিন্দুত্বের গৌরব কোথায় থাকবে ঠাকুর ? কে তোকে দেখে বিশ হাত তফাতে যাবে ?

গোকুল : ইয়ে—না—মানে হুজুর—কি করতে হবে বলুন ?

রাজা : বলতে হবে ? কেন, আগের বারে তো বলতে হয় নি কিছু। [চিৎকার করে] ফেকু তো হাতের কাজ দেখাবে না কি ? ফেকুর জন্য হাড়িয়া চাই—হাড়িয়া আনবে কে ?

গোকুল : [ভীতস্বরে] এক্ষুণি আনছি হুজুর—কিচ্ছু ভাববেন না—

গোকুল ঠাকুর দ্রুত বেরিয়ে যায়।

অর্জুন : হুজুর, একটা আর্জি ছিল আমার !

রাজা : কিরে অর্জুন ?

অর্জুন : হুজুর, হাতের কাজটা আমায় করতে দিন, হুজুর।

রাজা : না রে! এ কাজটা ফেকু করুক! ফেকু তো অচ্ছুৎ হরিজন। স্বজন স্বজনের গায়ের চামড়া তুলবে, জ্যান্ত দেহটা দগদগে আগুনে পোড়াবে—সেইটাই তো ভালো নাকি ?

অর্জুন : কিন্তু সরকার—এত কষ্ট করলাম আমি—

ফেকু : তুই থাম অর্জুন। আমি লক্ষণ রামের ব্যাটা! আমার বাপ ঠাকুর্দা জনম জনম শুয়োর গরুর গায়ের ছাল তুলত—আমি তুলব মানুষের ছাল—হ্যাঁ জ্যান্ত মানুষের ছাল—

অর্জুন : না আমি তুলব—

ফেকু : আমি।

অর্জুন : আমি।

রাজা : আহ্ গোল করিস না তোরা। চামড়া তোলার অচ্ছুৎ জানোয়ার কি শেষ হয়ে গেছে দুনিয়া থেকে? এই পাহাড়ী বনেই তো আছে আরও তিনটি জানোয়ার। আরও ভয়ঙ্কর আরও দজ্জাল। মঙ্গলার ছাল তুই ছাড়াস অর্জুন। এ কাজটা ফেকুকেই করতে দে।

অর্জুন : জী সরকার। আপনি যখন বলছেন তখন ফেকুই করুক।

ফেকু : [সোল্লাসে] হাই—ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং! ড্যা-ড্যাং—ড্যা—ড্যাং হাই দেবতা—হাই দেবতা। আহা আমার কলজের মধ্যে লকলক্ করে চিতার আগুন জ্বলছে গো। হাতের কাজ দেখাব—দেখাব জব্বর কাজ—জব্বর কাজ। লক্ষণ রামের বেটা আমি ফেকু রাম—বাপকো ব্যাটা সিপাইকো ঘোড়া—ঘোড়ামে হ্যায় বীর সওয়ার—হাম তৈয়ার—হো তৈয়ার—ড্যা-ড্যাং—ড্যা-ড্যাং-ড্যাং—

গোকুল : হুজুর হাড়িয়া এনেছি।

রাজা : দে ঠাকুর ফেকুকে দে। বেচারা অনেকক্ষণ ধরে ছটপট করছে তৃষ্ণায়।

গোকুল ঠাকুর কলসী নিয়ে এক কোণায় আসে। ফেকু ছুটে আসে সেই কোণায়—যেখানে রুনকীকে বেঁধে দাঁড় করানো ছিল।

ফেকু : জনমভোর নেশা করেছিলাম গাঁজার, সরকার হুকুম দিল হাড়িয়া খেতে। তা চলুক। শুকনো হোক, ভিজা হোক—দস্তুর তো এক—নেশা তো হবে জরুর। ছুরি ধরব, ছুরি ঘষব, কচকচ করে ভরত শালার গায়ের ছাল তুলব রুনকীর চোখের সামনে, ভরতের চামড়া তুলে ধরে কি বলে যেন হ্যাঁ—ইয়ে করব—

কলসী থেকে এক গেলাস হাড়িয়া ঢেলে খায়।

আহা-হা দিলটা জ্বলে গেল রে পেয়ারী রুনকী—! রুনকী—

অর্জুন : এ্যাই শালা রুনকী রাজাবাবুর জিনিস। হাড়িয়া টেনে ও দিকে নজর দিস না। চোখ কানা করে দিয়ে রাজাবাবু তোর গায়ের চামড়ায় ডুগডুগি বাজাবে ফেকু।

ফেকু : সিয়ারামের কসম। আমি খেল দেখাব রে অর্জুন জবর খেল। এমন খেল যা, রাজাবাবুকে জনমভোর এর আগে কেউ কখনও দেখায় নি। ফেকুর জীবনে সেরা খেল।

আবার হাড়িয়ায় চুমুক দেয়।

রাজা : [মুখে চুকচুক শব্দ করে] থাম রে ফেকু—থাম থাম। তোকে মাতাল করতে তো হাড়িয়া আনাই নি। আমার তিন হাজার টাকার জিনিষকে তো বরবাদ করতে পারি না। ওকে তো বাজারে ছাড়তে হবে। সাদা চোখে ও যদি ভরতের মরণটা দেখে ভিড়মি খায় তাহলে কি আমার কাজ ঠিকমত

হবে রে বুদ্ধু?

ফেকু : [নেশাগ্রস্তের ন্যায়] সরকার—

রাজা : দে তোর স্বজন, স্বজাত, রুনকীকে একটু হাড়িয়া দে। তুই খাবি এক চুমুক তো ওকে খাওয়াবি তিন চুমুক। তোর নেশা হবে এক হাত তো ওর হবে তিন হাত। রুনকীকে সওদা করতে দালাল এসে আমার বাড়িতে বসে আছে কাল থেকে রে বোকা।

নেশাগ্রস্তের ন্যায় চিৎকার করতে করতে বিষেণ ঢোকে।

বিষেণ : গুলি করব—সাবাড় করব—! বন্দুক—আমার বন্দুক কোথায়? বন্দুক লে আও—আমি সাবাড় করব কোথায় বন্দুক—

রতন : বিষেণ! সামাল দে নিজেকে। সামাল দে। জলদি। একদম হল্লা করিস না।

বিষেণ : তুই কে রে? রাজাবাবু আমাকে বকশিস দিয়েছে। সারারাত আমি বন্দুক হাতে চক্কোর মেরেছি ঐ বন-বাদাড়ে। মঙ্গলার রক্ত চাই আমি। রক্ত—রক্ত চাই—

রতন : নিজেকে সামাল দে রে জানোয়ার। এক চুমুক খেয়ে বেসামালই যদি হোস, তাহলে খাস কেন রে ঢ্যামনা? বমি করে ফেল।

বিষেণ : [উত্তেজিত] সাবধান রতন—মঙ্গলাকে পাকড়াতে পারি নি বলে আমার বুকটা জলছে; তুই বেশি ফ্যাচফ্যাচ করলে মঙ্গলার আগেই তোকে বউনি করব বলে দিলাম।

রতন : আরে রাখ খচ্চর, তোর মুরোদ খুব আমার জানা আছে। বরাত ভাল, পেয়েছিস সরকারের বকশিস—তাই নিজেকে—

বিষেণ : [উত্তেজিত] রতন—

রতন : হ্যাঁ—ঠিক—

রাজা : ঠাকুর?

গোকুল : হুজুর—

রাজা : বিষেণকে একপাশে নিয়ে গিয়ে একটু ঠাণ্ডা কর। একদণ্ডেই শালা এমন খেয়েছে যে তিন দিনে ওর নেশার খোঁয়াড়ি কাটবে কিনা সন্দেহ।

রাজা ভরতের অচৈতন্য দেহ পরীক্ষা করতে থাকে।

গোকুল : আয় বিষেণ—গোল করিস না চৌকিদার, এদিকে এসে বস—

রতন : [বিষেণকে] চল ওদিকে চল। মাতলামী না জানোয়ার! অনেক বড় কাজ বাকি আছে আমাদের। চল—

গোকুল : বিষেণ চল বাবা—চল।

তভক্ষণ রুনকীকে মাটিতে বসিয়ে ফেলেছিল ফেকু। কলসী থেকে পাত্রভরে হাড়িয়া তুলে দিচ্ছিল রুনকীকে। রুনকী স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ফেকুর দিকে।

ফেকু : [অনুচ্চস্বরে] নে-খা, খা রুনকী, দিমাক করিস না মাইরি। দিমাক করে কি হবে? খা-না খা। এক চুমুক খাবি চোখ দুটো নীলপানা হবে, দু চুমুক খাবি মনটা গুলাবি হবে, তিন চুমুক খাবি, তোর গলা খুলে গান করতে ইচ্ছা হবে, চার চুমুক খাবি তো নাচতে সাধ যাবে, পাঁচ চুমুক খাবি তো এই পাথুরে মাটি থেকে তোর শরীরটা আকাশে উঠে পাখীর মত ডানা মেলে পত পত করে উড়বি, আর ছ চুমুক খাবি তো এই দুনিয়াই তোর কাছে—

রুনকী : [স্থিরভাবে] ফেকু—

ফেকু : বল্ বল্ শুনছি আমি! মোটে তিন পাত্র তো খেয়েছি আমি। সাড় আমার ঠিক আছে। বলে ফেল—

রুনকী : তুই—তুই আমার স্বজন স্বজাত—

ফেকু : [নিস্পৃহ] ঠিক কথা—

রুনকী : তোর গায়ে এখনও অচ্ছুৎ গন্ধ। তোয় গায়ে অচ্ছুৎ রক্ত।

ফেকু : [নিস্পৃহ] তাতে হলো কি?

রুনকী : বেইমানি করবি আমাদের সাথে? ভরতকে খুন করবি? বল জবাব দে ফেকু?

ফেকু : [নিস্পৃহ] রাজাবাবু ওখানে দাঁড়িয়ে আছে রুনকী, তোর দিকে নজর আছে।

রুনকী : ঐ জানোয়ারটার হাতে আমায় তুলে দিবি? আমাকে ভিন দেশে পাঠাবি শরীর বেচতে? আমার ধর্ম মারবি?

ফেকু : [নিস্পৃহ] অচ্ছুৎ নীচ জাতের কোন ধর্ম নেই রুনকী।

রুনকী : আমার পেটে ভরতের ছেলে। তোর জাত ভাই—

ফেকু : [কিঞ্চিৎ উত্তেজিত] আঃ ওসব কথা রাখ তুই। আমি রাজাবাবুর নোকর। আমার ক্ষমতা কি আছে? আমি কি করতে পারি?

রুনকী : ওরা খুন করবে ভরতকে,—আমার ধর্ম নষ্ট করবে, মান কেড়ে নেবে, ভিন দেশে বেবুশ্যে বানাবে। তারপর মঙ্গলাকে ধরবে, যাদবকে ধরবে—খুন করবে আবার—তোর হাতে ছুরি তুলে দিয়ে ঠিক এই ভাবে—

ফেকু : [উত্তেজিত] আঃ চুপ যা—চুপ যা তুই। আমার মনটা কেমন নড়বড় হয়ে যাচ্ছে।

রাজাবাবু ফিরে তাকিয়ে।

রাজা : কি হলরে ফেকু? গোল কিসের? কি বলছে রুনকী?

ফেকু : [গোপন করে] সরকার রুনকী বড় দজ্জাল, কথাই শুনতে চায় না—

রাজা : [দু পা এগিয়ে এসে] কথাই শুনতে চয়ে না? [হাসে] কিন্তু সাপ একবার ধরা পড়লে সাপুড়ে তার বিষ দাঁত তুলে নেয়। যতই চক্কোর

তুলুক ছোবল দিলেও বিষ যে একদম ঝরে না ফেকু—

ফেকু : জী সরকার। আমিও লক্ষণ রামের ব্যাটা আমার সাথে দজ্জালি করবে এমন মুরোদ কার? তিন পাত্তর ওকে গিলিয়ে দিয়েছি সরকার।

রাজা : দিয়েছিস? খুব ভালো কথা। অবস্থা কেমন দেখছিস? চলছে?

ফেকু : জাত হরিজন মাগী কিনা তায় আবার সমথ জোয়ান শরীর—পুরো নেশা এখনও হয়নি শুধু ঝিম মেরে বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ছে সরকার। আর দুই এক পাত্তর ঢাললে—

রাজা : পুরো কলসীই ওর গলায় ঢেলে দে। বেসামাল হয়ে থাকুক তিনদিন। হ্যাঁ তিন দিন পরে যখন চোখ খুলবে, চেয়ে দেখবে লক্ষ্ণৌর শেঠজীর ঝলমলে ফুর্তিখানা। চালিয়ে যা রে ফেকু, হাতে একদম সময় নেই। পাহাড়ের পুব দিকে আলো ফুটতে চলেছে। সূর্য ওঠার আগেই আমাকে বাড়ি ফিরে স্নান করতে হবে, পূজো সেরে লক্ষ্ণৌর দালাল বিদায় করতে হবে।

ফেকু : জী সরকার। এ্যাই রুনকী, নে, খা, আর—আর এক পাত্তর খা। দেমাক করিস না মাইরি। খেয়ে নে পরী খেয়ে নে—

রাজাবাবু অন্যদিকে যান।

রাজা : ঠাকুর—

গোকুল : হুজুর—

রাজা : সব কিছু তৈরী?

গোকুল : হ্যাঁ হুজুর।

রাজা : [দৃঢ় সতেজ কণ্ঠে] রতন-বিষেণ-অর্জুন-লখাই—

তিনজন একত্রে : সরকার আমরা তৈরী!

রাজা : [ভরতকে ইঙ্গিত করে] জানোয়ারটাকে ওখানে তুলে দাঁড় করা। বুকের কলজেতে এখনও বাতাস আছে। রাজাবাবুর কানুনের বিদ্রোহ করার ফলটা ওকে চটপট ভালো করে বুঝিয়ে দে। রুনকীর গলায় আরও হাড়িয়া ঢাল ফেকু—ঢাল—

ফেকু : [রুনকীকে] খা আর একটু খা রুনকী—গোসা করিস না পেয়ারী, খা—একটুখানি খা—দেখবি মনটা তোফা গোলাপী হবে—

সমস্বরে একটা হিংস্র চিৎকার করে রতন, বিষেণ—অর্জুন চোখের পলকে ভরতের দেহটাকে তুলে ধরে।

রুনকী : [আর্তনাদের মত] ভরত—ভরতকে ওরা খুন করছে ফেকু। হায় ভগবান তুমি কোথায়? তোমার দুনিয়াতে কি বিচার নেই? তোমার দুনিয়াতে কি আমরা এই ভাবেই মরব?

রাজা : [হেসে] কিরে? বিচার তো দুনিয়াতে আমিই করি রে রুনকী। দুনিয়ার ভগবান তো আমিই! [চিৎকার করে] আরে মুদ্দফরাস লক্ষ্মণ

রামের ব্যাটা ফেকু রাম তোর হাতের গতি কি অচল হয়ে গেছে? হাড়িয়া ঢাল রুনকীর গলায়। চটপট কাজ শেষ কর।

ফেকু : [চঞ্চলভাবে কলসীটা তুলে ধরে] খা খা বলছি দেমাকী। আমাকে চিনিস না। না খেলে তোকে খুন করব। জ্যান্ত খুন করব খা—

কায়দা করে অলক্ষ্যে ফেকু হাঁড়িয়া মাটিতে ফেলতে থাকে। ততক্ষণে বেদীর মত উঁচু প্রকোষ্ঠে ভরতকে বদ্ধ অবস্থায় দাঁড় করিয়েছে ওরা। ভরতের মাথা অবনত। বুক ফুলে বড় বড় নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। রক্তাক্ত মুখখানা ঝাঁকুনি দিয়ে তুলল শুধু একবার। বন বাদাড় পাহাড় কাঁপিয়ে তীব্রস্বরে আর্তনাদ করে উঠল একবার।

ভরত : রুনকী—রুনকী রে—

রুনকী : [নিচ থেকে চিৎকার করে] ভরত—

রাজা : হাড়িয়া ঢাল ফেকু। শালীর গতরে এখনও তেজ আছে।

ফেকু : [রুনকীকে চেপে ধরে] বোকামী করিস নে। চুপ করে বোস এখানে —খেলাটা এবার জমে এসেছে—

অর্জুন : [বিষেণকে] পিছন দিকটায় তুই দাঁড়া—

বিষেণ : ঠিক আছে রে সাঙাৎ। তোর নিজের কাজ তুই কর।

রতন : ঠাকুর চুপচাপ দাঁড়িয়ে কেন?

গোকুল : [বিহ্বল] হ্যাঁ মানে—ইয়ে—

রাজা : [ব্যাস্ত] জলদি মন্ত্র পড় ঠাকুর—মন্ত্র পড়। ভাণ্ডারে যা আছে চটপট সব বলা শুরু কর। হাতে আর সময় একদম নেই। ফেকু রুনকীকে এখন ছাড় ··· আর নেশায় কাজ নেই। ছুরিখানা তাড়াতাড়ি বের কর। পূব পাহাড়ে লাল আলো ভেসে উঠছে জানোয়ার! তোর খেলাটা এবার চটপট ভালো করে দেখা।

ফেকু : [খুব সংগোপনে রুনকীকে] ডরাস না! নেশার ভান করে পড়ে থাক। যেমন বললাম তেমনি কাজ করব। আমি চললাম, যা বলেছি—মনে থাকে যেন—

রাজা : [উদ্বিগ্ন উত্তেজিত চঞ্চল] ফেকু—

ফেকু : একটু নেশা হয়ে গেছে সরকার। রুনকীকে হাড়িয়া দিতে আমাকেও একটু খেতে হলো কিনা। তা ডর পাবেন না সরকার, পায় একটু কাঁপন ধরেছে বটে কিন্তু হাত আমার ঠিক আছে। আমি লক্ষণ রামের ব্যাটা ফেকুরাম—বাপকো ব্যাটা সিপাই কো ঘোড়া। কোন্ জায়গার চামড়া আগে তুলব সরকার? হাত না পায়ের? ঘাড় না পিঠের?

রাজা : বুকের। ওর বুকের বাতাস এখনও জেগে আছে। ওখান থেকেই খেল শুরু কর ফেকু। পাঁজরের হাড় বেরুবে না, মাংস খসে পড়বে না কিন্তু পাতলা চামড়াটুকু শরীর থেকে তোলা আমি খেতে চাই।

ফেকু : জী সরকার, তাই হবে। আমি চামড়া তুলব, চামড়া, দুশমনের বুকের চামড়া।

এগিয়ে গিয়ে ভরতের সামনে মাটিতে বসে পাথরের উপর তীব্র ধারালো ছুরিখানা কয়েকবার ঘষে। নেপথ্যে ঢাক-ঢোল বেজে ওঠে। ভীত, কম্পিত স্বরে চোখ বুঁজে গোকুল ঠাকুর বিড় বিড় করে কি যেন মন্ত্র পড়ে। অর্জুন কোমর থেকে শিঙা তুলে একটা জোরে ফুঁ দেয়। রাজাবাবু হাসে।

ভরত : [অবসন্ন দেহকে একবার ঝাড়া দিয়ে মরণ চিৎকার করে ওঠে] মঙ্গল—মঙ্গলারে—যাদব—

রাজা : ডাক। সবাইকে ডাক! এক সময়ে এক সাথেই সবগুলোকে কোতল করব। ডাক—

ফেকু ছুরিখানা নিয়ে দাঁড়ায়।

ভরত : [আর্তভাবে] বিচার নেই রে! দুনিয়ায়, ভালো মন্দের বিচার নেই। জনম দিয়েছিলি ভগবান এ দেশের মাটিতে—তবে কেন জনম দিলি বেগার মানুষের? মানুষের মত বাঁচার পথ যদি নাই রাখলি, তবে কেন মানুষের বদলে আমাদের জানোয়ার বানা-লি না—?

রাজা : জানোয়ার? জানোয়ারই তো তোরা। বেগার খাটিস নি, রাজাবাবুকে তোয়াক্কা করিস নি, নিয়ম ভেঙেছিস—

ভরত : [তীব্রভাবে] হ্যাঁ ভেঙেছি। ভেঙেছি—কেন না আমরা মানুষের মত মাথা তুলে বাঁচতে চেয়েছি। বাঁচতে চেয়েছি মান নিয়ে ইজ্জত নিয়ে মানুষের অধিকার নিয়ে—

রাজা : [উচ্চস্বরে নির্দেশের মত] ফেকু—

ভরত : রুনকী—রুনকীরে—! আমি মরতে চললাম, কিন্তু মঙ্গল যাদবকে জানান দিস, আমি জানোয়ার রাজাবাবুর কাছে কখনও জানের ভিক্ষা চাই নি। জানান দিস ওদের, আমাকে যেমন ভাবে মেরেছে, ঠিক তেমনি ভাবে যেন ওরা প্রতিশোধ নেয় রুনকী—

রুনকী : [উঠে দাঁড়িয়ে] ভরত—

রাজা : হাত চালা ফেকু—হাত চালা। মান, ইজ্জৎ, অধিকারের স্বাদটা ওকে দিয়ে দে।

ঢাক ঢোলের বাজনা চরমে ওঠে।

রুনকী : ভরত রে—

ছুটে এগিয়ে আসে।

রাজা : এ্যাই খবর্দার! এগোবি না একদম। এগোবি না বজ্জাত।

অর্জুন : হেই সামাল—সামাল—

বিষেণ : সামাল। সামাল।

রতন এক ধাক্কায় রুনকীকে ফেলে দেয়।

রাজা : জোরে মন্ত্র পড় ঠাকুর। [গোকুল জোরে মন্ত্র পড়তে থাকে] ফেকু হাত চালা—

ফেকু : [কেমন যেন বিভ্রান্ত] সরকার—সরকার—আমায় মাপ করুন, আমি পারছি না। ওর কাছে যেতেই হাতখানা থরথর করে কেঁপে উঠছে। ওর চোখের পানে তাকাতেই বুকের ভেতরটা কেমন যেন—

রাজা : [ক্ষিপ্ত] কোন দিকেই তাকাতে হবে না তোকে। সোজা ছুরি চালিয়ে চামড়া তোল গায়ের। ওর চামড়া কতটা পুরু, দেহে কতখানি রক্ত আছে আমি দেখতে চাই।

ফেকু : [অসহায়] আমি পারছি না সরকার। পারছি না। অপদেবতা আমার ঘাড়ে ভর করেছে। ওর গায়ের কাছে যেতেই আমার বুকের ভিতরে কেমন ভয়ঙ্কর কাঁপুনি জাগছে। ডর লাগছে।

রাজা : [ক্রুদ্ধ] ফেকু—

ফেকু : আমাকে মাপ করুন সরকার।

রাজা : [ক্রোধে] তুই লক্ষ্মণ রামের ব্যাটা ?

ফেকু : বাপের ব্যাটা আমি হতে পারছি না সরকার। আমি মেয়েমানুষেরও অধম।

রাজা : [বিস্ফারিত চোখে] ফেকু ?

ফেকু : সরকার আপনি বরং আমার জানটা সেলামী নিন—কিন্তু আমি পারছি না। আমার হাত উঠছে না।

রাজা : [চিৎকার করে] বিষেণ—

বিষেণ : সরকার হুকুম করুন।

রাজা : সময় নেই হাতে। ছুরি বের করে, চামড়া তোল বদমাশের।

বিষেণ : জী সরকার।

রাজা : রতন !

রতন : সরকার ?

রাজা : পায়ের নিচে কাঠ সাজিয়ে আগুন জ্বালা। চামড়া তোলার পর ধীরে ধীরে আগুনে পুড়ে ওর পোড়া কাতর শরীরটা আমি দেখতে চাই।

ঢাক ঢোলের বাজনা চরম থেকে চরমে ওঠে। বিষেণ কোমর থেকে ছুরি বের করে ভরতের পায়ের মাঝখানে বসিয়ে দিয়ে চামড়া তুলতে সচেষ্ট হয়। আধমরা ভরত এবার মরণ যন্ত্রণায় পরিত্রাহি চিৎকার করে ওঠে।

ভরত : রুনকী—রুনকীরে—! মঙ্গলা—বাঁচা—ওরা আমার জান নিল রে !

ভরত এবার নিস্তেজ হয়ে ঢলে পড়ে। খুব কাছেই প্রচণ্ড শব্দে শিঙা বেজে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় ভাঙা ভীষণ শব্দ শোনা যায় একটা। উপরের পথে ঠিক বিষেণের কাছে মঙ্গলকে দেখা যায়।

মঙ্গল : আর একবার হাত নেড়েছিস কি আমার টাঙ্গী তোর মাথা ফালা ফালা করবে রে বিষেণ। এক এক কদম পিছু যা জলদী! যা—!

যাদবের কণ্ঠ ভেসে ওঠে অপর পাশে।

যাদব : চালাকী করিস না রতন। বন্দুক তোলার আগেই তোর কোমরে আমার বর্শাখানা আছাড় খেয়ে শরীরটা ফুটো করবে—

রাজা : খবর্দার—খবর্দার শয়তান—

ফেকু : [ছুরিখানা রাজাবাবুর মুখের সামনে নাচিয়ে] একদম নাচানাচি করো না সরকার। খেল তোমার খতম। লক্ষ্মণ রামের ব্যাটা ফেকুরাম জীবনের সবচেয়ে পাকা হাতের কাজটা দেখাবে এবার।

রাজা : ফেকু তুই-ই ?

ফেকু : হ্যাঁ আমি ফেকুরাম! বাপের শেষ পরিণামটা তো আমি ভুলিনি সরকার। বাপের ব্যাটা, বাপের শেষ কাজটা তো আমায় করতে হবে সরকার।

রাজা : [পকেটে হাত ঢুকিয়ে কিছু বের করার চেষ্টা করে] ওহ্ আচ্ছা বেইমান—

মঙ্গল : পকেট থেকে বন্দুক তোকে বার করতে দেব না সরকার। হুঁশিয়ার—

বিষেণ আচমকা মঙ্গলকে আক্রমণ করে, মঙ্গল এক ঝটকায় সরে গিয়ে বিষেণের হাঁটুতে বসায় টাঙ্গীর এক ঘা। বিষেণ চিৎকার করে মাটিতে বসে পড়ে। অর্জুন এবং রতন ছুটে পালায়। রাজাবাবু পিস্তল বের করে তাক করে মঙ্গলকে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে ফেকু বসিয়ে দেয় তার ছুরি রাজাবাবুর পিঠে। রাজাবাবু চিৎকার করে ওঠে।

ফেকু : খেলাটা কেমন দেখছিস সরকার ? আমি লক্ষ্মণ রামের ছেলে—দুশমনটা আমি ঠিক চিনেছি কি না বল ? জীবনের বড় খেলাটা ঠিক দেখালাম কিনা বল ?

মঙ্গল যাদব : [একত্রে] সাবাস—সাবাস ফেকু।

তিনজনে রাজাবাবুকে ঘিরে ধরে। রাজাবাবু তখন মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর।

ফেকু : [নেশাগ্রস্তের মত] ভুল করেছিলাম রে! বড় ভুল! নেশার ঘোরে চেতন ছিল না। বিলাসটাকে তুলে দিলাম জানোয়ারদের হাতে। রুনকী আমার চেতনটায় খোঁচা দিল—জানান দিল আমার কাজ।

রাজা : [গোঙানী] একটু জল—জল দে আমায়।

যাদব : খাবি অচ্ছুতের হাতে ? তোর মান যাবে না, জাত যাবে না ?

মঙ্গল : থুঃ-থুঃ! এই থুথু দিলাম তোর মুখে। পানি ভেবে খেয়ে নে শয়তান। পরকালে তোর পুণ্য হবে শালা।

যন্ত্রণা গোঙানীতে দুমড়ে মুচড়ে ছটপট করে ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসে রাজাবাবু। হঠাৎ রুনকী কান্নাপ্লুত কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে।

রুনকী : মঙ্গল ! যাদব !

মঙ্গল যাদব : কি হলো রুনকী ?

রুনকী : [কান্নায় ভেঙে পড়ে] আমার মরদ ভরত। ভরতটার দেহে আর জান নেই রে মঙ্গলা—আমি কি নিয়ে বাঁচব ?

মঙ্গল : [চিৎকার করে] থাম্। থাম্ রুনকী।

ফেকু : মঙ্গল ?

মঙ্গল : শয়তানের সাথে লড়াইতে নেমেছিস। কিছু পেতে গেলে কিছু দিতে হয়। অচ্ছুতের অধিকার কি আকাশ থেকে দেবতা বিলোবে ?

রুনকী : কিন্তু আমার ভরত—

যাদব : [ফিস ফিস স্বরে] রুনকী—

রুনকী : [অথৈ কান্নার স্বরে] ভরতটা চলে গেল। মরদটাই যদি চলে গেল তবে মেয়েমানুষের বেঁচে লাভ কি ?

মঙ্গল : আছে রে আছে ! রুনকী তোকে বাঁচতে হবে ভরতের জন্যই।

রুনকী : মঙ্গলা—

মঙ্গল : হ্যাঁরে রুনকী ! দুনিয়ার নিয়ম, একজন যায়—আর একজন আসে। একজনের কাজ পরের জন এসে করে। রুনকী, ভরত নেই। কিন্তু ভরতের ছেলে আছে না তোর পেটে ?

রুনকী : [বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত] অ্যাঁ !

মঙ্গল : হ্যাঁ। ভরত চলে গিয়ে তার কাজ শেষ করার একটা লড়াকু জান দিয়ে গেছে না ? মন ঠিক কর। চোখের পানি মোছ। হাত বুলিয়ে আদর কর শরীরের বাচ্চাটাকে ! আদর কর—

রুনকী অভিভূত। কেমন এক নবচৈতন্যের অনুভূতি তার শরীরে মনে ঝিলিক খেলে যায় রৌদ্রপ্রপাতের মত।

মঙ্গল : [ঘোষণার মত] ঐ বাচ্চাটা একদিন মাটিতে পড়ে কাঁদবে।

রুনকী : [অভিভূত] হ্যাঁ কাঁদবে।

মঙ্গল : হাত-পা ছুঁড়বে।

রুনকী : ছুঁড়বে।

মঙ্গল : দুনিয়ায় ডামাডোল থেকে শ্বাস নিয়ে বুক ফুলাবে—

রুনকী : বুক ফোলাবে।

মঙ্গল : চলবে—ফিরবে—

যাদব : খেলবে—লড়বে—

মঙ্গল : একদিন বড় হবে।

যাদব : হাতে নেবে টাঙ্গি—

মঙ্গল : চোখে জ্বলবে আগুন—

যাদব : ভরতের সন্তান সে –

মঙ্গল : বাপের দেনা শোধ করবে।

রুনকী : [অভিভূত] হ্যাঁ-হ্যাঁ বাপের কাজ শেষ করবে।

যাদব মঙ্গল ফেকু : [একত্রে রুনকীকে যেন বৃত্তবন্দী করার মত এগিয়ে] চোখের পানি মোছ, বুক বাঁধ। তোর শরীর দিয়ে আসছে দুনিয়ার আর এক নওজোয়ান। সেই নওজোয়ান চলবে, ফিরবে, লড়বে – হাসবে বাঁচবে – কেননা সেও তো অচ্ছুৎ! অস্পৃশ্য –! অচ্ছুৎ – অস্পৃশ্য! অচ্ছুৎ – অস্পৃশ্য –

রুনকী মুহুর্মুহু হাতের স্পর্শে আগত প্রাণের উত্তাপ নেয়। দুঃখের ম্লান ভেদ করে জেগে ওঠে তার চোখে আশার দৃপ্ত ঝলক! প্রভাতের স্নিগ্ধ রোদ, চড়াই উৎরাইয়ের প্রান্তে প্রান্তে ফুটে ওঠে। আর চারিদিকে কখন যেন বেজে উঠেছে মেঘমন্দ্রের মত অবিশ্রান্ত শিঙা আর ঢাক ঢোলের বাজনা।

সমবেত সওয়াল জবাব

নভেন্দু সেন
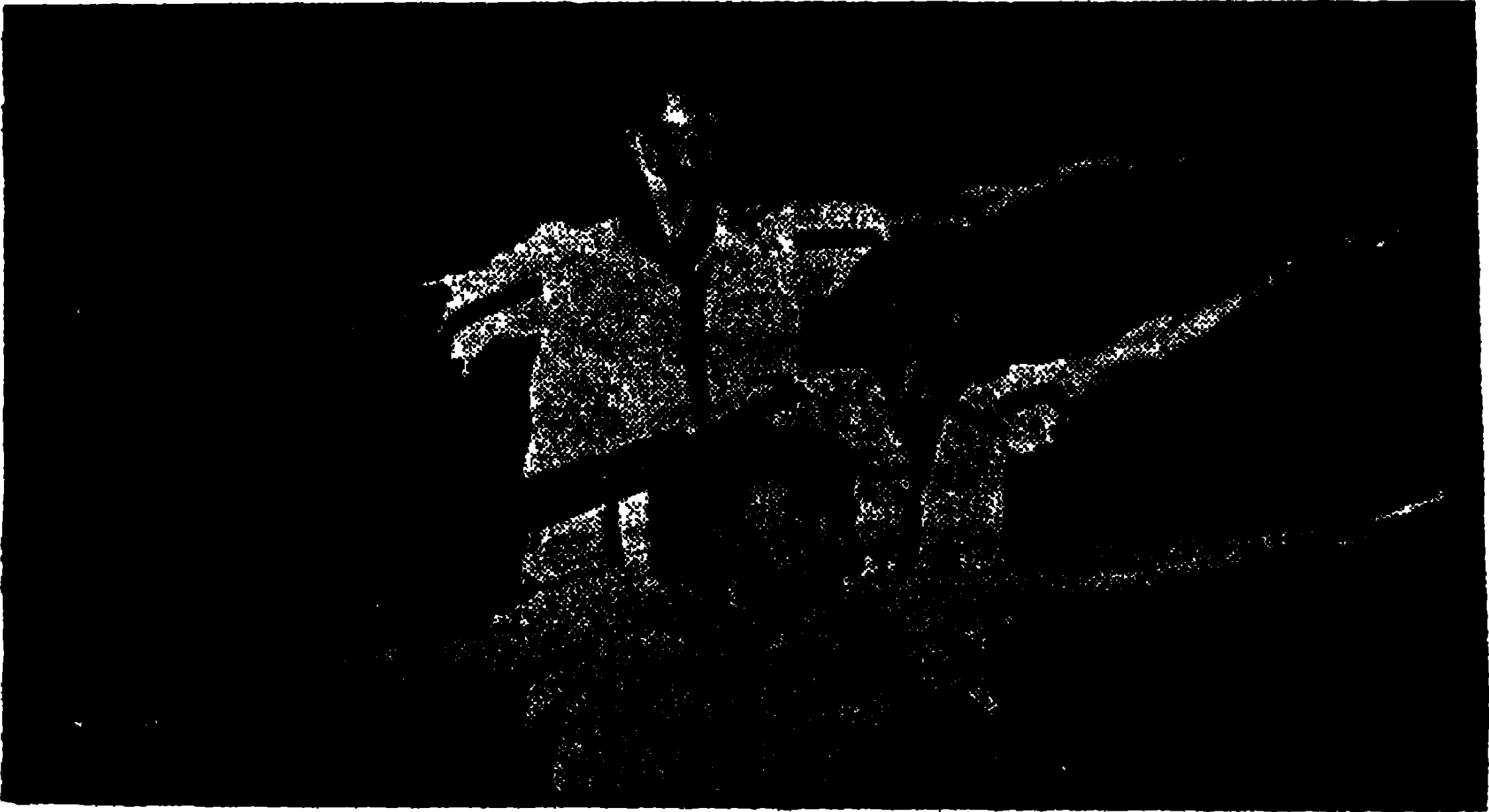
হ্যাঁ···সুখী ! তর দুই পায়ে বেড়ি বান্ধা সুখ—পিছনে শিকল আছে, নজরে আসে না।···মাগে মদে ডুবায়ে রেখেছে— অথচ ভিতরে সমস্ত রক্ত চুষে চুষে খায়— বুঝবার পারো না ! শুধুই চপেটাঘাতে কোন্ মশা মার ? গাধা !

মেঘদূত কোথায় পালাও—শুনে যাও—মানুষের কাছ থিকে জীবনের নতুন পাঠ শিখে যাও—মানুষের প্রাণ আছে—প্রাণেরে যথেচ্ছ মূল্যে বিকোবার অধিকার নাই ! মানুষ বাঁচে বাঁচা বাড়ার সংগ্রামে !

নাটক : সমবেত সওয়াল জবাব

নাট্যকার : নভেন্দু সেন। জন্ম : ১৯৪৪ কলকাতায়। আদি নিবাস ঢাকা বিক্রমপুর। শিক্ষা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং সরকারী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ডিপ্লোমাধারী শিল্পী। শিল্পকর্মে নভেন্দুর প্রেরণাস্থল তাঁর প্রয়াত পিতা শিল্পী চারুচন্দ্র সেন এবং মাতা প্রতিমা সেন। নাট্যশিল্পে প্রথম হাতে খড়ি নক্ষত্র-র শ্যামল ঘোষের কাছে। ক্রান্তিকালের প্রতিষ্ঠাতা। কর্মক্ষেত্র বোকারো ষ্টীল নগরীতেও 'নক্ষত্র' নামে একটি গ্রুপ তৈরী করেছেন। মঞ্চস্থপতিরূপে প্রথম কাজ নক্ষত্র-র বৃষ্টি বৃষ্টি-তে। প্রথম নাট্য-রচনা : নয়ন কবিরের পালা ১৯৬৯, বহুরূপী '৭১-এ প্রকাশিত। সমবেত সওয়াল জবাব—এঁর উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় রচনা। এ নাটকটি একই সঙ্গে সোদপুরের ক্রান্তিকাল ও বোকারো-র নক্ষত্র কর্তৃক প্রযোজিত।

রচনাকাল : ১৯৭৫

চরিত্রলিপি : ভাঙা মানুষ—১ ২ ৩। ঈশ্বর ব্যাপারী। মতলবী সাহেব। টেণ্ডার বাহক।

প্রথম অভিনয় : ১৮. ৬. ৭৫ রঙ্গনা, কলকাতা

প্রযোজক : ক্রান্তিকাল, সোদপুর। নির্দেশনা : নভেন্দু সেন। অভিনয়শিল্পী : ১ : জয়ন্ত বোস। ২ : হিমাংশু গুহ / স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩ : মৃণাল মুখোপাধ্যায় / পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ঈশ্বর ব্যাপারী : অসিত ঘোষ / অশেষ চট্টোপাধ্যায় / বিমল দত্ত। মতলবী সাহেব : দুলাল চক্রবর্তী / অশেষ চট্টোপাধ্যায়। টেণ্ডার বাহক : চিন্ময় সরকার। আলো : বিক্রম দাশগুপ্ত / বিমল দত্ত / অসিত ঘোষ। মঞ্চ : নভেন্দু সেন। আবহ : দেবাশিস দাশগুপ্ত।

রজনী : ৩২ বার। আমন্ত্রিত অভিনয় ৬। রঙ্গনা, রামমোহন মঞ্চ ২। প্রতি-যোগিতা ২৪। শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা ১০। দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা ৪। তৃতীয় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা ২। শ্রেষ্ঠ পরিচালনা ১২। শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপি ৬। আনুমানিক দর্শক ১৬ হাজার।

আলোকচিত্র : নাটক সংলগ্ন আলোক চিত্রগুলি নক্ষত্র, বোকারো-র প্রযোজনা থেকে নেওয়া। ভাঙা মানুষ ১ ২ ৩ যথাক্রমে তপন বসু অসিত কানুনগো আশিস রায়। মতলবী তপন ভদ্র।

কপিরাইট : নভেন্দু সেন।

অনুমোদন : এ বিষয়ে নাট্যকারের বক্তব্য : নাটকটি ক্রান্তিকাল গোষ্ঠী কর্তৃক রঙ্গনায় প্রথম যে আকারে অভিনীত হয়েছিল তাই প্রকাশ হলো। পরে প্রতিযোগিতার মঞ্চে সময় সংক্ষেপ করার প্রয়োজনে কিছু সম্পাদনা করা হয়। নাটকের সেই সংক্ষিপ্ত রূপটি সম্পর্কে যদি কোন নাট্য গোষ্ঠী কৌতূহলী হন তবে ক্রান্তিকাল ১নং দক্ষিণপল্লী সোদপুর, ২৪ পরগনা এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন। অভিনয়ের জন্য নাট্যকারের অনুমতির কোনো প্রয়োজন নেই। —ন. সে.

প্রথম দৃশ্য

খুব সাদামাঠা মঞ্চ। কেন্দ্রস্থলে শুধু দুটি ডেক। অত্যন্ত স্বল্প পরিসর আপার ডেকটি আবার লোয়ার ডেক-এর ঠিক মাঝখানে। নাটকে যে দু-একটি সামগ্রী ব্যবহৃত হবে তা ঐ আপার ডেকটির অভ্যন্তরে রাখা থাকতে পারে। কোন ডেকই দেড় থেকে দু-ফুটের বেশি উঁচু নয়। পর্দা উঠলে তিনটি বিচ্ছিন্ন আলোর বৃত্তে দর্শকদের দিকে পেছন ফিরে তিনটি মানুষ। প্রত্যেকের পরণেই কয়েদীর ছেঁড়া পোষাক। প্রথম ও দ্বিতীয় জন ডাউন স্টেজের দুই প্রান্তে বসে। তৃতীয় জন আপার ডেকে। কয়েক মুহূর্তের নৈঃশব্দ্যের পর হঠাৎ কোথাও বজ্রপাত হয়। মেঘভেঙে কোথাও বৃষ্টি নামল। মানুষগুলি দর্শকদের দিকে নীরবে ঘুরে বসে। প্রথমজনের দাঁতের ফাঁকে চেপে রাখা এক টুকরো বিড়ি—শতছিন্ন পোষাক হাতড়ে আগুন খুঁজছে। দ্বিতীয় জনের পায়ে কিছু বিঁধেছে, টেনে তোলবার চেষ্টায় কিছুটা নিবিষ্ট। তৃতীয় জন ছেঁড়া ফাটা পোষাকের থেকে চোর কাঁটা তুলছে। তিন জনের মধ্যেই তাড়া খাওয়া মানুষের চাপা উত্তেজনা।

ভাঙা মানুষ ১ একে চৌকিদারের হিস্যা তার ওপর হুঁজুরবাবুর

ভাঙা মানুষ ২ চুরির মালের অর্ধেকই যায় ঘুষের খাতে

ভাঙা মানুষ ৩ এমন করে কদ্দিন চলে

ভাঙা মানুষ ১ চলা বলতে পেট চলা তো। পেটের মধ্যে নিত্যিধিকি ধিকি-ধিকি আগুন জ্বলছে

ভাঙা মানুষ ২ হ্যাঁ—তারই মধ্যে টিকিটিকি ঠিকই চলছি

ভাঙা মানুষ ৩ ঠিকই চলছি। দাগী অচল টাকার মতো চলতে ফিরতে নিত্যি নতুন ধাক্কা লাগে

ভাঙা মানুষ ১ তার উপরে খবর আসছে, চতুর্দিকে জোর পাহারা

ভাঙা মানুষ ২ চোর তাড়াবার ?

ভাঙা মানুষ ৩ তাছাড়া কি ? উপরন্তু শুনছি নাকি দারোগাবাবু ইয়ে খুড়ি ক্রেমে ক্রেমে ফাঁস হচ্ছে

ভাঙা মানুষ ১ : পুরাপুরি ফেঁসে গেলেই নোটিশ আসবে, বদল হবার

ভাঙা মানুষ ২ : তখন আবার নতুন মনিব নতুন হিস্যা

ভাঙা মানুষ ৩ : তা তো হবেই। জিনিসের যা দাম বেড়েছে, পচা বখরায় কদ্দিন চলে

ভাঙা মানুষ ১ : তবে কিনা হুঁজুরবাবু বদল হলে যে জন নতুন মনিব হবে, শুনছি নাকি মানুষ ভালো নরম-সরম। নাম-ঠিকানা জাত-চরিত্তির এখন অবধি গোপন আছে

ভাঙা মানুষ ২ : গোপন আছে ! তুই শালা তোর মগজ ভর্তি গোবর নে

মন্দিরে যা বেচে খা গে … মনিবের শ্লা নাম কিরে বে? মনিব—মনিব!

ভাঙা মানুষ ৩: যা বলেছিস! মনিবের শ্লা জাত কিরে বে-সব হারামী একই জাতের

ভাঙা মানুষ ১: ধুর শালা ফের জ্ঞানের ঝাঁপি—বেশি বুঝিস?

ভাঙা মানুষ ২: তা ছাড়া কি! হারামজাদা উঠতে বসতে চাবুক খাচ্ছি, আর তিনি এখন নরম-সরম মানুষ খুঁজছে!

ভাঙা মানুষ ১: এ্যাই হারামী—মারবো টেনে তিনটে লাথি!

ভাঙা মানুষ ৩: এ্যা—এ্যাই, হয়েছে কী, আজকে কেন সোজা কতায় হঠাৎ হঠাৎ ক্ষেপে উঠছিস!

ভাঙা মানুষ ২: ছাড়ো দিনি—ক্ষেপে উঠছে! ওর মত শ্লা ফোতো কাপ্তান ঢের দেখেছি। সকলকে তোর মাগ পেয়েছিস?

ভাঙা মানুষ ১: বাঞ্চোৎ—ফের বউ তুলছিস্!

ভাঙা মানুষ ২: উরো—আমার বউ-স্বয়াগী। সে বেটি তার নতুন ভাতার খুঁজে নেছে আর ইদিকে শ্লার দরদ যেন চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঝরে পড়ছে!

ভাঙা মানুষ ৩: অ্যাঃ থাম্মি তোরা! তোদের শ্লা মরণকালেও গোঁয়ার্তুমি!

ভাঙা মানুষ ১: নাঃ! নতুন ভাতার খুঁজে নেছে বেশ করেছে। তোর ঘরে তোর সোমত্ত বোন দিনদুপুরে ইদিক সিদিক ঠুকরে খায় না?

ভাঙা মানুষ ২: খায় তো কি তোর বাপের খাচ্ছে? গতর আছে ভাঙিয়ে খাচ্ছে

ভাঙা মানুষ ১: হ্যাঁ—তা তো খাবেই—নিজে খাচ্ছে, তোকে দিচ্ছে

ভাঙা মানুষ ২: আমায় দিচ্ছে! থুঃ! ঐ পাপের পয়সা আমি ছুঁই না!

ভাঙা মানুষ ৩: [তীক্ষ্ণ হাসিতে] পাপের পয়সা! তুই শ্লা কোন পুণ্যের বান ডাকায়ে স্তে উদোর ভরাস! —চোরের আবার পাপপুণ্যি!

ভাঙা মানুষ ১: হ্যাঁ হ্যাঁ, শালার বাচ্চা পুণ্য মাড়ায়। দু বার দু বার বোনের বে পাকা হলো, ভেঙে দিলি কিসে জন্যি তা বুঝি না!

ভাঙা মানুষ ২: ভেঙে দিচ্ছি! কিসের জন্যি

ভাঙা মানুষ ১: কিসের জন্যি শ্লা!

ভাঙা মানুষ ৩: ধ্যেত্তেরি! সব পাড়াপড়শী জেগে যাচ্ছে চেপে যা না!

ভাঙা মানুষ ১: চাপবো কেন! তোমার যখন ছেলে মলো—চতুর্দিকে ঢাক পিটিয়ে গেয়ে দেয় নি কিসে মলো!

ভাঙা মানুষ ২: কিসে মলো, সে খবর শ্লা তুই দিছিলি

ভাঙা মানুষ ১: কে দিয়েছে? ফের বল তোর জিভটা টেনে ছিঁড়ো ফেলব!

ভাঙা মানুষ ২: ছেঁড় হারামী। দেখি বাপের ব্যাটা!

ভাঙা মানুষ ৩: এ্যাই শ্লা সব কুত্তার জাত! পাড়াপড়শী জেগে গেছে। জানলা দরজা খুলে যাচ্ছে

ভাগরে ভাগ ভাগ লাগভাগ লাগভাগ

ভাঙা মানুষ ১ ২ : [সভয়ে] খুলে যাচ্ছে !

ভাঙা মানুষ ৩ : তা ছাড়া কি ? কামড়াকামড়ি থামায়ে থে পালায়ে বাঁচ—

• গান •

ভাগরে ভাগ ভাগ লাগভাগ লাগভাগ
পৈত্রিক প্রাণ খাঁচা ছাড়লো রে
কোথায় গেলেন হুঁজুরবাবু
বাঁচান মোদের মাইনষের হাত থেকে ···

গানের তালে তালে বাঁশি বাজাতে বাজাতে দারোগা, মতলবী সাহেব ঢোকে। রক্ষা-কর্তার ভঙ্গীতে তিন জনের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়ায়।

সকলে : হুঁজুরবাবু !

মতলবী সাহেব : বাঁশি—চিনতে পারো নাই ?

ভাঙা মানুষ ১ : না হুঁজুর।

ভাঙা মানুষ ৩ : চেনবার আগেই মরা-বাঁচার ভয়টা কেমন ভাবে লেপটে ধরল

ভাঙা মানুষ ২ : আমার আবার ছোটার সময় কানের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করে
মতলবী : ঝাঁ ঝাঁ করে ? ইস্, তোর কানের অসুখ ফের বেড়েছে,—যথাযথ বর্ণনা থে অষুধ নে যাস—সেরেয়ো যাবে।
ভাঙা মানুষ ১ : হুঁজুর।
মতলবী : এঁ—
ভাঙা মানুষ ১ : শুনছি নাকি
ভাঙা মানুষ ১ ২ : আপনি মোদের
ভাঙা মানুষ ১ ২ ৩ : ছেড়ে ছুড়ে চলে যাচ্ছেন ?
মতলবী : চলে যাচ্ছি ? কোথায় যাচ্ছি ? কী শুনেছিস ?
ভাঙা মানুষ ১ : তা জানি নে
ভাঙা মানুষ ২ : তবে কিনা চতুর্দিকে জোর পাহারা
ভাঙা মানুষ ৩ : চোর তাড়াবার
মতলবী : ঠিক শুনেছিস। সব চোরেরে বশে আনবে এমন মহান ক জন আছে ?
ভাঙা মানুষ ৩ : আপনে হুঁজুর।
মতলবী : সে কথা আর ক জন বোঝে! সম্ভবতঃ এ মাসেরই শেষাশেষি পাকাপাকি বদল হবো। —তোদের এবার লীলাখেলা সাঙ্গ হলো …
সকলে : কেন হুঁজুর ?
মতলবী : তা বোঝ না ? যে হারামী আমার স্থলে পাকাপাকি বহাল হচ্ছে—তারে যারা হুঁজুর ডাকে—সঙ্গে সঙ্গে তারাও আইসবে, হাসবে খেলবে—রাতের বাজার মাত করবে …
ভাঙা মানুষ ১ : তাইলে, মোরা কোথায় যাব ?
ভাঙা মানুষ ২ : কেন, তোর সেই নতুন মনিব, নরম-সরম ভালোমানুষ!
ভাঙা মানুষ ৩ : চুপ হারামী। পিড়িং দিচ্ছে। হুঁজুর, আপনি কোথায় বহাল হচ্ছেন ?
মতলবী : আপাততঃ গাঁয়ের দিকে ঠেলে দেচ্ছে
ভাঙা মানুষ ৩ : তাইলে মোরাও গাঁয়ে যাব
ভাঙা মানুষ ১ ২ : হ্যাঁ …
মতলবী : পাগল নাকি! গাঁয়ের মানুষ, ভাত জোটাতে পাছার কাপড় মাথায় তুলছে—গাঁয়ে যাবি! আছেটা কী ? নিজের ঘরে চুরি করবি ?
ভাঙা মানুষ ১ : তাইলে উপায়!
ভাঙা মানুষ ২ : যিদিন থ্যে আপনে হুঁজুর হঠাৎ হঠাৎ উধাও হচ্ছেন সিদিন থ্যে শান্তি গেছে!
ভাঙা মানুষ ১ : হুঁজুর, ঠিক কুত্তার ন্যায় দিনে রেতে ধাওয়া খেয়্যে ইদিক

সিদিক অলিগলি করে বাঁচছি!

মতলবী : বখরা দিসনে?

ভাঙা মানুষ ২ : কোথে দেবো! আপনে চলে গেলে পরে চৌকিদারে আপনের ঠিক ডবল হাঁকে!

মতলবী : ডবল হাঁকে! নাম বল দিনি, শালার বাচ্চার জন্মের ন্যায় ঘুষের সাধ মিটিয়ে দিচ্ছি

ভাঙা মানুষ ১ : যাক গে যাক গে, যাহোক করে এর এট্টা বিহিত করেন। এমন ধারা কুত্তার ন্যায় দিনযাপন আর ভাল্লাগে না।

ভাঙা মানুষ ৩ : কুত্তার ন্যায়! কুত্তাই তো! হুজুর একে শাস্তি গেছে তার ওপরে হারামীদের মুখের থ্যে কতা খসতেই গায়ে যেন ফোস্কা পড়ে! চিল্লামিল্লি কামড়াকামড়ি ···

ভাঙা মানুষ ১ : আমারে ফের চটায়ে দেচ্ছ—সব রক্ত মাথায় গো চেপে আছে।

মতলবী : ঠিকই আছে ঠিকই আছে ··· বালাই ষাট। ক্রেমে ক্রেমে মাথার রক্ত যথাস্থানে ফিরে যাবে। বাছাদের পেটে বোধ হয় বেশ কিছুদিন দানা পড়ে নি। এ অবস্থায় শান্তি? উঁহু আসবে কোথে!

দর্শকদের সাক্ষী মানতে গিয়ে তাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়। প্রচণ্ড বিরক্তিতে ফেটে

এবার তোরা ক্ষ্যামা দে তো। মাচায় আসতে না আসতেই নিজের জ্বালা নিজের কোঁদল ··· জনগণের সঙ্গে এট্টু আলাপ সালাপ সেরে্য নেব ··· তা না খালি নিজের প্যাচাল পেড়ে যাচ্ছে।—চুপ থাক্!

তিন জন মানুষ একদলা কাদার মত ঝুপ করে পড়ে যায়। পোষাক-আশাক সাধ্যমত গুছিয়ে নিয়ে দর্শকদের

দেখেছেন তো, দিনের বেলা অরাজকতা আর রাতের বেলা বুভুক্ষা হারামজাদাদের। এসব ঠেলে জনগণের কাছেপিঠে পৌঁছানো এক ঝকমারি না? তার ওপরে শোনলেন তো, সমাজের সব নালা ঘেঁটে জিভের লাগাম এক্কেরে ছিঁড়ে গেছে! বিশিষ্ট লোকজনের সঙ্গে দু চার কথা বলতে গেলে ছ আটবার এটকে যাবে। আসল কথা—আমাদের এই অ্যাকশন না, যাকে বলে শাঁখের করাত। যেতে কাটে আসতে কাটে। যেমন ধরেন, যে ছেলেটা, মায়ের কাছে, 'না খাবনা, না খাবনা' বায়না কচ্ছে,—মায়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে বলছে—হেই চেয়ে দেখ পুলিশ আসছে।—'অ্যাই পুলিশ—ধরে নে যা তো!'—অমনি ছেলে ভয়ের চোটে কোলের মধ্যে সেঁদিয়ে গ্যে মুড়ে সাপটে খেয়ে নিলে! মজা দেখুন, আবার যখন, সেই ছেলে ফের ডাগর হয়ে খাবার জন্য পথে পথে মিছিল করে, তখন ঠিক, গভর্নমেণ্ট অফ দি পিউপিল্, ফর দি পিউপিল এ্যাণ্ড বাই দি পিউপিল,—মোদের দিকে

আঙুল তুলে চেঁচিয়ে বলচে—'হেই দেখেছো সারি সারি। জাল দেওয়া সব কালো গাড়ি। ভরছে টোটা বন্দুকে। কেউ জানে না কোন বুকে। সেঁদিয়ে দেবে পড়বে ঠাস। বাপের কিম্বা ছেলের লাশ।' বাস্, দু এট্টা লাশ পড়ে যেতেই খাবার কতা ভুলে গ্যে বেটাছেলে পলায়ে বাঁচে! সুতরাং যতক্ষণ না এ জাতীয় ফিয়ার কমপ্লেক্স দূর হচ্ছে—

মতলবী সাহেবের কথার মধ্যেই দূর থেকে পদধ্বনি গোছের কিছু একটা শোনা যাচ্ছিল। তাই ভাঙা মানুষ ১ ২ ৩ সেই আওয়াজ অনুসরণ করে উঠে আসে, উঁকি ঝুঁকি মেরে শব্দের উৎস খোঁজে, হঠাৎ ডাকে মতলবীর বক্তৃতায় ছেদ পড়ে।

ভাঙা মানুষ ১ ২ ৩ : হুঁজুর!

তিন জনেই আত্মগোপন করে।

মতলবী : [আড় চোখে দেখে ভ্রূক্ষেপ করে না] এ জাতীয় ফিয়ার কমপ্লেক্স যতক্ষণ না দূর হচ্ছে ···

ভাঙা মানুষ ১ ২ ৩ : হুঁজুর।

মতলবী : [পূর্বের ভঙ্গীতেই] এ জাতীয় ফিয়ার কমপ্লেক্স—

ভাঙা মানুষ ১ ২ ৩ : হুঁজুর।

মতলবী : [মুখরোচক বক্তৃতায় ছেদ পড়ায় আকস্মিক উত্তেজনায় ফেটে]—এ্যাই শ্যালা থানকির বাচ্চা, অম্লরোগে চোঁওয়া ঢেকুর—জাহান্নামে যা গভ্য যন্তন্নার দল।

ভাঙা মানুষ ২ : তা যেতিছি, কিন্তু কাছে দূরে কার যেন মৃদুমন্দ পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে

ভাঙা মানুষ ১ : হ্যাঁ হুজুর মেদিনী কাঁপায়ে কে যেন ইদিক পানে আসতিছে বলে মনে হয়

মতলবী : মামদোবাজী? মৃদুমন্দ পায়ের আওয়াজে মেদিনী কম্পিত হয়ে যায়? ভাঙখোর শুয়ারের বাচ্চা যতসব!

ভাঙা মানুষ ৩ : হুঁজুর মা-বাপ, অপরাধ নিয়েন না। উত্তেজনা এলে পরে ও শালার কানে ঝাঁ ঝাঁ লাগে—আসলে পেত্যয় যান নিঃশব্দ পায়ের আওয়াজ সত্যি সত্যিই শোনা যাচ্ছে!

ভাঙা মানুষ ১ ২ : হুঁজুর

ভাঙা মানুষ ১ ২ ৩ : আমরা লুকোলেম—

তিন জনই আত্মগোপন করে।

মতলবী : নিঃশব্দ পায়ের আওয়াজ, শোনা যাচ্ছে? শালারা কি বিশিষ্ট কর্ণের অধিকারী? নৈঃশব্দ্যারে শুনতে পায়?—নাকি—কিছুক্ষণ আগের নেশাটা আমারেই চেপে ধরল? মাগীরে বললাম, এট্টু কম করে হুইস্কি মেশাও [জিভ কেটে] যাক গে যাক, আসলে চব্বিশ ঘণ্টা মাগ ছেলে বাচ্চা-

কাচ্চাদের পরিত্রাহি চিল্লামিল্লি—কানে পালা তালা এঁটে যায়—কে? কে? কে?

ব্যানার সহ টেণ্ডার-বাহক ঢোকে। ব্যানারে লেখা কয়েকটা কথা—'গোপন টেণ্ডার গোপন'...'গরাদের ব্যবসা' 'চাহিদা সৃষ্টি' 'নৈশ ত্রাস'চাই', 'চোর চায়—ঈশ্বর ব্যাপারী' টেণ্ডার-বাহক গান গাইতে গাইতে মঞ্চের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে যায়।

টেণ্ডার : [গান] টেণ্ডার ... গোপন টেণ্ডার

মতলবী : আই—আপ্! কালা নাকি?

টেণ্ডার : [গান] গরাদের ব্যবসা ... চাহিদা সৃষ্টি ...

মতলবী : হ্যাণ্ডস্ আপ্।

টেণ্ডার : [গান] নৈশ ত্রাস চাই ... ত্রাস চাই...

মতলবী : ভয় পায় না। রোবট নাকি!

টেণ্ডার : [গান] রাত নেই বেশি বাকি। চোর চায়। ঈশ্বর ব্যাপারী চোর চায়...

মতলবী : [নিজের মনেই যোগসূত্র খোঁজে] ঈশ্বর ... ব্যাপারী...চোর [হঠাৎ চোখমুখ উদ্ভাসিত হয়]—হুঁজুর!

টেণ্ডার : টেণ্ডার ... গোপন টেণ্ডার ...

টেণ্ডার বাহক বেরিয়ে যেতে না যেতেই কোন অভাবনীয় যোগসূত্র আবিষ্কারের আনন্দে মতলবী চিৎকার করে ওঠে।

মতলবী : তোদের দুঃখের দিন গত হয়ে গেছে—

সকলে : [মুহূর্তে বেরিয়ে এসে] কী করে হুঁজুর?

মতলবী : আমার প্রার্থনার জোরে। মন্দিরে মসজিদে গীর্জায়—সর্বত্র যেখানে গেছি, কায়মনে প্রার্থনা করেছি,—ঈশ্বর, বাছাদের তুমি সুখ দেও!

সকলে : সুখ!

ভাঙা মানুষ ১ : ঈশ্বর মুখ তুলে চেয়েছে তালে?

মতলবী : হ্যাঁ, চেয়েছেন।

ভাঙা মানুষ ২ : পথে পথে কুত্তার জীবন তালে শেষ হবে?

মতলবী : হবে কি রে ... হয়ে গেছে।

ভাঙা মানুষ ৩ : অন্ধকারে ইদিক-সিদিক অলি-গলি করে মরে বাঁচা নয়?

মতলবী : না খোলামেলা স্বচ্ছন্দ জীবন।

সকলে : কদ্দুর—?

মতলবী : বেশি নয়, হেঁটে হেঁটে চলে যাওয়া যায়

ভাঙা মানুষ ১ ২ : [খুশিতে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে পাক খায়] হে-এই...

ভাঙা মানুষ ৩ : [হঠাৎ ভাবান্তরে] না! বিশ্বাস আসে না। পুরুষ পুরুষ ধরে

যেই সুখ বাপ ঠাকুর্দায় হাতরায়ে মরেছে, সে সুখের কাছে হেঁটে হেঁটে চলে যাওয়া যায় ?

ভাঙা মানুষ ১ : হ্যাঁ !

ভাঙা মানুষ ৩ : না !

ভাঙা মানুষ ২ : চুপ থাক হারামজাদা !

ভাঙা মানুষ ১ : হুঁজুর অধমের ধৃষ্টতা নিও নি।

ভাঙা মানুষ ৩ : সুখ আসছে ···যে সুখের সাথে উৎস গেছে, লক্ষ্য গেছে

মতলবী : হ্যাঁ—সে সুখের কাছে পায়ে পায়ে হেঁটে চলে যাবি। সুখ স্বচ্ছন্দ জীবন। জীবনের কাছে কোনদিন পাল্কী চেপে যাওয়া যায়—বল ?

ভাঙা মানুষ ৩ : তাহলে নিশ্চয় সেখানে হুঁজুর নাই ?

ভাঙা মানুষ ১ : তাছাড়া কী ?

ভাঙা মানুষ ২ : এইসব কালাঝোলা নিয়ে মুশকিলে পড়েছি ! শুনলি না, খোলা মেলা স্বচ্ছন্দ জীবন। হুঁজুর স্বেচ্ছায়

মতলবী : তা কি করে হয় ? হুঁজুর ছাড়া দুনিয়া চলে না কি ? জানিস না, অধীনতা জীবনের প্রথম লক্ষণ ! প্রাণ শরীরের অধীন, মাধ্যাকর্ষণের অধীনে সকলেই বাঁধা আছি ! সূর্যের অধীনে দুনিয়াটা নিজ কক্ষে পাঁই পাঁই ঘুরে যায়। তার জন্য সে কখনও নিজেরে অস্বচ্ছন্দ বলে মনে করে না কি ?—ইস এ সব গভীর তত্ত্ব গাড়লের মগজে ঢুকবে না। তোরা যাবি ? [সকলে মুখ চাওয়াচায়ি করে মাথা নিচু করে] অ। তাহলে এবার বাঁশরী বাজাই ! মাঝে মধ্যে প্রেমের বাঁশিতে সর্বনাশ ভর করে অঘটন ঘটে যায়

সকলে : না !

তিনজন তিনদিক থেকে ছুটে পালাতে গিয়ে — পরস্পর পরস্পরের শরীরের জালে আটকে যায়, মতলবী কথা শুরু করে। যে যার ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে আসে। প্রথমে ৩য়। তারপর ২য়। এবং সব শেষে ১ম।

মতলবী : আরে, তোর নামে একটা হুলিয়া রয়েছে না ? হত্যা ? নিজের ছেলেরে ? আচ্ছা, ক্ষিদার জ্বালায় কোন বাচ্চা না চেঁচায়ে পারে ? তার জন্যে একেরে—

ভাঙা মানুষ ৩ : না !

মতলবী : তোরও এট্টা কেলেঙ্কারী কাছে কিন্তু ! মদের দোকানে বেয়ারার কাজ নিলে লোভটোভ একেরে সংবরণ কত্তি হয়। গোছাগোছা নোট দেখে হাত সুরসুর করল—হ্যাঁ, জানি, বলবি ঘরের চিন্তায়। তাই মুঠা মুঠা নোট ন্যে ফুটপাতে লাফায়ে পড়লি, ··· নিজে বাঁচলি। কিন্তু সে ব্যাটা তো বেহেড মাতাল ! তার উপর রাজপথে ট্যাক্সির উৎপাত তোর জানা ছেল ! জেনে শুনে

নতুন যুগের গাড়ি আজ চলছে গড়গড়িয়ে

ভাঙা মানুষ ২ : না !

মতলবী : হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—তারপর ? ভালোমানুষের পো ? যে লোকটা ভাতের লোভে মাগেরে তোর ভাগায়ে নেলো,—রাতারাতি সে ব্যাটারে—ইস্, পাষণ্ড ! আর কি কোন পথ ছেল না ? মাঝখান থ্যে লাভ কি হলো ? সে বেটি তার আরেক ভাতার খুঁজে নেল—তুই এখানে খানাখন্দে

ভাঙা মানুষ ১ : চুপ যাও !

মতলবী : আস্তে, আস্তে ! গলা নাম্যে কথা বল। এ বাঁশিটা—বেশি না, চারবার ফুঁকে দেলে অবস্থা জটিল হয়্যে যাবে ! অবিশ্যি এইসব ছোটখাট অপরাধ—ধরা পইড়লে তৎক্ষণাৎ ছাড়া পেয়ে যাবি !

সকলে : [সমবেত আত্মসমর্পণে] হুঁজুর !

মতলবী : হয়েছে ? —তবে চল, যেখানে গেলে পরে, ভাত জুটবে। ভাতার হবি। বেহানকালে রোদ্দ উঠলে, পাকা ঘরের ছায়া পড়বে কাঠা চারেক। উঠান জুড়ে প্রাণের মায়া। তাজা, ডাগর কাচ্চা-বাচ্চা, এটা ভাঙছে ওটা ফেলছে—কোলেরটা তোর, মাটির ঢেলা খুঁটে খাচ্ছে ! কাজের মধ্যে হঠাৎ

বৌ ছুটে এসে—আঙুল দ্যে ঢেলা মাটি সাফ্ করছে। জালে-ঝোলে কান্না মাখা মুখের ছবি আঁচল দ্যে মোছায়ে দেচ্ছে! দাওয়ায়, [illegible] উদাস উদাস ধরণ দেইখ্যে ঝামটা দেচ্ছে, 'ছেলেটারে দেখতি পাও না? —[illegible] হয়েছ!'
—কিরে, যাবি?

ভাঙা মানুষ ১ : যাব হুঁজুর

ভাঙা মানুষ ২ : কবে যাব?

ভাঙা মানুষ ৩ : যেতে চাইলেই নেবে কেন?

মতলবী : নেবে নেবে। —নেবে কি তোর বদন দেখে! উল্টে পাল্টে বুঝে সুঝে চোখা চোখা প্রশ্ন কর‍্যে তবেই নেবে!

সকলে : পাইরব হুঁজুর?

মতলবী : পাইরবি পাইরবি। নিজের পরে আস্থা রেখ্যে মন মজানো কথা বইলবি, তবেই হবে। সে সব পরে যেতে যেতে বলে দেব নে, অখন, চল।

• গান •

নতুন যুগের গাড়ি আজ চলছে গরগড়িয়ে
টগ্‌বগ্ টগ্‌বগ্ টগ্‌বগ্, ঝিকঝিক ঝিকঝিক ঝিকঝিক ঝিক
বহুদিনের প্যেটের জ্বালা আইজ বুঝি হইল শেষ
মাগ ছেলে দুধে-ভাতে এবার বুঝি থাকবে বেশ
এতদিনে দুঃখ কষ্ট ঘুচিল সবে—

দীর্ঘ রাস্তা পেরিয়ে মতলবী তিনজনকে এনে ঈশ্বর ব্যাপারীর আখড়ায় দাঁড় করায়। বিচিত্র সব পাখির ডাক ভেসে আসে। মতলবী এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত খুঁজে বেড়ায়। ঈশ্বর ব্যাপারী গানের মাঝখানেই মঞ্চে প্রবেশ করেছিল তালে তালে। এখন পেছন থেকে নিঃশব্দে এসে হাতের ছড়িটি আলতো ছুঁইয়ে মতলবীকে জানান দেয়।

মতলবী : [চমকে] হুঁজুর!

ঈশ্বর : পদধ্বনি—চিনতে পারো নাই?

মতলবী : না। হুঁজুর তো জানেন অভিমান হলে পরে অধীনের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়।

ঈশ্বর : বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়! অভিমানে? সঙ্গত কারণ আছে নাকি?

মতলবী : নাই? অধম জীবিত আছে হুঁজুর তো এ সংবাদ জানেন?

ঈশ্বর : ষাট ষাট, এ সব অপ্রিয় কথা ওঠে কেন?

মতলবী : ওঠবে না? যখনই কোন চোর গুণ্ডা বদমায়েশ হুঁজুরের সেবায় লেগেছে—যোগান দিয়েছি।—দিয়েছি কি না?

ঈশ্বর : হ্যাঁ, দিয়েছ। অস্বীকার করে নাকি কেউ?

মতলবী : তাহলে হুঁজুর কী এমন ঘটে গেল যাতে করে দু চারটে তস্করের জন্য রাতারাতি ঢেঁড়ার ডাকলেন?

ঈশ্বর : ইস্, চুলকায়ে ঘা কর কেন ? আমি জানি ইদানীং তুমি গাঁয়ে গঞ্জেই হাঁড়িয়ার হাঁড়ি ভাঙতে এত বেশি মত্ত আছ

মতলবী : মত্ত আছি ? [দর্শকদের] শুনেছেন কর্তা ! মত্ত আছি সাধে ? দেশের মানুষ ভরপেট খেতে পাচ্ছে না, আর শালার বাচ্চারা সবার মুখের গ্রাস নৈমিত্তিক পচায়ে পচায়ে হাঁড়িয়া কর্ছেন ! নেশা হবে ! গুষ্টির পিণ্ডি হবে। [হঠাৎ ঈশ্বর ব্যাপারীকে] হুঁজুর, সরকারী হুকুমে যখন লাঠির ঘায়ে ফটাফট হাঁড়ি ভাঙতে থাকে—হাঁই মাই শব্দ করে মাগীগুলো তেড়ে আসে যেন শালীদের ছেলে মরে গ্যেছে ! ইচ্ছে করে এক এট্টারে ধরে—

ঈশ্বর : মতলবী,—মাল তৈরী আছে ?

মতলবী : এঁ ?

ঈশ্বর : মাল তৈরী আছে ?

মতলবী : হ্যাঁ হুজুর, তৈরী মাল এক্কেরে তৈরী আছে, ··· আর কেউ এসেছিল নাকি ?

ঈশ্বর : এ পর্যন্ত নয়।

মতলবী : ব্যাস্ ব্যাস, তাহলে হুঁজুর এ পর্যন্ত ক্ষ্যামা থাক। টেণ্ডার কেণ্ডার সব ছিড়্যে ফেলে দ্যেন ! এমন তুখড় মাল এত কম দরে কে শালা যোগান দেয় দেখি। —কটা চাই ?

ঈশ্বর : ক্রমশঃ বাইড়বে। বর্তমানে দু চারটে স্যাম্পেল ছাড়ো দিকি

মতলবী : [নিজের মনেই হিসেব করে] দু-চারটে ? তার মানে—দুয়ে-চারে গড়ে তিন ! [সোৎসাহে] হুঁজুর কী বইলব এক্কেরে মনিকাঞ্চন যোগ। তিনটাই সঙ্গে আছে !—তারপর, মালগুলি কী কাজে লাগাবেন ?

ঈশ্বর : কাজ আছে। উত্তরে আমার এট্টা কারখানা আছে, গরাদের ঠাঁই—তুমি তো জানো !

মতলবী : হ্যাঁ হ্যাঁ জানি, দেশের কাজের চাপে আপনার ফুরসৎ নাই—ছ্যাকরা গাড়ির মত তাই সেটা ক্যোদরে ব্যোদরে এদ্দিন চলে আসছিল

ঈশ্বর : বর্তমানে ব্যবসাটা ছাড়তে চাই। টাকা চাই। দ্রুত বিক্রী দ্রুত টাকা। বুঝতেই পারছ এ জন্ত প্রাথমিক স্তরে কিঞ্চিৎ চাহিদা সৃষ্টি প্রয়োজন।

মতলবী : হ্যাঁ—এর মধ্যে না বোঝার কী আছে ! কিন্তু মালগুলি কী কাজে লাগাবেন ?

ঈশ্বর : যদি বলি, সেই প্রাথমিক চাহিদা সৃষ্টির কাজে,—কৃত্রিম চাহিদা !

মতলবী : কৃ-ত্রি-ম- চাহিদা ?

ঈশ্বর : ব্যাপারটা এট্টু সাজায়ে দিলি এক্কেরে প্রাঞ্জল হয়ে যাবে, প্রথমে তস্করগুলি ঘরে বাইরে ফাঁক দেখলে—একটানা হামলা করে যাবে···

মতলবী : তার মানে ? ব্যাপক উৎপাত !

ঈশ্বর : হ্যাঁ, গৃহস্থের ঘরে ঘরে সমাজের আনাচে কানাচে ত্রাস।—ত্রাস সৃষ্টি কইরতে হবে

মতলবী : জাঁই। যার কিনা অনিবার্য পরিণাম বেবাক মানুষের সর্বত্র কাছায় টান এবং

ঈশ্বর : এবং ব্যাপক হারে আত্মরক্ষা! ছা-পোষা মানুষ চোরের উৎপাত থ্যে লোটা কম্বল বাঁচাতে যে যার মত ফাঁক ঢাইকবে!

মতলবী : গরাদ! গরাদ ছে!

ঈশ্বর : হ্যাঁ, ঠিক এমন ধারা কৃত্রিম উপায়ে গরাদে গরাদে গাঁ গঞ্জ ইস্তক সমাজ ছেয়ে ফেলব,—কোথাও কিঞ্চিৎমাত্র ফাঁকফুঁক রাখা চলবে না।

মতলবী : ও হো হো হো—হুঁজুর অভিনব প্রস্তাবনা—দারুণ!

তিন জনকে এক এক করে টেনে এনে ঝেড়ে-ঝুড়ে পরিষ্কার করতে থাকে।

ঈশ্বর : [পকেট থেকে একটি নকশা বার করে নিবিষ্ট মনে লক্ষ্য করতে করতে] হেই কাজের মাঝখানে ভেগে টেগে যাবে না তো?

মতলবী : ভেগে যাবে! তিন জনের নামই হুলিয়া রয়েছে না, ধরা পড়লে অনিবার্য ফাঁসিকাঠ!

ঈশ্বর : আরেকটু খুলে বইলতে পারো।

মতলবী : না খুলে বলবার কিছু নাই। সেরেফ কয়েকবার খাঁচা বদলের ইতিহাস

ঈশ্বর : কয়বার বদল হয়েছে?

মতলবী : এটা ধরে বইলব?

ঈশ্বর : না, আপাততঃ ছেড়ে বলতে পারো!

মতলবী : প্রথমে তিনজনই ছিল গাঁয়ের মুনিষ। এখেনে ওখেনে রোজ খাটত। প্রিকিতি আর মাইনষের চাপে একদিন শহরে এসে ডেরা বাঁইধলো—ভাইবলো বাঁচা যাবে! কিন্তু বেঁচে আর যাবেটা কোথায়? উল্টাপাল্টা খুনখারাপির ধাক্কায় একদল মি-ছি-ল করে চলে এলো সরকারী খাঁচায় অর্থাৎ কারাবাস। অতঃপর—

ঈশ্বর : থাক থাক, অতঃপর যা কিছু তা তো মোটামুটি গতানুগতিক। সরকারী খাঁচার থ্যে একদিন আচমকা ছাড়া পেয়ে কৃতজ্ঞতাবশতঃ বর্তমানে তোমার খাঁচায় …

মতলবী : হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ! একেরে আটকা পড়ে গেছে।

ঈশ্বর : ঠিক আছে, ঠিক আছে। মালগুলি অন্দরে—ও নে এসেছ—বাঃ তোমার খাঁচায় দেখছি বিভিন্ন জাতের পাখি মোতায়েন আছে?

মতলবী : হাঃ হাঃ হাঃ! ওইটুকুই অবশিষ্ট হুঁজুর। নইলে খাঁচার শিকের ঘষা লেগে পালকের রং একেরে নষ্ট হয়ে গেছে।

ঈশ্বর : না না তাতে কিছু আসে যায় না। খোলা খাঁচার হাওয়ায় যথেচ্ছ ওড়াল দেলে দু-চার দিনেই রং-চং-য়ে পেখম ছড়াবে—কি ?

মতলবী : জবাব দে জবাব দে

ঈশ্বর : আঃ চাপ দাও কেন ? স্পনটিনিটিতে বিশ্বাস যাও—আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ···

গুঞ্জন ওঠে ভাঙা মানুষের দলে।

মতলবী : চাপ্‌ !

ঈশ্বর : চাপ ! [হেসে] চাপ দেয় ফের। ছড়ায়, গানে সুমিষ্ট কথায় ছেলে মানুষের সাথে কাজ সারতি হয়। কী, ছোট্ট সোনা বন্ধুরা আমার, ভালো আছ সব ?

সকলে : [হ্যাঁ এর ভঙ্গীতে ঘাড় কাত করে] না !

ঈশ্বর : এ্যা ! তা কী যেন বলবার চাও, আমারেই বলে ফেলতি পারো।

তিনজন মুখ চাওয়াচায়ির মধ্যে কথা বলে।

ভাঙা মানুষ ১ : না, গোল বাঁধছে এট্টা জায়গায়

ভাঙা মানুষ ৩ : হুই সায়েবেরে আমরা সর্বদা হুঁজুর বলে থাকি

ঈশ্বর : বলে থাক ? বল। বাধা দিচ্ছে কে ?

ভাঙা মানুষ ২ : না, সাহেব আবার আপনারে সর্বদা হুঁজুর বলে কিনা ···

ঈশ্বর : ওহো ! হো-হো ! ইনটেলিজেন্ট। অর্থাৎ আমারে তোমরা কী বলবে ? মতলবী সাহেব ঝটিতি গোলটা মিটমাট করে দাও দিনি ···

মতলবী : ছড়ায় ? গানে ?

ঈশ্বর : হ্যাঁ ··· সুমিষ্ট কথায়

মতলবী : [গান] মামা-ভাগ্নের সম্পর্কটা মধুর রসে ভরা
ভাগ্নে বিনে মামা বাঁধে কার সাথে গাঁটছড়া
নেই মামা কানামামা কত মামা আছে
মামার করুণায় ফল ধরছে গাছে গাছে
চাঁদা-মামা এসে পরান চাঁদ কপালে টিপ
হঠাৎ মামা ক্ষেপলে পরে বুক করে ঢিপঢিপ
মামার মামা তস্যমামা তারও মামা আছে
সর্বজনের মামা যিনি গগনে বিরাজে। /কে ?

ভাঙা মানুষ ১ ২ ৩ : সূয্যিমামা !

মতলবী : হ্যাঁ, তোমারও মামা, আমারও মামা—আমারও হুঁজুর আবার তোমাদেরও হুঁজুর।

ঈশ্বর : এবং যেহেতু

মতলবী : [গান] সূর্য্যির আলোকে চাঁদ আলোকে উছলে

সেইজন্য মোরে সবাই চন্দ্রমামা বলে।

ঈশ্বর : [হঠাৎ প্রচণ্ড দাপটে] আর তোমরা ? তোমরা কারা ? কী তোমার পরিচয় ? তলিয়ে ভেবেছ কোনোদিন ?

সকলে : না হুঁজুর !

ঈশ্বর : তোমরা হচ্ছগ্যে সূর্যের রথের সেই বলবান ঘোড়া—সমুজ্জ্বল অশ্ববৃন্দ। ঘাড় বাঁকায়ে রেশমের মত সোনালী কেশর নেড়ে প্রচণ্ড দাপটে চলবা ফিরবা

ভাঙা মানুষ ১ : দু বেলা পেট ভরে খেতে টেতে পাব তো হুঁজুর ?

ঈশ্বর : অ্যাঁ ?

ভাঙা মানুষ ৩ : দু বেলা পেট ভরে খেতে টেতে পাব তো হুঁজুর ?

মতলবী : পাবি পাবি। খাবি দাবি কলকলাবি—গেরস্তের বাড়ি হামলা করবি, তোদের মধ্যে যে একেকটা প্রাণবায়ু আছে—

ঈশ্বর : এবং সেই প্রসিদ্ধ প্রাণবায়ু অন্নরস সহায়েই শরীরে অবস্থান করে—

মতলবী : হুঁজুরের তা কি জানা নাই ?

ঈশ্বর : মতলবী সাহেব ! ঝাড়াই বাছাইয়ের কাজটা ঝটপট সেরে নিতি হয়

মতলবী : হ্যাঁ, হুঁজুরের অভিরুচি। [হঠাৎ তৎপর হয়ে] এ্যাই এ্যাই. তোরা সব সার বেঁধে দাঁড়া। তোদের বিচার হবে। ঝাড়াই বাছাই হবে। নেতিয়ে পড়িস নি বাপধন—সিধে হয়ে দাঁড়া—মেরুদণ্ডে ছিলে পরাবি নাকি ?

সার বেঁধে দাঁড় করায়।

ঈশ্বর : না না অধিক চাপের প্রয়োজন নাই। অশ্ববৃন্দ, তোমাদের কাছে এখন গুটিকয় প্রশ্ন রাখা হবে, সে সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দে দিলে

মতলবী : হ্যাঁ—হুঁজুরের শ্রীচরণে পাকাপাকি স্থান হয়ে যাবে—কী প্রশ্ন হুঁজুর ?

ঈশ্বর : প্রশ্ন হলো [গান] মানুষের কি আছে আর মানুষের কি নাই

সাদামাটা দুটো কথা গোড়াতে শুধাই

সঠিক জবাব দিতে পারলে তেলে জলে মেশে

ভেবেচিন্তে সমঝে বল সব মানুষ বাঁচে কিসে ?

মতলবী : হ্যাঁ ঝটপট উত্তর দে দিনি। প্রশ্নগুলো সব ঠিকঠাক মনে আছে তো ?

ভাঙা মানুষ ১ : মানুষের কী আছে ?

ভাঙা মানুষ ১ ২ : মানুষের কী নেই ?

ভাঙা মানুষ ১ ২ ৩ : মানুষ বাঁচে কিসে ?

ঈশ্বর : বহুযুগ আগে স্বয়ং ঈশ্বর এক শাপভ্রষ্ট দেবদূত পৃথিবীতে পাঠায়ে ছিলেন—এসব প্রশ্নের উত্তর শিখবার জন্য—এবং শিক্ষা সম্পূর্ণ করে সে আবার স্বর্গে ফিরে গিয়েছিল

ভাঙা মানুষ ১ : শিক্ষা সম্পূর্ণ করে !

ভাঙা মানুষ ২ : পৃথিবীতে !

ভাঙা মানুষ ৩ : মানুষের কাছ থ্যে !

ঈশ্বর : হ্যাঁ, মানুষের কাছ থ্যে

ভাঙা মানুষ ৩ : কিন্তু সে কোন্ মানুষ হুঁজুর ?

ঈশ্বর : [হঠাৎ হাসে] মানুষ ! মানুষের কাছ থেকে

ভাঙা মানুষ ৩ : বুঝলাম কিন্তু কোন্ মানুষ হুঁজুর ?

মতলবী : ধেত্তেরি হারামজাদা ! হুঁজুর কি বনমানুষের কথা বলত্তিছেন নাকি॰?

সকলে : না !

ভাঙা মানুষ ১ : না — মানুষ তো বেবাক জাতের আছে

ভাঙা মানুষ ২ : অর্থবান

ভাঙা মানুষ ৩ : অর্থহীন

ঈশ্বর : হ্যাঁ হ্যাঁ আছে আছে — জ্ঞানী মূর্খ দুর্বল গোঁয়ার। কিন্তু তা সত্ত্বেও সকলেরই কোন্ জিনিসটা বর্তমান ? কি আরেকটু স্বচ্ছতা চাও ? যেমন ধর হাঁস মুরগী/কাক কচ্ছপ/নানান জাতের/ডিম থাকলেও/সবার ডিমেই/কোন্ জিনিসটি/আছেই আছে ? [মতলবীকে] বলি দাও তো

মতলবী : উম্-ম্-ম্ — ফটাস করে ফেটে গিয়ে বাচ্চা হবার সম্ভাবনা।

ঈশ্বর : এ্যা — ফটাস করে। গোল মিটেছে ?

ভাঙা মানুষ ৩ : কই মিটল ?

মতলবী ঈশ্বর : অ্যাঁই —

ভাঙা মানুষ ১ : হাঁসের ডিমকে ডিম বলসে

ভাঙা মানুষ ২ : ঘোড়ার ডিম-ও ডিম-ই বটে

ভাঙা মানুষ ৩ : মজা হচ্ছে হাঁসের ডিম ফেটে গ্যে কচি মত বাচ্চা বেরোয়

ভাঙা মানুষ ২ : কিন্তু ঘোড়ার ডিম ফেটে গ্যে ঘোড়ার বাচ্চা পয়দা হচ্ছে —

ভাঙা মানুষ ১ : হেঁ হেঁ—এটা কেমন সত্য হুঁজুর ?

ঈশ্বর : হায় হায় ! ওটা তো ফ্যাণ্টাসী — যা না থেকেও থেকে গেছে আবার থেকেও কোথাও নাই। মানুষের খেয়ালরসের অভিজ্ঞতা — যথা —

ভাঙা মানুষ ৩ : যথা আমাদের মতন মানুষ হুঁজুর। না থেকেও থেকে গেছি, আবার থেকেও অস্তিত্ব নাই

ভাঙা মানুষ ২ : হ্যাঁ, যাকে বলে অশ্বডিম্ব

ভাঙা মানুষ ১ : অর্থাৎ হঠাৎ ফটাস করে ফেটে গিয়ে উজ্জ্বল অশ্বটা কিছুতেই বের হয়ে আসে না···

নিজেদের মধ্যে মৃদু হাসির গুঞ্জন ওঠে।

ঈশ্বর : আঁ্যা ! [হঠাৎ স্বর বদলে] মতলবী সাহেব, এ কেমন জাতের পাখি

আমদানি করেছ ?

মতলবী : কেন হুঁজুর ?

ঈশ্বর : মনে আছে, সেবার হাটের থ্যে—হ্যাঁ, ঠিক এমন ধারা রংচংয়ে এট্টা পাখি এনে খোলা আকাশের নিচে ঝোলায়ে রাখলাম। অবশ্যই খাঁচায়... একদিন ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি হয়ে গেল ... জল থামলে নিকটে যেয়ে দেখি খাঁচাটা খাঁচাই আছে, অথচ ভিতরে অন্য এট্টা হাড়গিলে পাখি। হ্যাঁ কালা কুচ্ছিত

মতলবী : আঁই ! বন্ধ খাঁচা থেকে সাধের পাখিটা ওড়াল দে দিল ?

ঈশ্বর : না না, পাখিটা তো ওড়াল দেয় নাই। দিছিল কপট রংয়ের ছটা !

মতলবী : হুঁজুর !

ঈশ্বর : মতলবী সাহেব, ঝুটামাল দিতি চাও ?

মতলবী : না—! বিশ্বাস যান। এই শালা ঠিকঠাক জবাব দে দিনি—শালার বাচ্চার 'মাগ্যে নেই চায় রাধা কেষ্ট নাম'।

ঈশ্বর : আস্তে, আস্তে। হুঁজুরের বর্তমানে অতটা সুউচ্চ পর্দায় গলা সাধতে নাই ... ওঠ ওঠ ছোট্ট সোনা বন্ধুরা আমার ! শেষমেষ পাখিটার গতিটা কি হয়েছিল জানো ? অনাহার !

সকলে : অনাহার !

ঈশ্বর : হ্যাঁ। পরদিন থ্যে আর দানাপানি দিই নাই। অর্থাৎ প্রথমে চেঁচামেচি তারপর ঝিম মারা, ...তারপর ... হুঁ [নিঃশব্দে হাসে] মনে আছে পাখিটাকে গোর দ্বে দিলাম খাঁচার নিচের সেই রংচংয়ে জমিটায়। ঝুটা রং ধুয়ে ধুয়ে যে মাটিটা রঙীন হয়ে গিয়েছিল।

সকলে : না !

ঈশ্বর : [প্রচণ্ড চিৎকারে ফেটে] মানুষের খেয়ালরসের অভিজ্ঞতা—অশ্বডিম্ব, তোমাদের থাকা না থাকা যখন একই সত্যের এপিঠ ওপিঠ, তোমাদের ন্যে যা খুশি করতে পারি। ইচ্ছে হলে বুকে তুলে নেব, না হলে রঙীন খেলনার মত ভেঙে চুড়ে—

সকলে : হুঁজুর !

ঈশ্বর : তাহলে কেউই তোমরা মরবার চাও না ?

সকলে : না !

ঈশ্বর : পৃথিবীতে সুখী হয়ে বেঁচে বর্তে থেকে যেতে চাও ?

সকলে : হ্যাঁ।

ঈশ্বর : তাহলে বল,

সুখ থাক | শান্তি থাক | আনন্দ বক্ষমাঝে |
[আর] কোন্ থাকাটা | সর্বজনের | শেল হয়ে বাজে
—বল্ মানুষের কি আছে ?

ভাঙা মানুষ ১ ২ ৩ : পেট আছে

ঈশ্বর : চমৎকার ! চমৎকার—পেট আছে। অর্থাৎ ?

ভাঙা মানুষ ২ ৩ : পেটের জ্বালা আছে

ঈশ্বর : অর্থাৎ ?

ভাঙা মানুষ ৩ : ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে

ঈশ্বর : হ্যাঁ। কিন্তু—ক্ষুধাতৃষ্ণা | কোনোটারই | আদিঅন্ত নাই |
অগোচরে | খাঁচাকলে | আটকা মানুষ—তাই।
বল্ মানুষের কি নাই ?

ভাঙা মানুষ ১ : জ্বালার নিবৃত্তি নাই

ঈশ্বর : অর্থাৎ ?

ভাঙা মানুষ ১ ২ : খাদ্যের সংস্থান নাই'

ঈশ্বর : অর্থাৎ ?

সকলে : দানাপানি নাই

ঈশ্বর : হ্যাঁ। তার মানে খাদ্য নাই। ক্ষুধা আছে, কিন্তু খাদ্য নাই। কী [হাসে] তাহলে—খাদ্য ক্ষুধা | তেল জল | কিছুতে না মেশে | (আবার) দুই শত্রু | মিত্র হত | কোন্ সে পরসে | বল্ মানুষ বাঁচে কিসে ?

সকলে : ঈশ্বরের করুণায় প্রভুর দয়ায় হুঁজুরের চরণ সেবায়

ঈশ্বর : পাখীসব করে রব রাত্তি পোহাইল ··· হ্যাঁ, পাখীসব করে রব। রাত কেটে গেছে। পক্ষীকুলের কণ্ঠে প্রভাত সঙ্গীতের আভাস। মতলবী সাহেব ?

মতলবী : এই যে—

ঈশ্বর : ঝাড়াই বাছাই হয়ে গেছে

মতলবী : হয়ে গেছে !

ঈশ্বর : হ্যাঁ। দিনের বেলা গরাদের কারখানা, তারপর অন্ধকার হলে গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি অলিগলি কোণা খামচিতে ভয়ঙ্কর ত্রাস !

মতলবী : [সোল্লাসে] হয়্যে গেছে ··· হুজুরের কর্মযজ্ঞের চ্যালাকাট হয়ে গেলি তোরা। একেরে রাতারাতি

ঈশ্বর : যাও, এই খাদ্যের ভাণ্ডার খুলে যে যার পছন্দ মত মুড়ে সাপটে খেয়ে নাও

ঈশ্বর ব্যাপারী তাদের হাতে খাবারের ঝাঁপি তুলে দেয়। মানুষ তিনটি খুশির উল্লাসে প্রায় নাচতে নাচতে মঞ্চের এক কোণায় চলে যায়। ঢাকা খোলে। কিন্তু পরমুহূর্তে আর্ত চিৎকারে তিনজন তিন দিকে ছিটকে পড়ে। মতলবী সাহেব দৌড়ে আসে। ঝাঁপির ভেতরে উঁকি মেরে সভয়ে ঢাকা বন্ধ করে।

মতলবী : হুঁজুর !

ঈশ্বর : অ্যাঁ ?—ওহো, ও কিছু নয়। উত্তেজনাবশতঃ নেশায় ঝাঁপিটা বুঝি হস্তান্তর হয়ে গিয়েছিল। নাকি এই ভ্রমের মধ্যেই ঈশ্বরের ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত

রয়েছে ? [অনুরূপ আরও একটি ঝাঁপি তুলে নেয়] নৈব কিঞ্চিতাগ্র আসীন্মৃত্যু নৈবেদমাবৃতম আসীৎ, অশনায়য়া অশনায়াহি মৃত্যুস্তন্মনো কুরুতাৎসহী ··· পঞ্চভূত সৃষ্টির বহু আগে এ জগৎ ভোজনেচ্ছারূপ মৃত্যু দিয়ে ঢাকা ছিল [ঝাঁপির ঢাকা খোলে] আসলে ক্ষুধা মৃত্যুরই নামান্তর—

ঝাঁপির ভেতর থেকে এক টুকরো খাবার ছুঁড়ে দেয়। প্রথম ব্যক্তি মাঝপথে লুফে নিয়ে দৌড়ে পালাতে যায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ব্যক্তি তাকে বিপজ্জনকভাবে চেপে ধরে প্রায় শ্বাসরোধ করে কেড়ে নিতে চায়। ঈশ্বর হাসে।

দেখেছ, ক্ষুধার্ত হলে মানুষ নির্বিকার চিত্তে অপরের প্রাণনাশ করে। মতলবী সাহেব, এইবার সকলকে দানাপানি দিয়ে দিতে পারো—

মতলবী সাহেবের হাতে খাবারের ঝাঁপি তুলে দেয়। মতলবী বাঁশিতে ফুঁ দিতেই মানুষগুলি ছুটে আসে—অস্থির খিদের মতলবীকে উত্যক্ত করে তোলে।

মতলবী : দাঁড়া দাঁড়া আস্তে কর ··· ও রকম হামড়ে পড়লে পরে ··· এই এই দেখ ··· তোরা দেখছি ছিঁড়ে খুঁড়ে খাবি ··· এই শালা হাবাইত্যা যত্তো গিদ্দরের জাত ···

মতলবী বেরিয়ে যায়। পেছন পেছন মানুষগুলিও অদৃশ্য হয়। ঈশ্বর ব্যাপারী নির্বিকার মুখে তাদের চলে যাওয়া প্রত্যক্ষ করে। এখন মঞ্চে সে একা। পরম মমতায় বেশায় ঝাঁপিটি কোলে তুলে নেয়। পরপর দুটি ছোবলে বোধ হয় একটু নেশা হয়। ঝাঁপিটি সন্তর্পণে যথাস্থানে রেখে দর্শকদের দিকে এগিয়ে আসে। অমায়িক হাসিতে তার কথা শুরু হয়।

ঈশ্বর : দেখেছেন, কতক্ষণ থেকে উসখুস উসখুস করছি কিছুতেই ফুরসৎ মেলে না। আসলে মাচার মধ্যে এতক্ষণ যতকিছু ঘটে গেল ··· তাতে করে কেউ যদি আমাকে অসৎ কিম্বা ঘৃণ্য বলে মনে করে সেটা কিন্তু ভুল হয়ে যাবে। যেহেতু এ ক্ষেত্রে আমি জনৈক ব্যাপারী, ব্যবসা করে খেতে হয় ··· ধনবিজ্ঞানের আধুনিকতম সূত্র আমাকে মানতেই হবে ··· নাকি ? কেননা ডিম্যাণ্ড অনুযায়ী সাপ্লায়ের ···

কথার মধ্যে মতলবীকে ফাইল হাতে ঢুকতে দেখা যায়।

মতলবী : হুঁজুর ···

ঈশ্বর : ডিম্যাণ্ড অনুযায়ী সাপ্লায়ের যে সূত্র ছিল

মতলবী : [কাগজ এগিয়ে] হুঁজুর

ঈশ্বর : ধ্যেৎ !

সই করে দেয়। মতলবী চলে যায়।

ঈশ্বর : বর্তমানে একেবারে অচল, পচে গেছে। অর্থাৎ চাহিদা গড়ে ওঠবে কোথে ? যেখানে মানুষ কি যে চায় নিজেই বোঝে না। ব্যবসার ইতিহাসে ইদানীং তাই বিপরীত দেখা যাচ্ছে। সুচতুর বিজ্ঞাপন, চটুল উস্কানি··· আবার কখনও ত্রাস ··· নানাভাবে চাপসৃষ্টি করে

মতলবী : হুঁজুর

ফাইল হাতে এবার অন্য দিক থেকে

ঈশ্বর : নানাভাবে চাপসৃষ্টি করে

মতলবী : [কলম এগিয়ে] হুঁজুর

ঈশ্বর : ধ্যেৎ ! [সই করে দেয়। মতলবী চলে যায়] ক্রেতার কপট ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাগুলিকে প্রথমে চাগায়ে তোলা। তাহলেই ঘরে বাইরে ব্যাপক চাহিদা। যেমন ধরেন, জনৈক বস্ত্রব্যবসায়ী নতুন নক্শার শাড়ী বাজারে ছাড়বেন। যেমন করেই হোক প্রথমেই তার সে শাড়ী জড়াতে হবে চলচ্চিত্রের কোনো ব্যস্ততম নায়িকার সুঠাম শরীরে। ব্যাস ! সঙ্গে সঙ্গে মনের গহনে বীভৎস অভাববোধ—দোকানে দোকানে মা জননীরা একেরে হুমড়ি খেয়ে টানাটানি হেচড়া হেচড়ি—হেঁ হেঁ—এই হলো আধুনিকতম ধনবিজ্ঞানের কথা … ডিম্যাণ্ড কণ্ট্রোল …

মতলবী : [এবারে শূন্য হাতে] হুঁজুর

ঈশ্বর : ধেত্তেরি নিকুচি করেছে হুজুরের ! কথার মধ্যে খালি খিল্লি খেয়ে খেয়ে —ও মতলবী সাহেব !

মতলবী : হ্যাঁ—আমারে ফাঁসায়ে থে এদিকে হুঁজুর ডিম্যাণ্ড কণ্ট্রোল বোঝাচ্ছেন

ঈশ্বর : ফাঁসায়ে থে ! কিসে ফাঁসলে ?

মতলবী : আর কিসে ? হুঁজুর যে সময় ধরে বক্তিমে দিচ্ছিলেন ইতিমধ্যে কতদিন গত হয়ে গেছে…সে সংবাদ রাখেন ?

ঈশ্বর : সে কি !… আমার ব্যবসা … পক্ষীরাজের দল ?

মতলবী : আছে। সবই আছে। মাঝখান থ্যে শুধু অধীনের হাড়মাস কালি হয়ে গেল।

ঈশ্বর : ষাট ষাট, কী চেহারা হয়েছে তোমার ?

মতলবী : হ্যাঁ, ওদিকে ব্যবসার চেহারাও চট্ করে চেনা যায় না। কর্মচারীদের সুনিপুণ দৌরাত্মিতে ঘরে ঘরে হায় হায় রব

ঈশ্বর : চমৎকার !

মতলবী : [অর্থপূর্ণ হাসিতে] তাহলে, হুঁজুর কি এখনও বলবেন ঝুটামাল যোগান দিয়েছি ?

ঈশ্বর : ইস—এসব অপ্রিয় কথা ওঠে কিসে ! … তারা কই ? সমুজ্জ্বল অশ্ববৃন্দ ?

মতলবী : সুখে আছে। খেয়ে না খেয়ে একদিকে ছা-পোষা মানুষ ফাঁক ঢাকছে, আর খেয়ে খেয়ে তেনাদের সর্বাঙ্গ জুড়ে দারুণ চিকনাই। মাছি বসলে পিছলে যায়

ঈশ্বর : পোষাক আশাক

মতলবী : বদলে গেছে। নানান নক্‌শার জামা ও কাপড়ে সুসজ্জিত। টায়ারের জুতো দেখলে এখন শালার বাচ্চারা মিচকি হাসে। জরির কাজকরা নাগরার নক্‌শা কত !

ঈশ্বর : বাঃ! সেই সঙ্গে একটু আধটু

মতলবী : নেশা ? হ্যাঁ তাও চলছে। বলতে গেলে গায়ে ও গতরে সুখ যেন উপচে পড়ছে। হুঁজুর কি দেখবেন ?

ঈশ্বর : দেখব না! আমার জাতীয় পক্ষীর দল, মনের ময়ূর ; খুশিতে পেখম মেলেছে ··· পেখম। জাতীয় জীবনের সুমহান চালচিত্রির ··· হেঁহেঁ ··· দেখব না ··· চল

ঈশ্বর ব্যাপারী আর মতলবী সাহেব বিচিত্র পদক্ষেপে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে যায়। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আসে। পর্দা পড়ে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নেপথ্যে সুখী মানুষের গান ভেসে আসে। মঞ্চ আলোকিত হলে আবার সেই মানুষ তিনটিকে দেখা যায়। পোষাকে কায়দায় কিছু পরিবর্তন এসেছে। তিনজনের হাতেই পানপাত্র। নেশার ঝোঁকে গানের মাঝে মাঝে উৎকট হাসিতে ফেটে পড়ছে।

অনেক দিনের পরে হুঁজুরবাবুর কৃপাতে
সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে কাটাচ্ছি জীবন
রাতের বেলা গরাদ ভাঙলে গেরস্থের বাড়িতে,
গরাদের চাহিদা তত বাড়ে বাড়ি বাড়িতে।
হুঁজুরবাবুর ফ্যাক্টরী তাই চলছে রমরম করে,
তারই সঙ্গে চলছে মোদের প্যেট—

বিকট হাসির ঝড় ওঠে। অকস্মাৎ নেপথ্যে বাঁশির ফুঁ। মানুষ তিনটি সেই মুহূর্তে যে যার ভঙ্গীতে থেমে থাকে। শশব্যস্ত মতলবী ঈশ্বর ব্যাপারীকে নিয়ে প্রবেশ করে। গর্বে তার মুখ চোখ উজ্জ্বল। সগৌরবে সে প্রথমে ১ তারপরে ২ এবং সবশেষে ৩ মানুষটিকে দেখায়।

মতলবী : এ্যা—এ্যাই। এই যে দেখেন, বসবার ভঙ্গী দেখেছেন, কি রকম

তেজী তেজী ভাব! প্রথম থেকেই এ ছোকরার ডাঁয়ে বাঁয়ে ছোরা গুলির অব্যর্থ নিশানা। চলন্ত পক্ষীর থেকে উড়ন্ত মশক কারো ছাড় নাই …

ঈশ্বর : অর্থাৎ শুধুই কৌশল!

মতলবী : মানে?

ঈশ্বর : মানেটা পরে বুঝে নিও। তারপর?

মতলবী : এ-এ-এইযে। দেখেছেন বুক, পেট, পাছা জুড়ে কি রকম মাংসের জোয়ার লেগেছে! তার ওপরে দাঁড়াবার ঠাটটা দেখেন … গোটা পৃথিবীরে যেন কাঁধের ওপরে ধরে আছে। অসম্ভব বলশালী। গতর নাড়ালে যেন ভূমিকম্প হয়ে যায়। সম্প্রতি জোরে হাই তুলতে নিষেধ করেছি, কেন না সেদিন সামান্য তুড়ির চোটে

ঈশ্বর : অসামান্য কাণ্ড ঘটে গেছে?

মতলবী : হুঁজুর কি করে জানলেন?

ঈশ্বর : যা কিছু ঘটছে—ঈশ্বর ব্যাপারীর হিসেবে সবকিছু বহুপূর্বে ঘটে আছে! তারপর?

মতলবী : এ ছোঁড়াটা সামান্য এট্টু বয়স্ক হলেও বুদ্ধির গোড়ায় কিন্তু রস আছে। উদ্ভাবনী শক্তি এখনও সজীব। প্রথমে কিছুদিন রক্তাল্পতা রোগে ভুগেছিল। এখন দেখেন [চোখের নিচের পাতা টানে] এ্যা—রক্ত যেন ফেটে পড়ছে। যাবতীয় ত্রাস কিম্বা উৎপাতের ফন্দি টন্দি সর্বদা এটার মগজ থেকে আসে—

ঈশ্বর : অর্থাৎ—ছল, বল এবং কৌশল। মতলবী সাহেব, চমৎকার! জব্বর চাল চেলেছ এতদিনে …

মতলবী : সবই তো আপনার হুকুমে। [হঠাৎ তাকে অসহায় দেখায়] হুঁজুর মহাজন, এবার আমারে ছেড়ে দেন। কাজকর্ম স্ত্রী-পুত্র পরিবার ছেড়ে বহুদিন আপনার সেবায় লেগেছি …

ঈশ্বর : সে কি! প্রলাপ বকার মত বয়স তো তোমার [আপাদমস্তক দেখে] উঁহু … আসে নাই! রথ আছে … সমুজ্জ্বল অশ্ববৃন্দ আছে … অথচ সারথী নাই … ভাবা যায়?

মতলবী : হুঁজুর!

মতলবী এই কাতর ডাকের সঙ্গে ছোট্ট একটি ঘটনা ঘটে যায়। ঈশ্বর তার শেষ কথাগুলির সঙ্গে হাতের ছড়িটি দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে যাচ্ছিল। মতলবীর কাতর সম্বোধনে হাত জোড় করতে ছড়ির নিচের প্রান্তটি মতলবীর হাতের মধ্যে বাঁধা পড়ে। ঈশ্বর ব্যাপারী মুহূর্তে ছড়ি ছেড়ে ঘুরে দাঁড়ায় পকেট থেকে ভাঁজ করা নক্শাটি বের করে।

ঈশ্বর : শোন, গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি অলিগলি কোণা খামচিতে, এখনও যতটুকু ফাঁক ফুঁক রয়ে গেছে তার একটা প্রামাণিক নক্শা প্রস্তুত করেছি। বুঝো

নেবে চল—

ঈশ্বর বেরিয়ে যায়। মণ্ডলবী অসহায়ের ভাবে ছড়ির নিচের প্রান্তটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। ছড়িটি তার হাতে কোন এক অদৃশ্য ধ্বজার দণ্ডের মত দেখায়। আচ্ছন্নের মত সে বেরিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ কী মনে হতে থমকে দাঁড়ায়। তারপর পকেট থেকে বাঁশি বার করে ফুঁ দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায়। মানুষগুলি তাদের অসমাপ্ত হাসি নিয়ে আবার ফেটে পড়ে। একে অপরের সঙ্গে প্রায় তালগোল পাকিয়ে যায়। কথা বলে।

ভাঙা মানুষ ১ : তাইলে আমরা সুখী, কি বল স্যাঙাৎ ?

ভাঙা মানুষ ২ : সে আর বলতে ? নতুন হুঁজুর শালা ঘাড়ে ধরে সুখী করে নিল

ভাঙা মানুষ ৩ : হ্যাঁ—একেরে আদ্যপ্রান্ত সুখের রাংতা দিয়ে মোড়া

ভাঙা মানুষ ১ : যা বলেছ। স্যাঙাৎ, কাল ঠিক এমনধারা এট্টা স্বপন দেখেছি

ভাঙা মানুষ ২ : আম্মো

ভাঙা মানুষ ১ : তুই ?

ভাঙা মানুষ ২ : কেন ? স্বপ্নের বাজার তোর বাপ কিনে নেছে নাকি ? বসতে গেলে ট্যাকসো দেতে হয়—

ভাঙা মানুষ ১ : ধ্যেৎ—তা বলেছি নাকি ? শালা দিন দিন গাছপাঁঠা হয়ে যাচ্ছে—গা ভর্তি শুধু কাঁটা।

প্রথম ব্যক্তি মৃদু ধাক্কায় গড়িয়ে পড়ে যায়।

ভাঙা মানুষ ৩ : তুই-ই তো খোঁচালি। ভালামন্দ খাওয়ার অভ্যেস নাই, বদ-হজম হয়ে গেছে। স্বপন দেখবে না! আমি শালা সোমত্ত বয়সে—যাক্

ভাঙা মানুষ ১ : স্বপন দেখেছ !

ভাঙা মানুষ ২ : তুমিও !

ভাঙা মানুষ ৩ : তাছাড়া কি ? অবশ্য ঘুম ভেঙ্গে হঠাৎ এট্টা ভদ্রলোকের মতো খটকা লেগেছে

ভাঙা মানুষ ২ : লাগবে না। আমরা এখন আগাপাশতলায় ষোলো আনা ভদ্দরলোক

ভাঙা মানুষ ১ : থাম দিনি। কী খটকা স্যাঙাৎ ?

ভাঙা মানুষ ৩ : খটকা হলো আমরা যখন বেঘোরে ঘুমায়ে থাকি তখনই তো স্বপন দেখি ?

ভাঙা মানুষ ২ : কচু

ভাঙা মানুষ ১ : ধ্যেৎ

ভাঙা মানুষ ২ : মাইরি, আমার বৌটা ঘুমের কোনো তোয়াক্কা করত না—জেগে জেগে স্বপ্ন দেখত

ভাঙা মানুষ ৩ : ধুস-শালা, ঘনঘন বৌয়ের আখ্যানে ফিরে আসে—ম্যালেরিয়া জ্বর। ··· ঘুমায়ে পড়লে স্বপন দেখি কিনা ?

ভাঙা মানুষ ২ : তা তো দেখি
ভাঙা মানুষ ৩ : তাইলে জেগে উঠলে সে স্বপন কি করে মনে আসে ?
ভাঙা মানুষ ১ : কেন ?
ভাঙা মানুষ ১ ২ : ভেবে ভেবে
ভাঙা মানুষ ৩ : তাইলে ভাবনাটা ঘুমের মধ্যেও জেগে থাকে
ভাঙা মানুষ ১ : এ কেমন যুক্তি হলো ?
ভাঙা মানুষ ৩ : কেন জানি মনে হয় এই স্বপনটপন মোদেরই ভাবনার কথা—
ভাঙা মানুষ ১ : হুঁ তা—
ভাঙা মানুষ ১ ২ : হতে পারে
ভাঙা মানুষ ৩ : হতে পারে না রে—হয়। বর্তমান অতীত ভবিষ্যৎ সব শালা ভাবনার পথ ধরে মগজের মধ্যে ঢুকে পড়ে ঘুম কিম্বা জাগরণ ··· বাঞ্চোৎ ভাবনার হাত থেকে কিছুতে নিস্তার নাই
ভাঙা মানুষ ১ : কী বলছ
ভাঙা মানুষ ২ : কিছুই বুঝবার পারি না
ভাঙা মানুষ ৩ : আমিও না! মাঝে মধ্যে সবকিছু হাভাব্যাভা হয়ে যায়। ত্রিকাল ··· ত্রিভুবন ··· সব শালা ঘাড়ে এসে চেপে বসে।
ভাঙা মানুষ ১ ২ : স্প্যাঙাৎ!
ভাঙা মানুষ ৩ : তোদের কিছু মনে হয় না, না ?
ভাঙা মানুষ ১ : না। ও সব ভাবনার কথা মগজে আসে না
ভাঙা মানুষ ২ : কেন ভাববো! আমরা তো সুখী!
ভাঙা মানুষ ৩ : সুখী—হ্যাঁ। আমারও তাই মনে হয়। মাঝে-মধ্যে জীবনের বুকে চেপে—শ্বাসরোধ করে দেখাবার সাধ জাগে, 'দেখে যা কেমন কৌশলে আমি সুখী হয়ে গেছি—'
ভাঙা মানুষ ১ : তবে ?
ভাঙা মানুষ : ২ মিছামিছি উল্টাপাল্টা ভাবো কেন ?
ভাঙা মানুষ ৩ : [হঠাৎ কিসের আক্রোশে ফেটে পড়ে] কে ভাবে! কোন শালা খাল কেটে ডাঙালো কুমীর ডেকে আনে! ধুকপুক ধুকপুক শব্দে নিজে নিজে আসে। কাল ছেলেটা যেমন হঠাৎ ঘুমের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল ওই ভাবনার পথ ধরে। আমারে চিনবার পারে নাই। প্রথমে দেখে ভয় পেলো। চিৎকার পারলেম—ছেলে কাছে এলো। বললে, ও, বাপ তুমি এত সুখী হয়ে গেছ সত্যিই চিনবার পারি নাই
ভাঙা মানুষ ১ : মিছা কথা!
ভাঙা মানুষ ২ : ভাবনা জাগাতে চাও
ভাঙা মানুষ ৩ : [কেমন অসহায় হয়ে পড়ে] না! মিছামিছি ভুল বুঝলে

সন্দেহের দাস হয়ে যাবি। আমিও তোদের মত ··· সুখের খাঁচায় ঝিম মেরে বসে থাকতে চাই। বিশ্বাস যা, আমিও ভাববার চাই না।

ভাঙা মানুষ ১: হুঁ! ভাববার চাই না, না চাইলেও শালা যেন ছেড়ে কথা বলে!

ভাঙা মানুষ ২: হঠাৎ ভিতর থিক্যে এত জোরে টান দেয়

ভাঙা মানুষ ৩: [সোল্লাসে] হাই! তবে? তবে যে বলছিলি কিছুতেই ভাবনা আসে না?

ভাঙা মানুষ ১: ওটা রোগ

ভাঙা মানুষ ২: সুখী মানুষের ব্যাধি

ভাঙা মানুষ ৩: ব্যাধি? তাইলে নিশ্চিত বিরাম আছে?

ভাঙা মানুষ ১: আছে না! হাসো

ভাঙা মানুষ ২: খেলো।

ভাঙা মানুষ ১ ২: গান গাও

ভাঙা মানুষ ৩: ভুল! ভুল। কত তো হাসলেম—কণ্ঠনালী চিরে ফেলে' কত তো গাইলেম—বিরাম আসে না।

ভাঙা মানুষ ১: হোঃ হোঃ হোঃ—স্যাঙাৎ শালা মাল খেয়ে যাত্রাভিনয় শুরু করে দেছে

ভাঙা মানুষ ২: থাম দিনি! হেসে দিলে সব কিছু শেষ হয়ে যায়! শালার ষড়যন্ত্র বুঝে গেছি। আবার জ্বালার মইধ্যে ঠেল্যে দে,—স্যাঙাৎ, তুমি শালা একা একা সুখী হতে চাও? তুকতাক শুরু করে দেছো

ভাঙা মানুষ ১ ২: যাদুবিদ্যা!

ভাঙা মানুষ ৩: হ্যাঁ যাদুবিদ্যা! জীবনের যাদু হঠাৎ হঠাৎ ছোঁওয়া দিয়ে 'কোথায় পালায়ে যায় ধরবার পারি না। যাবার আগে ছেলেটার মুখে চোখে যে যাদু লেগেছিল

ভাঙা মানুষ ১ ২: চুপ যাও!

ভাঙা মানুষ ৩: এর চেয়ে শতগুণ চিৎকার পারতেও ছেলেটা তো থামে নাই। দু হাত ভর্তি শুকনা কাঠি দ্যে বলেছিল, বাপ আগুন দেও ··· আগুন ··· তুমি মরি গ্যেলে যে আগুনে তোমার মুখাগ্নি হবে ··· আমি পালায়ে বেঁচেছি ··· কোথে দেবো—সুখের বন্যায় সমস্ত আগুন নিভে গেছে

বিশ্রী গোঙা'নতে ভেঙে পড়ে।

ভাঙা মানুষ ১ ২: না!

১, ২ চিৎকার করে ওঠে। নেপথ্যে মক্তলবী সাহেবের গলা শোনা যায়। কথা বলতে বলতে ঢোকে। কণ্ঠস্বরে নিদ্রাজড়িত আলস্য।

মক্তলবী: অ্যাই! অ্যাই—চিৎকার থামাবি ··· শালা আঁটকুড়ের বাচ্চারা

ময়াল সাপের মত খেয়ে খেয়ে চিৎকার পারে, যেন হাড়ে হদ্দে খিল লেগে যায়। চিৎকার থামাবি ?

ভাঙা মানুষ ১ : না – চিৎকার পারে না হুঁজুর, কাঁদে।

মতলবী : কাঁদে ? কেন কাঁদে কেন ? কোন দুঃখে ?

ভাঙা মানুষ ২ : না হুঁজুর দুঃখে নয়। ও-ই [কারণ খুঁজে না পেয়ে] – কাঁদে।

মতলবী : ধেত্তেরি হারামজাদা, কাঁদে তো বুঝলাম – কি কারণে ?

ভাঙা মানুষ ১ : [মদের ভাঁড় দেখিয়ে] এই কারণে

ভাঙা মানুষ ২ : [অনুরূপ ভঙ্গীতে] কারণ বারির চোটে

মতলবী : চোপ্ শালা জাঁহাবাজ। বলি, দুঃখটা কিসের ?

ভাঙা মানুষ ৩ : দুঃখে নয় – সুখে হুজুর, সুখে। সুখে কাঁদি।

মতলবী : অ – সুখে ! অ্যাঁ ? শালার বাচ্চারা দুঃখেও কাঁদে সুখেও কাঁদে ? হুঁঃ ! নার্ভাস ব্রেকডাউন। দেখি, চোখ দেখি –

১ এর কাছে গিয়ে চোখের নিচের পাতা টেনে দেখতে গিয়ে হঠাৎ বিপজ্জনক কিছু দেখে দারুণ চমকে ঠেলে দেন। ১ ২ এর গায়ে গড়িয়ে পড়ে।

জিভ দেখি – জিভ [১ এবং ২ একসাথে জিভ দেখায়] অ্যাই শুয়ার ! ভ্যাজ-চাচ্ছিস বলে মনে হয় !

ভাঙা মানুষ ৩ : না হুঁজুর, সুখী জিভ কিনা তাই –

মতলবী : [একটু বেসামাল দেখায়] ও, ঠিক আছে। [পরিবেশ বদলাতে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়ে।] নে নে, তাড়াতাড়ি সাজগোজ সেরে ফেল। আজ আবার কৃষ্ণপক্ষের ষষ্ঠী না সপ্তমী। অধিক রাতে চাঁদ উঠে যাবে। লোকের নজরে পড়বি। মিছামিছি লাশ ফেলতে যাবি কেন ? এ্যাই, এ্যাই – দড়ির মইটা আবার ফেলে যাচ্ছে – নে নে তাড়াতাড়ি তোল। অনেকটা এলাকা সারতে হবে। [মানুষগুলি শিথিল ভঙ্গীতে বেরিয়ে যাবার জোগাড় করে] বা – বাবাবা বাঃ !

ভাঙা মানুষ ২ : কী হুঁজুর।

মতলবী : [বুক পকেট থেকে ভাঁজ করা নক্‌শাটা বার করে] আসল জিনিসটাই ফেলে যাচ্ছে – নক্‌শাটা নিবি নে ?

ভাঙা মানুষ ৩ : [বিরক্তির সঙ্গে মতলবীর হাত থেকে নক্‌শাটা প্রায় ছিনিয়ে নেয়] ভুল হয়ে গ্যাছে

মতলবী : [ব্যঙ্গের সুরে] ভুল ! ভুল হয়ে গেছে ?

ভাঙা মানুষ ৩ : [ঝোঁকের সঙ্গে] কেন আমাদের ভুল হতে নাই ?

মতলবী : ঠিক আছে, ঠিক আছে, নে এবার

মানুষগুলি বেরিয়ে যায়। তাদের উদ্দেশে।

যাত্রা শুরু কর – দুগ্গা দুগ্গা দুগ্গা [চেঁচিয়ে জানান দিতে থাকে] শোন, –

এট্টা শুভ সংবাদ ছেল। সংবাদ হলো হুঁজুর প্রসন্ন হয়ে ত্তোদের অক্ষর তিনটে নাম দিয়েছেন—ছল বল এবং কৌশল। যাঃ যাঃ যাঃ— ! হুঁজুর—

মঞ্চ ক্রমশঃ অন্ধকার হয়ে শুধু মতলবীকেই আলোয় ধরেছিল। মতলবী যাঃ যাঃ বলতে বলতে ক্রমশঃ পিছু হটে অন্ধকারে চলে আসতে থাকে। মুহূর্তের জন্ম মঞ্চ সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়। তারপর হুঁজুর ডাকের সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ আলোয় মতলবী আর ঈশ্বর মুখোমুখী।

মতলবী : হুঁজুর ! তখনই বললাম ভাঁটিতে মুশকিল আছে—আছাড়ি পিছাড়ি প্রয়োজন

ঈশ্বর : কেন ? কল বিগড়েছে !

মতলবী : সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। কথার বার্তার ছিরিছাঁদ দেখে প্রথমেই খটকা লেগেছিল। তারপর চোখ জিভ দেখে আক্কেল গুড়ুম

ঈশ্বর : ঢং ঢাং বদলে যাচ্ছে !

মতলবী : না, বদলে গেছে। শালার বাচ্চাদের চোখেমুখে উড়ুউড়ু ভাব। তারাগুলি কি রকম জলজল করে। জিভের ধার যেন শতগুণ বেড়ে গেছে।

ঈশ্বর : কাজে কর্মে ভুল হয়ে যায় !

মতলবী : হাঁা হুজুর।

ঈশ্বর : কথায় বার্তায় এট্টু আধটু বিদ্রূপের ঝাঁঝ !

মতলবী : হুঁজুর কি অন্তর্যামী ?

ঈশ্বর : না, এ রকমই হয়। তাই এ রকমই হতে যাচ্ছে—

মতলবী : তখনই বললাম, একটু আধটু চাপের প্রয়োজন

ঈশ্বর : মতলবী, চাপের যদি প্রয়োজন হয় একেরে শেষমেষ ··· একটা সময় ছিল ক্রীতদাস ক্রীতদাসীদের চাবুকের গড়ন ছিল বিচিত্র, অদ্ভুত। পাঁচ ছয় নয়-মুখ। আবার প্রত্যেকমুখে ছোট ছোট লোহা বাঁধা। সে সব চাবুক এখন যাদুঘরে স্থান পায়। যুগের সাথে সাথে চাপের কৌশল সম্পূর্ণ বদলেছে।

মতলবী : মানলেম। কিন্তু হুঁজুর, মনিব বদলাবার আগে আমার গুঁতোয় হারামীর বাচ্চারা ছিল ভালো। তখন শালাদের চোখমুখে সারাক্ষণ জ্বালা ছিল ··· কিন্তু ধমকালেই ফুস করে নিভে যেত

ঈশ্বর : আর অখন ?

মতলবী : এমনিতে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব, কিন্তু ধমকে দিলেই দপ্ করে জলে ওঠে

ঈশ্বর : জলুক ! কত জলবে ? সুখে রাখো, কিন্তু সর্বদা বিচ্ছিন্ন করে। একের জ্বালা যেন কিছুতেই অন্তকে জাগায়ে না তোলে

মতলবী : সে কি করে সম্ভব হুঁজুর !

ঈশ্বর : যেমন করেই হোক।··· জোট বাঁধলে পরে মুহূর্তে বাইরের ত্রাস ঘর পর্যন্ত এসে যাবে .

মতলবী : জানি। কিন্তু হুজুর কেন জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন সরাসরি চিনায়ে দিলেন ?

ঈশ্বর : পাগল ! কে কারে চিনায়ে দেয় ! মানুষের বিকিকিনি করে খাচ্ছ, চরিত্র বোঝ না ! বাচ্চাকালে কে তোমার মা, কোথায় তোমার খাদ্যের আধার কে তোমাকে চিনায়ে দিছিল ? হাঙ্গার এণ্ড লিবিডো খাদ্য ও যৌনতা সময় হলে মানুষের ঝুঁটি নেড়ে জানান দে যায়—কী তার প্রাথমিক প্রয়োজন কাউকে চিনায়ে দিতে হয় না। নিরাপত্তা আত্মোন্নতি ·· চাহিদার পর চাহিদা—একের পর এক চাগায়ে ওঠে। মেটে না। সমাজটা এমন কৌশলে গড়া, স্বাভাবিক নিয়মে কিছুতেই পূর্ণতা আসে না। চাপা, ঘা খাওয়া ইচ্ছাগুলি ইদিক সিদিক ছোটে, পথ খোঁজে, ইচ্ছাপূরণের পথ। এ এ বড় বীভৎস খোঁজাখুঁজি মতলবী সাহেব ! বেসামাল হয়েছ কি সমাজটা ভেঙেচুড়ে বিলকুল বদলায়ে ফেলতি চায়, জোটে বাঁধে—তাই বিচ্ছিন্নতা দাও —গায়ে গায়ে লেপটে থাকবে—অথচ ভিতরে যোজন যোজন ফাঁক ··· ফ্যাণ্টাসি দেও ··· ফ্যাণ্টাসি দিবাস্বপ্ন !

কথার মাঝে মতলবী ও ঈশ্বর ব্যাপারীর যে অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটছিল সে সূত্রেই ঈশ্বরের শেষ সংলাপের অংশে দেখা যায় তার হাতে এক ঝলমলে সাদা পোষাক যা সে বস্ত্রাবৃত দ্বিতীয় ডেকটির পেছনদিক থেকে ঘুরে আসবার সময় বার করে এনেছে। কথার শেষে পোষাকটি সে মতলবীর দিকে ছুঁড়ে দেয়। মঞ্চ মুহূর্তের জন্য অন্ধকার হয়ে যায়। যুদ্ধজেটের মত এক বিউগিলের আর্তনাদ অন্ধকার মঞ্চকে সচকিত করে দেয়। সেই শব্দ অস্পষ্ট হলে মৃদু ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসে। মঞ্চের অদ্ভুত আলো আঁধারি পরিবেশের মধ্যে দেখা যায় দ্বিতীয় ডেকে সাদা ঝলমলে পোষাক পরিহিত দেবদূত। নিচে মঞ্চতলে এক কোণায় মানুষ তিনটি তালগোল পাকিয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে আছে। ঘুমের ঘোরে মশা মারছে। তার মধ্যে ১ আড়মোড়া ভেঙে ওঠে—ওপরে তাকাতেই দেবদূতকে দেখে ভীষণ চমকে বাকি দুজনকে জড়িয়ে ধরে।

ভাঙা মানুষ ১ : স্থ্যাঙাৎ

ভাঙা মানুষ ২ ৩ : কে ?

দেবদূত : আমাকে চিনবে না। বহুযুগ আগে তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থ্যেকে মানুষের থাকা না থাকার তিনসত্য শিখে গিয়েছিলাম।

ভাঙা মানুষ ৩ : কে বলে চিনব না ?

ভাঙা মানুষ ১ : তুমি সেই শাপভ্রষ্ট দেবদূত।

দেবদূত : চমৎকার ! জানো দেখছি।

ভাঙা মানুষ ১ : জানি।

ভাঙা মানুষ ৩ : আবার ফিরে এসেছেন কেন ?

ভাঙা মানুষ ২ : শিক্ষা তো সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।

দেবদূত : পাগল ! শিক্ষার কখনও শেষ আছে !

ভাঙা মানুষ ৩ : আছে

ভাঙা মানুষ ১ : মানুষের ক্ষুধা আছে

ভাঙা মানুষ ২ : খাদ্য নাই

ভাঙা মানুষ ৩ : মানুষ সুখের মূল্যে হুঁজুরের দাস হয়ে বাঁচে !

দেবদূত : অবশ্যই কিন্তু সে তো অস্পষ্ট অতীতের কথা

ভাঙা মানুষ ১ : হতে পারে

ভাঙা মানুষ ২ : কিন্তু এর বেশি আমরা তো কিছুই জানি না

ভাঙা মানুষ ১ : জানবার প্রয়োজন নাই।

দেবদূত : আছে ! আছে আছে। যুগের সাথে সাথে মানুষের চাওয়া না চাওয়ার ঢং-ঢাং সমস্তই বদলে গেছে। মরা বাঁচার রহস্য, দেশপ্রেম, প্রভুভক্তি, ঈশ্বরের সাধনা ইত্যাদি বিষয়ে সনাতন সওয়ালের নতুন জবাব উঠে আসে !

ভাঙা মানুষ ৩ : আমরা তো সমবেত জবাব দিয়েছি

দেবদূত : সমবেত সওয়াল জবাব—সে তো আদিম মানুষের কথা। ভুলে যাচ্ছ কেন ? তোমরা এখন সুসভ্য দেশের নাগরিক। সভ্যতার যাদুস্পর্শে প্রত্যেকেই বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। পৃথক মানুষ—পৃথক জবাব।

ভাঙা মানুষ ১ : পৃথক জবাব চাও !

ভাঙা মানুষ ২ : সনাতন সওয়ালের !

ভাঙা মানুষ ৩ : কেন ?

দেবদূত : কেন নয় ? ঈশ্বরের আশীর্বাদে এখন তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম, ছল বল এবং কৌশল প্রত্যেকেই বিচ্ছিন্ন ক্ষমতার অধিকারী।

ঈশ্বরের ছড়িটি এখন যাদুদণ্ডের মত কাজ করে। পর্যায়ক্রমে ১ ২ এবং ৩ কে নির্দিষ্ট করে কথা বলে চলে।

তোমার বল আছে অথচ কৌশল আয়ত্বে নেই, মারণাস্ত্রের সমস্ত কৌশল তুমি জানো কিন্তু বুদ্ধিহীন। ছলনা জানো না। তুমি কূট ছলনায় পটু অথচ কৌশল আর বল সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে তোমাকে ছাপিয়ে আছে…

ভাঙা মানুষ ৩ : এসব কথা কি করে জানলেন ?

দেবদূত : কেন জানবো না। সংসারে যা কিছু ঘটছে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী, সবকিছু ইতিপূর্বে ঘটে আছে। তোমরা সামান্য নট, যথাযথ অভিনয় করো

ভাঙা মানুষ ১ : তার মানে আমাদের কথা

ভাঙা মানুষ ১ ২ : কাজ

ভাঙা মানুষ ১ ২ ৩ : সমস্ত নির্দিষ্ট হয়ে আছে

দেবদূত : হ্যাঁ এমন কি ইচ্ছাও

ভাঙা মানুষ ৩ : না !

দেবদূত : অস্বীকার করে লাভ নেই। নির্বিচারে যে যার ধর্ম মেনে নাও। যেমন জল নির্বিকার বয়ে যায় কেন না সেটাই তার কাজ। মাটি মুখ বুঁজে সবকিছু সহ্য করে, অন্যথায় দারুণ প্রলয়। যেমন তোমাদের নির্দিষ্ট কাজে যোজন যোজন ফাঁক, তেমনি ভাবনায়, পৃথক ভাবনা পৃথক পৃথক খোঁজা-খুঁজি। ভাবো — যে যার জবাব ভেবে রাখো, সময় হলে তোমাদের কাছ থেকে জীবনের পাঠ নিয়ে যাবো — ভাবো —

দেবদূত অদৃশ্য হয়। তার সংলাপের শেষ অংশটি যেন দৈববাণীর মত আবার নেপথ্য থেকে ভেসে আসে। এবং অবশেষে ভাবো কথাটি পাক খেতে খেতে ক্রমশঃ অপস্রিয়মাণ রথের চাকার মত এক যান্ত্রিক আওয়াজ তুলে মিলিয়ে যায়। এ যেন মানুষগুলির মনে দেবদূতের শেষ কথাগুলির প্রতিক্রিয়া। আচ্ছন্নের মত ১ এবং ২ দেবদূতের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া পথের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে।

ভাঙা মানুষ ৩ : চলে গেছে

ভাঙা মানুষ ১ : হ্যাঁ

ভাঙা মানুষ ৩ : না যায় নাই। কাছাকাছি নিশ্চয় কোথাও লুকায়ে রয়েছে

ভাঙা মানুষ ১ : ধুস্ — আমি শালা পেত্যক্ষ দেখেছি

ভাঙা মানুষ ২ : চলে যাওয়ার আওয়াজ আম্যও পেতক্ষ শুনেছি।

ভাঙা মানুষ ৩ : চোখ কান ঠিক আছে তো রে ?

ভাঙা মানুষ ১ : তার মানে ? সর্বক্ষণ সন্দ করে করে তোমারই শালা চোখ-কান বিগড়ে গেছে

ভাঙা মানুষ ৩ : না — এই তো প্রথম তোরা নিজ চক্ষে দেবদূত দেখলি

ভাঙা মানুষ ১ : শুনেছিস — ? কথা শুনলে মনে হয় শুধু চম্মচক্ষে আমরাই দেখেছি

ভাঙা মানুষ ২ আর ন্যাঙাৎ শালা সকালে বিকালে সগ্গে গিয়ে জলক্রীড়া করে

ভাঙা মানুষ ১ দেবাদেবীদের সঙ্গে ?

ভাঙা মানুষ ২ না রে, অপ্সরী। স্বর্গের মেয়েছেলে

দুজনে হাসে।

ভাঙা মানুষ ১ : স্বর্গে মর্তে গতায়াত আছে ··· তার মানে শাপভ্রষ্ট দেবদূত ?

ভাঙা মানুষ ৩ : হতে পারে

ভাঙা মানুষ ১ ২ : অ্যাই

ভাঙা মানুষ ২ : হতে পারে ?

ভাঙা মানুষ ৩ : হ্যাঁ হতে পারে। পোষাক বাচনভঙ্গী ছাড়া কোথাও তফাৎ আছে বল ? আমিই সেই শাপভ্রষ্ট দেবদূত ! তোদের কাছে জীবনের নতুন পাঠ শিখবার এসেছি।

ভাঙা মানুষ ২ : ইস্—স্তাঙাৎ বাড়াবাড়ি শুরু করে স্তেছ

ভাঙা মানুষ ১ : ইদিকে শালা হৈ হৈ করে সময়ও তো চলে যাছে

ভাঙা মানুষ ২ : হুট করে দেবদূত এসে যেতে পারে

ভাঙা মানুষ ১ : তখন কি জবাব দেবা ?

ভাঙা মানুষ ৩ : জবাব ? কে চায় জবাব ? ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী জবাব তৈয়ার আছে। সময় হলে দেবদূত ঘাড়ে ধরে বলায়ে ন্যে যাবে। খোঁজাখুঁজি করে কোন লাভ নাই

ভাঙা মানুষ ২ বুজেছি—তুমি শালা একেরে বিগড়ে গেছ। আমাদের খোঁজতে হবে।

২ গুছিয়ে বসে। ১ উঠে গিয়ে ভাবে, আর একটু মদ ঢেলে আনতে যায়।

ভাঙা মানুষ ১ প্রশ্নগুলা ভুলে যাস নাই ?

ভাঙা মানুষ ২ না মনে আছে। মানুষের কি আছে ?

ভাঙা মানুষ ১ পেট আছে

ভাঙা মানুষ ২ ধ্যেৎ! ও তো জীবন ধারণের কথা।

ভাঙা মানুষ ১ তবে ?

ভাঙা মানুষ ২ প্রশ্নগুলো ঠিকই আছে। শুধু পৃথক জবাব চাই।

ভাঙা মানুষ ১ পৃথক জবাব, কোথে পাব ?

ভাঙা মানুষ ১ অ্যাঃ সে জন্যই তো খোঁজাখুঁজি। খোঁজ ··· মানুষের কী আছে ? কী আছে ?

ভাঙা মানুষ ১ : [মশার কামড়ে উত্যক্ত হয়ে] আঃ—চুলকানি আছে, যাঃ !

ভাঙা মানুষ ৩ : আঁই—কী আছে বললে ?

৩ হঠাৎ ১-এর হাত চেপে ধরে। ভাঁড়ের মদ টলমল করে।

ভাঙা মানুষ ১ : অ্যাই অ্যাই হাত ছাড়ো—মাল ছল্‌কে যায়

ভাঙা মানুষ ৩ : মাল ছল্‌কে যায়—অ্যাঁ ? হ্যাঃ হ্যাঃ চলতে ফিরতে নানান ধাক্কায় যখন প্রাণ ছল্‌কে পড়ে যায় ··· তখন তো হাত ছাড়ায়ে নিস না ?

ভাঙা মানুষ ১ কি বইলছ ?

ভাঙা মানুষ ৩ কি বলছি বোঝবার চেষ্টা কর ! কি আছে বললি ?

ভাঙা মানুষ ১ [অসহায়] চুলকানি আছে

ভাঙা মানুষ ৩ হ্যাঁ, এমন চুলকানি শয়নে-স্বপনে সর্বদা চুটমুট করে—কুরে-কুরে খায়

ভাঙা মানুষ ২ শালা লটপট বকছে ···

ভাঙা মানুষ ১ তখনই বললাম—একটু করে খাও

ভাঙা মানুষ ৩ [ছটফট করে বেড়ায়] না ! খুলে যাচ্ছে ··· পচা জট খুলে যাচ্ছে—চাপ এইলে পরে জন্মস্থান যেইভাবে খুলে যায়

ভাঙা মানুষ ১ ২ : আঃ!

ভাঙা মানুষ ১ : শালার বায়ু চড়ে গেছে

ভাঙা মানুষ ৩ : [২-র হাত চেপে] ঠিকঠাক জবাব দে দিনি, মানুষের কি নাই?

ভাঙা মানুষ ২ : ধেত্তেরি—এ তো আচ্ছা জ্বালা শুরু করে দ্যেল [জোর করে ৩-এর মুঠি শিথিল করে হাত ছাড়িয়ে নিতে নিতে] মশার কামড় থিকে কিছুতে নিস্তার নেই—শালা!

ভাঙা মানুষ ৩ : [সোল্লাসে] ঠিক! ঠিক বলেছিস। উঠে আসছে—সঠিক জবাব উঠে আসছে—মশার কামড় থিকে কিছুতে নিস্তার নাই! তাইলে—তাইলে মানুষ বাঁচে কিসে?

ভাঙা মানুষ ১ : চইড়েছে ভাল

১ এবং ২ চোখের ইশারায় ষড়্ করে। তারপর দুজনে একটি মশার ওড়াউড়িকে অনুসরণ করে প্রচণ্ড চপেটাঘাতে।

ভাঙা মানুষ ১ ২ : মশা মেরে

ভাঙা মানুষ ৩ : হ্যাঁ, পেয়ে গেছি। সনাতন প্রশ্নের নতুন জবাব পেয়ে গেছি!

ভাঙা মানুষ ১ ২ : স্পাডাৎ!

ভাঙা মানুষ ৩ : [হঠাৎ ঘনিষ্ঠ হয়ে] আচ্ছা, আচ্ছা এই জায়গায় ভয়ঙ্কর মশার উৎপাত, তাই না?

ভাঙা মানুষ ১ : হ্যাঁ। শান্তিতে তিষ্ঠোতে দেয় না

ভাঙা মানুষ ২ : হুঁজুরকে বলে জায়গাটা বদলে নিতে হবে

ভাঙা মানুষ ৩ : কেন? ছেড়ে যাবি কেন? যেখানে থাকব সে জায়গাটারে বসবাস যোগ্য করে তোলা নয় কেন?

ভাঙা মানুষ ১ মশা মেরে?

ভাঙা মানুষ ৩ হ্যাঁ—মশা মেরে! এখনও সময় আছে—নইলে বিষাক্ত কামড়ে দুই পায়ে আজন্মের গোদ হয়ে যাবে। স্বচ্ছন্দ চলার কোনো উপায় থাকবে না

ভাঙা মানুষ ২ ধ্যেৎ! মাঝে মধ্যে কী যে বল—হেঁয়ালীর মত মনে হয়

ভাঙা মানুষ ১ স্পাডাৎ—যা কিছু বলবার আছে—ঝেড়ে কাশো দেখি।

ভাঙা মানুষ ৩ বলবার কিছুই নাই—সময় যদি কিছু থাকে তো করবার—

ভাঙা মানুষ ১ সময়ও তো চলে যাচ্ছে

ভাঙা মানুষ ৩ তবে চলে আয় কাজে নামা যাক

ভাঙা মানুষ ২ থামো! কী কাজ? কী কইরবার আছে আমাদের?

ভাঙা মানুষ ৩ জানি না—কী কাজ শালা প্রাণের তাগিদই বলি দেবে। মাথাটা জলের মধ্যে খুব জোরে ঠেসে ধরলে সবটা যখন হাঁকপাক হাঁকপাক করে ওঠে, বাঁচার তাগিদই বলে দেয় ঠেলে ওঠাটাই তার কাজ

ভাঙা মানুষ ২ মিছা কথা। জিবের ডগায়ে যেন খই ফুটছে

ভাঙা মানুষ ১ [ভেঙে পড়ে] স্যাঙাৎ, এ সব কথা এতদিন বল নাই কেন ?

ভাঙা মানুষ ২ ভুল পথে নে যেতে চায়

ভাঙা মানুষ ৩ না

ভাঙা মানুষ ১ সারাটা জীবন ধরে অনেক ঠকেছি সন্দে অবিশ্বাসে এত নীচ হয়ে গেছি

ভাঙা মানুষ ২ খাড়া হ ! ভেঙে যাস কেন ? সুখে থাকতে ভূতের উৎপাত ! ··· আমরা সুখী ···

১ প্রায় টেনে নিয়ে পালাতে চায়।

ভাঙা মানুষ ৩ : হ্যাঁ ··· সুখী ! তর দুই পায়ে বেড়ি বান্ধা সুখ — পিছনে শিকল আছে, নজরে আসে না

ভাঙা মানুষ ২ : চুপ যাও

ভাঙা মানুষ ৩ : মাগে মদে ডুবায়ে রেখেছে — অথচ ভিতরে সমস্ত রক্ত চুষে চুষে খায় — বুঝবার পারো না ! শুধুই চপেটাঘাতে কোন্ মশা মার ? গাধা ! ·

ভাঙা মানুষ ২ । ও-শ্ শালা, খুন করব তোকে।

ভাঙা মানুষ ৩ : কর ! যে অবিশ্বাসে আমারে মাইরবার চাস, সেই অবিশ্বাসে পিছনে নজর মেল ! যে আক্রোশে আমার টুঁটি ছিঁড়ে ফেলতি চাস, সে আক্রোশে সমস্ত শিকল শুদ্ধু টান দে — মূল থিকে ছিঁড়ে আসবে।

ভাঙা মানুষ ২ : যদি তা না আসে ?

ভাঙা মানুষ ৩ : তাইলে মরণ

ভাঙা মানুষ ১ : আর যদি আসে — তাইলে জীবন ?

ভাঙা মানুষ ৩ : হ্যা — হয় বাঁচো — নয় মর — মাঝখানে কোন পথ নাই !

নেপথ্যে মতলবীর পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা যায়। দেবদূতের ঝলমলে পোষাকেই ডাকতে ডাকতে মঞ্চে প্রবেশ করে হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে নিজেকে সামলায়।

মতলবী : এ্যাই ··· এ্যাই [দেবদূতের বাচনভঙ্গীতে] এই, কি বলছ তোমরা —

ভাঙা মানুষ ১ ২ : শাপভ্রষ্ট দেবদূত ?

ভাঙা মানুষ : হ্যাঁ শাপভ্রষ্ট দেবদূত ··· সারি সারি দুর্দান্ত মশক। যাদের মারবার জন্য দুর্জয় কামান লাগে

মতলবী : [ক্ষিপ্ত মতলবীর অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ ঘটে] এই শালা, শুয়োরের বাচ্চারা — মরবার পাখা উঠেছে তোদের ?

ভাঙা মানুষ ১ ২ : একি !

ভাঙা মানুষ ১ : হুঁজুরের কণ্ঠস্বর বলে মনে হয়

ভাঙা মানুষ : হ্যাঁ, হুঁজুরের কণ্ঠস্বর

মানুষগুলি ঘনিষ্ঠ হয়ে ক্রমশঃ মতলবীর কাছে আসে। মতলবী দিশেহারা হয়ে পড়ে

মতলবী : এ্যাই এ্যাই···ভ্রেৎ ভ্রেৎ ··হুঁ—জু—র

মুহূর্তে অদৃশ্য হয়—য মুখগুলি মঞ্চতল থেকে প্রথম এবং দ্বিতীয় ডেক ছুটে আসে।

ভাঙা মানুষ ৩ : দেবদূত কোথায় পালাও—শুনে যাও

ভাঙা মানুষ ২ : মানুষের কাছ থিকে জীবনের নতুন পাঠ শিখে যাও

ভাঙা মানুষ ১ : মানুষের প্রাণ আছে

ভাঙা মানুষ ২ : প্রাণেরে যথেচ্ছ মূল্যে বিকোবার অধিকার নাই

ভাঙা মানুষ ৩ : মানুষ বাঁচে বাঁচা বাড়ার সংগ্রামে !

কিসের শক্তিতে মানুষগুলি একত্রে ঋজু হয়ে দাঁড়ায়। দূরে কোথাও আবার বজ্রপাত হয়। অপসৃয়মান সেই শব্দকে ছাপিয়ে সাইরেনের তীব্র শব্দ ওঠে। আলো বদলে মানুষগুলির মুখের রেখা ক্রমশঃ অস্পষ্ট করে পশ্চাৎপটে অসংখ্য ইস্পাত কঠিন ছায়ার জন্ম দেয়। নেপথ্যে 'ফায়ার'—এই ভীষণ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তিনটি গুলির শব্দে মানুষগুলির মাথা নুয়ে পড়ে। ঘড়ির টিকটিক শব্দে তাদের শরীর একটু একটু করে ভেঙে পড়তে থাকে। চূড়ান্ত পর্যায়ে ভেঙে পড়ার আগেই—দামামা ও তার-সানাইয়ের অন্তুত এক সঙ্গীতে তারা ক্রমশঃ ঋজু হতে হতে আবার সেই ইস্পাত কঠিন রূপ নেয়। পুনরায় ফায়ার—ফায়ার ভীষণ ঘোষণা···। অসংখ্য গুলির শব্দ। ঘড়ির শব্দে ভেঙে পড়া। অন্তুত সঙ্গীত। সেই সঙ্গীতের সঙ্গে এবারে মানুষগুলি দৃপ্ত ভঙ্গীতে ফিরে আসার পরও দামামা ও তার-সানাইয়ের সঙ্গীত থামে না। তাকে ছাপিয়ে উঠতে চায় মেশিনগানের ঝাঁক ঝাঁক গুলির শব্দ। পর্দা পড়ার পরও এই দুই বিরোধী শব্দ জেগে থাকে।

নাটক : প্রস্তুতি

নাট্যকার : নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত। জন্ম : ৩১শে অক্টোবর ১৯৪৭ ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া গ্রামে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। ছাত্রজীবনে পি. এস ইউ-র সঙ্গে যুক্ত হন একদা। মর্জিমাফিক না হওয়ায় সরকারী চাকরি পেয়েও ছেড়ে দেন। উত্তরকালে থিয়েটার নিয়েই হোলটাইমার বলা যায়। নক্ষত্র গোষ্ঠীতেই নাট্যচর্চার শুরু। ১৯৭১-এ ফ্রিড্‌রিশ ড্যুরেনমাট-এর—দ্য ডেড্‌লি গেম অবলম্বনে খনন কাহিনী রচনা ও নক্ষত্র থেকে বেরিয়ে থিয়েটার কমিউনের প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে পর পর যে সব প্রযোজনার দায়িত্বে ছিলেন, সেগুলি হলো বিভুর বাঘ (রচনা নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, ১৯৭২), পরবর্তী বিমান আক্রমণ (রচনা নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত ও তরুণ ঘটক, ১৯৭৩), স্বদেশী নকশা (রচনা মোহিত চট্টোপাধ্যায়, ১৯৪৭), কিং কিং (রচনা নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, ১৯৭৫), দানসাগর (রচনা দেবাশিস মজুমদার, ১৯৭৬) এবং সাম্প্রতিক রচনা ও প্রযোজনা : প্রস্তুতি (১৯৭৮)।

রচনাকাল : ১৯৭৭

চরিত্রলিপি : কালী। সন্তু। নিরাপদ। সাদাত। মা। ভিখিরী। হারু। দিনেশ। হাসিনা। জ্যাকসন। পক্কা। অমিয়। বুবু।

প্রথম অভিনয় : ১৭ই জুলাই একাডেমি সন্ধে ৭টা।

প্রযোজনা : থিয়েটার কমিউন। অভিনয়শিল্পী : কালী : সুজিত মুখোপাধ্যায়। সন্তু : বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। নিরাপদ : নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত। সাদাত : অনুপম কানুনগো। মা : মণিদীপা রায়। ভিখিরী : দেবরঞ্জন সেনগুপ্ত। হারু : সুবীর গোস্বামী। দিনেশ : তপন সেনগুপ্ত। হাসিনা : সরস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায়। জ্যাকসন : সুব্রত ভট্টাচার্য। পক্কা : নির্মলেন্দু ঘটক। অমিয় : মানস মজুমদার। বুবু : মলয় সেনগুপ্ত। সঙ্গীত আলোক পরিকল্পনা রচনা পরিচালনা : নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত। মঞ্চ সহকারী-পরিচালনা : তপন সেনগুপ্ত। আলোক নিঃন্ত্রণ : পঙ্কজ ধর। শব্দ গ্রহণ : হিমাদ্রি ভট্টাচার্য। ধ্বনি প্রক্ষেপণ : শ্রীপতি দাস। রূপসজ্জা : মণিদীপা রায় / নির্মলেন্দু ঘটক / মহঃ হাসিফ। ব্যবস্থাপনা : নির্মলেন্দু ঘটক / বিশ্বজিৎ বসু।

রজনী : এ পর্যন্ত একাদেমিতেই নিয়মিত অভিনীত হচ্ছে।

কপিরাইট : নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত।

আলোকচিত্র : নাটক-সংলগ্ন আলোকচিত্রগুলি তুলেছেন নিমাই ঘোষ থিয়েটার কমিউনের ৩য় রজনী-র অভিনয় থেকে এবং বিনা ফ্ল্যাশে।

অনুমোদন : অভিনয়ের জন্য নাট্যকারের লিখিত অনুমতি অবশ্য প্রয়োজন। ৯ রজনী গুপ্ত রো কলকাতা ৭০০০০৯

প্রস্তুতি

নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত

সন্তু: মা! তোমরা আর কতকাল নিজেদের এই ছোট্ট গণ্ডিটার মধ্যে ঘুরপাক খাবে? তুমি হয় তো ভাবছো তোমার এক ছেলে খুন হয়েছে—দাদাকে গুণ্ডারা মারলো—কারখানায় গণ্ডগোল—জানি তোমার মনে অনেক প্রশ্ন। কিন্তু মা, একটা বদল যে ভেতরে ভেতরে ঘটে চলেছে—তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ তো তুমি তোমার চোখের সামনে দেখলে। দাদাকে যখন ওরা খুন করতে এসেছিল সারা বস্তি কিন্তু তখন একজোট হয়ে ওদের বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত। মাগো, বস্তির কেউ আজ আর একা নয়। সবাই এক। সবাই মিলে একটা জোট।

পর্দা খোলার পর ঘষা কাঁচের মত অল্প একটু আলো এসে পড়ে। ঐ আবছা আলোতেই দেখা যায় কালী ব্যায়াম করছে। দূরে কোথাও ভোরের ট্রাম চলে যায়। কালীর ব্যায়াম চলে। এবার সাইক্লোরামায় ধীরে ধীরে সন্তুর মুখটা খানিকটা শরীর সমেত ভেসে ওঠে। দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দ শোনা যায়।

সন্তু : শুনতে পাচ্ছেন? ভোরের প্রথম ট্রাম চলে গেল। আমাদের সারা বস্তিটা এখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে। একটু পরেই কল্-কল্ করে সবাই জেগে উঠবে। আমার নাম সন্তু। হ্যাঁ, আমি এই বাড়িরই ছেলে। বেলা একটু বাড়লে আপনারা দেখতে পাবেন এই ঘরে আমার একটা ছবিও টাঙানো আছে। টেবিলে আছে কয়েকটা খাতা-বই। মা আমার একটা জুতো পর্যন্ত বাক্সে রেখে দিয়েছেন। বাবা-মা-হাসিনা বৌদি—মানে কি দাদার সঙ্গে এখনও বিয়ে না হলেও আমি কিন্তু বরাবরই হাসিনা বৌদি বলতে অভ্যস্ত ছিলাম, সাদাত কাকা, অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি এই কয়েকমাস আগেও আমরা সবাই বেশ মিলেমিশেই একসঙ্গে বেঁচে ছিলাম। আমাদের কোন বোন নেই : আমার মা রোজ এই কাক-ডাকা ভোরেই কলঘরে যান। দাদা রোজ সকালে ব্যায়াম করে। বাবা ··· কিন্তু বাবাকে দেখছি না কেন? বাবা তো কোনদিন এত ভোরে ওঠেন না! বাবা কোথায়?

অল্পদূরে পুরো বস্তিটা ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। কাশি, চিৎকার একঘেয়ে-একটানা কোন বুড়ো কঁকিয়ে কঁকিয়ে জোরে কথা বলতে চায়। বালতির খড় খড়ানি—কিছু বচসা—স্তিমিত হয়ে এলে একটি মেয়েকে দেখা যায় একটা বালতি নিয়ে কালীদের বাড়ির সামনে দিয়ে চলে যায়। মেয়েটি হাসিনা। এ ঘরে কালীর ব্যায়াম চলে। বাপের চৌকির দিকে তাকিয়ে ভাখে বাপ নেই। সমবেত নিয়মে চলে এমন একটি কলঘরের উদ্দেশে মাকে ডাকে।

কালী : মা মা—

মা : [বাইরে থেকে] যাচ্ছি যাচ্ছি। আমি কলঘরে। কেন?

কালী : বাবা কোথায়?

মা : এই তো দেখে এলুম ঘুমুচ্ছে।

কালী : না, বিছানায় তো কেউ নেই।

মা : কোথাও গেছে হয় তো—এসে পড়বে এখুনি।

কালী : এতো সকালে বাবা আবার কোথায় গেল? বাবা তো কোনদিন এতো সকালে—

কালো চাদরে মুড়ি দিয়ে নিরাপদ ঢোকে। হাতে দুধ-সহ একটা বাটি।

কি ব্যাপার? এতো সকালে আবার কোথায় বেরিয়েছিলে?

নিরাপদ : সে কৈফিয়ৎ কি তোকে দিতে হবে নাকি ?

কালী : না বলছি– তুমি তো কোনদিন এত ভোরে –

নিরাপদ : এত ভোরে – ভোরে তো কি ? ভোর ভোর উঠতে হবে না ? হাওয়া-বাতাস না লাগালে শরীলের কলকব্জা – তোর মা কি কলঘরে গেছে নাকি ?

কালী : হ্যাঁ।

নিরাপদ : বাঁচা গেছে।

কালী : মানে ?

নিরাপদ : মানে আমি তোর বাপ। দেখি পেছন ফের তো, পেছন ফের। দেখি দেখি –

কালী : কেন ?

নিরাপদ : আহা দেখিই না। ইস্ তোর ফোঁড়াটা তো এখনো শুকোয় নি। তোরা শরীলের যত্ন নিবি না – এদিকে রোজ বলিস পেটের ব্যথা – জোয়ান ছেলে শরীলের যত্ন-আত্যি না করলে চলে ? হ্যাঁ – তা প্রায় হপ্তা দেড়েক হয়ে গেল –

এতক্ষণে দুধের বাটিটা খাটের নিচে লুকোনো হয়ে গেছে।

কালী : [ঘুরে দাঁড়িয়ে] তুমি হঠাৎ আমার শরীর নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে উঠলে – আগে তো কোনদিন তোমাকে –

নিরাপদ চাদর মুড়ি দিয়ে শুতে শুতে একটা প্রকাণ্ড হাই তোলে।

নিরাপদ : ফোঁড়া টোঁড়া খুব সাংঘাতিক। পেটের ব্যথা পয়জন। আর বাজে বকতে ভাল্ লাগছে না। তুই বৈঠকি মার, খান কতক ডন্ দে – আমি একটু ঘুমুই।

বাইরে থেকে চিৎকার করতে করতে প্রতিবেশী সাদাত ঢোকে।

সাদাত : আজ এ আমি কিছুতেই ছাড়ব না। পুরনো শুাঙাৎ নিরাপদ। শালা শেষটায় তোর এই কীর্তি ! কালী – বৌঠান – এই যে কালী, দেখলি – শুনলি তো সব। আর তো চুপ মেরে থাকলে চলবে না। তোর বাপ কোথায় ?

এবার চৌকির দিকে নজর যায়।

কালী : সাত সকালে কি আবার ঝুট ঝামেলা হলো কাকা ?

সাদাত : চুরি। স্রেফ্ চুরি। আল্লার কিরে কালী। তোর বাপ আমার বখরীটার দুধ গেঁড়ালো – মাইরি আজ আমি নিজের চোখে দেখেছি।

কালী : চুরি ? বাবা তোমার – কি ব্যাপার, একটু খুলে বলো তো সাদাত কাকা।

সাদাত : খোলাখুলি সব জানেন তোমার বাপ। এই তো ঐ মাল আর আমি

কাল রাতেই এক সঙ্গে তাড়ি খেলুম—বিল্‌কুল্‌ গলায় গলায় দোস্তি। আর আজ সকালে আমার বখরী—এই শালা নিরাপদ—

চিৎকারে কালীর মা স্নান সেরে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। কাঁধে ভেজা কাপড়।

মা: কি ব্যাপার—আরে সাদাত ভাই, তুমি! নেশা ভাঙ্‌ বুঝি এখনো কাটে নি?

সাদাত: কথাটা নিজের সোয়ামীরেই শুধোন বৌঠান। স্যাঙাৎ ভোর ভোর আমার বখরীর ফুল টাইম দুধ গেঁড়িয়েছে—আজ আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমার কতো আদরের মুন্নি বখরী—কালী তো সব শুনেছিস, হাসিনার কিরে, চুপ মারলি কেন?

মা: সাদাত ভাই, আমায় একটু খুলে বলো তো—আমি তো এর কিছুই বুঝতে পারছি না।

সাদাত: তখন খুব ভোর-ভোর—জানলেন বৌঠান—কাল রাতের খোঁয়ারি তো আর পয়লা নম্বরের ছিল না, তাই মানে কি সারা রাত, জাগাই আছি বলবেন। রাত ভোর এপাশ ওপাশ করি, কিছুতেই শালার ঘুম আর আসে না। তা ভোরের দিকে পাতলা মতো একটু ঘুমের দুলুনি এলো কি শুনি চচ্‌র-র্‌—চ-চ্‌র-র শব্দ। শুকনো কলায়ের পাত্তরে দুধ দুইয়ে নেওয়ার আওয়াজ। প্রথমে খেয়ালটা ঠিক হলো না জানলেন। তারপরেই শুনি আমার মুন্নির গলার চার টাকা দামের ঘুন্টিটার টুং-টাং আওয়াজ। তখন ভাবলুম—আমার মুন্নি আমায় দেখে অমন করে ডরায় কেন? নরম নরম লাথি মারে কেন? আবার সেই শব্দ। না। তাহলে তো আমি দুইচি না। এ তো অন্য কেউ। 'তুই কেরে'?—বলে হাঁক পাড়তেই কি একটা কালো মতো চাদর পরা ছুটে পালিয়ে গেলো। ওই দেখুন সেই চাদর গায়ে শালা কেমন ঘুমের ভাণ করে আছে। এই শালা নিরাপদ, তুই কিন্তু ঘুমুচ্ছিস না আমি জানি। তাড়ির খোঁয়ারি শালা এতক্ষণ পর্যন্ত কারো থাকে?

ঘুমন্ত নিরাপদর গায়ে চাপর মারতে থাকে।

মা: সাদাত ভাই শোনো শোনো। আমি যখন কলে যাই সে তো তখন দিব্যি ঘুমুচ্চিল। তোমার চোখের কোনো ভুল হয় নি?

সাদাত: [হাসে] চোখের ভুল। হাসালেন বৌঠান, স্রেফ্‌ হাসালেন। ফুটপাথের দোকানদারী আমার, কম সুদে টাকা লেনদেনের কারবার আছে, তাও আপনারা পাঁচজনে জানেন—মাস পড়লে তিন ঘরের বস্তি-ভাড়া আদায় করি—মুন্নির দুধ বেচি—তার ওপর ঘরে আমার সোমত্ত জোয়ান মেয়ে হাসিনা। বৌঠান, চোখের ভুল আমাদের হয় না। আপনার সোয়ামী আমার দুধ গেঁড়িয়েছে—স্রেফ্‌ বাঙলা কথা। যে কোন কিরে।

কালী: মা! বাবা এই কিছুক্ষণ আগেই ফিরেছে।

সাদাত : তুই বল কালী, তুই বল।

মা : ছিঃ-ছিঃ! সাদাত ভাই তোমার দুধের পাওনা তুমি নিয়ে যাও। একটু দাঁড়াও।

মা কালীর পকেট থেকে পয়সা বার করে গুনতে থাকেন।

সাদাত : পাওনার কথা যখন তুললেন, তখন বলি — মুন্নি আমার রোজ তিন পো-টাক দুধ দেয়। ও বেলা কিছু কম। কালী তো সব শুনেছিস হাসিনার কাছে। তুই বল বাপ।

কালী : হাসিনা বলছিলো এ বেলা ও বেলা মিলিয়ে তোমার মুন্নির দুধ হয় মোট আধ সের। তা তুমি যখন বলছো —

সাদাত : জানে না, জানে না। ও মেয়ে ঘরের কোনো খবরই রাখে না। খিজিপনা নিয়েই তো আছে। আধ সের?

মা পয়সা নিয়ে ফিরে আসেন।

মা : সাদাত ভাই, এই নাও তোমার তিন পো-র দাম। দোহাই তোমার, এঁ নিয়ে আর খামোকা কথা বাড়িয়ে মানুষ শুনিয়ো না।

সাদাত : আপনার কথা শুনলে চোখে জল আসে বৌঠান। পাঁচজনরে বলে বেড়াবো নিজের ঘরের কথা? স্থান পয়সা কটা স্থান।

পয়সা নিয়ে

চলি। খদ্দের বাড়ি গিয়ে আবার বলে আসতে হবে আজ আর হলো না। রোজকার ব্যাপার তো —

যেতে যায়।

কালী : সাদাত কাকা!

সাদাত : বল্ ভাই।

ঘুরে দাঁড়ায়।

কালী : একটু দাঁড়াও! [বাপের লুকোনো জায়গা থেকে দুধের বাটিটা বের করে] এই নাও। খদ্দের তোমার বহুদিনের পুরনো। দুধ না পেলে যদি চটে যায়। এই নাও। এটাও নিয়ে যাও।

সাদাত হতভম্ব। তারপর পয়সাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পাত্রটা নিয়ে যেতে যেতে

সাদাত : দেখলেন! শুনলেন তো বৌঠান? ছেলে আপনার আচ্ছা যা হোক ঘুরিয়ে একখান চড় কসালে গালে। মনে থাকবে রে কালী, মনে থাকবে।

চলে যায়। রাস্তা দিয়ে এক ভিখিরীকে আসতে দেখা যায়। একটানা সুরে বাংরিজিতে বলে চলে।

ভিখিরী : নো মাদার, নো ফাদার, অল ফিনিসিং। বাবা নেই — মা নেই — পয়সা একটা ভিক্ষে দেবেন? নো মাদার, নো ফাদার, বোম্বাই নেই, দিল্লী

নেই, বাবা নেই, মা নেই, পয়সা একটা ভিক্ষে দেবেন—

মা : [নিরাপদকে] তোমার লজ্জা করে না ? ছিঃ-ছিঃ ! পরের জিনিস চুরি করতে তোমার লজ্জা করে না ? কানে শুনতে পাচ্ছো না না ?

কালী : আর ঘুমের ভাণ করো না বাবা। এবার তো রাস্তায় বেরোনো বন্ধ করবে। সাদাও কাক বলে বেমালুম হজম করলো—অন্য কেউ হলে গলায় গামছা দিয়ে টেনে নিয়ে যেতো।

মা : কথাগুলো তোমার কানে যাচ্ছে ? নিষ্কর্মা কোথাকার !

ভিখিরী বাস্তর নোংরা কেলা জায়গায় বেশ গুছিয়ে বসেছে।

কালী : যে ভাবে পারি হপ্তায় তোমায় দু-চার টাকা হাত খরচা দিই। নিজে বিড়ি সিগারেট না খেয়ে তোমার মদ তাড়ির খ্যাটন যোগাই। তবু চুরি !

মা : শুনবে না। এখন তো এ সব কথা শুনবে না। কেন তুমি দুধ চুরি করতে গিয়েছিলে ? কেন ? কেন ?

আচমকা ঘুম ভাঙলে যেমন হয়, নিরাপদ ঝটকা খেড়ে উঠে পড়ে।

নিরাপদ : কি, কি হলো ? তোমরা এত চেল্লাচ্ছ কেন ?

কালী : চেল্লাচ্ছি কেন ? কিছুই তো জান না, না ?

মা : এমন হাবার মত দেখছ—

নিরাপদ : এ্যাই, এ্যাই, হাবা ফাবা বলবে না বলে দিলাম।

মা : না বলবে না। চুরি করতে গেছলে কেন ? জবাব দাও।

নিরাপদ : কিসের চুরি ? কি চুরি করেছি আমি ?

মা : তা-ও মনে করিয়ে দিতে হবে ? তোমার জন্যে একদিন আমি গলায় দড়ি দেব।

নিরাপদ : ছুইসাইড করবে গিন্নি ? তা কালীর মুখ দেখে উঠেছি, শেষটায় শালা মায়ে পোয়ে আমায় খুনের দায়েই ফাঁসাবে মনে হচ্ছে।

কালী : বাবা ! তোমাকে আমি সাফ জানিয়ে দিচ্ছি এ বাড়িতে থাকতে হলে আর পাঁচটা ভদ্রলোক যেমনি থাকে তেমনি থাকবে, যা জোটে দু বেলা তাই খাবে।

মা : কালী তো যেমন যেমন পারে তোমার হাত-খচ্চা দেয়।

কালী : চুরি ফুরি যদি আর কোনদিন শুনি, তাহলে হয় তুমি এ বাড়িতে থাকবে নয় আমি থাকব। 'মদো-মাতালের ছেলে' এটা শুনতে শুনতে আমার বেশ অভ্যেস হয়ে গেছে, কিন্তু চোরের ব্যাটা যদি কাউকে বলতে শুনি, সেদিন তোমারই একদিন কি আমারই একদিন—এই আমি তোমায় সাফ সাফ জানিয়ে দিলাম।

ভিখিরী : নো ফাদার, নো মাদার, পয়সা একটা ভিক্ষে দেবেন ? বাবা নেই—মা নেই—পয়সা একটা—

নিরাপদ : তা তো জানাবিই। বুড়ো বাপকে মারবি, গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ির বার করে দিবি, তা না হলে আর জন্ম দেব কেন? মারবি? মদো-মাতালের ছেলে? শালা চামার কোথাকার, স্ট্রাইক মারিয়ে নিজের চাকরির তো দফা-রফা করলি, এবার বুড়ো বাপরে মারবি। মার—মার, মায়ে পোয়ে মিলে মার।

মা : আর লেকচার—বক্তিমে মারতে হবে না। বিয়ে ইস্তক-তো আমার রক্ত চুষে খেয়েছ, আর কালীকে কেন?

নিরাপদ : এ্যাই চোপ্! বেশি কথা কইবে না। মেয়েছেলে মেয়েছেলের মত থাকবে। বেশি কথা কইবে না। এ সংসারের কর্তা কে, আমি না তুমি? শালা মা জানে বাপ, মন জানে পাপ। দিলে সারা দিনটার তেওটা মেরে! পাপে ভর্তি দুনিয়া, পাপী, হারামজাদী।

কালী : বাবা, মুখ খারাপ করো না। খবরদার বলছি মুখ খারাপ করো না। তোমার ভাগ্যি ভাল যে মা তোমার সংসার করতে এসেছিল। লজ্জা করে না তোমার?

নিরাপদ : তোর লজ্জা করে না? শুয়োর কোথাকার! হপ্তায় দু এক টাকা হাত খচ্চা দিচ্ছ আর ভাবছ বুড়ো বাপরে টোপা করে নিয়েছ? বাপ তোমার পারচেজ হয়ে গেছি? এঁ্যা? ওরে হারামী, তেমন তেমন দিনে তোর ঐ হাত খরচার টাকায় এরোপ্লেন বানিয়ে মাঠে ঘাটে উড়িয়ে দিতাম। থাকতো শালার ইংরেজ আমল, দেখিয়ে দিতাম। ওস্তাগর! আমি এক পয়লা নম্বরের ওস্তাগর। দর্জির বাচ্চা পাক্কা দর্জি। মেটেবুরুজের পাকা দেয়াল—ঘর ভর্তি তামা-পেতল-কাঁসা, ফুল মাসের খোরাক ভর্তি ঘর। দেখে নি? তোর মা দেখে নি? সবই দেখেছে। এখন শালা রোজগারপাতি নেই, সংসারের বোঝা, তাই ছেলের হয়ে টেনে কথা কইছে। সবই বুঝি বাবা, সবই বুঝি আমি। দূর শালা! দুটোতে মিলে খালি মুখ ঝামটা! তোদের বাড়ির গুষ্টির ট্যাংকে —থাকবোই না, থাকবোই না শালা এ বাড়িতে।

কালী : যাবে কোথায়? মদের দোকানে?

নিরাপদ : না রে, আঙুরের ক্ষেতে। টপাটপ পাড়বো আর খাবো। তুইও খাবি তো চল্। কথার ছিরি দেখ! আমি যে কেন বিয়ে মারাতে গেসলাম —এ দুটোকে দেখি আর ভাবি।

মা : তা তো বলবেই! বলবে না? কি দেয় নি তোমাকে বাবা? বাবার যা কিছু সব, সব তুমি পেয়েছিলে। নগদ টাকা। পাঁচ ভরি সোনা।

নিরাপদ : দেড় ভরি তার ব্রোঞ্জের ছিল, আমি তখনই বলেছিলাম। তোমার বাবা কান দিয়েছিল সে কথায়? অবিশ্যি আমারও তখন ফল-ফলন্ত, বাড়-বাড়ন্ত কারবার। নিরাপদ দাস ডিমাণ্ড কোনদিনই করেন নি।

মা: ছাই। তোমার শুধু ছিলো একটা সেলাইয়ের কল আর জনা চারেক কারিগর।

নিরাপদ: পাঁচজন কারিগর!

মা: বাবা তোমায় একটা ছোট-খাট কারখানাও দিয়েছিল। দামী দামী আয়নায় পারা লাগানোর ফলাও কারবার। দিনমান দশ-বারটা মানুষ খাটত সেখানে। বাবুয়ানি করে দুদিনেই সব লাটে তুলে দিলে। কত দিন খাই না। মরার আগে বাপ-মাকে একবার চোখের শেষ দেখাটাও দেখতে দিলে না। তোমার হাতে পায়ে ধরেছি।

নিরাপদ: থামো থামো, আর বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথা বলো না। সারা জীবন বাঙাল বলে আমারে হেনস্তা করেছো। ঐ মুখ ছিল তাই রক্ষে পেয়ে গেলে। নইলে দিন দুপুরে শেয়াল কুকুরে তোমায় টেনে নিয়ে যেত।

কালী: বাবা!

নিরাপদ: নট্! আমি তোমার ফাদার না।

কালী: বা-বা-বা!

নিরাপদ: বাবা না, বাবা না। ঐ যে তোমার মা। আমি তোমার কেউ না।

মা: ভগবান! তুমি কি একদিনও আমায় একটু বুঝবে না? কতবার কেঁদেছি দাদার বিয়েতে যাব বলে। যেতে দাও নি। সন্তু যেতে চেয়েছিল—একটা পয়সা দাও নি। এমন মার মেরেছিলে ছেলেটার আমার একটা চোখ সারা-জীবনের মত অন্ধ হয়ে গেল। রাত দিন মদ গিলেছ—ঘরের কথা কোনদিন ভাবো নি। ইয়ার বন্ধুরাই তোমার সব ছিল। আর এখন? ছুতো-নাতা ধানাই পানাই করে পয়সা নেওয়া আর মদ গেলা। এবার তুমি আমার কালীকে পাবে। বড়ো কপাল করে এসেছিলো সন্তু। তুমি খাওয়ার আগেই ওরা …

অঝোরে কেঁদে ফেলে।

কালী: মা—কেঁদো না। চোখের জলে ও বুড়োর বহুদিনের অরুচি ধরে গেছে। থামোকা কেঁদো না।

মা: আর কত সহ্য হয় রে কালী আমিও তো মানুষ। আমি পারি না। আমি আর পারি না।

নিরাপদ: কাঁদো! কাঁদো! বাবা কালী, মায়ের সগে গলা মেলাও। শালা সাত সকালে আমার অজান্তে ঘরের মধ্যে সিনেমা স্যুটিং শুরু হয়ে গেছে। মাগীগুলো আজকাল চোখে খুব পাত্কো পুষছে।

কালী: বাবা!

নিরাপদ: চোখ রাঙাবি না কালী, চোখ রাঙাবি না।

কালী: বেরোও। বেরোও বলছি। বেরোও।

নিরাপদ : মারবি ? মারবি নাকি ? [সাদাতের ফেলে দেওয়া পয়সাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে] লাথি, আমি তোদের এই সংসারের মুখে লাথি মারি। এই আমি চললুম। যদি ফের বাপ বলে ডাকতে যাবি তো রোজ সকালে শালার ঐ সাদাত মিঞার ছাগলের দুধ চুরি করবো—এই আমি বলে দিয়ে গেলাম। শালা যতো ঝামেলা। বললুম কাল বুকে ব্যথা উঠেছে, তা একটু দুধ, দাও দুধ, খাও দুধ—এঃ! ভারী আমার ইয়ের ছাগল, তার আবার চোখ-রাঙানি, পেত্নীর মতো ফ্যাচ্-ফ্যাচ্ কান্নাকাটি—ধুর!

কালী : বেরোও তুমি।

নিরাপদ আপন মনে গালাগালি করতে করতে চলে যায়।

ভিখিরী : বাবা নেই, মা নেই, নো মাদার, নো ফাদার, পয়সা একটা ভিক্ষে দেবেন—নো মাদার—নো ফাদার—পয়সা একটা—

মা : থাক। কেউ ডাকতে যাবি না। দেখি পেটে লাগলে কোন চুলোয় জোটে ?

—এই আমি চললুম। ফের যদি বাপ বলে ডাকতে যাবি তো—

কালী : বাবাকে চিনি। পয়সা কটা চোলাইতে ফুঁকে দিয়ে তবে ফিরবে তুমি দেখে নিও।

মা : বুঝলো না। আমার কথাটা একবারও ভাবলো না।

কালী : ভাববে ? বাবা ? তোমার আবার মাথা খারাপ হলো নাকি ?

মা : পয়সা কটা পর্যন্ত নিয়ে গেল। তুই আটকাতে পারলি না ?

কালী : আটকাতে গেলে মারামারি লাগতো। আমাকে না পারলে তোমাকে মারতো।

মা আচমকা কালীর গালে একটা চড় মারে।

মা : বাজে কথা বলবি না। আমার গায়ে সে আজ পর্যন্ত কোনদিন হাত তোলে নি।

বিছানা গুটোতে থাকেন।

মা : মানুষটা চিরকাল এমন ছিলো না। এক সময় নামডাকে সেরা ছিল দর্জি-

পাড়ায়। তোরা তখনও হোস নি। কি তেজ! কামকাজে কি যত্ন! কত সাহেব মেমের যে দামী দামী জামাকাপড় বানাতো! আর আজ? কোথায় সেই মেটেবুরুজের পাকা বাড়ি, আর কোথায় এই—

কালী: তুমি আর বাবার হয়ে সাফাই গেয়ো না। যেহেতু সাহেব-মেমদের দামী দামী জামাকাপড়ের পয়লা নম্বরের ওস্তাগর—ব্যাস্! সাহেবরা যখন দেশ ছেড়ে গেল—কই, তুমিই তো বলেছো—দাদু তখন কত করে বোঝালো হাওড়া হাটে দোকান দিতে, অর্ডারী মাল বানাতে। খাটনিও কম পড়ত, ডজনকে ডজন মাল, এক মাপ, এক ছাঁট। না, করবো না। কেন? না লাইন বরাবর গরু কাটার মত করে জামাকাপড় আমি বানাই না। আমি পয়লা নম্বরের ওস্তাগর। ও সব কসাইয়ের কাজ আমি করবো না। তো করো না। বাঙালের গোঁ নিয়ে থাক, চুরি-চামারি করে পয়সা জোটাও আর চোলাই ঢেলে ঢুলু ঢুলু চোখে সাহেব-মেমদের রঙীন রঙীন গাউন বানাও। কেন, দাদুর দেওয়া আয়নার কারখানাটা রাখতে পারল না? তুমি বলতে পারতে না? তাহলে তো দু বেলা দু মুঠো জুটতো।

মা: তোর বাপ তো কোনদিন আমার কোন কথা শোনে নি।

কালী: অথচ আজ! যে কারখানা এক সময় আমাদের নিজেদের ছিল আজ সেই কারখানাতেই আমি একশো-দশ টাকা মাইনের চাকুরে। একবারও জানতে চায়—কারখানার ধর্মঘটে সংসারের কি হাল—কোথেকে কি ভাবে দিন চলছে? রোজ কাজে যেতাম। আয়নায় পারা লাগানো—যে কোনো সময় অ্যাসিডে সারা শরীর পুড়ে যেতে পারে। এক টুকরো লম্বা রবার কোমর থেকে পা পর্যন্ত মড়া খাটিয়ার মত জড়ানো। ব্যাস্। তাও না হয় চলতো। কিন্তু এটুকু কারখানা, তো ইউনিয়ন তিনটে। গেল বছরের কথা মনে নেই? মারদাঙ্গা, রক্তারক্তি, গেট-মিটিং। তলায় তলায় মস্তান ইউনিয়ন-দাদারা মালিকের সঙ্গে মিটমাট করে ভাত কাপড়ে মারলে কাদের? আমাদের। ঠিক পারতুম। লড়াই দিয়ে নিজের-নিজের জায়গা আগলে রাখতে ঠিক পারতুম। তো রাতারাতি পুলিশ, বোমা, ছুরি, পাইপগান।—হাজারে হাজারে পাড়া ছাড়া হলুম আমরা সবাই। তবে এবারেও যদি—

মা: এবারও তাই হবে? সন্তু যে ভাবে গেলো—[হঠাৎ কালীকে ধরে] তুই, তোর কিছু হবে না তো? আমি তাহলে কাকে নিয়ে থাকবো? হাসিনার কি হবে? এ কথা কি তুই একবারও ভাববি না?

কালী: জানি না।

মা: আমি বলি কি কালী, তুই অন্য কোন কাজ ছাখ—যা হোক কিছু একটা খুঁজে পেতে নে। এই মার দাঙ্গায়, আমার দোহাই, তুই নিজে আর যাস নে। আমার কথা না হয় ছেড়ে দে। কিন্তু সাদাতের মেয়েটা—পাড়াপড়শী

অনেকেই তো তোদের মেলা-মেশা নিয়ে অনেক কিছু বলেছে—তোর বাপ, সাদাত ভাই এদেরও না হয় মত নেই, কিন্তু আমি বলছি তোরা এই নিয়ে—

কালী : অত ভয় পেয়ো না মা। বিয়ে হোক বা না হোক, মরতে তো একদিন হবেই। তাই বলে গতরে খাটা মানুষদের হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে কেন? তবে এ কথাও জেনো, এবারের এই ধর্মঘটে সব শ্রমিকই আমাদের দলে, আমাদের সবগুলো দাবিই ন্যায্য দাবি। কিছুতেই ওরা আমাদের ধর্মঘট ভাঙতে পারবে না। হ্যাঁ, চোরা-গোপ্তা কাউকে মারতে পারে, খুন করতে পারে—কি করে ভুলবো মা, সন্তু ছিল আমার ভাই। আবার এ কথাও তো ভুলতে পারি না মাস গেলে ওই মাইনেটা না পেলে খাবো কি? ঐ টাকাটা যে আমার চাই। অথচ ভাবতে পারো, এক সময় এই কারখানাটা ছিলো আমাদের নিজেদের। দাদু তোমার বিয়েতে বাবাকে দিয়েছিলো যৌতুক হিসেবে। বছর খানিকের মধ্যে বাবাও দিলে উড়িয়ে। বিমলবাবুও সুযোগ বুঝে দাও মারলে। বাবা নিশ্চয় কদিন খুব ফূর্তি করে মদ খেয়েছিল। আমাকে কোলে নিয়ে আদর করেছিল—বড়ো ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে মনে মনে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু একবারও ভাবে নি তার আদরের কালীচরণ দাস তাদের নিজেদেরই কারখানায় অ্যাসিডে ধুয়ে ধুয়ে সাদা কাঁচে পারা লাগিয়ে দামী দামী আয়না বানাবে। কমজোরী আলোর তলায় বসে ফুটন্ত অ্যাসিডের বালতিতে পারা লাগাতে গিয়ে হয় তো তার …

অত ভয় পেয়ো না মা।...এবারের এই ধর্মঘটে সব শ্রমিকই আমাদের দলে।

এই কথা চলাকালীন মা অন্যমনস্ক হয়ে ধীরে ধীরে সন্তুর ছবি ও টেবিলের কাছে গিয়ে ওর খাতা-পেন্সিল-পেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে। কালীর কথা বোধ হয় তার কানে যায় না। কালী

বুঝতে পারে। ধীরে ধীরে কয়লার গুঁড়োয় দাঁত মাজতে মাজতে চলে যাবার সময় হঠাৎ মায়ের দিকে ঘুরে

কালী : কি হলো ? সন্তুর ছবির দিকে অত কী দেখছ ?

অনেক দূরে কোথাও অনিয়মিত গুলির শব্দ শোনা যায়। মা কৌটো থেকে কালীর জন্য মুড়ি তুলে বাটিতে নেয়। ধীরে ধীরে অন্যমনস্কভাবে চৌকির ওপর বসে। কাঁদতে থাকে। কালী মুখ ধুয়ে ফিরে এসে মাকে কাঁদতে দেখে থমকে দাঁড়ায়।

কালী : মা — [মা উত্তর দেয় না] মা —

মা : কতদিন হলো রে কালী ?

কালী : প্রায় তিন মাস।

মা : চোখের সামনে সব যেন দেখতে পাচ্ছি। সারারাত মশা আর গরমের চোটে ওর ঘুম আসছিল না। খালি এপাশ ওপাশ করছে। মাঝে মধ্যে তোকে ডিঙিয়ে জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে রাস্তাটা দেখে — আবার এসে শোয়। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ উঠে বসলো। জামাটা পড়লো। বললুম কোথায় যাচ্ছিস ?

কালী : আমি জেগেই ছিলাম। সন্তু কোনো উত্তর দিলো না। আমাকে একবার ডাকলোও না।

মা : দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে রাস্তাটা দেখলো, তারপর আচমকা আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, মা মাগো, আমার জন্য কখনো কাঁদবে না। বলো কাঁদবে না।

কালী : সারা গা ভর্তি ব্যাণ্ডেজ, এতো ব্যাণ্ডেজ যে একটা মানুষের শরীরে লাগতে পারে, আগে কোনদিন জানতাম না। চাপ চাপ রক্ত ফুটে বেরুচ্ছে। কত শুষবে ? মানুষের রক্ত !

মনে হল যেন একটা গুলি হঠাৎ ছিটকে এসে কারুর বুকে লাগলো — তার গোঙানি শোনা যায়। নিস্তব্ধ।

মা : পুলিশ তোর বাবাকে পর্যন্ত শ্মশানে যেতে দিল না। চারিদিকে শুধু পুলিশ পুলিশ আর পুলিশ।

রাস্তা দিয়ে হারু এবং দিনেশকে আসতে দেখা যায়, দিনেশের হাতে কেরোসিনের টিন।

দিনেশ : কালী, কালী বাড়ি আছ নাকি ?

কালী : আরে দিনেশদা যে ! এসো, আয় হারু, আয়।

হারু : কেমন আছেন মাসীমা ?

মা : ভালো। তুমি ভালো তো ? বসো বাবা। আমি উনুনটা একবার দেখে আসি।

কালী : তা হঠাৎ কি মনে করে দিনেশদা ?

হারু : এই এলাম। বাজারে দিনেশদার সঙ্গে দেখা — তোর কথা উঠলো, চলে এলাম।

দিনেশ : বাজারে যাওনের পথে তোমার বাপরে দেহি হন্‌হন্‌ কইর‍্যা মধু দাসের গলিতে যায়।

কালী : তুমি কি আজ এই প্রথম দেখলে নাকি ?

দিনেশ : না—তাই কানাঘুষায় শুনছি বটে,—তবে চম্মচক্ষে আইজই ছ্যাখলাম। ছাড়াইতে পার না ?

কালী : মদ খাবে বাবা—তা আমি ছাড়াতে যাবো কেন ? আচ্ছা দিনেশদা, আমাদের যদি আর একটু পয়সাওলা ঘর হতো—নৈতিক অধঃপতন নিয়ে লোকে দু চার কথা বলতো বটে, তবে অর্থনৈতিক দিকটা উঁচু থাকায় তোমরাই আবার সমীহ করে কথা কইতে। কিরে হারু ?

হারু : হ্যাঁ-হ্যাঁ বাবা। মাল—মাল—মালই দুনিয়া—দুনিয়াই মালের। গুরু, তোদের সকালের চা খাওয়া হয়ে গেছে ?

কালী : শুনলি তো দুবার দিয়েও উনুনে আঁচ চড়ছে না। আসলে তোর বোধ হয় চা-এর বদলে দুধ খাওয়ার শখ।

দিনেশ : হ, অখন তো দুধই দরকার। কারখানার যা অবস্থা, তাতে এখন দুধ-মাখন-ঘি-পরটা এ সবই লাগে। শোলোকেও তো আছে—মাংস খাইলে মাংস বাড়ে। ঘিয়ে বাড়ে বল। দুধ খাইলে চন্দ্র বাড়ে। শাকে বাড়ে মল।

হারু : হচ্ছে চায়ের কথা। তা চায়ে না হয় দুধ লাগে, তুমি আবার এর মধ্যে গু-মুত টেনে আনলে কেন ?

দিনেশ : কারখানার যা হাল—তাই-ই কইলাম। তা দুধই কও—আর মুতই কও।

কালী : বাজে কথা রাখো। আসল কাজটা কি খোলসা করে বলো তো ?

দিনেশ : এতদিন ওরা ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টা করছে। যদি আবার আইজ দুপারের মিটিংয়ে কোনো মাইরপিট দাঙ্গা হয়—

হারু : তুমি কি চুপচাপ মার খাবে বলে তৈরী হচ্ছো ?

দিনেশ : ক্যান ? আমারে মাইরবো ক্যান ? এতদিন কাম করলাম—আমারে তো সকলেই চিনে।

কালী : আর যাদের কেউ চেনে না—যারা অল্প কিছুদিন কাজ করছে—তারা পড়ে পড়ে মার খাক—তুমি কি—

দিনেশ : উল্টা অর্থ করো ক্যান ? কথা তা না। মাইনা বাড়ানো—বোনাস—নতুন লোক নেওয়া—আমাগো যে সব দাবি আমি তার অন্যথা কই না। আমি কই, এয়া না হইলেও কোন রকম তো দুই বেলা চলতে ছিলো। তোমারে আমি অভিযোগ করি না কালী, তুমি তো আর নেতা না—শুধু কই অনেকেই তো তোমারে মান্য করে—যদি কোন রকমে অগো প্রস্তাবে রাজি হওয়া যায়—

হারু : এ কথা তুমি আজ আমাদের দুপুরের মিটিংয়ে বলো—ছাখো সবাই কি বলে। তবে আমি মনে করি—ওদের প্রস্তাবের অর্থ যদি একটাই হয়, অর্থাৎ স্ট্রাইক তুলে নেওয়া—তাহলে আমরা সবাই মিলে তার বিরোধিতা করবো, এও আমি তোমাকে বলে দিলাম।

কালী : শোন দিনেশদা, বেআইনিভাবে গুণ্ডামীর ভয় দেখিয়ে যদি মালিক আর তার লেজুড় ইউনিয়ন আমাদের সবাইকে পেটে মারতে চায়, তাই বলে পেট চেপে শুয়ে পড়ে কাতরাতে নিশ্চয় আমরা কেউ রাজি হবো না।

দিনেশ : অরা কয়, বোঝাপড়ার সময় পাইর হইল না, তার আগেই আমরা—অরা কয়—এই ধর্মঘট অগণতান্ত্রিক।

হারু : অগণতান্ত্রিক? মালিকের দালালীর ডিমে যারা তা দিয়ে বেড়ায়—পুলিশের বেয়নেটের আড়ালে শাসন চালায়, তাদের কাছে আমরা গায়ে গতরে খাটা মানুষরা গণতন্ত্র শিখবো?

কালী : এতো বছর বাদে আমরা গণতন্ত্র আদায় করেছি রক্ত দিয়ে—হাজারে হাজারে পাড়া ছাড়া হয়ে থেকে। মিথ্যে ভয় পেও না দিনেশদা। হাজারো দুঃখ কষ্টের মধ্যেও আমরা যখন লড়াই করে বেঁচে আছি, মনে প্রাণে কারখানার উন্নতি চেয়েছি—আমাদের বাদ দিয়ে—আমাদের দাবিকে অগ্রাহ্য করে সে কারখানা চলতে পারে না, পারবেও না।

দিনেশ : তোমারে আর হারুরে অরা কিন্তু মালিকের দালাল কয়।

কালী : অমিয়রা ভয় পেয়েছে দিনেশদা। তাই আমাদের দালাল বললো বা আর কি বললো তাতে আমাদের কিছুই যায় আসে না।

দিনেশ : পোলাপান লইয়া ঘর করি কালী—অঘটন যদি কিছু একটা হয়—

কালীর হাতদুটো ধরে।

হারু : তোমার ওপর কিছু হওয়ার আগে আমাদের ইউনিয়নের নেতাদের ওপর হতে পারে—এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

কালী : আর আমাদের ওপর হলেই বা, ভুলে যেও না দিনেশদা, সন্তু ছিলো আমার ভাই, আমার রক্তের ভাই। মনে পড়ে, এই তো মাত্র মাস তিনেক আগের কথা—ব্যাণ্ডেজ দেখেছো সাদা সাদা, তার ওপর চাপ চাপ রক্ত, পুরো ছবিটা মনে পড়ছে?

দিনেশ : সন্তু! হ, মায়ের দুধ খাইছিল বটে পোলাডা—

হারু : সন্তু একবার আমার ছোট ভাইয়ের হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার সময় বলেছিলো, তোরা এতো ভুল ইতিহাস পড়িস কেন? ভারতবর্ষের ইতিহাসটা আর একবার আগাগোড়া নতুন করে লিখতে হবে। সময় হলে আমরাই তার দায়িত্ব নেবো।

সংদাত মিঞাকে রাস্তা দিয়ে আসতে দেখা যায়। হাতে কালীদের দুধের বাটি।

কালী : আরে সাদাত কাকা যে! দুধ না পেয়ে তোমার খদ্দেররা আবার চটে যায় নি তো?

সাদাত : [অপমানটা এখনো মনে আছে] তা খদ্দেরদের আর দোষ কি কালী? তারা তো আর মাঙনা চাইতে আসে না—রাতের আন্ধারেও আসে না। দিনের আলোয় পয়সা দিয়ে মাল নেয়। মনে থাকবে, মনে থাকবে রে কালী, মনে থাকবে।

সাদাত চলে যায়।

দিনেশ : মিঞা যেন একটু গরম গরম।

হারু : রোদ চড়ছে। বোধ হয় সুদের টাকাটা কোন শালা হজম করে দিয়েছে। এ্যাই, তুই বাজারে যাবি তো?

কালী : হ্যাঁ।

হারু : চ, আমিও তোর সঙ্গে যাচ্ছি।

দিনেশ। ঠিক আছে। দুপারের মিটিংয়ে দেখা হইবো। আমি আবার যাই—দেহি—কেরাসিন তেলডা পাওয়া যায় কি না—

চলে যায়।

হারু : [যেতে যেতে] আমায় আনা চারেক পয়সা দিস তো—খুচরোয় আমার কিছু কম আছে।

কালী ও হারু চলে যায়।

মা : [ভেতরের ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে] বাজার থেকে একটা পাতিলেবু আনিস কালী। কতদিন লেবুর মুখ দেখি না।

ভিখারী : বোম্বাই নেই—দিল্লী নেই—বাবা নেই—মা নেই—অল ফিনিসিং—নো মাদার—নো ফাদার পয়সা একটা ভিক্ষা দেবেন—

ভিখিরী শুয়ে পড়ে। কোঁচড়ে মুড়ি ও হাতে কালীদের বাটি নিয়ে হাসিনা ঢোকে। মা ঘর ঝাঁট দেয়। ঝাঁট দিতে দিতে একটা পয়সা পেয়ে কপালে ঠেকিয়ে আঁচলে বাঁধে।

হাসিনা : মামী, [বাটিটা দেখিয়ে] বাপ এটা পাঠিয়ে দিলে। এখানে রাখি?

মা : রাখ।

হাসিনা : রাগ করেছো?

মা : কার ওপর?

হাসিনা : আমার ওপর।

মা : দূর পাগলি! তোর ওপর রাগ করতে যাবো কেন?

হাসিনা : মামা ঘরে নেই?

মা : না।

হাসিনা : নিশ্চয়ই ওসব খেতে গেছে, কেন যে খায়! জানো তো মদ খেলে

মাথা ঘোরে, হাত পা অবশ হয়, চোখ দুটো রক্তের মত লাল হয়ে যায়। [নাক চেপে] আর কি বিচ্ছিরি গন্ধ !

মা : এত যে বলছিস, খেয়ে দেখেছিস নাকি কখনো ?

হাসিনা : মাগো—আমার বমি আসে।

মা : তুই বোস, কালী বাজারে গেছে—এক্ষুণি ফিরবে।

হাসিনা : মামী, বাপ সকালে তোদের খুব খারাপ খারাপ কথা বলেছে আমি সব শুনেছি।

মা : সাদাত ভাইয়ের কোনো দোষ ছিল না। তোর জিনিস কেউ যদি না বলে কয়ে নেয়, তা সে যতো কাছের মানুষই হোক—তোর রাগ হবে না ? তোর বাপ তো বাপু ঠিক কথাই বলেছে।

হাসিনা : বাপের বাপু মাথার ঠিক নেই। ভাবলুম একবার আসি।

মা : তা এলি না কেন ?

হাসি : বারে ! তোমার ছেলের যা চোখ রাঙানি, আমার কেমন ভয় করে। [হঠাৎ] আচ্ছা মামী ঘোর তো—ঘোর—

মা : কেন ? কেন ?

হাসিনা : আহা ঘোরই না—একটু চুপ করে থাকতে পারো না ?

ফিতেটা তুলে নেয়।

মা : ওটা দিয়ে আবার কি হবে ?

হাসিনা : কেউ যখন কোনো কাজ করে, তখন চুপ করে থাকতে হয়।

মা : ও ?

হাসিনা : দশ—পনেরো—তেরো।

মা : ওটা দিয়ে কি হবে ?

টেবিলের ওপর সস্তার খাতার মধ্যে লিখতে লিখতে

হাসিনা : তোমাকে একটা জামা—

কোঁচড় থেকে মুড়ি পড়ে যায়।

মা : তুই বাপু বড় ছটফটে। নিজের মুড়িটুকু আগলে রাখতে পারিস না ? বিয়ে হলে করবি কি ?

হাসিনা : কেন তোমার ছেলে কি মুড়ি নাকি ?

হেসে মাকে জড়িয়ে ধরে।

মা : গায়ের মাপ নিলি কেন ?

হাসিনা : মামী, আমি তোমাকে একটা ভালো ব্লাউজ বানিয়ে দেবো।

মা : ওমা ! কাপড় পাবি কোথায় ?

হাসিনা : সে আমার আছে, তোমায় ভাবতে হবে না।

মা : না-না-না।

হাসিনা : বারে, আমার নিজের বুঝি টাকা থাকতে নেই ? আমি যদি নিজের টাকায় তোমায় কিছু করে দিই তুমি নেবে না কেন ?

মা : না-না—আমি তা বলি নি। বলছি কি, মিছিমিছি টাকাগুলো খরচ করবি কেন ? আমার তো আছেই ! [গায়েরটা দেখিয়ে] তাছাড়া এটা তো নতুনই।

হাসিনা : নতুন না ছাই ! আমি বুঝি জানি না ? আমি বানিয়ে দেবো— তোমায় নিতে হবে—ব্যাস।

সন্তর খাতার কাগজটা ছিঁড়ে নেয়।

মা : [একটু রূঢ় স্বরে] ওটা ছিঁড়িস না। রেখে দে, ওটা রেখে দে বলছি ! কেন, কেন—কেন ধরিস ওসব ? আর কোনদিন ওখানে হাত দিবি না। [হাসিনা মাথা নিচু করে করে থাকে] তোরা সবাই মিলে আমায় এত জ্বালাস কেন ?

হাসিনা : মামী—মামী ! [কেঁদে ফেলে] আমার মনে ছিল না। আর কোনদিন হাত দেবো না—দেখো—সত্যি বলছি।

মা : তোরা সবাই সমান—সবাই। তোরা কত দেখিস—কত জায়গায় যাস— তোর মামা ঘরের চৌকাঠ পেরোলেই আমার কথা ভুলে যায়—কালীর চাকরী আছে—আমি—আমি কি নিয়ে থাকি ? শেষ বারের মতো—

হাসিনা : মামী, কেঁদো না—কেঁদো না, কাঁদলে তো আর সন্তভাই ফিরে আসবে না।

মা : [উদাস-উদ্দেশ্যহীন] কিন্তু বাঁচার জন্য ও যে বড়ো ছটফট করতো— সবাইকে বড়ো আপন করে নিতে চাইতো—এত জীবন ছিল ওর মধ্যে তাই বোধ হয়—সত্যিই তো যারা যায় তারা তো আর ফিরে আসে না। [হঠাৎ যেন দমটা জোরে নিয়ে] হাসিনা, মা আমার, আমাকে একটু দূরে কোথাও নিয়ে যাবি ? আমার যে আর কিছুই ভালো লাগে না। একটু খোলামেলা জায়গাতেও যদি দিন কয়েকের জন্য যেতে পারতাম—এই অন্ধকারে চোখের মণিদুটো কেমন ঘোলাটে লাগে—ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসে—হ্যাঁরে, তোর তেমন কোনো জানা শোনা জায়গা নেই ?

হাসিনা : আমার মামার বাড়ি। যাবে ?

মা : যাবো। খুব খোলামেলা জায়গা ?

হাসিনা : হ্যাঁ। আগে রেলগাড়ি করে ডোমজুড়ে নেমে তার পরে নদী—

মা : নৌকা করে যদি একবার—একবার মেঘলা দিনে আমায় নিয়ে যেতে পারিস—

হাসিনা : যাবো—পীরের দরগার কাছে, শুক্রবার শুক্রবার হাট হয়—

মা : মেলা ?

হাসিনা : মেলাও হয়। কত দূর দূর থেকে পুতুল নাচ – যাত্রা – পীরের গান – কবির লড়াই – আমি তোমাকে সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবো। মামার নৌকা আছে। আমি তো বাইতে পারি। তুমি আমি যাবো। মামী, যাবে তো ?

মা : যাবো। কিন্তু সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসবো, কালী যে ঘরে এসে আমায় দেখতে না পেলে –

হাসিনা : তাহলে চলো আমরা তিনজনে মিলেই যাই – তোমার ছেলেরও খুব ভালো লাগবে, আমি তো জানি। দেখো, যাবে তো মামী ?

মা : যাবো। কিন্তু তোর মামা যে আবার সন্ধে হলেই কোথা কোথায় ঘোরে ! আমার ভাবনা কি কম ?

হাসিনা : মামা ? ও কিছু ভাবতে হবে না। সন্ধে হলেই মামা আর বাবা দুজনেই ইয়ার দোস্ত। দিনের বেলায়ই শুধু ঝগড়া-কাজিয়া। আমি বাবাকেও চিনি – মামাকেও চিনি –

একটু জড়িত, ঈষৎ মত্তপ গলায় নিরাপদ ও জ্যাকসনের ইংরাজী গান শোনা যায়। দেখা যায় নিরাপদ ও জ্যাকসন আসছে।

ঐ তো মামা আসছে। সঙ্গে আবার কে দেখ।

মা : হ্যাঁ রে, তাই তো ! কে বল তো ?

হাসিনা : হবে কেউ মামার জানা-শোনা। মামার কোনো বন্ধু বোধ হয়।

মা : আবার কোনো পাওনাদার নয় তো ?

হাসিনা : দূর ! দেখছো না দুজনে কেমন হাসতে হাসতে হেলে দুলে আসছে।

মা : হাঁা, তাই তো, হাসিনা আয়, আয়।

ওরা তাড়াতাড়ি মুড়ি কুড়িয়ে ভিতরে চলে যায়। ভিখিরী এবার খানিকটা চলে যাচ্ছিল, ইংরেজী গান শুনে আবার তার বোল বলতে থাকে। কিছুক্ষণ থেমে, ভিখিরী যেদিক দিয়ে ঢুকেছিল, সেইদিকে বেরিয়ে যায়।

জ্যাকসান আপাদমস্তক সী-ম্যান। জ্যাকেট, গলায় ক্রশের চেন। তামাটে তার গায়ের রঙ – হাতে উল্কি। নিরাপদর চোখে দামী বিলিতি সান্‌গ্লাস।

নিরাপদ : [জড়িত গলায়] তা আমায় তুমি দূর থেকে দেখেই চিনতে পেরেছ জয়কৃষ্ণ ?

জয় : নো ব্রাদার, নট জয়কৃষ্ণ। বিলেত ঘুরে আসার পর এখন আমি জ্যাকসন। নো ফানি। সী-ম্যান সমুদ্রের ডলফিন। হোল ওয়ার্ল্ড টুর করেছি।

নিরাপদ : হোল ওয়ার্ল্ড ? এ্যাঁ ? শালা দুনিয়ায় কত কি ঘটছে – এই বস্তি আর চোলায়ের দোকানে বসে থেকে তো টেরও পাই না – তবে কিনা আজ কিন্তু চোলাইয়ের দোকানে না গেলে তোমার সঙ্গে দেখাও হতো না জ্যাকসন।

জয় : ইয়েস জ্যাকসন। জ্যাম্বো জেট দেখেছো ? জ্যাম্বো ? তারা এ্যাডভার্টাইস

দেয় — সব শালা আমি মুখস্ত করেছি। তারা এ্যাডভার্টাইস্ দেয় "সেলর ইউ হ্যাভ এ গার্ল এভরি পোর্ট, বাট আই হ্যাভ নাইন দেম ইন ওয়ান মাই জ্যাম্বো জেট্"। ওয়েল নিরাপদ, লাইফ এনজয় করতে চাও তো সী-ম্যান হও। জ্যাম্বো জেটকে চ্যালেঞ্জ — এভরি পোর্ট আই গট ফাইভ্ গালর্স। কোন শালার পোর্টএর চলতি আইন কানুন তোমায় ছুঁতে পারবে না। যদি আইন মাফিক বেআইনি তুমি কাজে লাগাতে পারো। স্রেফ নোট। মাল। টু ডে আই ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ফিফ্‌টি ফাইভ থাউস্যাণ্ড মানি। নো ফানি হোয়াট ইউ কল ?

নিরাপদ : তুমি লাখোপতি জ্যাকসন। তোমার গায়ের রঙও ফিরেছে। ইউ নাউ হেভি। কাম ইন জ্যাকসন। দিস ইজ মাই হাউস। আমরা এসে পড়িছি। এই হলো আমার ভব-বৃন্দাবন — নিকুঞ্জ কানন — নিরাপদ-কুটির।

গলা খাঁকারির শব্দে হাসিনা এসে মিষ্টি মিষ্টি মুখে দরজার কাছে দাঁড়ায়।

নিরাপদ : কে মা হাসিনা ? তোমার মামী কোথায় মা ? হয়্যার গন্ ?

হাসিনা : মামী ভেতরে।

নিরাপদ : ভেতরে ? শিগ্‌গির তাকে ডাকো, বলো আমার বন্ধু এসেছে। এখনও ভেতরে কেন ? [হাসিনা চলে যায়] কাম ইন, কাম ইন জ্যাকসন। সিট ডাউন সিট ডাউন জ্যাকসন। কি খাবে বলো ?

জয় : উই আর সী-ম্যান। পেট আমাদের সব সময়েই ভর্তি থাকে। নো ফুড, ওন্‌লি ড্রিঙ্ক। আই মিন তুমি আমি দুজনেই এখন ফুল বটম বেলি। পেট আমাদের দু জনেরই ভর্তি। নো অফারিং। হয়্যার ইজ ইয়োর ওয়াইফ ? আই মিন বৌদি ?

নিরাপদ : বৌদি বৌদি ? গিন্নি [মা ঢোকেন] জ্যাকসন — মাই ওয়াইফ শ্রীমতী সন্ধ্যারানী দাসী। সন্ধ্যারানী — কুইন অফ দি ইভিনিং — ইউ নো — মাই ওয়াইফ।

জয় : হা-ডু-ডু বৌদি ? বৌদি. বললাম কারণ দিস নিরাপদ অ্যাণ্ড মি আমরা একই ক্লাসে পড়তাম — ও ছিল আমার চেয়ে তিন বছরের বড়। দ্যাট ইজ ইউ মাই বৌদি। অ্যাণ্ড চার্মিং বৌদি।

নিরাপদ : গিন্নি তোমায় চার্মিং বললো ! এর মানে তোমায় পরে বলব।

হাসিনার উদ্দেশে।

আর এই হলো আমার দোস্ত হাসিনার মেয়ে সাদাত আলি। [ভুল শুধরে] না-না — সাদাত আলির মেয়ে হাসিনা, গুড গার্ল।

জয় : হা-ডু-ডু ?

হাসিনা হেসে ফেলে। পরমুহূর্তেই সামলে নেয়

নিরাপদ : গিন্নি জ্যাকসন — জ্যাকসন — জ্যাকসন — আমার বন্ধু। টু ডে

হোল ওয়ার্ল্ড টুর করা সী-ম্যান ডলফিন, লাখপতি। ইস্কুলে আমরা দুজনেই ছিলাম মাইও টু মাইও ক্লোজ ফ্রেণ্ড।

জয়: ভেরি ক্লোজ বৌদি। সব মাস্টার ছাত্র সব ব্যাটা আমাদের দেখে জ্যেলাসী হতো। আমাদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করতো। বাট ক্লস এভরি ডে বরাবরই আমি ছিলাম স্ট্রং বডি বয়, স্রেফ ঘুঁষি চালাতাম। কোন ছাত্রকে রেহাই দিই নি। একবার এক মাস্টারকেও দু ঘা দিয়েছিলাম। তবে ইয়োরস হাজব্যাণ্ড আই মিন দিস নিরাপদ বরাবরই একটু ভীতু ছিল। মানে কি ফিয়ার।

নিরাপদ: নো ফিয়ার। নো ফিয়ার। এ্যাণ্ড এই নিরাপদ দাস মেরিটরিয়াস স্টুডেন্ট অফ ক্লাস সিক্স—সব্বাইকে টেক্কা দিত। তোমার মনে আছে জ্যাকসন?

জয়: ইয়েস আই রিমেম্বার। আমার মনে আছে। এই ক্লাস সিক্সেই একবার জানেন বৌদি হেড-স্যারের কলার চেপে ধরেছিলুম বলে আমায় ইস্কুল থেকে লাস্ট্রিকেট করে দেয়। এ্যাণ্ড দেন আই অ্যাম ফোর্টিন, মাত্র চোদ্দ বছরের একটা নিস্পাপ শিশু।

নিরাপদ: গিন্নি তুমি জানো না হেড স্যারকে মারার ব্যাপারে জ্যাকসনের কোন দোষই ছিল না। রাগে দুঃখে কেঁদে কেটে আমিও শালা ইস্কুল ছেড়ে দিলাম। ইউ রিমেম্বার জ্যাকসন?

জয়: ইয়েস আই রিমেম্বার। তখন থেকেই মনে খালি ধান্দা ওয়ার্ল্ড—ফুল ওয়ার্ল্ড দেখতে হবে। ব্যাস। ৭ বছর স্রেফ ঘরে বসে কাটিয়ে দিলুম। তার পর একদিন সোজা চলে গেলুম পোর্ট। আই মিন মেরিন হাউস। নাম লেখালুম। হেল্থ টেস্ট করলো। নেক্স্ট টাইম্ কল এলো। এবং প্রথমেই কোথায় গেলুম জানেন বৌদি? বার্সিলোনা!

নিরাপদ: জায়গাটা যেন চেনা চেনা লাগছে? ওয়ার্ল্ড-এর ঠিক কোন্ দিকটায় বলো তো?

জয়: স্পেন। ক্যাপিটেল? ইউ নো? স্পেনের রাজধানী? মাদ্রিদ। তারপর কল এগেন এ্যাণ্ড এগেন কল—এ্যাণ্ড ভয়েজ—সমুদ্র পাড়ি। সমুদ্র, জানেন বৌদি সমুদ্রের কোন শেষ নেই।

নিরাপদ: সমুদ্রের কোন শেষ নেই গিন্নি। সব ডলফিন।

জয়: অ্যাণ্ড টু-ডে বৌদি অ্যাফটার নাইনটিন্ ইয়ার্স হোল ওয়ার্ল্ড টুর দিয়েছি!

নিরাপদ: হোল ওয়ার্ল্ড? নাইনটিন ইয়ার্স? উনিশ বছর। ফেল্না নয়। ভাবো একবার। লঙ লঙ এগো—সো লঙ এগো—নো বডি নোজ হাউ লঙ এগো? জ্যাকসন তোমার মনে পড়ে সেই পদ্যটা?

মা : আপনারা কথা বলুন—আমি চা করে আনি ?

জয় : নো টী প্লীজ বৌদি। উই আর বেলি-ফুল। মানে পেট একদম অল লোডেড কারগো-শিপ।

নিরাপদ : মানে মাল ভর্তি জাহাজের খোল।

মা : আপনারা তাহলে গল্প করুন আমি রান্নাটা দেখে আসি।

মা চলে যায়।

নিরাপদ : পোয়েট্রি। মনে পড়ে জ্যাকসন ?

জয় : হোয়াট ইউ পোয়েট্রি কল ব্রাদার—

নিরাপদ : লিটিল মিস মুফেত—

জয় : ইয়েস আই রিমেম্বার। স্যাট ওন এ টুফেত—

নিরাপদ : ইটিং হার কার্ডস অ্যাণ্ড হোয়াই।

জয় : দেয়ার কেম এ স্পাইডার অ্যাণ্ড স্যাট ডাউন বিসাইড হার—

নিরাপদ জয় : এ্যান্ড ফ্রাইটেণ্ড মিস মুফেত্ এ্যাওয়ে।

নিরাপদ : হোয়াট এ মেমোরি ? হোয়াট এ মেমোরি—শালার হেড স্যার মাইরি তোমার মতো স্টুডেন্টকেই দিলে লাষ্টিকেট করে ? হেড স্যার একটা বাঞ্চোৎ।

জয় : [কালীকে দেখিয়ে] হু হি ? ইয়োর বয় ?

নিরাপদ : কালী। কালীচরণ। মাই ফার্স্ট বয়, বিজি সন। সংসারে দেখাশুনার কাজে লাগিয়ে দিয়েছি। চাকরি দিয়েছি। এবার দেবো বিয়ে।

জয় : ইয়েস ম্যারী। আর্লি টু বেড অ্যাণ্ড আর্লি টু রাইজ ইন দি মরনিং। সমুদ্রেও যে নিয়ম তোমার ডাঙ্গাতেও তাই—

নিরাপদ : জুয়েলারী বয় আমার কালীচরণ জ্যাকসান। কালী ? কাম। এদিকে এসো। পরিচয় করো—মাই বেস্ট ফ্রেণ্ড, একমাত্র বন্ধু জ্যাকসন—হোল্ ওয়ার্ল্ড টুর করা সী-ম্যান এবং এই আমার ফার্স্ট সন কে. সি. দাস।

জ্যাকসন : হা-ডু-ডু ?

নিরাপদ : গেট আউট। গেট আউট। সংসারের দেখাশুনার কাজে লেগে যাও। কেমন দেখলে ?

জ্যাকসন : গুড বয়। নট স্ট্রং বডি বয়।

নিরাপদ : শুধু একটাই দোষ—বাই উঠেছে মোচলমান মেয়ে—ঐ যে দেখলে বিদুষী—হাসিনা, আমার স্যাঙাৎ সাদাত—তার মেয়ের সঙ্গে লাভ। বিয়ে করতে চায়।

জ্যাকসন : আমরা সী-ম্যান আমরা বলি লাভ ইজ এ লাইফ। ভালবাসাই জীবন।

নিরাপদ : জ্যাকসন তুমি বিয়ে করো নি ? ভালবেসে ?

জ্যাকসন : বিয়ে ? নো ওয়ারল্ড-এর প্রায় সব দেশের মেয়েই আমি দেখেছি। বাট টু টেল ইউ ওপেন, বিয়ে করে কেউ সুখী হয় না। তুমি তো বিয়ে করেছো নাউ টেল মি ওপেন, তুমি সুখী ?

নিরাপদ : একদম না। একটুও না। এ কি শালার সংসার না ভাগাড় !

হাসিনাকে ডাকতে ডাকতে সাদাত ঢোকে।

সাদাত : হাসিনা—এই হাসিনা—বলি হাঁড়ি চড়বে কি চড়বে না ? বেলা কটা হলো খেয়াল আছে ? না পরের উনুনে ফুঁ দিলেই নিজের পেটের ভাত ফুটবে ?

হাসিনা : [রান্নাঘর থেকে এসে] সকালে যে বলে গেলে বাইরে খাবে।

সাদাত : আমি খাই না খাই আমি বুঝবো, তুই কি গিলবি ?

হাসিনা : সে আমিও বুঝবো।

মা : [উঁকি দিয়ে] আমি ওকে আজ এখানে খেতে বলেছি।

সাদাত : তা হলে তো চুকেই গেল বৌঠান। মানে কি, তাহলে আমার দিকেও একটু নজর রাখবেন।

নিরাপদ : ফিস্ট, ফিস্ট কালী, আজ আমাদের একটা গ্র্যাণ্ড ফিস্ট হয়ে যাক। আমার বহু পুরনো বন্ধুরও দেখা পেয়ে গেলাম আজ, কি বলো জ্যাকসন ?

জ্যাকসন : নট টু ডে বৌদি। আজ নয়, আজ আমার লাঞ্চ অন্য জায়গায়।

নিরাপদ : ইউ ক্যান্‌সেল ইট। বাতিল করে দাও, ঠিক আছে ঐ কথাই রইলো। কালী, গ্র্যাণ্ড ফিস্ট। সাদাত সিট হিয়ার। কাম সিট ডাউন। পরিচয় করিয়ে দিই—আমার বন্ধু—জ্যাকসন হোল ওয়ারল্ড ট্যুর করা ছোটবেলার ইস্কুলের বন্ধু সী-ম্যান, ডলফিন। আর এ হলো আমাদের বস্তিওয়ালা সুদখোর—ফুটপাতের দোকানদার। সন্ধে হলেই মদ, তাড়ি, চোলাই খায়—আমার পুরনো স্যাঙাৎ সাদাত আলি। রাত্রিতে চোখে কম দ্যাখে।

জ্যাকসন : হা-ডু-ডু ?

নিরাপদ : এ বেটা উত্তর দে—হা-ডু-ডু ?

জ্যাকসন : রথম্যানস্‌ সিগারেট খাবেন ? আপনি সুদখোর ? তাসখেলা জানেন ? থ্রি কার্ডস তিন পাত্তি ?

সাদাত : না। আর আমি সুদখোরও নই। সামান্য লেনদেনের কারবার।

ভেতরে থেকে কালী ও মা-এর নীচের কথা শোনা যাবে

কালী : বাবা তো দিব্যি ফিস্টের কথা বললো। এত মাল কোথায় ? সামান্য একটা কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত নেই। ফিস্ট ?

মা : তুই বরং দুটো ডিম নিয়ে আয়।

নিরাপদ : তুমি তো তখন বিলেতে জ্যাকসন। তোমার এই রথম্যানের প্যাকেট আর ম্যাচলাইট দেখে আমার মেটেবুরুজের পুরনো দর্জি লাইফের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

সাদাত : আর আমার মনে পড়ে যাচ্ছে পয়লা বিয়ের কথা। তখনও এমন লম্বা লম্বা সিগারেট পাওয়া যেতো। পয়লা বিয়েতে বাজনার কি ঢং—আলোর কি রোশনাই বয়স তখন কম। দুনিয়ার রঙও তখন অন্য রকম।

জ্যাকসন : প্রথম প্রথম বিয়েতে কিন্তু সকলেরই এই আপনার মতো দুনিয়ার সব রঙ চঙ মনে হয় তারপর সব ফর্সা। স্রেফ সাদা। লম্বা এক মাস্তুল তার সঙ্গে লাগান থাকে মোটা এক বাঁশ। তাও সাদা।

নিরাপদ : মেটেবুরুজ। মাই ডিয়ার। সাহেব মেমদের লম্বা লম্বা গাউন বানাতাম কাপড় লাগবে পাঁচ গজ—তো চাকরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিতো ছয়-সাত কখনো কখনো আট গজ পর্যন্ত। তবে এই মেমেদের লেডিস কাজে সবচেয়ে শক্ত হলো বুকের আর পেছনের আঁটো আঁটো সেলাই, আর সে সুতোই বা কি! পোমে চড়িয়ে নয় নম্বর সুঁই দিয়ে তিল করে গিলতে হতো—তার এক এক ডিজাইনে এক এক জগৎ এক এক বাহার—ঘুমাইলে শালার স্বপ্নের মইধ্যে গ্যাখতাম ···

সাদাত : তা তুই এখন দিনের আলোয় খোয়াব দেখতে থাক [নিরাপদর দিকে কটাক্ষ করে] আমি আমার মুন্নি বখরীটারে আর একবার দানাপানি দিয়ে আসি—

নিরাপদ : তুই একটু ভালো মতোই দানাপানি দিস। না খাইয়ে খাইয়ে শালার ছাগল যেন একেবারে কাঠবেড়ালী মেরে গেছে!

জ্যাকসন : বাট নট ভেরি লেট।

নিরাপদ : এই সাদাত—এ ইংরাজির অর্থ হইল তোর ঝট্‌পট্ করার কিছু নেই।

নিরাপদ : তাহলে? জ্যাকসন, তোমার পজিশান এখন কোথায়—একবার ভাবো!

জ্যাকসন : টপ। টপ টু দি ওয়ারল্‌ড।

নিরাপদ : কি চেহারা—কি জামা-জুতো—সিগারেট—ম্যাচলাইট—কি তোমার ইংরেজী! জ্যাকসন, তোমারে একটা কথা বলবো—মানে কি ছেলেবেলায় এক সঙ্গে ইস্কুলে প্রাণের বন্ধু ছিলাম তো—তাই জিজ্ঞাসা করছি, একটা কথা বলবো, মনে কিছু করবে না তো?

জ্যাকসন : নো মাইনড নিরাপদ।

নিরাপদ : জয়কৃষ্ণ—

জ্যাকসন : নো জয়কৃষ্ণ। আমি এখন জ্যাকসন।

নিরাপদ : না-না—তুমি আমার কাছে এখনও সেই জয়কৃষ্ণই আছো। জয়কৃষ্ণ, আমি দু বেলা ভাল মতো পেটভরে খেতে পাই না রে ভাই! ছেলে আমায় হপ্তায় হপ্তায় হাত খরচা দেয়, কত জানো? মাত্তর দু-টাকা। জয়কৃষ্ণ, মাইরি

তুমিই বলো, কোন শালার ভদ্দরলোকের এ ভাবে চলে ? ভায়া মদ তাড়িতে আমার কোনদিন বমি হয় নি—গেলো পরশু, সেই আমিই শালা ঢক্ঢক্ করে গ্যালন গ্যালন বমি করলুম। মাথা ভার—হাঁটু শালার যেন আর চলতেই চায় না। কেন বলো তো ? এ শালার পেটে সারাদিন কোন দানাপানিই ছিল না। জয়কৃষ্ণ, আমি এই বস্তির গু-মুতের নালায় আছাড় খেয়ে পড়ে গেলাম। পাড়ায় ছিল শনি পুজো—এই বস্তির হাড় হাভাতে হারামীর বাচ্চারা টপাটপ পুজোর বাতাসা খায় আর আমায় মাতাল ভেবে লুঙ্গিতে টান মারে—ইট ছোঁড়ে—আমি শালার পুজোর একটু সিন্নিও পেলাম না। ভায়া, তুমি যখন সংসারের কথা জানতে চাইলে তখন এমন বানিয়ে বানিয়ে বললাম—তুমি সব কথা বিশ্বাস করো নি তো ? মাইরি জীবনে শালা এই কি হবার ছিল !

জানলার ফাঁক দিয়ে কালী ও হাসিনার মুখ দেখা যায়। ওরা বোধ হয় এতক্ষণ নিরাপদের সব কথাই শুনছিল।

এ ভাবে কোন মানুষ বাঁচতে পারে ? মাইরি, তুমি আমাকে এখান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যাবে ? সব শালাকে আমি ঘেন্না করি—বৌ-ছেলে-পাড়া পড়শী—সব—সব শালাকে আমি ঘেন্না করি। তুমি আমায় বাঁচাও। আচ্ছা, আচ্ছা আমি শালার মানুষ তো ! ভালো খাবো, জামাজুতো পরবো, আর পাঁচজন লোকের সঙ্গে হেসে হেসে কথা কইবো—হাল্কা মত একটু মদ খাবো—চাঁটের সঙ্গে মেটে—কাজুবাদাম—কি বলো, তাই না ? জয়কৃষ্ণ ভাই আমার, আমায় একটু সাহায্য করো না ? যে কোনরকম সাহায্য। তোমার তো ব্যাঙ্কে অনেক টাকা। তুমি কতো বড়লোক। পারবে না ? ভদ্দরলোকের রক্ত আমার গায়—ছোটলোকি তো অভাবে। পারবে না ? জয়কৃষ্ণ ?

জ্যাকসন অবাক। চিন্তান্বিত। একটু রূঢ়। এবার অপমানিত। একটু ক্রুদ্ধ।

জ্যাকসন : বেগিং ? ভিক্ষে চাইছো ? না। তাই বা কি করে হবে ? তুমি আমার বন্ধু। মাইণ্ড-টু-মাইণ্ড ক্লোজ ফ্রেণ্ড, তুমি নিশ্চয়ই ভিক্ষে চাইছো না ?

নিরাপদ : না-না-না। ভিক্ষে নয়। সাহায্য। একটু সাহায্য করো আমায়। আবার ঠিক উঠে দাঁড়াবো। ভায়া আমার—কালীর মাইনে কতো জানো ? ১১০ টাকা। তাও শালার কারখানায় ধর্মঘট। মায়না পায় না।

জ্যাকসন : ওনলি, মাই গড ! কি করে বেঁচে আছো তোমরা ?

নিরাপদ : বেঁচে তো নেই ! [এইবার নিরাপদ ভেঙ্গে পড়ে] আমায় তুমি বাঁচাও। বেঁচে উঠে তোমার সব ঋণ আমি শোধ করে দেবো। জয়কৃষ্ণ, আমি তোমার পায়ে পড়ি—এখানে কেউ নেই—কেউ দেখবে না—কেউ জানবে না। একবার তুমি আমায় কথা দাও। কথা দাও ভাই।

জ্যাকসন : নাও ইউ বেগিং। এবার তুমি ভিক্ষে চাইছো নিরাপদ। আমি

লিভারপুল — রটারডাম — ভার্সাই — হামবুর্গ — সিসিলি — সব জায়গায় দেখেছি ভিখিরী। বেগারস্! কি করে তারা? ভিক্ষে চায়। বেগিং। কিন্তু তোমার মত হাত-পা ধরে না। সব চাইতে বেশি ভিখিরী ইটালিতে। আমি ইটালির কল এলে যাই না। জাস্ট ক্যান্সেল করি। ইণ্ডিয়া ফিরে এসেও দেখি তাই! ইউ মাই ফ্রেণ্ড, আমার পুরনো বন্ধু হয়ে তুমিও সেই ভিখিরী? মাই গড! নেভার — নেভার কক্ষনো না, আর কখনো আমি ইণ্ডিয়া ফিরবো না — [পোরটেবল থেকে মদ খায়] মাদারল্যাণ্ড — আমার জন্মভূমি ভিখিরী — হোয়াট এ স্যাড্? কি কষ্ট? [আবার মদ] নো লাঞ্চ — আমি কোন ভিখিরীর ঘরে লাঞ্চ খাই না। নাউ আই গো। আমি যাচ্ছি। তুমি আমার পেছনে পেছনে আসবে না। ডোণ্ট সে মি জয়কৃষ্ণ! বিলেত ঘুরে আসার পর এখন আমি জ্যাকসন। ইউ আর এ বেগার। মাই মাদারল্যাণ্ড এ বেগার — হোয়াট এ স্যাড্!

জ্যাকসন বেরিয়ে যায়। লাইটার নিঃত ভুলে যায়। নিরাপদ কাঁদতে কাঁদতে বৃথাই চেষ্টা করে জ্যাকসনকে ধরতে। পারে না। বসে থাকে। জানলার ধারে কালা ও কালীর মুখটা রূঢ় হয়ে ওঠে। হাসিনা তাকিয়ে থাকে কালার দিকে।

সাদাত মিঞাকে দেখা যায় জামা পরে হাত মুখ ধুয়ে হাঁক পাড়তে পাড়তে আসছে।

সাদাত : কই গো বৌঠান বেলা যে চড়চড় করছে। এবার ফিস্টিটা পাতে পাতে তুলে দেন।

ঘরে ঢুকেই বুঝতে পারে সবকিছু কেমন যেন নির্বাক। বুঝতে পারে না এই আকস্মিক নৈঃশব্দ্যের কারণ কি।

—মাই মাদারল্যাণ্ড এ বেগার। হোয়াট এ স্যাড!

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রথম দৃশ্য যেখানে শেষ হয় দ্বিতীয় দৃশ্যের শুরু সেখানে। জানালায় কালী ও হাসিনার মুখ দেখা যায়। এ ঘরে রিক্ত ব্যর্থ নিরাপদ জ্যাকের ফেলে দেওয়া লাইটার হাতে থম্ মেরে বসে থাকে। চোখে জল। সাদাত মিঞাকে আসতে দেখা যায়। সাদাত কই গো বৌঠান বেলা যে চড়-বড় করেছ—এবার ফিষ্টিটা পাতে পাতে তুলে দেন। ঘরে ঢুকেই বুঝতে পারে সবকিছু কেমন নিশ্চল।

কালী : মর। মর। শালা—অকৃতজ্ঞ—চামার—ভিখিরী। জন্ম-ইস্তক সুখের মুখ দেখলাম না একদিন—যে ভাবে পারি সংসারের জন্য জোয়াল কাঁধে খেটে চলেছি—আর এদিকে উনি—কোথাকার কোন এক মাতাল—গুণ্ডা—স্মাগলার-বন্ধু, তার পায়ে পড়ে কেঁদে-কঁকিয়ে যেতে চাইছেন সগ্গের সিঁড়ি দেখতে। না—বেরোও—আজই এই মুহূর্তে! বেরোও তুমি। তোমাকে আমি আর সহ্য করতে পারছি না—বেরোও। নির্লজ্জ-বেহায়া—

নিরাপদ চুপ করে থাকে। চোখে জল।

সাদাত : এ আবার কি নতুন ব্যাপার? কালী, ও কালী, বলি তোমার বাপের বন্ধুটি গেলেন কোথায়?

হাসিনা : বাবা, তুমি একটু বাইরে যাও না।

কালী : [হঠাৎ সাদাতকে] সাদাত কাকা তোমার হাতে কেমন জোর? কেমন শক্তি? দু হাতে একবার এই গলাটা টিপে আমায় মেরে ফেলতে পারবে? পারবে মেরে ফেলতে?

সাদাত : কেন? এ সব কি কথা? নিরাপদ চুপ মেরে আছে কেন? বৌঠান—বৌঠান কোথায়?

হাসিনা : মামীকে ডেকো না। মামীকে তুমি এর মধ্যে ডাকবে না বাবা।

সাদাত : বেশ। কিন্তু কী এমন হলো—কোথায় খাবো ফিস্টি—না এখন খামোকা হোটেল খর্চা।

সাদাত কি ভেবে কে জানে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ লাইটারটা দেখতে পায়। লাইটার তুলেছে দেখে নিরাপদ খপ্ করে ওর হাত থেকে লাইটারটা কেড়ে নেয়।

সাদাত : না-মানে আমি দেখতে নিয়েছিলাম···

হাসিনা : বাবা তুমি এখন যাও।

হাসিনা সাদাতকে বাইরে ঠেলে দেয়। সাদাত ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়।

কালী : 'ছোটলোকি তো অভাবে'—'ছোটলোকি তো অভাবে'—এঁ্যা, তা এতোই যখন বোঝ, অভাবটা দূর করার মুরোদ নেই কেন? মাতাল—জন্ম-ভিখিরী!

নিরাপদ : [জ্যাকের লাইটারটা নাড়াচাড়া করতে করতে] শালার বড়লোক বন্ধু আমার যকের ধন ফেলে গেছে।

কালী : ফেলে গেছে না তুমি গেঁড়িয়েছ ?

নিরাপদ : না-না—ফেলে গেছে—ফেলে গেছে—তাইই সই। এতেই হবে।

কালী : কি হবে এতে ?

নিরাপদ : এ মাল নিয়ে আমি হাতে হাতে ঘুরবো।

কালী : তারপর ?

নিরাপদ : তারপর ? তারপর যেমন করে পারি যার গচ্ছিত জিনিস তারে আমি ফেরত দেবো ! এ মাল আমি ছাড়বো না।

কালী : ফেরত দেবে ? তুমি ?

নিরাপদ : হ্যাঁ আমি—এই আমিই তারে ফেরত দেবো।—সারা দুনিয়ার যকের ধন এই আমার হাতে। এবার আমি যাই—[কেঁদে ফেলে] তুই আর আমায় বকিস না কালী। তুই সর, এবার আমি যাই।

কালী : কোথাও যাবে না। চুপ করে এখানে বসে থাকো। আমি জানি ও লাইটার বেচে আবার তুমি মদ খাবে। তোমার ফিস্ট—গ্র্যাণ্ড ফিস্ট—একা—তোমাকে একা একাই সব গিলতে হবে, এই আমি বলে দিলাম।

কালী কথাটা বলে থামতে না থামতেই নিরাপদ নাটকীয় ভঙ্গিতে দরজা দিয়ে ছুটে বাইরে এসে লাইটারটা হাতে-ধরে উঁচুতে তুলে —

নিরাপদ : জ্যাকসান, তোমার দেওয়া যকের ধন এই আমার হাতের মুঠোয় ! তোমার রটারডাম, মাদ্রিদ, সুয়েজ খাল—ফুল ওয়ার্ল্ড—এই আমার হাতের মুঠোয় ! তবু তো কিছু দিয়ে গেলে বন্ধু ! কিন্তু আমায় ছেড়ে পালাবে কোথায় ? এই আমি আসছি—আমি আসছি।

নিরাপদ বেরিয়ে যায়। মা আসেন।

মা : কি—কি হলো ?

কালী : মাগো, আমাদের আর মান-সম্মান একটুও রইল না—ঐ কোথাকার কোন এক জাহাজী গুণ্ডা, বাবা তার পা ধরে কয়েকটা টাকা ভিক্ষে চাইছিল—গুণ্ডাটার ফেলে যাওয়া লাইটারটা নিয়ে—শালা এই জন্যেই কি আমি এত বছর এই রোগা শরীরে অ্যাসিডে অ্যাসিডে হাতদুটো পোড়ালাম—এই জন্যেই কি আমার ভাইটা মরল ? মিথ্যে ! সব মিথ্যে !

হাসিনা : তুমি এত বাড়াবাড়ি করছো কেন ? তাছাড়া বন্ধুর কাছে মামা হাত পেতে ভিক্ষে চেয়েছে বলেই এ সংসারের সবকিছু মিথ্যে হয়ে যাবে ? এতো সস্তা ?

মা : তোর বাপ মাতাল হতে পারলো—চোর হতে পারলো, আর কারুর কাছে একটু ভিক্ষে চাইলেই তুই এত ছটফট করে উঠবি ? বেশ, আজ না হয় শেষ-

বারের মত বাপকে বুঝিয়ে বলিস। যদি না শোনে ঘাড় ধরে বাড়ির বার করে দিবি—আমি কিচ্ছু বলবো না।

হাসিনা : শোন, আমি একবার মামাকে বলবো। আমি তো কোনদিন কিছু বলি নি—একবার বললে মামা নিশ্চয়ই শুনবে।

কালী : আমি আর কোন বলাবলির মধ্যে নেই। ও তোমরা যা পারো তাই করবে। এতদিনে আমি একটা জিনিস বেশ বুঝতে পেরেছি—একটা চোরের, একটা মাতালের ১১০ টাকা মাইনে পাওয়া এই টি বি রোগীর মত চেহারার ছেলেটার কোন দাম নেই। যদি কোনদিন কিছু থেকেও থাকতো, তাহলেও সে সব শেষ হয়ে গেছে সেই রাতে, যেদিন সন্তু আমাদের সবাইকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলে গেল। শালা ভাবতে বেশ মজা লাগে—চোর-মাতাল ভিখিরীর ঘরেই ছিল ও রকম আমার একটা ভাই! আমাদের মত ঘরে ও রকম কোন ছেলের দরকার ছিল না! সব মিথ্যে—ফালতু—কোন দাম নেই!

হাসিনা : মুখ ফুটে বারবার মামীর সামনে এই একটা কথা বলতে তোমার একটুও বাঁধছে না?

মা : [খুব ঠাণ্ডা] কেন বাঁধবে! ওর বাপকে যদি এত বছর সহ্য করে থাকতে পারি—তাহলে ওর কথাও ধীরে ধীরে আমার সহ্য হয়ে যাবে। ওর বাপ খেতে দিতো বলেই না সব সইতে হতো! তোর কথাও আমার অভ্যেস হয়ে যাবে কালী।

কালী : মা!

হাসিনা : মামা যা করে, তাই করেছে। এতে এতো বাড়াবাড়ির কি আছে?

মা : হাসিনার মত মেয়ের বোধ হয় তুই যোগ্য নোস কালী।

কালী : আমি …

কালী এবং হাসিনা দু'জনেই মায়ের দিকে তাকায়।

মা : একটা সন্তু হারিয়ে আর একটা মেয়ের চেহারায় যাকে কাছে পেলাম—সেই হাসিনার যোগ্য বোধ হয় তুই নোস। সন্তু তো কবে শেষ হয়ে গেছে। তবু আজ সকালে যখন আমার গায়ের মাপ নিয়ে হাসিনা ওর খাতার পাতাটা ছিঁড়ল—আমার যা মুখে এসেছে আমি ওকে তাই বলেছি—ও তো রাগ করে নি। জোরে একটু কথা পর্যন্ত বলে নি। আর এই একটু আগে একটা মাতাল মানুষ যদি তার পুরনো কোন বন্ধুর কাছে কেঁদে-কঁকিয়ে একটু ভিক্ষেই চায়—তাই বলে তোর নিজের রক্তের ভাইটা পর্যন্ত তোর কাছে মিথ্যে হয়ে যাবে? তুচ্ছ হয়ে যাবে? কোনও দাম নেই? হাসিনা আর তোতে কত তফাৎ, কত ফারাক! আমার ভয় হয়, তোদের দু জনের বিয়ে হলে হাসিনার না আবার আমার মতো কপাল পোড়ে!

হাসিনা : মামী!

কালী : শোনো। আমি এতদিন কোন কথা বলি নি। এবার তোমাকে দু একটা কথা বলবো। আমি কারো যোগ্য নই। তোমার—বাবার—সন্তুর—দাদাত কাকার—কারখানার ধর্মঘটের—এই পাড়াপড়শীর কারুর—কারুর যোগ্য নই আমি। শেষ পর্যন্ত তোমার মুখ থেকেও যখন এই কথাটা শুনলাম তখন—ঠিক আছে তাই হবে। তোমরা থাকো। তোমরা সবাই যে যার যোগ্য হয়ে থাকো। আমি পারবো না। কিচ্ছু পারবো না। এই হাড় হাভাতে গুষ্টির মুখ চেয়ে কেন আমি আমার নিজের জীবন নষ্ট করি। কেন ভূতের বেগার খেটে মরি। আমার তো কোন দরকার নেই। তুমি তোমার হারানো ছেলে যদি হাসিনার মধ্যে খুঁজে পেয়ে থাকো, বাবা যদি তার পুরনো জীবন ঐ মাতাল-গুণ্ডা বন্ধুর মধ্যে খুঁজে পেয়ে থাকে, তাহলে তো চুকেই গেলো!

মা : তোর বাপের আর আমার পাওয়াকে তুই এক করলি?

কালী : জানি না। একটু আগে তুমি হাসিনাকে যা বললে তাতে শুধু বলবো তুমি আমার মা, না ডাইনী, আমি জানি না।

মা : কি? কি বল্‌লি তুই? আমি—

কথা শেষ করতে পারে না। স্তব্ধ। মূক। পাথরের মত ভারী একটা বোঝা বুকে চেপে ধরেন। আস্তে আস্তে বেরিয়ে যান।

কালী : [রান্নাঘরে চলে যাওয়া মায়ের উদ্দেশে] নিজে বেশি লেখপড়া শিখতে পারি নি বলে ছোটভাইটা যাতে মানুষ হয়—আমাদের চাইতে আর একটু বেশি লেখাপড়া শিখতে পারে—কই—অমন বিপদের রাতে একবারও আমাকে কিছু জানিয়েছিল? জানানোর দরকার মনে করেছিল? হয়তো ভেবেছিল পার্টি-পলিটিক্সের অতো জটিল কথা আমার এই অশিক্ষিত মাথায় ঢুকবে না। হয়তো ভেবেছিল আমি কিছু বুঝবো না—আসলে আমার মাইনেটা ছাড়া তোমাদের কাছে কোনদিনই আমার কোন দাম ছিল না!

হাসিনা : তুমি মামীকে ঐ কথাটা বলতে পারলে? তোমার একটুও ···

কালী : [হাসিনাকে] কেন! কথায় কথায় খালি সন্তু কেন? আমি কি সন্তুকে কম ভালোবাসতাম? আমি কি দাদার কোন দায়িত্ব পালন করি নি?

হাসিনা : মামী তোমাকে মোটেই ও কথা বলে নি। আর যা বলেছে, বলেছে। মায়েরা সব কথাই বলতে পারে।

কালী : কথায় কথায় শুধু সন্তুর সঙ্গে আমার তুলনা? হোক সে আমার ভাই—আজ সে মৃত। আমি—আমি তো এখনও বেঁচে আছি—তোমাদের কাছে একটা বেঁচে থাকা মানুষের কোন দাম নেই?

হাসিনা : কেন থাকবে না? সন্তু ভাইয়ের মারা যাবার পর মামী কেমন হয়ে গেছে তুমি জানো না? মামীর কিসে কষ্ট তুমি বোঝ না? কাজ থেকে

ফিরতে তোমার একটু দেরী হলে মামী যে কত কি ভাবে ?

কালী : ভাবে ! ভাবে শুধু আমার মাইনের কথা !

হাসিনা : [ক্রুদ্ধ] বাজে কথা বলো না।

কালী : কিসের বাজে কথা ? হাজারো অন্যায় করলেও এ সংসারে বাবাকে নিয়ে কিছু বলা যাবে না—শালা নিজের চাইতেও যাকে বেশি ভালোবাসতাম সেই ছোট ভাইয়ের সঙ্গে তুলনা করে কথায় কথায় শুধু আমাকে অক্ষম অযোগ্য বলা—তাহলে তো আমার যোগ্যতা আর ক্ষমতা শুধু—ঐ—টাকা রোজগারে—আমার মাইনেতে !

হাসিনা : তুমি চুপ করো। চুপ করো। তোমার কথা আর আমি শুনতে চাই না। তোমার মন এত ছোট ! তোমার কি দরদ বলে বুকে কিছু নেই—তুমি এত নীচ—যাও—যাও—তুমি তোমার কাজে যাও।

বলেই হাসিনা নিজে যেতে যায়।

কালী : [দু হাতে হাসিনাকে শক্ত করে ধরে] যাবও না। থাকবও না দরদ আমার নেই ! দরদ দেবারও কেউ নেই ! আমাকে কথার খোঁচায় ঘা মেরে তুমি খুব সুখ পাও, তাই না ? শোন—একটা কঙ্কালকে পাশে নিয়ে তোমার মতো মেয়ের রাত কাটুক—আমি চাইবো না। আবার অন্য কেউ তোমাকে দেখুক স্পর্শ করুক এও আমি চাইবো না। ছাখো, আমি—আমার বয়স তো খুব বেশি নয়। এ দুনিয়ায় চোখ ফুটতেই সংসারের জোয়াল নিয়েছি কাঁধে। আমি—আমি খুব দুর্বল। আমি জীবনে খুব কম মিথ্যে কথা বলেছি—লোকে আমায় ভুল বুঝেছে বেশি—সব—সবাই। আমি—জীবনে কোনদিন কোন মেয়েকে ছুঁয়ে দেখি নি। আমায় ছেড়ে তুমি যেয়ো না—আমায় ছেড়ে তুমি যেয়ো না—

হাসিনা পুরো শরীর দিয়ে কালীকে জাপ্টে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে।
মা আসেন।

মা : খেতে আয়।

কথাটা বলে মা ভেতরে যান। একটু পরে একটা থালা নিয়ে আসেন।

হাসিনা, তোর বাপ ঘরে শুয়ে আছে। খাওয়া হয় নি। থালাটা দিয়ে আয়। দেরী করিস না।

হাসিনা থালাটা নিয়ে ধীরে ধীরে চলে যায়, কালী মাথা নীচু করে বসে থাকে।

মা : খেতে আয়। পেটে তোর ব্যথার কষ্ট। সারাদিন না খেয়ে থাকলে পারবি কেন, আয়। [কালী চুপ] বাপের কথা ভাবতে হবে না। বন্ধু না কে কি ফেলে গেছে বললি, সেটা বেচে এতক্ষণে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু খেয়েছে।

কালী : মা, আমার কথায় তোমার খুব লেগেছে ?

মা : না।

কালী : সত্যি বলছ ?

মা : থাক না। ওসব কথা এখন থাক। খেতে আয়।

কালী : বাবাকে একবার দেখে আসব ?

মা : খেয়েই না হয় দেখতে গেলি — এতো নতুন কিছু না।

হাসিনা ফিরে আসে, মাথা নীচু।

মা : সাদাত ভাই খাচ্ছে তো ?

হাসিনা : থালাটা নিয়ে ঢেকে রেখে এইমাত্তর মামাকে খুঁজতে গেল।

মা : ঠিক আছে। তোরা আয়।

হাসিনা : তুমি খাবে না মামী ?

মা : সাদাত ভাই তো বল্‌লি তোর মামাকে খুঁজতে গেছে —

বাইরে থেকে ডাকতে ডাকতে হারু আসে।

হারু : কালী — কালী ! কি রে চুপ করে একা বসে আছিস কেন ?

কালী : এমনি।

হারু : চল। মিটিংয়ে যেতে হবে না ? দিনেশদা কোথায় ?

ঘরের বাইরে এসে ময়লা-ফেলা জায়গার সামনে।

দিনেশদা — ও দিনেশদা ঘুমুচ্ছো নাকি ?

যেন পাশের বস্তি থেকে দিনেশ বেরিয়ে আসে।

দিনেশ : হ ! ঘুমানেরই তো টাইম ! চলো ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া মিটিংয়ে যাই। কালী কই ?

কালী জামা গায়ে দিয়ে বেরোয়।

হারু : শোন দিনেশদা, আমরা যদি আরো কিছু দিন স্ট্রাইক চালিয়ে যেতে পারি, মালিক আমাদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হবে। এই সময় কোন রকম ভেঙে পড়া চলবে না।

দিনেশ : না, ভাঙনের কথা না।

কালী : [মায়ের উদ্দেশে] মা — আমি মিটিংয়ে যাচ্ছি। [হারুদের উদ্দেশে] চলো।

ওরা তিন জন চলে যায়, নিরাপদ সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনে ঢোকে।

নিরাপদ : গিন্নী, গিন্নী ! কোথায় গেলে ! এই ছাখো আমার হাতে কী।

মা ও হাসিনা রান্নাঘর আসে।

মা : [ভেতর থেকে এসে] কোত্থেকে এত সব আনলে তুমি ?

নিরাপদ : বাজারের দোকান থিকা। ধরো এতে চাল আছে। এই তোমার ডাল, মুগ, মুসুর, অড়হর সব মিলিয়ে এনেছি। এই তোমার বড় চিরুনী। একটা জিনিস কিছুতেই মাথায় আসছিলো না, এইবারে মনে পড়েছে। তোমার ওই আটা চালুনি, ওই একটা কিনে আনতে ভুলে গেছি। এই

কালীর নতুন গেঞ্জি, ব্যায়াম করার পর কালীর প্রোটিন – ছোলা। ভাবছো তো টাকাগুলো কোথায় পেলাম। ভগবান জুটিয়ে দিয়েছে। আমার মুখ শুঁকে দেখো, এতো টাকা পেয়েও আমি কিন্তু একবারও মদ খাই নি। শুধু এই খুঁড়িতে এট্টু মেটে এনেছি।

হু একটা জিনিস আরো বার করে। সরষের তেলের একটা টিন বার করে।

মা : তোমার এতো সব জিনিস কেনার কথা মনে থাকে ? ঘরের আর পাঁচ জনের কথা তুমি ভাবো ?

নিরাপদ : কালীর খাওয়া হয়েছে ? গেল কোথায় ?

মা : কারখানার মিটিংয়ে গেছে।

নিরাপদ : [হাসিনাকে] এই দেখো মা, তোমার জন্যে কি এনেছি ! কোত্থেকে এনেছি, কি করে এনেছি, তা কিন্তু জানতে চাইবে না। বলো তো এর মধ্যে কি আছে ?

মা : আহা তুমি ওর হাতেই দাও না ! ও নিজেই খুলে দেখুক।

হাসিনা ওটা খুলে দেখতে থাকে।

নিরাপদ : খরচের হাত বুঝলে মা। আমি কোনদিন টাকা পয়সা জমিয়ে রাখতে পারি না। আর না জমাতে পারলেই তো তুমি হয়ে গেলে ফেলনা। কি ? কেমন, পছন্দ হয়েছে তো ? পরার আগে একবার জলে ধুয়ে নেবে।

হাসিনা : লেবেলটা ছিঁড়ে ফেলবো, মামা ?

মা : ছিঁড়বিই তো ! নতুন ছাপ শুদ্ধু কাপড় আবার কেউ পড়ে নাকি !

হাসিনা : আমি জানি। মামা, তোমাকে একটা কথা বলবো।

নিরাপদ : হুঁ। কিন্তু তার আগে বলো জিনিসটা তোমার পছন্দ হয়েছে কিনা !

হাসিনা : হ্যাঁ ! খুব পছন্দ হয়েছে। বলবো মামা ?

নিরাপদ : বলো। এখন আমি সংসারে মন দিয়েছি। মদ খাওয়া চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছি। এখন ফ্যামেলির সব কথা আমায় শুনতে হবে বৈকি !

হাসিনা : [খুশির হাসি হেসে] তা হলে আর আমার কিছু বলার নেই মামা !

নিরাপদ : বসো, একটু চা খেয়ে যাও। গিন্নী, একটু চা বানাবে নাকি !

মা : এখন আবার চা খাবে কি ! তোমার তো খাওয়াই হয় নি। তা ছাড়া দুধ – চিনি –

হাসিনা : আমি ঘরের থেকে নিয়ে আসবো মামী ?

মা : না থাক, চা তুমি পরে খেও। এখন ভাত খাবে চলো।

নিরাপদ : বেশ [হাসিনাকে] তুমি ঘরে যাও মা। সবসময় এই ভাবে তোমার একা একা ঘুরে বেড়ানো ঠিক না। কাল সকালে কিন্তু একবার কাপড়টা আমায় পরে দেখিও। তোমার বাপ কই ?

হাসিনা : বাবা তো তোমাকেই খুঁজতে গেছে।

নিরাপদ : সে কি ! আমি তো এই সব কেনাকাটায় ব্যস্ত ছিলাম। আমায় কি আর শালা পুরনো ডেরায় খুঁজে পাবে। ঠিক আছে। সাদাতকে নিয়ে তুমি বেশি ভেবো না। ও আমি দেখছি, তুমি যাও।

হাসিনা : মামী গেলাম।

প্যাকেটটা নিয়ে যায়।

মা : আয়।

নিরাপদ : কালীর আর হাসিনার বিয়েটা হয়ে গেলে, তোমারও শান্তি, আমারও শান্তি। শুধু একটা কথাই ভাবি, আত্মীয় স্বজন, সমাজের আর পাঁচজন –

মা : তোমার কোন্ আত্মীয় স্বজন বিপদে তোমায় দেখেছে – সন্তু মারা যাবার পরে তারা একবারও খোঁজ নিতে এসেছে ? তুমি আর কখনো ওদের বিয়েতে আপত্তি করো না।

নিরাপদ : না আপত্তি না। সাদাত আমার অনেকদিনের বন্ধু। আমাদের বিপদে-আপদে, পয়সা-কড়ি দেয় বটে। সাদাত কিন্তু খুব কঞ্জুস। তুমি জানো তো ?

মা : তাতে কি ! বিয়েতে তো আর আমরা কিছু চাইছি না। হাসিনা তো আমাদের ঘরেরই মেয়ে। সন্তু বেঁচে থাকলে কি ওদের বিয়েতে এতো দেরী হতো।

নিরাপদ : না তা ঠিক। তবে আত্মীয় স্বজন, সমাজ, এই বন্ধনটারে তো আর তুমি অস্বীকার করতে পারো না। দেখি আমি ভাবি। তুমিও ভাবো। আমার ইচ্ছে ছিলো খুব ধুমধাম করেই বিয়ে হয়। তা শ্রীমানের আবার কারখানায় ধর্মঘট। ঠিক আছে। বিপদ আপদ নিয়েই মানুষের জীবন, তোমার খেজুরী গুড় কোথাও পাওয়া গেল না, আমার ইচ্ছে ছিলো যে একঠিলা খেজুরী গুড় আনি !

মা : সে তো আমি কবে বলেছি। তোমার এখনও মনে আছে !

নিরাপদ : তা হলেই বোঝো ! আমি, নট্ এ ব্যাড্ ম্যান, সবই আমার মনে থাকে। তোমার জন্য একটা শাড়ি কেনার কথাও আমার মনে ছিলো। কিন্তু পকেট একেবারে হাওয়া। যাকগে, আমায় একটু বেরোতে হবে। তুমি এই-গুলো গুছিয়ে গাছিয়ে রাখো। কালীকে বলো রোজ সকালে এক্সারসাইজের পর যেন ছোলা খায়। আমারে তুমি নয় আনা, না, দশ আনা পয়সা দিতে পারবা !

মা : দাঁড়াও।

বলে জমানো খুচরো পয়সার ভাঁড়টা নিয়ে আসে। গুনে গুনে পয়সাগুলো দেয়।

নিরাপদ : [গুনছে] চৌষট্টি, পঁয়ষট্টি, ছেষট্টি, সাতষট্টি। এই যে পাঁচটা পয়সা

আমার বেশি হয়ে গেল! এই নাও! রেখে দাও! আমি একবার চট করে ঘুরে আসি। তুমি মেটেটা একটু মুখে দিও কিন্তু!

মা : এখন আবার কোথায় যাবে। একটা দিন একটু ঘরে থাকো না।

নিরাপদ : এই একটু ঘুরে এসেই ঘরে থাকবো। দেখি, শালা সাদাতটা আবার বেমক্কা কোথাও হারিয়ে গেল কিনা। হারামজাদা রাতে আবার চোখে কম দেখে। যাই একবার দেখেই আসি। মনটা কেমন কু-ডাক ডাকছে। কালীরে নতুন গঞ্জি দেখাইও কিন্তু।

নিরাপদ বেরিয়ে যায়, মা একটু চুপ থেকে খুশি মনে জিনিসগুলো গুছোতে থাকে। পক্কা ও বুবু ডান দিক দিয়ে ঢোকে।

পক্কা : কালী — কালী —

মা : কাকে ডাকছো বাবা ?

পক্কা : কালী বাড়ি নেই ?

মা : না। এই তো কিছুক্ষণ আগেই বেরিয়েছে।

পক্কা : বলবেন আমরা খুঁজতে এসেছিলাম।

মা : তোমার কী নাম বলে যাও — কালী এলে আমি বলবো।

পক্কা : বলবেন অমিয়দা ডাকতে এসেছিলো।

বুবু : ভুলে গেলেও ক্ষতি নেই মাসীমা — দেখা আমাদের ঠিক হয়ে যাবে।

পক্কা ও বুবু ডানদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়, উল্টোদিক দিয়ে কালী ঢোকে।

কালী : বাবা এসেছিল ?

মা : এই গ্যাখ মানুষটা কত কী কিনে এনেছে! এতো আছেই — তা ছাড়া তোর গেঞ্জি, ছোলা — বার বার করে বলে গেছে রোজ তুই ব্যায়াম করার পর ছোলা খাবি। তোকে কারা যেন খুঁজতে এসেছিল। নাম বলে গেল অমিয়।

কালী : ও — কিন্তু বাবা এতো টাকা পেল কোথায় ?

মা : হাসিনার জন্য একটা ভাল শাড়িও এনেছে।

কালী : বাবা লাইটার-বেচা টাকায় এ সব এনেছে —

মা : যে টাকায়ই আসুক — এতদিন তো শুধু নিজেই মদ খেয়ে এসেছে — ঘরের কথা তো একবারও ভাবে নি, আজ যদি ভালোবেসে কয়েকটা জিনিস কিনে আনে, তুই তাকে খারাপ বলিস না কালী। নিজে একটু মদও খায় নি। কতো কি বললো — তোর হাসিনার বিয়ে তার কতবড় সাধ-আহ্লাদ, তোর কারখানায় ধর্মঘট — আমি ভাবতাম মানুষটার কোন গ্রাহ্যই নেই — কিন্তু না রে সব তার মনে থাকে। জীবনে সে যত ভুল অন্যায়ই করুক না কেন বাপ তো তোর — এ নিয়ে তুই আর মাথা গরম করিস না।

কালী : বাবা খেয়েছে ?

মা : না। বললো ঘুরে এসে খাবে। তুই খেতে চা।

কালী : এখন আবার কোথায় ঘুরতে গেল! বাবার কাছে কোন টাকা পয়সা আছে ?

মা : না। সব দিয়েই তো এগুলো এনেছে।

সাদাত ঢোকে, একটু টলটলায়মান।

সাদাত : নিরাপদ হাওয়া! কোথাও নেই। চোলাইয়ের দোকান—নিতাই নাপিতের সেলুন—মুচিওয়ালার ফুটপাত—নিরাপদ হাওয়া! অনেকক্ষণ একা একা চোলাইয়ের দোকানে বসেছিলুম তো—মনটা আমার খুব ভার—চ্যাটচেটে আঁটালো মালের দোকানের বেঞ্চিতে দুখানা মাছি সেঁটে গেল—আর উঠতেই পারছে না—জল ঢেলে দিলে স্লিপ খেয়ে উড়ে পালাতে পারতো—কাছে কোন জলও ছিল না। তাই একটা পাইট কিনে ছিপি খুলে একটু ঢেলে দিলুম। পাখা মেলে পাখি দুখানা আমার চোখের সামনে থেকে হাওয়া হয়ে গেল। আমি তখন একা বসে থেকে মনে-মনে খুব কাঁদছি—পুরো এক পাইট তো আর ফেলে দিতে পারি না—যদিও কিনেছিলাম মাছি ওড়াবার জন্য—তাই আমি [ঘরের কাছে আসে]—নিরাপদ এখনো ফেরে নি বৌঠান ?

হাসিনা নতুন কাপড় পরে আসে।

মা : এসেছিল, একটু কাজে বেরিয়েছে।

হাসিনা : তুমি এই সন্ধে রাতেই গিলেছো ?

কালী : সাদাত কাকা বাড়ি যাও। ভাববার কিছু নেই। বাবা ঠিক সময়েই আসবে।

হাসিনা : ভাবলুম মামাকে একবার পরে দেখাই—

মা : কাল সকালে দেখাস, এখন তোর বাবাকে নিয়ে ঘরে যা।

হাসিনা : চলো। আজ আবার সন্ধে হতে না হতেই পেটে ঢেলেছো ?

সাদাত : কি করবো—দুটো মাছি এমন ভাবে চ্যাটালো আঁটায় সেঁটে গেল—[কেনা জিনিসগুলো দেখে] নিরাপদ এগুলো বোড়েছে মনে হয়! নিরাপদ এগুলো কিনেছে বৌঠান—নির্ঘাৎ ঠকে গেছে ও—কোন দর-দাম জানে না। ও কিনতে পারে না—বৌঠান, নিরাপদর কাছে কোন বাড়তি পয়সা ছিল, না আছে!

মা : না। তার কাছে কোন পয়সাকড়ি নেই। দশ আনা পয়সা তাকে দিয়েছি, তোমাকে সে খুঁজতে গেছে।

সাদাত : [হাসিনাকে] দশ আনা পয়সা নিয়ে আমায় খুঁজতে গ্যাছে নিরাপদ! চল—আমরা ঘরে যাই। দশ আনা পয়সা নিয়ে নিরাপদ আমাকে যখন খুঁজে পাবে না তখনো ও দুখানা মাছি চ্যাটালো আঠায় বসে থাকবে। —চলি বৌঠান। আচ্ছা হাসিনা, তুই কখনো দুখানা মাছি দেখেছিস—

হাসিনা : [গজরাতে গজরাতে] তুমি এবার বাড়ি চল। তখন থেকে খালি

চ্যাটালো আঁটা আর মাছি—সোজা পা ফেলে হাঁটো বলছি। পড়ে গেলেই দেখাব মজা। এই আমি বলে রাখলাম।

ওরা চলে য য়, কালী মায়ের দিকে এগোয়।

মা : তুই বিশ্বাস করিস না কালী। তোর বাপ মোটেই মদ খেতে যায় নি। মানুষ কতরকমে বদলে যায়। তোর বাপেরও হবে। আমার মন বলছে সে চিরকাল এমন থাকবে না।

কালী : বাবা যদি আর একটু মানুষের মতো হয়—আমি সব দুঃখ ভুলে যেতে রাজি আছি মা। তখন বাবাকে এমন ভাষায় কথাগুলো বললাম—আমার নিজেরই এমন খারাপ লাগলো। আচ্ছা মা, যদি আর কয়েক মাস ধরে আমাদের কারখানায় এই স্ট্রাইক চলে তাহলে?

মা : তাহলে কি?

কালী : না বলছি কি ভাবে সংসার চলবে, তার—

মা : কারখানার আর পাঁচজনের যেভাবে চলবে, আমাদেরও তাই।

কালী : দিনেশদা কিন্তু খুব ভেঙ্গে পড়েছে।

মা : তোরা সবাই মিলে তাকে বোঝাবি, অযথা ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন।

কালী : না তা ঠিক। আসলে তোমাকে আর বাবাকে যদি আর একটু মানুষের মত রাখতে পারতাম—সত্যি কথা বলতে কি মা, জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত তোমাকে কখনো হাসিখুশি দেখেছি বলে মনে হয় না।

মা : ও—তুই নিজেই যেন কত সুখে আছিস। তোর ওপরেই তো এতগুলো মানুষের—

কালী : এতগুলো আবার কোথায়? মোটে তো তুমি আমি আর বাবা। এ আমি ঠিক চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। মাগো, আমার যে কত কথা মনে হয়—ছোটবেলায় তোমাকে দেখেছি—তুমি কত মোটা ছিলে—তোমার দু হাতে এই মোটা মোটা সোনার বালা—পরনে লাল পাড়ের দামী শাড়ি—

মা : এত কথাও তোর মনে আছে?

কালী : বারে—আমি তো এ সব স্পষ্ট দেখতে পাই। গনগনে আগুন—মাটির হাঁড়িতে গরম ভাত, লাল আগুনের আভায় তোমার মুখে অল্প-অল্প ঘাম—কত বড়ো সিঁদুরের টিপ তুমি পড়তে তখন—আর আমরা তখন—

মা : তোকে একদণ্ড না দেখতে পেলে তোর বাবা কেমন উতলা হয়ে উঠতো। তোরও তো সোনার রুলি ছিল। তোর বাপ বলতো বড়ছেলে আমার পয়মন্ত, দেখেছো জন্মাতে না জন্মাতেই সাহেবদের কেমন সুনজরে পড়ে গেছি। একবার লাল রঙের সিল্কের কাপড়ে তোর জন্যে একজোড়া জামা-প্যান্টও বানিয়েছিল।

কালী : আমি পরেছিলাম?

মা : পরেছিলিসই তো।

কালী : মাগো, জানো তোমাকে একটা সত্যি কথা বলি আমি—আমি, মনে-মনে সত্যিই সন্তুর মতই হতে চাই। পারি না। আচ্ছা, পারি না বলে কি আমি অক্ষম ?

মা : তা কেন হবে ? একজন কি কখনও আর একজনের মতো হতে পারে ? তুই তোর মতই হবি। তুই—বোস, আমি এগুলো গুছিয়ে রাখি।

কালী মাথা নেড়ে সায় দেয়। মা ওগুলো গুছিয়ে রাখতে রান্নাঘরে যায়—আবার আসে। —কালী সন্তুর ছবির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। মা ভেতরে চলে যায়। সাই-ক্লোরামায় সন্তুর ছবি ভেসে ওঠে।

সন্তু : মাগো, আমার টেবিলটা রোজ এত করে ঝেড়ে-মুছে একটা ভীষণ ভারী দমবন্ধ-করা স্মৃতি করে তুলো না। তাতে আরো কষ্ট পাবে। ব্যথা পাবে। আজ সকালে যখন হাসিনা বৌদি তোমার গায়ের মাপ নিয়ে লিখে রাখা আমার খাতার পাতাটা নিয়ে ছিঁড়ে ফেললো, তখন তুমি কিন্তু হাসিনা বৌদিকে অকারণে খুব বেশি কষ্ট দিয়েছো। আমার একার স্মৃতি কি এতই মূল্যবান ? আমি কিন্তু স্মৃতির ভারে তোমাদের নুয়ে থাকতে দেখতে চাই না। আমার মতো হাজারো সন্তুর মা-দাদা বৌদিরা শুধু স্মৃতি রোমন্থনই করবে—তাহলে—আমি তাই ঠিক করেছি এবার আমার ছবিটা—আমার ছবিটা—

কাঁচ ভাঙার শব্দে কালী চমকে জেগে ওঠে।

কালী : কি হলো ? সন্তুর ছবিটা একেবারে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল ! [দৌড়ে বাইরে আসে] কে ? কে ওখানে দাঁড়িয়ে ? জবাব দিচ্ছ না কেন ? কে ? দিনেশদা তুমি ! তুমি সন্তুর ঐ একটা মাত্র ছবি—কেন এমন কাজ করলে—কথার উত্তর দাও দিনেশদা ?

দিনেশ : ইঁটটা মারছিলাম তোমার মাথা লক্ষ্য কইরা—আন্দাজে ঠাওর পাই নাই। এ জীবনে আর কাইল থিকা কাম নাই। হপ্তা গেলে বেতন নাই—পোলা মাইয়া বৌ-এর খাওয়ান নাই—

কালী : কেন কি হয়েছে ? তুমি এ ভাবে কথা বলছো কেন ? কি হয়েছে আমায় খুলে বলো ?

দিনেশ : কাইল থিকা কারখানায় লকআউট। অগো গোপন মিটিংয়ের খবর পাইছি আমি।

কালী : কারখানায় লক-আউট ? কি বলছো তুমি ?

দিনেশ : ঠিকই কই। যাও। খোঁজ লও না ক্যান ? বুজরুকি মাইরা তোমরা পাঁচজনে ধর্মঘট করলা—মালিকের লগে পারো তোমরা ? সকালে তো খুব লেকচার মারলা ? আর হারু ? ঐটুকু পোলা ! কথা কেমন লম্বা চওড়া ! পারলা ? তোমাগো দাবি-দাওয়া মালিক মানলো ? ধর্মঘট কইরা তোমরাই

লক-আউট আনলা—আগে যদি জানতাম—আমি যদি মরি, আমার লগে তোমরা আর পাঁচজনে মরবা তো কালী—না তোমরা তো মর না। তোমরা যুবা—এক কাম গেলে আর এক কাম পাবা। ঘরে তোমার এট্টুখানি মোটা দড়ি হবে কালী? ছ্যাও না, ছ্যাও।

কালী: কি করবে দড়ি দিয়ে?

দিনেশ: ব্যায়াম। ব্যায়াম। শরীল ভালো করুম। তুমি যেমন রোজ সকালে উইঠা ব্যায়াম করো—আমিও আইজ রাইতে এট্টু ব্যায়াম করতাম।

কালী: উল্টোপাল্টা কথা বলো না দিনেশদা। আমাদের আর সব কোথায়? ঠিক আছে, তুমি সোজা তোমার ঘরে চলে যাও। যেতে পারবে, না আমি তোমায় ধরে নিয়ে যাবো?

পক্কা ঢোকে।

পক্কা: কাকে কোথায় ধরে নিয়ে যাবি রে কালী?

অমিয়কে দেখা যায়।

কালী: অমিয়? অমিয় আমাদের কারখানার কি খবর?

বুবু ঢোকে।

বুবু: সে কথা অমিয়দাকে জিগ্যেস করছিস কেন বে? অমিয়দা কি তোর বাপের চাকর?

দিনেশকে চলে যেতে দেখা যায়।

কালী: দিনেশদা—দিনেশদা কোথায় যাচ্ছো?

দিনেশ: তোমাগো এট্টা কিছু হউক—কিছু এট্টা হউক এ আমি মনেপ্রাণে চাই কালী। তোমারে যে অখন বাড়িতে পাওয়া যাইব অমিয়গো হেই খবরও দিছি আমি—

বুবু দিনেশকে একটা চড় মারে। দিনেশ বসে পড়ে।

বুবু: চপ্ শালা। বুড়ো ভাম। এত্তেলা লাগালুম আমি—আর এ হুড্ডা বলছে খবর দিয়েছি আমি!

কালী: অমিয়—একটা বুড়ো মানুষকে তোরা মারলি—তোরা কি—

পক্কা: এ্যাই তোদের একটা বড়ো বদ-অভ্যেস কালী! পরের দুঃখে নাক গলিয়ে কাঁদা। তোরা মাইরি সব শালা ঐ এক দলের। কেন বে?

কালী: অমিয়, এরা কি বলছে?

অমিয়: কাল থেকে তো কারখানা লক-আউট হয়ে যাবে কালী। আমি বলি কি স্ট্রাইকটা তোমরা তুলে নাও। আর একটা কাগজে তোমাদের মুচলেকা দিয়ে দাও। কারখানা যেমন চলছিল তেমনই চলবে। শুধু এই স্ট্রাইক-এর এই কদিনের মাইনে তোমাদের কাটা যাবে। কেমন রাজি তো?

দিনেশ: আমি রাজি, আমি এয়াতে রাজি আছি। এই কয়দিনের মায়না

কার্তিক — বাকি দিনের মায়না তো পাবো। অমিয়বাবু, আমি আপনার কথায় রাজি আছি।

কালী : না। আমাদের কেউ কোন দিন কোন মুচ্‌লেকা দেবে না।

পকা : শালা সম্মান দিতে জানে না! অমিয়দা বলছে লিখে দিতে, আর এ শালা বলছে দেবে না?

বুবু : ভোল পাল্টে রাতারাতি শেয়ালের বাচ্চাও দেখি বাঘের মতো ম্যাও করে — কি গো অমিয়দা?

অমিয় : আমার কিছু বলার নেই। তোমাদের সকলের ভালোর জন্যেই বলছি কালী, একবার লক-আউট ডিক্লিয়ার হয়ে গেলে - ভেবে ছাখো। সন্তু তো তোমার ভাই ছিল। আমরা কেউ চাই নি অকালে ঐ রকম একটা তাজা ফুল পাপড়ি ছড়িয়ে শুকিয়ে যাক।

পকা : সন্তু? অ। এখন মক্কায় গিয়ে পার্টির আণ্ডার গ্রাউণ্ডে কাজ করছে।

কালী : অমিয়, রাত অনেক হয়েছে। বাড়ি যা।

পকা : [আচম্‌কা মারে] আবার বলছে 'তুই'?

অমিয় : গতবারের লক-অউটের সময় পকা অনশন করেছিলো। তুমি নিশ্চয় জানো কালী?

পকা : আমার বিশ কেজি ওজন কমে গিয়েছিল।

বুবু : আমার পঁচিশ কেজি।

পকা : সব — সব সইবো। মারো — খুন করো — সরকার তো এখন তোমাদের হয়ে গেল — পুলিশ এলে গুলি চালাও — সব — সব সইবো।

বুবু : কিন্তু শালা কালী — মেরে ইয়ার — বেইমানি করে আমাদের পথে বসাবি এ আমরা হারগিস্ সহ্য করবো না।

অকস্মাৎ পেটে ঘুঁষি।

পকা : হারগিস্ না।

পেট-চেপে ধরা কালীকে আঘাত করে।

দিনেশ : এট্টা কাগজে এট্টু সই দিলে কি অমন ক্ষতি হবে কালী?

কালী : তুমি বুঝবে না দিনেশদা। ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি।

পকা : কোথায়? লালবাজারের ল্যাম্প পোস্টে লালবাতি জ্বালাতে! দাঁড়াও না মাইরি, আজ একটু ফ্যায়সলা হোক!

কালীকে টেনে তুলে।

বুবু : এই কালী — শোন — শোন তোর সেই মাগীটা — আরে সেই মোছলমান মেয়েছেলেটা — কি যেন নাম — হায় হায় অমিয়দা — কি চ্যায়রা — কি ছ্যায়লা — কি কোমর?

কালী : [বুবুর টুঁটি টিপে ধরে] বুবু তোকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি —

হাসিনার নামে কোন ইতর ভাষা তুই ব্যবহার করবি না।

পক্কা মাথায় রড মারে।

পক্কা : হা-সিনা।

কালীর গোঙানি।
হঠাৎ দিনেশ উঠে পড়ে চিৎকার করে।

দিনেশ : কে কোথায় আছো—দ্যাখো কালীরে খুন করে—

ধীরে ধীরে সোরগোল বাড়তে থাকে। মা ছুটে আসে। কয়েকজন দৌড়ে আসে। চিৎকার-সোরগোলে বস্তিটা জেগে উঠছে। অমিয়রা পালায়। হারু-সহ-দু তিন জন ওদের তাড়া করে যায়।

মা আসে।

মা : কি ? কি হয়েছে ? কারা মারছে, কালী—কালী ওঠ বাবা—

দিনেশ : কারখানার ঐ অমিয়রা—হারুরা ওগো ধরতে গ্যাছে—

হাসিনা ও সাদাত দৌড়ে আসে।

সাদাত : কালী—

কালী গোঙায়।

হাসিনা : মামী, ধরো ওকে ঘরে নিয়ে যাই। বাবা, তোমরা কেউ পুলিশে খবর দাও।

হারুরা ফিরে আসে।

হারু : পালিয়েছে। পুলিশে খবর পরে দিলেও চলবে। আগে ধরুন। কালীর কোথায় লেগেছে দেখি।

এরা কালীকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে যায়।

কালী : [রক্তাপ্লুত] অমিয় তোরা খুব ভুল ভেবেছিস। কারখানা লক আউট করে, গুণ্ডামি করে—খুন করে—এত মানুষের রুটি-রুজির আন্দোলনকে তোরা কোনদিন বন্ধ করতে পারবি না। কোন দিনও না।

দিনেশ : আমি যাই—আমি ডাক্তার ডাইকা আনি। হারু, তুমি কালীর মাথায় জলপট্টি ছাও। মাথায়ই লাগছে বেশি।

দিনেশ চলে যায়।

সাদাত : ভয়ের কিছু নাই। [মেয়েকে] শালা আমরা এতগুলা মানুষ—আগে একটু খবরও যদি পাইতাম—

হারু : চিৎকার করে একবার আমায় ডাকতে পারলি না! একা একা যত সাহস দেখাতে গেলি।

ওরা কালীকে ঘিরে থাকে। জলপট্টি লাগানো হয়—বাতাস করা হয়।

কালী : মা, কাল থেকে কারখানায় ওরা লকআউট চালু করেছে।

নীরবে এদের শুশ্রূষা চলতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে দূর থেকে মাতাল নিরাপদর গলার আওয়াজ শোনা যায়।

নিরাপদ : কালী—কালী—গিন্নি—গিন্নি? এই শালা সাদাত—বাড়ির সব গেল কোথায়—গিন্নি—গিন্নি—তোমরা সব গেলে কোথায়? কালী?

ভুলে সোজা গিয়েছিল—এবার ফিরে এসে ঘরে ঢোকে। দু পায়ে ভর দিয়ে যেন দাঁড়াতেও পারে না।

নিরাপদ : তোমরা সব চুপচাপ কেন? গিন্নি—কালী? এই তো—এই তো সব—কি—কি জটলা কেন?

কালী : [ভাঙ্গা গলায় ভয়ঙ্কর শারীরিক কষ্টে] কে? ও! মা—তুমি না বলেছিল বাবা আর কোনদিন মদ খাবে না?

মা—এতক্ষণ গভীর সংযমে নিজেকে আটকে রেখেছিলেন—এবার উন্মত্ত এক-ক্ষোভে—যন্ত্রণায় হিংস্র হয়ে নিরাপদর গলায় জড়ানো চাদর চেপে ধরে। নিরাপদর কিনে আনা জিনিস গুলো নিরাপদর গায়ে ছুঁড়ে মারতে মারতে।

মা : তুমি মানুষ, না জানোয়ার? তোমার ছেলেকে এসে লোকে খুন করে যায় আর তুমি মদ খেয়ে বাড়ি ফেরো? সন্তুকে খেয়েও তোমার সাধ মেটে নি—মাতাল—চোর—মিথ্যেবাদী! মরতে পারো না? তোমার মতো মাতালকে—তুমি মরো—তুমি মরো—তুমি মরো।

নিরাপদ স্থির-নিশ্চল। নেপথ্য থেকে সন্তুর কথা ভেসে আসে।

সন্তু : মা! তোমরা আর কতকাল নিজেদের এই ছোট্ট গণ্ডিটার মধ্যে ঘুর-পাক খাবে? তুমি হয় তো ভাবছো তোমার একছেলে খুন হয়েছে—দাদাকে গুণ্ডারা মারলো—কারখানায় গণ্ডগোল—জানি তোমার মনে অনেক প্রশ্ন। কিন্তু মা, একটা বদল যে ভেতরে ভেতরে ঘটে চলেছে—তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ তো তুমি তোমার চোখের সামনে দেখলে। দাদাকে যখন ওরা খুন করতে এসেছিল সারা বস্তি কিন্তু তখন একজোট হয়ে ওদের বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত। মাগো, বস্তির কেউ আজ আর একা নয়। সবাই এক। সবাই মিলে একটা জোট।

বহুদূর থেকে একটা সুর ভেসে আসে। রঙে-শব্দে-ছবিতে-গানে শেষ মুহূর্ত যেন আরও ভরপুর—আরও বেগবান।

বিজন ভট্টাচার্য : জীবনের রূপরেখা

শৈশব—বাল্য : ১৯১৫—৩০

জন্ম : ১৭ জুলাই ১৯১৫ খ্রী। দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন, বিদেশে রুশ বিপ্লব ১৯১৭। জন্মভূমি : পূর্ববঙ্গে ফরিদপুর জেলার খানখানাপুর। পিতা ক্ষীরোদবিহারী। মাতা সুবর্ণপ্রভা। মাতুল সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে বিজন জ্যেষ্ঠ। বিজনের মনোজগতে একদিকে যেমন তাঁর পিতৃদেবের প্রভাব, অন্যদিকে তেমনি তাঁর পরিবেশ এবং মানুষজনের প্রভাব এই কালেই গভীর সংবেদনা সৃষ্টি করে।

কৈশোর—যৌবন : ১৯৩০—৪২

১৯৩০ থেকে কলকাতায়। কলেজীয় শিক্ষাগ্রহণের পর্বেই দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ। ৩৬ সালে ছাত্র ফেডারেশনে যোগদান। আনন্দ বাজারে চাকরি ৩৮—৩৯-এ। লেখক জীবন শুরু। প্রথম প্রকাশিত গল্প : জালসত্ত্ব ১৯৪০। রেবতী বর্মণের রচনায় উদ্বুদ্ধ। মুজাফ্‌ফর আহমেদের সান্নিধ্যলাভ। এই বছরেই কম্যুনিস্ট পার্টির সান্নিধ্যে আসেন। দার্জিলিং ভ্রমণকালে বুকে আঘাত সূত্রে ক্ষয়রোগ।

যৌবন : ১৯৪২ – ৬০

'৪২ এর আগস্ট আন্দোলন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। জনযুদ্ধ। গণনাট্য সংঘের প্রয়োজনে প্রথম নাটিকা রচনা ১৯৪৩। গণনাট্য সংঘ কর্তৃক নাট্যভারতী মঞ্চে মে '৪৩ মঞ্চস্থ। জবানবন্দী রচনা '৪৩। প্রযোজনা : জানুয়ারি '৪৪। নবান্ন রচনা '৪৩-'৪৪। প্রথম প্রযোজনা ২৪ অক্টোবর '৪৪। ৪৪-এ পার্টির সদস্যপদ লাভ। চাকরি ছেড়ে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। জনপদ (উপন্যাস) '৪৫। জলসা (ছোটগল্প) '৪৬। অবরোধ (পূর্ণাঙ্গ) '৪৭। এই '৪৭-এ বিজন বিবাহ করেন কবি মনীশ ঘটকের কন্যা মহাশ্বেতাকে। '৪৮-এ পুত্র নবারুণের জন্ম। এই '৪৭-এই আকাশবাণী থেকে তাঁর জীয়নকন্যা (গীতিনাট্য) প্রথম প্রচারিত হয়। 'রাজনৈতিক বিভ্রান্তি দেখা দিল বিজন মানসে'। মরাচাঁদ (একাঙ্ক) প্রথম প্রযোজিত হলো '৪৬-এ। ব্যক্তিগত জীবনে ও সাংগঠনিক জীবনে বিরোধ দেখা দিতে লাগলো। '৪৮-এ গণনাট্য সংঘ ত্যাগ করলেন। জীবিকার তাগিদে চলচ্চিত্রের কাজে বোম্বাই যাত্রা '৪৮-এ। 'নাগিন'এর স্ক্রিপ্ট রচনা। চলচ্চিত্রে অভিনয় : ছিন্নমূল, তথাপি। '৫০-এ কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। ক্যালকাটা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা '৫১। কলঙ্ক (একাঙ্ক) '৫০। জননেতা (একাঙ্ক) '৫০। কলঙ্ক-র প্রথম প্রযোজনা '৫১। জতুগৃহ (পূর্ণাঙ্গ) '৫২। গোত্রান্তর (পূর্ণাঙ্গ) '৫৭। প্রথম প্রযোজনা '৫৯। রানীপালঙ্ক (উপন্যাস) '৬০।

প্রৌঢ়ত্ব : ১৯৬০ – ৭০

মরাচাঁদ (পূর্ণাঙ্গ) '৬০। প্রথম প্রযোজনা : '৬১। ছায়াপথ (পূর্ণাঙ্গ) '৬১। প্রথম প্রযোজনা '৬১। মাস্টার মশাই (পূর্ণাঙ্গ) প্রথম প্রযোজনা '৬১, অপ্রকাশিত। সোনালী মাছ (উপন্যাস) '৬২। দেবীগর্জন (পূর্ণাঙ্গ) '৬৬। প্রথম প্রযোজনা : '৬৬-তে। 'তাঁর মানসপটে গ্রেট মাদার তত্ত্ব স্থান জুড়ে বসলো'। এইকালে বিজনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় হলো পবন, কেতকদাস ও প্রভঞ্জন চরিত্রে। ধর্মগোলা (পূর্ণাঙ্গ) '৬৭। কৃষ্ণপক্ষ (পূর্ণাঙ্গ) '৬৬। প্রথম প্রযোজনা : '৭৫। সাগ্নিক (একাঙ্ক) '৬৮। গর্ভবতী জননী (পূর্ণাঙ্গ) প্রথম প্রযোজনা : '৬৯। স্বর্ণকুম্ভ (রূপকনাট্য) '৭০।

বার্ধক্য : ১৯৭০ – ৭৮

ক্যালকাটা থিয়েটার ত্যাগ। আজ বসন্ত (পূর্ণাঙ্গ) '৭০। প্রথম প্রযোজনা 'পটুয়া'র উদ্যোগে। কবচ-কুণ্ডল নামে দলের প্রতিষ্ঠা '৭০-এ। লাস ঘুইর‍্যা যাউক (একাঙ্ক) '৭০। সোনার বাংলা (পূর্ণাঙ্গ) প্রথম প্রযোজনা '৭১। অপ্রকাশিত। গুপ্তধন (নাট্যরূপ) '৭২। নীলদর্পণ (সম্পাদনা) প্রযোজনা '৭২। চলো সাগরে (পূর্ণাঙ্গ) '৭১। প্রথম প্রযোজনা '৭৭। চুল্লী (একাঙ্ক) '৭৪। হাঁসখালির হাঁস (একাঙ্ক) '৭৭। গন্ধর্ব পত্রিকার উদ্যোগে বিজন অবদানের মূল্যায়ন সংখ্যা অক্টোবর '৭৭। বিজনের অন্তিম অভিনয় : মরাচাঁদ, মুক্তাঙ্গন ১৮ জানুয়ারি '৭৮। দেহাবসান ১৯ জানুয়ারি '৭৮।

গন্ধর্ব : বিজন ভট্টাচার্য : '৮৫ সংখ্যার সৌজন্যে – সম্পাদক, গ্রুপ থিয়েটার।

আগুনে হাত রেখে

অমর গঙ্গোপাধ্যায়

বিজনদাকে পোড়াতে গিয়ে আমার সন্তানের বাঁচা-মরার প্রশ্নটাকেও আজ লাল কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখেছি। বিজনদাই তো একদিন বলেছিলেন—'ইয়ং ড্রামাটিস্ট, এই পোড়ার দ্যাশে দুঃখটারে তো খুঁইজা ব্যাড়াইতে হয় না, দুঃখটা তো নিজেই তোমারে খুঁজতে আছে, সেইটারে কিছুতেই পারসোনাল হইতে দিও না। আগুনের মধ্যে হাত বাড়াইয়া দিবা—তাইরপর ভাববা, পুড়তাছে সারা দ্যাশটা। উই—ড্রামাটিস্টস অব দি ডেডিকেটেড সোলজারস। পেইন ইজ নো পেইন টু আস। উই হ্যাভ আওয়ার ওন ড্রিমস টু ভিফাই অল পারসোনাল সরো। উই হ্যাভ আওয়ার টাস্কস্ টু ডিনাই অল ফলসহুড, উই আর—এ্যাণ্ড উইল রিমেইন আনভ্যাঙ্কুইস্ড।

নাটক : আগুনে হাত রেখে

উৎসর্গ : বিজন ভট্টাচার্যের স্মৃতির উদ্দেশে

নাট্যকার : অমর গঙ্গোপাধ্যায়। জন্ম : ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ কলকাতায়। আদি নিবাস ঢাকা বিক্রমপুর। শিক্ষা : 'আদৌ হয় নি'। বিশ্বাস : 'পরিণামে কোন সংগ্রামী সাহিত্যই পরাজিত হয় না'। রাজনীতি : 'হো-চি-মিনের ভিয়েতনামের রাজনীতি—নো কম্প্রোমাইজ'। নাট্যচর্চায় হাতেখড়ি : লোক ও নাটক এবং লোক-সংস্কৃতি সংঘে। প্রথম নাট্যরচনা : এক অধ্যায় ১৯৫০, প্রযোজনা লোক ও নাটক। প্রথম প্রকাশিত নাটক : জীবন-যৌবন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'একতা' পত্রিকায়। 'দ্বান্দ্বিক' রচনা সূত্রেই এঁর প্রথম খ্যাতি। প্রথম প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ 'চেনামুখ : অচেনা মানুষ' (শারদীয় গন্ধর্ব)। রচিত পূর্ণাঙ্গ নাটক : নায়িকার নাম নিয়তি, (গন্ধর্ব-এ প্রকাশিত ও প্রযোজিত) অন্ধকারের আয়না, জন্মদিন, আগ্নেয়গিরি।

রচনাকাল : সেপ্টেম্বর ১৯৭৮

চরিত্রলিপি : নিলয়। সরোজ। মলয়। প্রদীপ।

প্রথম অভিনয় : প্রযোজনার অপেক্ষায়।

অনুমোদন : এ নাটক অভিনয়ের জন্য কোন অনুমতির প্রয়োজন নাই। তবে গ্রুপ থিয়েটারের ঠিকানায় নাট্যকারকে জানালে তিনি খুশি হবেন।

দৃশ্যসজ্জায় দারিদ্র্য-চিহ্ন রুচি ও শোভনতার পাশাপাশি বিদ্যমান। আয়োজন অতি সাধারণ—অথচ নিতান্ত সামান্যই শুধু পরিচ্ছন্ন বিন্যাসে পরিপাটি। বিছানা সমেত একটি খাট এবং মঞ্চের ডান দিকে একটি-টেবিলকে কেন্দ্র করে দুটি চেয়ার এবং টেবিলে চমৎকার ভাবে সাজানো কিছু সামান্য লেখার সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখা হয়েছে। একটি টেবিল ল্যাম্প নীলাভ আলোয় টেবিল এবং টেবিলে বসে থাকা নিলয়কে আলোকিত করে রেখেছে। সময় রাত দশটা। নিলয় সঞ্চয়িতা খুলে আবৃত্তি করছে।

নিলয় : দূর হতে ভেবেছিনু মনে—
দুর্জয় নির্দয় তুমি, কাঁপে পৃথ্বী তোমার শাসনে।
তুমি বিভীষিকা,
দুঃখীর বিদীর্ণ বক্ষে জ্বলে তব লেলিহান শিখা।
দক্ষিণ হাতের শেল উঠেছে ঝড়ের মেঘ পানে,
সেথা হতে বজ্র টেনে আনে,
ভয়ে ভয়ে এসেছিনু দুরুদুরু বুকে
তোমার সম্মুখে।

শেষ দিকে কোন এক আবেগপ্রবল দৃপ্ত উত্তেজনায় সামনের হঠাৎ লালাভ আলোকবৃত্তে এসে।

তোমার ভ্রূকুটিভঙ্গে তরঙ্গিল আসন্ন উৎপাত,
নামিল আঘাত।
পাঁজর উঠিল কেঁপে,
বক্ষে হাত চেপে
শুধালেম, 'আরো কিছু আছে নাকি,
আছে বাকি
শেষ বজ্রপাত?'
নামিল আঘাত।
এই মাত্র? আর-কিছু নয়?

সরোজের প্রবেশ।
নিলয় মঞ্চের অন্ধকার অংশে চলে যায়!

যখন উদ্যত ছিল তোমার অশনি
তোমারে আমার চেয়ে বড় বলে নিয়েছিনু গণি।
তোমার আঘাত সাথে নেমে এলে তুমি
যেথা মোর আপনার ভূমি।
ছোট হয়ে গেছ আজ।
আমার টুটিল সব লাজ।

যত বড় হও।

তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড় নও।

'আমি মৃত্যু-চেয়ে বড়' এই শেষ কথা বলে

যাব আমি চলে।

সরোজ ঘরের আলোটা জ্বেলে দেয়। নিলয় স্বপ্নাচ্ছন্ন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সরোজের দিকে।

সরোজ : কি রে! চিনতে পারছিস না?

নিলয় : [আপন সত্তায় ফিরে আসে] না। রবি ঠাকুর আওড়াতে আওড়াতে কেমন যেন অন্য কোথায় চলে গেছলাম। ওই বুড়ো কবিটি মগজে গোটা একটা ভিন্ন পৃথিবী সাজিয়ে দিতে পারে।

সরোজ : বাজে বকিস না। আসলে তোদের দাদা-ভাইয়ের মগজের পোকা-গুলোই ভিন্ন জগতের। তা হঠাৎ তোর মৃত্যুর চেয়ে বড় হবার শখ চাপলো কেন?

নিলয় : [আশ্চর্য বেদনার্ত স্বরে] আমরা কোনদিন মৃত্যুর চেয়ে বড় হতে পারবো না সরোজদা, আমরা তো দিনে দশবার শুধু মরতে শিখেছি। এই বৃদ্ধ কবি আমাদের মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষে বাঁচবার বীজ বুনে দিতে চেয়ে-ছিলেন।

সরোজ : [বিছানায় বসে] বুলি কপচাস নি, আবৃত্তিটা তুই ভালোই করিস। শুনতে ভালই লাগে। কিন্তু সেই সঙ্গে যদি দর্শন হাঁকড়াস—

নিলয় : [হেসে] তোমরা তো এককালে লাঠি-গুলি বেয়নেটের সামনে গণনাট্যের গান গাইতে, দাপটে আছড়ানো সেই দিনগুলো কি সত্যিই পালিয়ে গেল? শত্রু শিবিরের টমিগান কি তোমাদের সমস্ত গানকে হত্যা করেছে?

সরোজ : বিলো-দ্য-বেল্ট ঘুষি চালাচ্ছিস নিলয়! আজ যা পারি না, অথচ একদিন যা অনায়াসে পারতাম, তার পেছনে আছে বিচিত্র এক ইতিহাসের এলোমেলো হাওয়া।

নিলয় : পেছনে কি ছিল জানতে চাই না, জানতে চাই, সামনে কি আছে?

সরোজ : আরে বাবা, আমার মত পাঁড় মাতালকে এ সব পিলে চমকানো বেমক্কা প্রশ্ন হাঁকড়ে জেরবার করার কোন মানে হয়?

নিলয় : এড়িয়ে গেলে তো চলবে না সরোজদা। একদিন যারা আগুন জ্বেলে ছিল, তাদেরই তো জবাব দিতে হবে, সে আগুন নেভে কেন?

সরোজ : জবাবটা তাহলে তুই শুনবিই?

নিলয় : নির্ঘাৎ শুনবো। জবাব তোমাদের দিতেই হবে।

সরোজ : এত বড় প্রশ্নটার জবাব আমরা দেবো কি রে! জবাব তো দিয়েই

গেছেন, তোদের রবি ঠাকুর। কিন্তু জবাবদিহিটা কি তুই বুঝতে পারবি?

নিলয়: তোমার মাতলামো কোন দিনই বুঝতে পারি না, তবে চেষ্টা করলে রবি ঠাকুরকে হয়তো বোঝা যায়।

সরোজ: বেশ। তবে শোন—

প্রভাত রবির ছবি আঁকে ধরা
সূর্যমুখীর ফুলে।
তৃপ্তি না পায় মুছে ফেলে তায়—
আবার ফুটায়ে তুলে।

কি রে? একবারে ভোম মেরে গেলি যে?

নিলয়: সত্যিই অনেকখানি অবাক হয়ে গেছি সরোজদা! মদ তাহলে তোমাকে একেবারে গিলতে পারে নি?

সরোজ: আবার বিলো-দ্য-বেল্ট ঘুষি চালাচ্ছিস? তার চেয়ে রমাকে বলে আয় আমার জন্য এক কাপ লিকার বানাতে।

নিলয়: বৌদি বাড়ি নেই।

সরোজ: বাড়ি নেই মানে? তোর দাদা বৌদি কি সিনেমায় গেছে নাকি?

নিলয়: তুমি তো ভাল করেই জান, দাদা সিনেমা দেখে না।

সরোজ: সে তো জানিই—তোর দাদা সিনেমায় যায় না, সিগারেট খায় না, মদ ছোঁয় না এবং অনেকদিন ধরে কোন কিছুই লেখে না। তা মহারাজ মহারানী গেছেন কোথায়? রাতে যুগলে ফিরবেন তো?

মলয়ের প্রবেশ। অবিন্যস্ত পোষাকে একান্তই উদ্‌ভ্রান্ত। কাঁধে ঝোলানো চটের ব্যাগ। আচরণে এলোমেলো অথচ বাচনে প্রত্যয়দীপ্ত। দহন ক্লান্ত অবসাদের নেপথ্যে বিরাজমান সাগ্নিকতা। বর্তমানে পলাতক, ভবিষ্যতে আস্থাবান জটিল দ্বন্দ্বের এক বিচিত্র সমাহার।

মলয়: কি রে? রাত দশটার পরেও এখানে বসে কি গ্যাঁজাচ্ছিস? ট্রেন ধরবি না?

সরোজ: তুমি তো জান চাঁদ—আমি জীবনে কখনো কোন বিষয়েই পাশ করি নি।

মলয়: [ব্যাগটা রাখতে রাখতে] মানে?

সরোজ: মানেটা কি সত্যিই বুঝিস নি?

মলয়: তার মানে—ট্রেনটা তুই ইচ্ছে করেই ফেল করবি।

সরোজ: নির্ঘাৎ।

মলয়: নিলয়, হোটেলে বলে আয়—রাতে তিন জনের খাবার যেন রেখে দেয়।

সরোজ: কি ব্যাপার! দেশটা কি তোরা আমেরিকা বানিয়ে ছাড়বি নাকি?

মলয়: আমি হাজার চেষ্টা করলেও কোনদিন তা পারবো না, ও সব কৃতিত্ব

তোদের জন্যই তোলা আছে। শুনেছি, কয়েক গ্যালন মদ না খেলে তোর নাকি মগজ সাফ হয় না। অবশ্য আমার ইচ্ছে আছে একদিন ভাল মত ঝাঁটাপেটা করে দেখতে হবে তাতে সাফ হয় কিনা।

নিলয় বেরিয়ে যায়।

সরোজ : ছেলেটাকে লজ্জা দিয়ে তাড়ালি তো!

মলয় : তার মানে, তুই নিজে কোন লজ্জাই পাস নি? তা অভ্যেস যা করেছিস —চাট হিসেবে অন্তত লজ্জার মাথাটা তো খেতেই হবে।

সরোজ : আরে বাবা! সকলেই জানে আমি নিতান্তই পাস্ট-টেন্স। প্রেজেণ্টের সঙ্গে ফিউচারটাকেও সেরেফ পাস্ট-টাইম করে ফেলেছি, কিন্তু তুই ঢোকার পর থেকেই দমাদ্দম চাট ছুঁড়ছিস কেন বল দিকি? কি হয়েছে বল তো?

মলয় : [উদাস স্বরে] কি আবার হবে। হবার আছেটা কি?

সরোজ : [মাথা নেড়ে] না—কোথাও কি যেন একটা বেসুরে বাজছে। লজ্জার মাথা আমি চিবিয়ে খেয়েছি এটা আমার 'ওমর খৈয়ামের' মত নির্জলা সত্য। কিন্তু চোখ-কানের মাথা তো খাই নি চাঁদ। [হঠাৎ মলয়কে ধরে নিজের দিকে ফিরিয়ে] তাকা—আমার দিকে ভাল করে তাকা।

মলয় : [অবসন্ন বিরক্তির অসহায় দুই হাতে সরোজের হাত সরিয়ে] আঃ! ছাড়। কি ছেলেমানুষী করছিস?

সরোজ : আমি তোকে ভাল করেই চিনি মলয়। [বিষণ্ণ এক অস্থিরতায় মলয়ের দিকে পিঠ করে সরে যেতে যেতে] যতবার তুই আবেগের ঘরে দারুণ কোন আঘাত পেয়েছিস—ততবারই দেখেছি, মার-খাওয়া আবেগটাকে লুকোবার উত্তেজনায় তোর দুটো হাত আপনা থেকেই মুঠো হয়ে গেছে। [উদ্‌ভ্রান্ত মলয় সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে নিজের মুষ্টিবদ্ধ হাতের দিকে] মুঠো খোলার চেষ্টা করিস না মলয়। তুই শিল্পী—যন্ত্রণাকে মুঠোর মধ্যে ধরে রাখাটাই তোর কাজ। [হঠাৎ ঘুরে—তখনো মুষ্টিবদ্ধ হাতের দিকে তাকিয়ে থাকা মলয়ের দিকে সামান্য দুপা এগিয়ে] আমাকেও বলবি না, কি হয়েছে?

মলয় : [বিষণ্ণ অবসাদে গম্ভীর দূরাগত স্বরে] বিজনদা আজ মারা গেছেন।

সরোজ : [সমগ্র অস্তিত্বে প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে] কি বললি?

মলয় : [হঠাৎ সচেতন হয়ে অজান্তে মুঠো-হয়ে যাওয়া দুই হাতের দিকে তাকিয়ে] বিজনদাকে পুড়িয়ে এলাম।

সরোজ : [নিলয়ের চেয়ারটায় বসে] কোথায় পুড়িয়ে এলি?

মলয় : কেওড়াতলার বৈদ্যুতিক শ্মশানে।

সরোজ : কি ভাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে?

মলয় : লাল কাপড়ে ঢাকা ছিল দেহটা। লরিতে করে ঘোরানো হয়েছে বিভিন্ন মঞ্চে। নিয়ে যাওয়া হয়েছে ভুলতে-না-পারা পার্টির অফিসে। তারপর

বোধ হয় সাড়ে সাতটার সময় লরি এসেছে 'মুক্তঅঙ্গনের' সামনে। সেখানেই লরি থেকে বিজনদাকে তুলে দেওয়া হয়েছে পালঙ্কে। পরাজিত-শায়িত-সম্রাটকে কাঁধে তুলে নিয়েছে সমবেত যুযুৎসবা। সারা পথে একটি গান শুধু ধ্বনিত হয়েছে হাজার কণ্ঠে—'এসো—মুক্ত করো, মুক্ত করো, অন্ধকারের এই দ্বার।'—বিশ্বাস কর সরোজ, কত বার—কত দিন—কত ভাবে ওই গান শুনেছি আমি; কিন্তু সত্যিকারের অন্ধকার-অনুভূতি বুকে নিয়ে কখনো কোনদিন সমুদ্রশঙ্খদৃপ্ত এমন আশ্চর্য কোরাস আমি শুনি নি!

সরোজ: [অন্যমনস্কভাবে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালাতে নেভাতে থাকে] কোরাসে কারা ছিলেন?

মলয়: জানি না। সকলকে চিনিও না। কোর্ট থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত নাট্যকার আমি। কেমন করে চিনবো মিছিলের সেই নতুন মুখ। সবিতাব্রত দত্ত ছিলেন, কিন্তু তিনিও তো সেই সমুদ্রে সামান্য নগণ্য জলবিন্দু মাত্র।

সরোজ: বিজনদার মৃত মুখটা ভাল করে দেখেছিলি?

মলয়: সে তো গত পাঁচ বছর ধরে যখনই দেখা হয়েছে, তখনই দেখেছি।

সরোজ: তার মানে?

মলয়: তাঁকে তো বহুকাল আগেই মেরে রাখা হয়েছে, মেরে ফেলা হয়েছে, মাথায় শিরোপা চাপিয়ে তাঁর চলার পথে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে অজস্র কাঁটা। আমার কাঁধে হাত রেখে যেদিন বলেছিলেন, 'ইয়ং ড্রামাটিস্ট—নবান্নের পঁচিশ বছর তো হইয়া গ্যাল; আরেকটা নবান্ন ল্যাখা হইবো কবে?'—সেই দিনই তো বুড়োর চোখে মৃত্যুর পদচিহ্ন দেখেছিলাম। হাসপাতালে একটা ফুসফুস জমা রেখে—মামার কাগজে মোটা মাইনের চাকরি বিসর্জন দিয়ে পঁচাত্তর টাকার হোল-টাইমার সেই প্রদীপ্ত পুরুষের মুখে সেদিন প্রতিটি বলিরেখায় দেখেছি আসন্ন বলির সূচনা।

সরোজ: আগাগোড়া চাবকে তোর পিঠের চামড়া তুলে দিতে ইচ্ছে করছে। নবান্নর পঁচিশ বছর বাংলার নাট্যজগতে নিশ্চয়ই একটা দুরন্ত শপথের বছর। দিশেহারা মানুষটা তাঁর সারা জীবনের গোপন হাহাকার জানিয়ে ছিলেন তোকে অথচ কদর্য জঘন্য সোনারিলের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে তুই কিছুতেই এমন কিছু লিখলি না—যাতে তিনি অন্তত সামান্য সান্ত্বনা পান।

মলয়: [তীব্র বেদনায় উচ্চকিত প্রত্যয়সিদ্ধ সমর্থনে] বিশ্বাস কর ··· বিশ্বাস কর সরোজ—মহিমান্বিত সেই পরাজিত সম্রাটের অসহায় চোখ দুটো আমাকে প্রতিদিন তাড়া করেছে, 'নীলদর্পণের' প্রবলপৌরুষের চোখে সেদিন যা দেখেছি—তা তো কোনদিন ভুলতে পারবো না। বিদ্রোহের প্রতীক তোরাপকে দেখেছি ক্লান্ত-বিষণ্ন ভূমিকায়। তারপর অনেক রাত তো জেগে কাটিয়েছি, কিন্তু নবান্নকে ছুঁতে পারি—এমন কোন কিছু লেখার

ক্ষমতা কোনদিন আমার ছিল না।

সরোজ : চেষ্টা করেছিলি ?

মলয় : করেছিলাম। পারি নি। কতদিন নিজের হাতে স্থঁচ ফুটিয়েছি। কত রাত সোনারিল না খেয়ে জেগে কাটিয়েছি। কতবার ভেবেছি—নবান্নর পঁচিশ বছরকে ব্যর্থ হতে দেব না। সারারাত আলো জ্বালিয়ে কাগজ কলম নিয়ে বসে থেকেছি বলে রমা রাগ করেছে। নিলয় ঠাট্টা করে বলেছে—আলোটা নিভিয়ে দিয়ে দেখো, হয়তো কোন আইডিয়ার ভূত এসে যেতেও পারে। আলো জ্বালিয়ে রাখলে ওরা আসবে কি করে ?

সরোজ : অথচ বিজনদা তোর কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন ···

মলয় : [তীব্র আর্তনাদে] না—না রে সরোজ, না। তুই জানিস, বিজনদার ওই একটা ফুসফুসে প্রত্যেকের জন্য ছিল কী তীব্র ভালবাসা। বিজনদা নিশ্চয়ই জানতেন—আমি কতবড় অপদার্থ। তবু তিনি আমার ঘুমন্ত ঝিমন্ত অস্তিত্বে সোনার কাঠির পরশ দিতে চেয়েছিলেন। ওই মাতাল মানুষটার হৃদয়-আছড়ানো একটা কথা কতোদিন আমাকে ঘুমোতে দেয় নি।

সরোজ : কাব্যি করিস না মলয়। আবেগে ভেজানো সাফাই গাইবার চেষ্টা করিস না। অপদার্থতা আর সোনারিল-গেলা পালিয়ে-বেড়ানো জড়তার অজুহাত ···

মলয় : [তীব্র প্রত্যয়ে] না।···[অবাক বিস্ময়ে দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হাতের দিকে তাকিয়ে] নবান্নর উত্তরাধিকার আমার জন্য নয়। তার জন্য ভিন্ন কোন প্রত্যয়সিদ্ধ নাট্যকার হয়তো কোথাও প্রস্তুত হচ্ছে স্বর্ণ জয়ন্তীর সোনালী দিনের অপেক্ষায়। গ্রাম বাংলাকে ছুঁতে পারি—এমন কোন অধিকার আমার কখনো ছিল না। যাঁদের চিনি তাঁদের সেই অধিকার কারো আছে কিনা তাও জানি না। ভুলে যাস না—তিতাসের জন্য স্বয়ং উৎপল দত্ত বিজনদাকেই ডেকেছিলেন! আমি তো এককালে কথার আতসবাজিতে চমকের ফুলঝুরি ছড়িয়েছি, তার বেশি কোন ক্ষমতা ছিল না—নেই। কিন্তু যথার্থ শক্তিমান উৎপল দত্তও কি বিজনদার ওই হাহাকার শোনেন নি? নবান্নের পঁচিশ বছরটাকে তিনিও ব্যর্থ হতে দিলেন কেন ? বলতে পারিস—নবান্নের সজ্জিত সৈনিক শম্ভু মিত্র অন্তত ওই বছরটাতে অগ্নিময় দীপ্তপুরুষ হয়ে ওঠেন নি কেন ? ভারত সরকার সেই বছর নাট্যকারের পুরস্কারটা দিয়েছিল কাকে—কোন নাটকের জন্য ? 'আজ বসন্তে'র নাট্যকারকে শীতে তুহিন রাজ্যে নির্বাসিত করেছিল কারা ?

সরোজ : [তীব্র ধিক্কারে] কিন্তু তুই ঘুমিয়েছিলি কেন ?

মলয় : ঘুমোই নি। ঘুমোতে পারি নি। বোমারু বিমান খোঁজা সার্চলাইটের মত বিজনদার দুটো ধিক্কারে জ্বলন্ত চোখ আমাকে দীর্ঘদিন তাড়া করেছে।

কিন্তু তুই বল তো—নগণ্য একটা জোনাকী কবে কোথায় কোন ইতিহাসে রাত্রি শেষের সূর্যটিকে ধরতে পেরেছে?

নিলয়ের প্রবেশ। স্বল্প সময় দুজনে দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে।

নিলয়: হোটেলে মাত্র দুজনের ভাত ঢাকা দিয়ে রাখা হয়েছে।

সরোজ: তোরা খেয়ে আয়। [চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে আসে] আমার ফুয়েল—[ছোট একটা বোতল বার করে খেতে যায়] আমার সঙ্গেই আছে।

মলয়: [প্রচণ্ড ধিক্কারে তীব্র প্রবল গর্জনে] সরোজ!

সরোজ নিলয় চমকে ওঠে। সরোজের ছিপি খোলা বোতল থেকে তরল মাদক অজান্তে গড়িয়ে নিঃশেষে ঝরে যায়। বিভ্রান্ত সরোজ হঠাৎ সচেতন হয়ে তাকিয়ে থাকে খালি বোতলটার দিকে।

সরোজ: [হতাশ স্বরে] সারাদিন ঝর্‌ঝর্ থত্থর
কাঁপে পাতা পত্তর,
ওড়ে যেন ভাবে ও—
মনে মনে আকাশেতে বেড়িয়ে
তারাদের এড়িয়ে
যেন কোথা যাবে ও।

অবস্থান এখন টেবিল ল্যাম্পের নীল আলোক বৃত্তে।

মলয়: ঠাট্টা করছিস?

সরোজ: [গান] কে নিবি গো কিনে আমায় কে নিবি গো কিনে,
পসরা মোর হেঁকে হেঁকে বেড়াই রাতে দিনে।
এমনি করে হায় আমার
দিন যে চলে যায়
মাথার 'পরে বোঝা আমার বিষম হল দায়।
কেউ বা আসে, কেউ বা হাসে, কেউ বা কেঁদে চায়।

মলয়: কি ঝামেলা! তুই কি আগেই কয়েক গ্যালন টেনে এসেছিস নাকি?

সরোজ: কে লইবে মোর কার্য, কহে সন্ধ্যারবি—
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল; সে কহিল, স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।

মলয়: উপদেশ দিচ্ছিস?

সরোজ: আকাশে তো আমি রাখি নাই মোর
উড়িবার ইতিহাস।
তবু, উড়েছিনু এই মোর উল্লাস।

মলয়: সারারাত মাতলামো করবি বলেই কি বাড়ি ফিরলি না?

সরোজ : [হঠাৎ আত্মস্থ হয়ে—শেষবারের মত খালি বোতলটার দিকে দিকে তাকিয়ে] না। তোর কাছে একটা নাটক চাইবো বলে এসেছিলাম।

মলয় : আমার কাছে ? নাটক !

সরোজ : বুঝতেই পারছি—দারুণ ভুল করেছি। বিজনদার মৃত্যুদিনেও যে নতুন শপথ নিতে পারে না …

মলয় : বিশ্বাস কর সরোজ—অন্তত একবারের জন্য আমাকে বিশ্বাস কর। গ্রামবাংলাকে স্পর্শ করার কোন যোগ্যতা আমার নেই। হঠাৎ চমকের অবান্তর অস্তিত্ব আমি। তোদের সকলের ভালবাসার ছোঁয়ায় একদা ঝলসে উঠেছিলাম। আজ আমি নেহাতই নিভন্ত-ঝিমন্ত-ঘুমন্ত …

নিলয়। ক্লান্ত-শ্রান্ত-বিভ্রান্ত-বিয়োগান্ত।

মলয় : তার মানে ?

নিলয় : [তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে] অ্যালিটারেশন। অনুপ্রাস।

সরোজ : ছোট ভাইয়ের কাছে বাকি মানেটা আর জানতে চাস না। নাটক তুই আর কোন কালেই লিখতে পারবি না। তোর কাছে আসাটা, আমার সত্যিই ভুল হয়েছে।

নিলয় : অত বড় ভুলটার মধ্যেও একটা ঠিক তো রয়েই গেছে। ইতিহাসের সাজানো পাতা কি ভাবে খসে যায় তার খানিকটা তো দেখেই গেলে। এবার ও ঘরে গিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখে এস—বাকি চেহারাটাও স্পষ্ট দেখতে পাবে।

মলয় : ওর কথায় কান দিস না সরোজ ! ও শুধু জানে, আমরা হেরে গেছি। কেন হেরে গেছি সেটা ও জানে না। ও জেনেছে, ইতিহাসের সাজানো পাতা কখনো কখনো খসে যায়,জানে নি,ইতিহাসের সাজানো পাতা খসে যাওয়ারও একটা ইতিহাস থাকে।

নিলয় : সেটা আমি ভাল করেই জানি। সেই ইতিহাসের নেপথ্যটাকে তো রোজ দেখেছি তোমার মধ্যে ; মাঝে মাঝে দেখেছি সরোজদার মদের বোতলে। এইমাত্র শুনে এলাম—বিজনদা মারা গেছেন। হঠাৎ এক আধ দিন তাঁকে দেখেছি পার্টি অফিসে। তার চেয়ে অনেক বেশি করে দেখেছি অজস্র নাটকে। কালকেও দেখে এসেছি মুক্তঅঙ্গনে 'মরাচাঁদ'—

মলয় : [সাগ্রহে] দেখেছিস ? কাল গেছলি তুই 'মরাচাঁদ' দেখতে ?

নিলয় : [বিদ্রূপে] না—'মরাচাঁদ' দেখতে যাইনি। দেখতে গেছলাম জীবন্ত বিজনদাকে। ইতিহাসের ঝরাপাতা যখন চলমান ইতিহাসকে স্পর্শ করে তখন তার ঝলসে ওঠা সত্তাটাকে দেখতে গেছলাম।

মলয় : কি দেখলি তাই বল।

নিলয় : জেনারেশন গ্যাপের গালভরা বিশেষণ তোমরা চাপিয়ে দিয়েছ

আমাদের মাথায়। আমরা কি দেখি আর কি বুঝি—সেটা জেনে তোমাদের কি লাভ?

মলয়: আঃ! এখন ও সব তর্ক তুলিস না। অন্তত আজকের দিনটার জন্য সব তর্ক ভুলে যা। কিছু আগেই আমাদের পরাজিত সেনাপতিকে পুড়িয়ে এসেছি। তাঁকে মৃত্যুর ঠিক আগের দিন তোরা কোন্ চোখে দেখেছিস, সেটা অন্তত জানতে দে।

নিলয়: [তীব্র প্রতিবাদে] কে বলেছে বিজনদা পরাজিত? ব্যক্তি বিজনদা মাতাল হয়ে জাহান্নামে যেতে পারেন—তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। হতাশা আর গ্রাম্য ট্যাবুতে তিনি অনায়াসে আচ্ছন্ন হতে পারেন—সে জন্য আমরা দুঃখিত কিন্তু শুধু ওই কারণেই তাঁকে আমরা ফসিল ভাববো কেন? শিল্পী বিজনদা তো বার বার আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। সেখানে তো তিনি কারো সঙ্গে কখনো আপোষ করেন নি। 'মরাচাঁদের' শেষ অভিনয়েও আমরা দেখেছি তাঁর শিল্পীসত্তার সংগ্রামী ভূমিকা। ঝলসে ওঠা মানুষটাকে তো তোমাদের বিচিত্র ইতিহাস চেতনা ঝলসানো কাবাব বানাতে পারে নি! সিনেমার দশ-বিশ পঞ্চাশ হাজারী মনসবদার উৎপল দত্তকে আমরা ক্ষমা করতে পারি না। কিন্তু মঞ্চের উৎপল দত্তকে তো আমরা মাথায় করেই রাখতে চাই। সরকারী দাঁড়ের তোতা বর্তমানের শম্ভু মিত্রকে আমরা অবাঞ্ছিত বলেই মনে করি—কিন্তু ছেঁড়াতারের শম্ভু মিত্রকে আমরা কোন দিনই ভুলবো না।

সরোজ: একেবারে ক্ষেপে উঠলি যে! বোস—ঠাণ্ডা হয়ে বোস। ভাল করে না ভেবে সব কথা সব সময় বলতে নেই।

নিলয়: ওটাকেই ক্ষুব্ধযৌবনের হঠকারিতা বলে! [হঠাৎ মলয়ের বুক পকেটে হাত ঢুকিয়ে কিছু টাকা বের করে] তোমরা কথা বল, আমি আসছি।

প্রস্থানোদ্যত।

মলয়: কি ব্যাপার! হঠাৎ অতগুলো টাকা নিয়ে কোথায় চললি?

নিলয়: সরোজদার জন্যে এক বোতল মদ কিনবো। তোমার জন্য কিনবো গোটা দশেক ম্যানড্রেক্স। আর কিনবো কিছু বরফ আর দুটো আইস-ব্যাগ।

মলয়: তার মানে? ও সব দিয়ে কি হবে?

নিলয়: দুজনে নেশা করে মাথায় আইসব্যাগ চাপিয়ে—বেশ ঠাণ্ডা মাথায় মৃত নাট্য আন্দোলনের ফরেন্‌সিক রিপোর্টটা তৈরী করবে।

মলয়: [পরাজিত স্বরে] বাড়াবাড়ি করছিস নিলয়। অন্তত সরোজকে নিয়ে ঠাট্টা করাটা ...

সরোজ: কোনক্রমেই অন্যায় নয়। নিলয় তো ভিন্ন যুগের প্রতিনিধি।

আমাদের গান আমরা ওদের কণ্ঠে তুলে দিতে পারি নি—সেটা তো আমাদেরই অক্ষমতা।

নিলয়: [বিদ্রূপে] আর আমাদের নেশা আমরা তোমাদের কণ্ঠে তুলে দিয়েছি—সেটা আমাদের সক্ষমতা—তাই না!

মলয়: [একটা উদ্যত চড় তুলে সামান্য সময় নিলয়ের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত স্বরে] তুই হাসপাতালে চলে যা …

নিলয়: সেখানেই যাচ্ছিলাম …

সরোজ কি ব্যাপার? হঠাৎ হাসপাতালে?

নিলয়: বৌদি হাসপাতালে আছে।

সরোজ সে কি রে! কি হয়েছে রমার?

মলয়: কিছু হয় নি—হবে। এ চাইল্ড উইল বর্ন টু নাইট।

সরোজ তা—তুই যাবি না হাসপাতালে?

মলয়: যেতাম—নিশ্চয়ই যেতাম। কিন্তু আজ আমার মধ্যে কোথায় কি যেন একটা ভয় বাসা বেঁধেছে …

সরোজ: ভয়! সেটা আবার কি? তোকে তো কখনো ভয় পেতে দেখি নি?

মলয়: না না। সে রকম ভয় নয়।…[বিষণ্ণ স্বরে] তুই তো জানিস সরোজ—এর আগে আমার দুটো সন্তান জন্মেই মারা গেছে। আর মারা গেছে—ঠিক আমি তাদের মুখ দেখবার পরেই। এবার রমা হাসপাতালে যাবার সময় বলে গেছে—সন্তান জন্মালে, আমি যেন অন্তত তিন দিন আমার সন্তানকে দেখতে না যাই।

সরোজ: রমা এই কথা বলেছে!

মলয়: রমাকে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই। মা হয়েও সন্তানকে কোলে না পাওয়ার যন্ত্রণাটা আমরা কোনদিন বুঝতে পারবো না। [হঠাৎ হেসে ফেলে] রমা এবার কিছুতেই হ্যাটট্রিক করতে রাজি নয়। ডাক্তার যখন বললেন—আজ রাতেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে—রমা তখন নিলয়কে বলেছে, ভস্মলোচনকে বলে দিস তিন দিন যেন ও ছেলেকে দেখতে না আসে।

সরোজ: রমা তোকে ভস্মলোচন বলেছে?

মলয়: দূর পাগল! রমা ওটা বলবে কেন? ওটা আমিই যোগ করে নিয়েছি। আমার সকল সৃষ্টিই তো আমার দৃষ্টিপাতে ছাই হয়ে গেছে। জানিস দু দুবার সন্তানের মৃত্যুর পরে বুকে জমে ওঠা দুর্বার যন্ত্রণায় ও যখন ছটফট করেছে—নিলয় তখন মাই চুষে রমার জমে ওঠা দুধ খেয়েছে। এবার নিলয়ও বলেছে—দাদা, বৌদির বুকের দুধ এবার আমি কিছুতেই 'শোষণ' করতে রাজি নই। একটা শিশুর খাদ্য আমি শুষে নিচ্ছি, এটা ভাবলেই আমার কান্না পায়।

সরোজ: তার মানে নিলয়ও তোকে ভস্মলোচন ভেবেছে।

মলয় : না রে না। ও শুধু বৌদির কথাটা নিজের কথা বলে চালাতে চেয়েছে। রমাকে ও কিছুতেই আমার কাছে ছোট হয়ে যেতে দেবে না, ওর বৌদির কথাটাকে ও নিজের কথা বলে চালিয়েছে।

সরোজ : আমার কেমন যেন একটা সন্দেহ হচ্ছে, তোর সন্তানের মৃত্যু-বীজ তোর মধ্যেই বাসা বাঁধে নি তো?

মলয় : [বিষণ্ণ হাসি] সোনারিল-ম্যানড্রেক্স আর সোকোনল সোডিয়ামের কথা বলছিস তো? কিন্তু দেড় বছর ধরে ওসব কিছুইতো খাই নি আমি। রমা তো আমাকে বলেছিল—একটা সুস্থ সন্তান আমাকে দাও। তোমার হাজার কষ্ট হলেও আমার কষ্টটা একবার ভেবে দেখো। শুধু একবারের জন্য প্রমাণ করো—আমাদের বিয়েটা সত্যিই ভালবাসার বিয়ে।

সরোজ : সত্যিই দেড় বছর ধরে কোন রকম ডায়জিপাম তুই খাস নি? [মলয় মাথা নাড়ে] এবার তোর সন্তান তাহলে বাঁচবেই। ওকে বাঁচাতেই হবে।

মলয় : কে জানে!—বিজনদাকে পোড়াতে গিয়ে আমার সন্তানের বাঁচা-মরার প্রশ্নটাকেও আজ লাল কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখেছি। বিজনদাই তো একদিন বলেছিলেন—'ইয়ং ড্রামাটিস্ট এই পোড়ার ছাশে দুঃখটারে তো খুঁইজা ব্যাড়াইতে হয় না, দুঃখটা তো নিজেই তোমারে খুঁজতে আছে, সেইটারে কিছুতেই পারসোনাল হইতে দিও না। আগুনের মধ্যে হাত বাড়াইয়া দিবা—তাইরপর ভাববা, পুড়তাছে সারা ছ্যাশটা। উই—ড্রামাটিস্টস অব দি ডেডিকেটেড সোলজারস। পেইন ইজ নো পেইন টু আস। উই হ্যাভ আওয়ার ওন ড্রিমস টু ডিফাই অল পারসোনাল সরো। উই হ্যাভ আওয়ার টাস্ক্‌স টু ডিনাই অল ফলসহুড, উই আর—এ্যাণ্ড উইল রিমেইন আনভ্যাঙ্কুইস্‌ড।'

সরোজ : একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না—বিজনদা তোকে এসব কথা বলতে গেলেন কেন? তুই তো হেরে-যাওয়া, হারিয়ে-যাওয়া, পলাতক নাট্যকার।

মলয় : বিজনদা একটা কথাও আমাকে শোনাবার জন্য বলেন নি। সবটাই তো নাটকের ভাষায় 'থিংকিং-এ্যালাউড'। নিশ্চয়ই আরো অনেককেই তিনি এই কথাই বলেছেন। ভুলে যাস না—'আজ বসন্তের' বৃদ্ধ বিচারক তো তিনি নিজেই। আত্মঘাতী অস্তিত্বকে তো তিনি চিরকাল জীবনের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চেয়েছেন।

সরোজ : অথচ সেই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েও তোর সেই বৃদ্ধ বিচারককে তুই বলতে পারিস নি—'আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি'।

মলয় : [অসহায়-আত্মসমর্পণ] জমানো ছাইয়ের গাদায় আগুন খোঁজে পাগলে—সত্যিকারের আগুন আজ দু চোখ ভরে দেখে এসেছি। দারুণ বুড়িয়ে যাওয়া আল্পনা গুপ্তা এসেছিলেন—এসছিলেন রুগ্ন মোহিত আইচ। রুগ্ন

আমাদের গান আমরা ওদের কণ্ঠে তুলে দিতে পারি নি—সেটা তো আমাদেরই অক্ষমতা।

নিলয়: [বিদ্রূপে] আর আমাদের নেশা আমরা তোমাদের কণ্ঠে তুলে দিয়েছি—সেটা আমাদের সক্ষমতা—তাই না!

মলয়: [একটা উদ্যত চড় তুলে সামান্য সময় নিলয়ের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত স্বরে] তুই হাসপাতালে চলে যা ...

নিলয়: সেখানেই যাচ্ছিলাম ...

সরোজ: কি ব্যাপার? হঠাৎ হাসপাতালে?

নিলয়: বৌদি হাসপাতালে আছে।

সরোজ: সে কি রে! কি হয়েছে রমার?

মলয়: কিছু হয় নি—হবে। এ চাইল্ড উইল বর্ন টু নাইট।

সরোজ: তা—তুই যাবি না হাসপাতালে?

মলয়: যেতাম—নিশ্চয়ই যেতাম। কিন্তু আজ আমার মধ্যে কোথায় কি যেন একটা ভয় বাসা বেঁধেছে ...

সরোজ: ভয়! সেটা আবার কি? তোকে তো কখনো ভয় পেতে দেখি নি?

মলয়: না না। সে রকম ভয় নয়।...[বিষণ্ণ স্বরে] তুই তো জানিস সরোজ—এর আগে আমার দুটো সন্তান জন্মেই মারা গেছে। আর মারা গেছে—ঠিক আমি তাদের মুখ দেখবার পরেই। এবার রমা হাসপাতালে যাবার সময় বলে গেছে—সন্তান জন্মালে, আমি যেন অন্তত তিন দিন আমার সন্তানকে দেখতে না যাই।

সরোজ: রমা এই কথা বলেছে!

মলয়: রমাকে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই। মা হয়েও সন্তানকে কোলে না পাওয়ার যন্ত্রণাটা আমরা কোনদিন বুঝতে পারবো না। [হঠাৎ হেসে ফেলে] রমা এবার কিছুতেই হ্যাটট্রিক করতে রাজি নয়। ডাক্তার যখন বললেন—আজ রাতেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে—রমা তখন নিলয়কে বলেছে, ভস্মলোচনকে বলে দিস তিন দিন যেন ও ছেলেকে দেখতে না আসে।

সরোজ: রমা তোকে ভস্মলোচন বলেছে?

মলয়: দূর পাগল! রমা ওটা বলবে কেন? ওটা আমিই যোগ করে নিয়েছি। আমার সকল সৃষ্টিই তো আমার দৃষ্টিপাতে ছাই হয়ে গেছে। জানিস দু দুবার সন্তানের মৃত্যুর পরে বুকে জমে ওঠা দুর্বার যন্ত্রণায় ও যখন ছটফট করেছে—নিলয় তখন মাই চুষে রমার জমে ওঠা দুধ খেয়েছে। এবার নিলয়ও বলেছে—দাদা, বৌদির বুকের দুধ এবার আমি কিছুতেই 'শোষণ' করতে রাজি নই। একটা শিশুর খাদ্য আমি শুষে নিচ্ছি, এটা ভাবলেই আমার কান্না পায়।

সরোজ: তার মানে নিলয়ও তোকে ভস্মলোচন ভেবেছে।

মলয় : না রে না। ও শুধু বৌদির কথাটা নিজের কথা বলে চালাতে চেয়েছে। রমাকে ও কিছুতেই আমার কাছে ছোট হয়ে যেতে দেবে না, ওর বৌদির কথাটাকে ও নিজের কথা বলে চালিয়েছে।

সরোজ : আমার কেমন যেন একটা সন্দেহ হচ্ছে, তোর সন্তানের মৃত্যু-বীজ তোর মধ্যেই বাসা বাঁধে নি তো?

মলয় : [বিষন্ন হাসি] সোনারিল-ম্যানড্রেক্স আর সোকোনল সোডিয়ামের কথা বলছিস তো? কিন্তু দেড় বছর ধরে ওসব কিছুইতো খাই নি আমি। রমা তো আমাকে বলেছিল—একটা সুস্থ সন্তান আমাকে দাও। তোমার হাজার কষ্ট হলেও আমার কষ্টটা একবার ভেবে দেখো। শুধু একবারের জন্য প্রমাণ করো—আমাদের বিয়েটা সত্যিই ভালবাসার বিয়ে।

সরোজ : সত্যিই দেড় বছর ধরে কোন রকম ডায়জিপাম তুই খাস নি? [মলয় মাথা নাড়ে] এবার তোর সন্তান তাহলে বাঁচবেই। ওকে বাঁচাতেই হবে।

মলয় : কে জানে!—বিজনদাকে পোড়াতে গিয়ে আমার সন্তানের বাঁচা-মরার প্রশ্নটাকেও আজ লাল কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখেছি। বিজনদাই তো একদিন বলেছিলেন—'ইয়ং ড্রামাটিস্ট এই পোড়ার শ্মশানে দুঃখটারে তো খুঁইজা ব্যাড়াইতে হয় না, দুঃখটা তো নিজেই তোমারে খুঁজতে আছে, সেইটারে কিছুতেই পারসোনাল হইতে দিও না। আগুনের মধ্যে হাত বাড়াইয়া দিবা—তাইরপর ভাববা, পুড়তাছে সারা শ্মশানটা। উই—ড্রামাটিস্টস অব দি ডেডিকেটেড সোলজারস। পেইন ইজ নো পেইন টু আস। উই হ্যাভ আওয়ার ওন ড্রিমস টু ডিফাই অল পারসোনাল সরো। উই হ্যাভ আওয়ার টাস্ক্স টু ডিনাই অল ফলস্‌হুড, উই আর—এ্যাণ্ড উইল রিমেইন আনভ্যাঙ্কুইস্‌ড।'

সরোজ : একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না—বিজনদা তোকে এসব কথা বলতে গেলেন কেন? তুই তো হেরে-যাওয়া, হারিয়ে-যাওয়া, পলাতক নাট্যকার।

মলয় : বিজনদা একটা কথাও আমাকে শোনাবার জন্য বলেন নি। সবটাই তো নাটকের ভাষায় 'থিংকিং-এ্যালাউড'। নিশ্চয়ই আরো অনেককেই তিনি এই কথাই বলেছেন। ভুলে যাস না—'আজ বসন্তের' বৃদ্ধ বিচারক তো তিনি নিজেই। আত্মঘাতী অস্তিত্বকে তো তিনি চিরকাল জীবনের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চেয়েছেন।

সরোজ : অথচ সেই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েও তোর সেই বৃদ্ধ বিচারককে তুই বলতে পারিস নি—'আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি'।

মলয় : [অসহায়-আত্মসমর্পণ] জমানো ছাইয়ের গাদায় আগুন খোঁজে পাগলে—সত্যিকারের আগুন আজ দু চোখ ভরে দেখে এসেছি। দারুণ বুড়িয়ে যাওয়া আল্পনা গুপ্তা এসেছিলেন—এসছিলেন রুগ্ন মোহিত আইচ। কম

করে চল্লিশ মিনিট ধরে ওঁরা সমানে প্রচণ্ড দাপটে গান গেয়ে গেছেন। বুড়ির গলায় আজ যৌবনের বান ডেকেছিল। রুগ্ন মোহিত আইচ আজ সতেজ সুরের ফোয়ারা হয়ে উঠেছিলেন। বুড়ি আল্পনা গুপ্তা যখন বলিষ্ঠ তর্জনী নাচিয়ে মোহিত আইচের সঙ্গে সুরের আগুন জ্বেলেছিলেন [অবরুদ্ধ স্বরে] তখন ইচ্ছে হয়েছিল ওর দুটো পা ছুঁয়ে একটা প্রণাম করি, চিৎকার করে বলতে চেয়েছিলাম—'মাগো, আমার মাথায় হাত রেখে আমার দারুণ-শীতে-সিঁটিয়ে-ওঠা হৃদয়টার জন্য তোমার হোমাগ্নির কিছুটা উত্তাপ রেখে যাও'—

সরোজ সিগারেট ধরায়।

সরোজ: বলতে পারলি না কেন?

মলয়: লজ্জা পেয়েছিলাম, আমাকে যাঁরা চেনেন, তাঁরা ভাবতেন—আমি নিশ্চয়ই কুড়িটা সোনারিল কিংবা দশটা ম্যানড্রেক্স খেয়েছি।

সরোজ: শুধু ওইটুকু লজ্জায় একেবারে হেরে চলে এলি?

মলয়: টানা বিশ বছর ধরে বার বার আমি হেরেছি। কিন্তু আজ তো আমি হারি নি। শুধু লজ্জা পেয়েছি—নিজের ওপর ঘেন্না ধরেছে। ওই লজ্জা আর ধিক্কারটাই তো আমার জিত। আগে তো কখনো লজ্জা পাই নি। কোন আত্মধিক্কার জাগে নি, গানে গানে ছয়লাপ মিছিলে রাজনীতির এলোমেলো হাওয়ার বিভিন্ন শিবিরের শরিকদের দেখলাম, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে—পায়ে পা মিলিয়ে পাশাপাশি হাঁটছে। উত্তাল-উদ্দাম সেই মিছিলকে তো হাজার সেলাম জানিয়ে এসেছি।

সরোজ। [তীব্র বিদ্রূপে] চমৎকার! সাবাস! বলিহারী! তারপর ইণ্টেলেকচ্যুয়াল আত্মতৃপ্তির আতসবাজি মগজে সাজিয়ে ফিরে এসেছি আপন ঘরে! ওখানে এমন একজনও কি ছিল না যে তোর গালে ঠাস করে একটা চড় মারতে পারে?

মলয়: নিশ্চয় ছিলেন। অত বড় মিছিলে তেমন পৌরুষ নিশ্চয়ই ছিল। তাঁরা অবশ্য আর উপেক্ষা দিয়ে আমার দুই গালে দুটো চড় তো মেরেছেনই। শুধু উমানাথদা সস্নেহে আড়াল করে রেখেছিলেন আমাকে··· সিগারেটটা দে।

সরোজ: [সবিস্ময়ে] কি দেব?

মলয়: [দৃঢ়স্বরে] যেটা টানছিস—ওই সিগারেটটা আমাকে দে।

সরোজ: ব্যাপারটা কি বল তো? সিগারেট দিয়ে তুই কি করবি?

প্রদীপের প্রবেশ। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। পরিচালক প্রয়োজন বোধ করলে সামান্য পরেও প্রবেশ করাতে পারেন।

মলয়: দরকার আছে। দে।

বিস্মিত সরোজ জ্বলন্ত সিগারেট তুলে দেয় মলয়ের হাতে। সামান্য সময় সিগারেটের আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর ডান হাতের তালুতে জ্বলন্ত সিগারেটটা চেপে ধরে নিভিয়ে ফেলে। নেভা সিগারেটটা বাড়িয়ে দেয় সরোজের দিকে।

সরোজ : এটা কি করলি তুই ? কেন করলি।

প্রদীপ : [উদাসীন বিদ্রূপে এগিয়ে আসতে আসতে] রোমান্টিক মলয়বাবু অগ্নিপরীক্ষায় ফার্স্ট প্রাইজ সমেত উত্তীর্ণ হলেন। মুখে কোন যন্ত্রণার ছাপ না রেখে যিনি হাতের তালুতে জ্বলন্ত সিগারেট নেভাতে পারেন—তিনি অবশ্যই নমস্য। হে অগ্নিভূক অবতার—কৃপা করে যখন পাপপূর্ণ ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছেনই, তখন আমাদের আশীর্বাদ করুন—আমাদের মৃতদেহ যখন পুড়তে থাকবে, তখন যেন আমরা আপনার মত সহনশীল হতে পারি।

মলয় : [ঠিক এই মুহূর্তেও বহুদূরে অবস্থিত কোন স্বপ্ন-রাজ্যের নাগরিক]

আগুনে হাত রেখে ভেবেছি আমিও এক অগ্নি পুরোহিত—
বসন্তে সমারোহে ফুৎকারে ওড়াতে পারি জরাগ্রস্ত শীত।
তুষারে আচ্ছন্ন কোন মেরুদেশে অনায়াসে এনে দিতে পারি
উত্তপ্ত মরুর দাহ।
তারপর প্রবাহিত দীর্ঘ সারি সারি
নদীর দু পাড়ে আমি বুনে যাব সমাসন্ন ফসলের গান।
মেঘের হৃদয় চিরে বজ্রগর্ভ বিদ্যুতের ভয়াল কৃপাণ
ঝরাবে সান্ত্বনা-বারি।
লেলিহান নৃত্যপরা জ্বলন্ত চিতায়
নিজেকেই তুলে দেব নিজ হাতে। তীব্রকণ্ঠ প্রবল ঘৃণায়
ধিক্কারের দগ্ধ-বুকে লজ্জার দহন-দীপ্ত আমি সত্যকাম—
আগুনেই হাত রেখে লিখে রেখে যেতে চাই অগ্নিময় নাম।
তারপর কোন দিন ইতিহাসে ব্যর্থকাম সৈন্য-তালিকায়
যদি দেখি নিজেকেই সাজিয়েছি পলাতক ঘৃণ্য ভূমিকায়—
যদি দেখি শিয়রেই সমুদ্যত বজ্রপাতে আমার বিচার
অমোঘ অকাট্য এ তবে কোন দিন চাইবো না অপার কৃপার
নপুংসক আবেদনে হাসির মোড়কে মোড়া উপেক্ষার ক্ষমা—
বাতিলের দলে আমি। তবুও আগুন ছুঁয়ে যা করেছি জমা—
তাই দিয়ে শুধে যাব ভস্মসার জীবনের অলিখিত ঋণ।
রাত্রিটা আমারই থাক। তোমাদের চোখে থাক দৃপ্তদীপ্ত দিন।
আগুন ছুঁয়েছি আজ। হৃদয়ে নিয়েছি তুলে দাহ ও দহন ;
বাকি আছে ধরে আনা হঠাৎ-উধাও-ধূর্ত পলাতক মন।

প্রদীপ : সাবধান বন্ধুগণ! কাব্যরোগ মারাত্মক—এর সংক্রমণ ধরাশায়ী করে

দেয় কুস্তিভাজা পালোয়ানে যখন তখন !

মলয় : এত রাতে তুই আবার কোত্থেকে এলি ?

প্রদীপ : সে খবরে তোর দরকার কি ? যা, হাতটায় অন্তত ডেটল লাগিয়ে আয়। দেখিস, নেশার ঝোঁকে ডেটল ভেবে অ্যাসিড লাগিয়ে দিস না।

মলয় : [হাতের দিকে তাকিয়ে] ডেটলের দরকার নেই।

প্রদীপ : যা বলছি তাই কর। না হলে দুবেলা পাঁচ লাখ করে পেনিসিলিন কেউ আটকাতে পারবে না।

মলয় : আমার ওপরে আর ডাক্তারী ফলাস নি।

প্রদীপ : তা কথাটা খুব বেঠিক বলিস নি। সরোজের মুখেই শুনেছি ক্যানিংয়ের মশাও নাকি তোর রক্ত খেয়ে টপাটপ মাটিতে শুয়ে পড়েছিল। [সরোজকে] তারপর ? তুই এখানে কি মতলবে ?

সরোজ : [মলয়কে দেখিয়ে] বাঁদরটার কাছে একটা নাটক চাইতেই এসেছিলাম।

প্রদীপ : ওর কাছে নাটক চাইতে এসেছিলি ? তার চাইতে আমার কাছে গিয়ে বিষ চাইলেই তো পারতিস। কনফার্মড অপদার্থদের কাছে তোদের যত আবদার। দেশে কি নাট্যকারেরও আকাল পড়েছে নাকি ?

মলয় : তুই হাসপাতাল থেকে আসছিস ?

প্রদীপ : সেটাও তোর জানার দরকার নেই। ঘরে ঢুকেই তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম হাতের তালুতে সিগারেট নেভাচ্ছিস। আইডিয়াটা নভেল, এবার গোটা শরীরটা কার্নেসে ঢুকিয়ে দেখ একদিন। যদি সটান বেড়িয়ে আসতে পারিস—আমি তাহলে ডাক্তারী ছেড়ে দিয়ে একটা সার্কাস পার্টি খুলবো, কাগজে বিজ্ঞাপন দেব—একমাত্র আমাদের তাঁবুতে ছাড়া পৃথিবীর আর কোন সার্কাস দলে এমন জানোয়ার নেই, যে সত্যিই ফায়ারপ্রুফ।

সরোজ : তোরা সকলে মিলেই দেখছি ওকে শেষ করে ছাড়বি। ঠাট্টারও তো একটা মাত্রা থাকা উচিত।

মলয় : ফসিলের কাছে কখনো ফসল আশা করিস না। কয়েক বছর আগের শারদীয়া কালান্তরে ধন্ত-ধন্ত এক নাট্যকারের একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম। তিনি অক্লেশে প্রমাণ করেছেন—বাংলা নাট্যজগতে কোন প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার জন্মান নি। দীনবন্ধু মিত্র থেকে তুলসী লাহিড়ী তাঁর হাতে পেয়েছেন সম্ভবত শতকরা পঁয়ত্রিশ নম্বর। বিজন ভট্টাচার্য কিংবা উৎপল দত্ত হয়তো শতকরা তিরিশের বেশি পান নি। সেখানে আমাদের নম্বর নিশ্চয়ই মাইনাসের ঘরে।

সরোজ : কালান্তরে এমন কোন প্রবন্ধ সত্যিই বেরিয়েছে নাকি ?

মলয় : বেরিয়েছিল। শুনেছি—প্রবন্ধ লেখক বর্তমানে কোন এক প্রগতিশীল

রাজনৈতিক শিবিরের তথাকথিত সাংস্কৃতিক পাণ্ডা। কনফার্মড ফ্যাশিস্ট লেখক পিরানদেল্লোকে যাঁরা প্রগতিশীলতার পিরান চাপিয়ে বাজারে ছেড়েছেন—তিনি তাঁদেরই একজন।

সরোজ : এতো ভাল গাড্ডায় পড়া গেল, কে কোথায় কি প্রবন্ধ লিখেছে—তাতে তোর কি ?

মলয় : আমার আবার কি ? কিছুই না। শুধু বিজনদার কথাগুলো মগজে গিজগিজ করছে। এক বৃষ্টির দিনের বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীটের গাড়িবারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন 'শুধু কথা সাজাইতে যাইও না। ভাল ভাল কথা আইজকাল অনেকেরই মুখস্ত আছে। উই লিভ ইন দি ওয়ার্লড অব ওয়ার্ডস। শব্দ না—যদি ধরতেই চাও তাইলে গোটা মানুষটারেই ধরবা। ফানুষ তো আমরা অনেক বানাইছি ··· মানুষ বানাইছি কয়টা ?'

সরোজ : তুই কি সত্যিই ম্যানড্রেক্স খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিস ?

মলয় : তার মানে ?

সরোজ : বিজনদার কথার সঙ্গে কালান্তরের প্রবন্ধের কি সম্পর্ক ?

মলয় : আমরা কেউই তো কোন গোটা মানুষ তৈরী করতে পারি নি। বিজন উৎপল দত্তের পরীক্ষার খাতায় নম্বর বসেছে তিরিশের নিচে। আমার খাতায় নির্জলা মাইনাস। [ডান হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে] শতকরা ষাট নম্বরী নাট্যকারটির কাছে চলে যা। সত্যিকারের মানুষ গড়ার নাটক সেখানে নিশ্চয়ই পাবি।

প্রদীপ : ব্যাস ! সমাধান তো হয়েই গেল। তুই পেয়ে গেলি ষাট নম্বরী নাট্যকার, আমিও পেয়ে গেলাম ক্রুস মার্কস পাওয়া অভিনব জানোয়ার। এত্ত বড় সংস্কৃতি বিপ্লব খোদ চীনেও হয় নি।···ক্ষমা করবেন ডায়জিপাম বাবা ! আপনার কলম কি লোম দিয়ে তৈরী জানি না ; আপনার গর্জন ধাতব না জান্তব তাও বুঝতে পারি না ; আপনার চামড়া গরিলার না গণ্ডারের, সেটাও ঠাওর পাই না ; ভক্তবৃন্দকে ছলনা করবেন না প্রভু—এই অর্বাচীন ভক্তকে দয়া করে জানিয়ে দিন নাটক আপনি লিখবেন কি না ?···

মলয় : আজ তোকে একটা অনুরোধ করবো সরোজ—রাখবি ?

সরোজ : মদ ছাড়তে বলবি না তো ?

মলয় : না। 'এস, মুক্ত কর, মুক্ত কর অন্ধকারের এই দ্বার' গানটা একবার গাইবি ?

প্রদীপ : পাশের ঘরের ভাড়াটেরা আবার ফায়ার-ব্রিগেডে ফোন করবে না তো ?

সরোজ : হঠাৎ ওই গানটা শুনতে চাইছিস কেন ?

মলয় : বিজনদার শবযাত্রায় ত্রিবেণী সঙ্গমটাকে চোখ বুঁজে আর একবার

অনুভব করতে চাই। চোখ বুঁজে দেখতে চাই চারণকণ্ঠে উচ্চারিত রাজপথে সহজাত 'কবচ-কুণ্ডলের' উত্তাল মিছিলটাকে।

প্রদীপ : সে জন্য গানের কি দরকার ? গোটা চারেক ম্যানড্রেক্সই তো যথেষ্ট।

মলয় : আজকের দিনেও কি ওই গানটা গাইবি না তুই ?

প্রদীপ : ফুয়েল সাপ্লাই দে। গান কেন—সেরেফ মেসিন গান চালিয়ে দেব।

মলয় : চুপ করে থাকিস না সরোজ—ধর, গানটা ধর।

প্রদীপ : গান যদি গাইতে না পারিস, তাহলে ···

মলয় : ভুলে যাস না—সুভাষ মুখুজ্জেও দারুণ বেসুরো গলায় ওই গানটা গাইতেন। বিজনদা বলেছিলেন—'ওই গান আমাগো বীজমন্ত্র, সুরে হউক, বেসুরে হউক—ওই গান আমাগো গাইতেই হইবো'।

প্রদীপ : 'আমাগো' বলতে বিজনদা কস্মিন কালেও তোমাদের বোঝান নি মাণিক। বৃত্রাসুরের যুগে জন্মালে প্রিন্স অব দি গডল্যাণ্ড ওঁর পাঁজর কথানাও চেয়ে নিতেন। ভুলিস না—জোনাকীর আলো জ্বলে পেছন দিকে, আর হীরের আলো ঠিকরে ওঠে চার দিকে।

মলয় : কি রে ? জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, জর্জ বিশ্বাস আর সলিল চৌধুরীর সাড়া জাগানো জোয়ারটা কি আজকের দিনেও তোর গলায় আটকে থাকবে ?

প্রদীপ : প্রাকৃতিক নিয়মেই জোয়ারটা ভাঁটায় এসে ঠেকেছে বাপ। গলায় কিছু বোতল জোগান দে—কয়েকটা ঢেঁকুরের সঙ্গে কয়েক কলি গান ছিটকে বেরিয়ে আসতে পারে।

সরোজ : গান আমি গাইতে রাজি আছি। শুধু একটা সর্ত আছে।

মলয় : কি সর্ত ?

প্রদীপ : অন্ধকারের দ্বার মুক্ত করার জন্য প্রথমেই মুক্ত কচ্ছ হতে হবে।···

সরোজ : যত বার বলবি তত বারই গাইবো আমি। যে গান বলবি, সেই গানই গাইবো। কিন্তু—অন্তত একটা নাটক তোকে লিখে দিতেই হবে।

প্রদীপ : ওটা আবার একটা সর্ত নাকি ? যতসব বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয়ের বিভিন্ন বর্ণের পারমুটেশন কম্বিনেশন। তার চেয়ে সর্ত কর—জীবনে অন্তত একবার তোকে আত্মহত্যা করতেই হবে।

মলয় : কথা দিলাম—একটা নাটক লিখে দেবই।

প্রদীপ : [লাফিয়ে ওঠে] কি বললি ? নাটক লিখবি তুই ? কাছে এগিয়ে আয়—কাছে এগিয়ে আয়।

মলয় : কেন ?

প্রদীপ : মাথাটা ভাল করে দেখতে হবে। বেশ কয়েকটা নাট-বল্টু বোধ হয় ঢিলে হয়ে গেছে।

মলয় : আমার স্বভাব তো তুই জানিস সরোজ। আমাকে দিয়ে নাটক লেখাতে হলে বেশ কয়েক দিন খোঁচাতেই হবে।

প্রদীপ : সে জন্য কোন চিন্তা নেই, আমার ডাক্তারীর ছুরি-কাঁচি আমি রেডি করে রাখবো, এক এক খোঁচায় সেরেফ এসপার ওসপার করে দেব। খোঁচায় খোঁচায় জেরবার করে দেব। তবে হ্যাঁ—বীরু মুখুজ্জের 'বিশে জুন' লিখলে চলবে না। জনগণ যা চায়, তাই যদি দিবি ঠিক করে থাকিস—তাহলে 'সেক্স-হরার' আর 'হাসির গমক' আর 'রূপের চমক' থাকা চাই।

উদাত্ত-গম্ভীর স্বরে গান ধরে : এস, মুক্ত কর, মুক্ত কর অন্ধকারের এই দ্বার এক সময় শেষ হয়ে আসে। মলয় দু হাতে চোখ ঢেকে মুহ্যমানের মত বসে থাকে। ও এখন বসে আছে মিলয়ের চেয়ারে নীল আলোকবৃত্তের আশ্রয়ে। প্রদীপ দাঁত দিয়ে নখ খুঁটছে সরোজ স্বল্প সময় তাকিয়ে থাকে ভিন্নজগতের মলয়ের দিকে।

কি রে! নাটকটি কবে পাবো? [প্রস্তরীভূত মলয় চুপ করে বসে থাকে] কি রে! কোন উত্তর দিচ্ছিস না কেন? [এগিয়ে গিয়ে মলয়কে ঝাঁকানি দেয়। বিভ্রান্ত মলয় মাথা তোলে। দু চোখে জল] একি? তুই কাঁদছিস?

মলয় : এতক্ষণে আমার মৃত সন্তান বোধ হয় ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

সরোজ : কি পাগলের মত আবোল তাবোল বকছিস?

মলয় : নাটক তুই পাবি সরোজ। জন্মেছি ডাস্টবিনে—গোলাপ ফুল কোনদিন ফোটাতে পারবো না। মগজের অলিতে গলিতে বাসা বেঁধে রয়েছে কুড়ি-বছরের সোনারিল—সোকনল সোডিয়াম ম্যানড্রেক্স। আমার যে কোন সৃষ্টি আঁতুরেই মারা যাবে। আমার মৃত সন্তান কোলে করে তুই যদি কাঁদতে চাস—আমার কাগজের সন্তান তোর হাতে তুলে দেবই। বিজনদার শেষ কথাই আজ মেনে নিলাম। বুড়োটা কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন—'ল্যাখতে না পারলেও ল্যাখা থামাইও না। পছন্দ না হইলে ছিঁড়া ফালাইবা। কিন্তু কিছুই যদি না ল্যাখ—তাহলে বুঝবা ক্যামন কইরা তোমার ল্যাখা ঠিক হয় নাই। টাইস কামস ওয়ান্স উইথ এ গোল্ডেন চান্স। গেট ইওর সেলভ প্রিপেয়ারর্ড ফর ছাট অপারচুন মোমেণ্ট।' ..আজ আমি প্রস্তুত সরোজ। একটা ফোঁটা গোলাপ তোর হাতে তুলে দিতে পারবো না, কিন্তু প্রত্যেকটা কাঁটা বেছে তুলে দেব তোর হাতে।

প্রদীপ : অতিশয় উপাদেয় সিদ্ধান্ত, উষ্ট্র বাহিনীর রসদে এবার কোন রকম ঘাটতি ঘটবে না। কাঁটা চিবোনোর ক্ষতবিক্ষত স্বাদ আত্মজ রক্তে লবনাক্ত উঠবে। মনের সাধে কাঁটা চিবোবে সরোজ ...

সরোজ : হ্যাঁরে মলয়—তুই কি সত্যিই হাসপাতালে যাবি না?

মলয় : নিজের সন্তানই যদি সাথে করে নিয়ে আসে মৃত্যু পরোয়ানা—/ সেখানে খুঁজবো কোন কদর্য সান্ত্বনা? / কৃতজ্ঞ-হৃদয় যদি তখনো অটুট থাকে, না হয়

চৌচির/বিপন্ন অস্তিত্বে ভবে রাজছত্রে সমাসীন কোন উচ্চশির/স্বেচ্ছায় সাজাবে নিত্য বরণের মধুপর্কে হননের বিষাক্ত সম্ভার/পৃথিবীর আদালতে কে জানাবে অভিযোগ ? অমোঘ বিচার / ঘোষকের উচ্চকণ্ঠে যদি না ঘোষণা করে, তুমি অপরাধী' / যদি দেখি গরহাজির আমারই নিয়তি, যিনি শেষ ফরিয়াদী/সেখানে দেখতে যাবো আড়ম্বরে সুসজ্জিত কোন প্রহসন ? / ক্লেদক্লীন্ন এ জীবনে এক-মাত্র সত্য যদি সন্তান হনন—/ আমার স্বপ্নের রাজ্যে সোনার ফসল যদি দস্যু পঙ্গপাল/শকুনের ডানা মেলে খাদ্য খোঁজে প্রত্যহের—আর মহাকাল / আপন স্বাক্ষরে যদি লিখে দেয় এ জমিতে ওরাই মালিক। / সেখানে আমি তো শুধু পরাজিত বিপর্যস্ত নিহত সৈনিক! / আমারই রক্তের ঋণ মৃত্যু পণে শুধে যাবে আমারই সন্তান—/ সেখানে শোনাবো আমি কান্নার মাণিকে গাঁথা কোন মৃত্যুগান ?

সরোজ : সে গানটা আমিই ধরবো। তবে সে গান ধরবো, তুই চলে যাবার পরে।

মলয় : না—একটা মৃত্যুকে আমরা আজই তুলে দিয়েছি গানে গাঁথা সুরের চিতায়, আত্মজ হননের জঘন্য অপরাধটাকে ঠিক আজই আর দেখতে চাই না। আমার বিনিদ্র চোখে স্বপ্নরাও কাছে আসতে ভয় পায়। আমার সমস্ত বিষ যে দু হাতে তুলে নিয়েছে আমাকে অশেষ করে নিজেকে শেষ করার জন্য—সেই রমাও মাত্র তিনটে দিন ভিক্ষা চেয়েছে।

প্রদীপ : [প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে] তোর সন্তান দুরন্ত স্বাস্থ্য নিয়ে দাপটেই বেঁচে আছে, ওর ওজন—আট পাউণ্ড।

মলয় : [অবরুদ্ধ কাতর স্বরে] তুই ··· তুই হাসপাতাল থেকেই আসছিস ?

প্রদীপ : রমা আমারই বোন। ও শুয়ে আছে আমারই ওয়ার্ডে।

মলয় : রমা ··· রমার জ্ঞান ফিরেছে ?

প্রদীপ : ডাক্তারী নিয়ে কাজলামো করিস না। তোর ছেলে হয়েছে বিকেল পাঁচটায়। দশটা পর্যন্ত রমা দারুণ ভয়ে সিঁটিয়ে ছিল। নিলয় হাজার চেষ্টা করেও হাসাতে পারে নি।

মলয় : নিলয় জানতো আমার ছেলে হয়েছে ?

প্রদীপ : ও জানবে না, তো কে জানবে ? চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আঠারো ঘণ্টা রমাকে বাঁচার গান শুনিয়েছে কে ? তোর ছেলে হবার পরে হাসপাতালের সমস্ত নিয়ম আমাকে দিয়ে ভাঙিয়ে নিয়ে তিন ঘণ্টা অপলক দৃষ্টিতে সেই শিশুর দিকে তাকিয়ে ছিল কে ? শুধু একটা কথায় রমার মুখে মোনালিসার হাসি এনে দিয়েছিল কে ?

মলয় : রমা হেসেছে ? রমা আজ হেসেছে ?

প্রদীপ : হাসবে না ? নিলয় যখন হাসতে হাসতে বললো—বৌদি, তোমরা

আজ সকলেই সব পেলে। আমি বেচারা হারালাম তোমার বুকের দুধ।'
তখনই তো রমা খিল-খিল করে হেসে উঠলো, বললো—তো দাবি তুই
নিজে ছেড়ে না দিলে কেউ কোনদিন তা কেড়ে নিতে পারবে না।

মলয় দুহাতে মুখ ঢেকে চুপ করে বসেছিল। সরোজ এগিয়ে এসে মলয়ের পিঠে হাত রাখে। বিভ্রান্ত চোখ তুলে মলয় সরোজকে ভেদ করে ভিন্ন কোন রাজ্যের অবাক দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সরোজ : বিজনদা একদিন মাত্র একটা কথাই আমাকে বলেছিলেন। তুইও আমার সঙ্গে ছিলি সেদিন। বলেছিলেন—'তোমার গলায় সুর আছে, দুঃখ পাইলে সুরটার কাছে হাত পাতবা। ছাখবা সুর তোমার পার্সোনাল দুঃখটারে ইউনিভার্সাল কইরা দিছে, আর তা যদি করতে না পারে—বুঝবা, তোমার সুরে ভেজাল আছে।'

মলয় : কি বলতে চাস তুই?

সরোজ : কিছুই বলতে চাই না। শুধু আর একটা গান গাইতে চাই। তুই খেয়াল করিস নি—তোর চোখ এড়িয়ে মিছিলে আমিও ছিলাম। একটা গানের কথা কিন্তু তুই ভুলে গেছিস। সে গান আমাদের পাঁজরে শিহরণ তোলা গান। এ গান যে দিন হারিয়ে যাবে—সে দিন আমরা প্রত্যেকেই হেরে যাব। গাইবো সেই গানটা?

মলয় : নিশ্চয়ই গাইবি। তার আগে শুধু একটা কথা জেনে নিতে দে। [প্রদীপকে] রমা বলেছিল—যদি ছেলে হয়, তাহলে তার নাম রাখবে ও নিজে।

প্রদীপ : রেখেছে।

মলয় : কি নাম?

প্রদীপ : বিলয়।

মলয় : [সামান্য সময় অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ হাসতে হাসতে] আমাকে প্রতিদিন বিদ্রূপের চাবুক মারার জন্যই এমন নাম রেখেছে ও। ঠিক আছে। বিদ্রূপের একটা জবাব আমি সরোজের হাতে তুলে দেবই। [সরোজকে] তোর গানটা ধর সরোজ।

পরিচালক এখানে সমস্ত মঞ্চে ভিন্ন কোন আলোর আয়োজন রাখতে পারেন। অথবা তিনটি বিভিন্ন রঙের স্পট লাইটে তিন জনকে আলোকিত করে তুলতে পারেন। উদাত্ত স্বরে সরোজ গান ধরে: 'বাঁচবো রে, বাঁচবো রে আমরা, বাঁচবো রে, বাঁচবো...'

সুধী প্রধান

গণনাট্য ও নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য

১৩৮৪ সালে আশ্বিন সংখ্যায় 'গন্ধর্ব' পত্রিকাতে
বিজন ভট্টাচার্য সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখার জন্য
উক্ত পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক-মণ্ডলীর সদস্য
নৃপেন সাহা আমাকে বিশেষ অনুরোধ করেন।
নৃপেনের কথায় ইতিপূর্বে শম্ভু মিত্র সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখে
'গন্ধর্বে' ছাপাতে পারি নি—যা পরে 'অভিনয়' কাগজে প্রকাশিত হয়।
তাই এবারে লিখবার উৎসাহ ছিল না। কিন্তু নৃপেনের আগ্রহে
শেষ পর্যন্ত লিখি এবং নবান্ন যুগের কিছু ফটোও দিই।
কিন্তু সম্পাদক-মণ্ডলীর অন্যান্য সদস্য সমেত, নাকি বিজনের
আপত্তির জন্য সে-প্রবন্ধ নৃপেন ছাপাতে পারেন নি।
নৃপেন এখন নূতন পত্রিকা বের করছেন বলে সেই লেখাটা
সামান্য কিছু পরিবর্তন করে ছাপতে দিচ্ছি।
কথা আছে মৃতের সঙ্গে লড়াই করে না।
তাই এই লেখাটা বিজনের জীবিত কালে প্রকাশ করা উচিত ছিল—
কিন্তু তার জন্য দায়ী 'গন্ধর্ব' কাগজের সম্পাদক-মণ্ডলী
এবং বিজনের অকালমৃত্যু। বিজন বেঁচে থাকতে
কোন কোন লেখায় তার সমালোচনা করেছি
এবং তারপর দেখাও হয়েছে।
কিন্তু কখনো মুখে কিম্বা লিখে বলে নি যে আমার তথ্য ভুল।
বরং 'গন্ধর্বে' তার জীবনের যে সকল তথ্য বেরিয়েছে তা
যে রীতিমত ভুল—এ কথা তাকে জানাবার সময় পেলাম না।
বিজন ও শম্ভু মিত্রকে গণনাট্য আন্দোলনে আনতে যিনি বিশেষ
উদ্যোগী ছিলেন—সেই বিনয় ঘোষকেও আমার প্রবন্ধ শুনিয়েছি।
সামান্য দু-একটি কথা (তথ্য নয়) পরিবর্তন করা ছাড়া তিনিও
পরিষ্কার আমাকে জানিয়েছেন—প্রবন্ধটি অবশ্য ছাপতে।
প্রথমেই 'গন্ধর্ব' প্রকাশিত বিজনের জীবনীমূলক সংবাদের ত্রুটিগুলি
সংশোধনের চেষ্টা করি। ছাত্র ফেডারেশন ১৯৩৪-৩৫ সালে গঠিত
হয় নি। প্রগতি লেখক সংঘের মত ছাত্র ফেডারেশনও ১৯৩৬ সালে

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের অধিবেশনের সমসাময়িক কালে গঠিত হয়। তারপর বিজন ১৯৪২ সালে পার্টি সদস্য হন নি। ১৯৪৪ সালের প্রথমে হন। এবং 'নবান্ন' নাটকের প্রস্তুতির সময় তিনি সর্বক্ষণের কর্মী হন। পার্টিতে এসে তার ক্ষয় রোগ হয় নি। পার্টিতে আসার আগে দার্জিলিং-এ বেড়াতে গিয়ে ঘোড়া চড়তে গিয়ে ঘোড়া চাপা পড়ে ফুসফুসে ক্ষত হয়। কিন্তু এ সবই পার্টিতে আসার আগে। বিজন 'অনামী' চক্রের সভ্য ছিলেন না। ৯ দিনে 'নবান্ন' লেখার কথাটা বাড়াবাড়ি। বিজন প্রথমে 'নবান্ন'-র প্রথম দৃশ্য রচনা করে বৌবাজারের অফিসে শোনান। তার পর বেশ কিছু দিন বাদে ১৭ই মার্চ ১৯৪৪ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সদানন্দ রোডের তিনতলার ঘরে বসে শোনান। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় নোয়াখালি যাওয়ার প্রস্তাব তিনি কার কাছে রেখেছিলেন জানি না। কিন্তু আমি সংগঠক বা চারুপ্রকাশ ঘোষ গণনাট্য সংঘের তৎকালীন সম্পাদক হিসাবে এ খবর 'গন্ধর্ব' মারফত প্রথম জানতে পারলাম। শিশিরকুমার ভাদুড়ি—'নবান্ন' মাত্র এক রাত্রিই দেখেছিলেন। এইসকল ত্রুটি সংশোধন করার প্রয়োজন এই জন্য বোধ করলাম যে, ঘটনাগুলি, সময় ও পারিপার্শ্বিক সঠিক বিবৃত না হলে লঘু-গুরু বিচার ঠিক হয় না। কমিউনিস্ট পার্টির অবহেলায় সুকান্তর ক্ষয়রোগ হয়েছিল এমন কথা আজও শুনতে হয়। তেমনি কমিউনিস্ট নেতৃত্বের গোঁড়ামির জন্য বুদ্ধিজীবিরা বেশিদিন তাদের সঙ্গে চলতে পারে না—এই অভিযোগ বোধ করি প্রতিদিন সারা পৃথিবীতে ধ্বনিত হচ্ছে।

যাই হোক বিজন ভট্টাচার্য সম্পর্কে এত কথা বলার আমার কী অধিকার এ কথা আজকের পাঠকের জানতে চাওয়া স্বাভাবিক। বিশেষ করে 'গন্ধর্ব' 'বহুরূপী'র বিজন জ্যোতিরিন্দ্র সংখ্যা পাঠ করলে সতর্ক পাঠক হয়তো জানতে পারবেন আমি বিজনের কয়েকটা নাটকের অভিনেতা ছিলাম। ১৩৭৪ সালে শারদীয়া 'কালান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজনের প্রবন্ধ যা 'গন্ধর্ব' ও 'বহুরূপী'তে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে—তাতে বহু বন্ধুর নাম করেও বিজনের আমার কথা একবারও মনে হয় নি কেন? এমন কি বিনয় ঘোষের নামও মনে পড়ে নি। অথচ এই বিনয় ঘোষ তাকে একটি বই উৎসর্গ করেছিলেন। ১৯৪৩ সনের মে মাসে বিজনের 'আগুন' নাটিকার সঙ্গে বিনয়বাবুর 'ল্যাবরেটরী'তে বিজন যে অভিনয় করে—তা তার নাটিকার তুলনায় বেশি প্রশংসা লাভ করে। আর এই 'ল্যাবরেটরী'ই সর্বভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রথম সম্মেলন উপলক্ষে বোম্বাইয়ে অভিনীত হয়। আগুনে কেন আমি অভিনয় করলাম এবং জবানবন্দী থেকে মরাচাঁদ পর্যন্ত (নীলদর্পণেও) তার সঙ্গে যুক্ত থাকলাম এবং পরে পৃথক হলাম তার পূর্ণ বিবরণ এ প্রবন্ধে দেওয়া যাবে না। শুধু এইটুকু জানানো দরকার যে ১৯৪০-এর নাট্য আন্দোলন যে রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতায় বৃদ্ধি পেয়েছিল—তা ১৯৪৮ থেকেই মতাদর্শগত সংগ্রামে পরস্পর বিরোধী শিবিরে

পরিণত। প্রথম যুগের আমরা যারা পরে পার্টিতে থাকি বা না থাকি—ধীরে ধীরে কোন না কোন পক্ষে গেছি। বিজন যতগুলি নাটক লিখেছে বা অভিনয় করেছে—আমি তা না করলেও ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত গণনাট্য সংঘে কাজ করেছি। তারপর ১৯৭২ পর্যন্ত 'কুলীনকুলসর্বস্ব' 'কৃষ্ণকুমারী', 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' প্রভৃতি প্রযোজনা করেছি এবং নাট্য-আন্দোলনের বিরুদ্ধে বাধা-নিষেধগুলি অপসারণ করার কাজে ক্ষুদ্র সাধ্য ব্যয় করেছি। কংগ্রেস সরকার শাসন ক্ষমতায় আসার পর নাট্য আন্দোলনে শাসক শ্রেণী ও বিদেশী চক্রের প্রভাব যে বৃদ্ধি পেয়েছে—তা দিল্লীর একাডেমি ও বিদেশী পুরস্কারগুলি থেকে বোঝা যায়। গণনাট্য সংঘের বিলোপ সাধন করে নবনাট্য ও সৎনাট্য করার আওয়াজ ভারত-চীন সীমানা সংঘর্ষের আগের যুগ থেকেই ওঠে। সীমানা সংঘর্ষের ফলে যেমন পার্টি বিভক্ত হলো—তেমনি সংস্কৃতি আন্দোলনের সর্বভারতীয় সংগঠন ধ্বংস হলো। ভূমিকম্পে ভিত্তি যখন দুলতে থাকে তখন সানাই বাজনদারদের ঘর আগে পড়ে। তবু পশ্চিম বাংলায় আবার গণনাট্য সংঘ গড়ে উঠলো—যার সঙ্গে থাকলাম আমি। অপর দিকে হলো—ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন। বিজন কোন দিকে যাবে? কারণ প্রবোধবন্ধু অধিকারীও আছেন—বড় শরিকের সঙ্গে।

১৯৭৭ সালের অক্টোবর সংখ্যার 'আনন্দলোক' পত্রিকার ২৮৪ পৃষ্ঠায় প্রবোধবন্ধু অধিকারী শম্ভু মিত্র সম্পর্কে লিখছেন: 'আমি আচার্য শম্ভু মিত্রের কথা বলছি যিনি গণনাট্যের রাজনৈতিক নাগপাশ থেকে নাটককে নবনাট্যের মুক্তিতীর্থে এনে পৌঁছে দিয়েছিলেন।' (গোত্র নাট্য: লক্ষ্য প্রতিষ্ঠা) এই প্রবোধবন্ধু ১৯৭১ সালেই বিজনের 'গর্ভবতী' নাটকের ভূমিকায় বিজন সম্পর্কে প্রায় এক কথা কি করে লিখতে পারলেন যদি না বিজন নিজে লিখতেন ১৩৭৪ (১৯৬৯) সালের শারদীয় কালান্তরে: 'মা সনকার দুঃখমোচনের চাইতে আজ দলগত স্বার্থ ও দলগত মন্ত্রের অভ্রান্ততা প্রমাণ করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। সাধনা যজ্ঞের কোন ভস্মই আজ আর আমাদের কোন ধন্বন্তরীকে অ-শিবনাশী নিরাসক্ত ত্রিশূলীর বৈপ্লবিক সমাহিতি দিতে পারছে না। কেননা মার্কস-এঙ্গেল্‌স্ লেনিন বিধৃত জাগতিক দুঃখশোকের নিরসনতন্ত্র একমাত্র নিরাসক্ত জ্ঞানবর্ত্মেই জনগণের সেবক ভক্তজন মনেই প্রতিভাত হতে পারে। আসক্তির পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত প্রবৃত্তিমার্গের ভ্রষ্ট যাজ্ঞিকদের এই সহজ সত্যটি জানবার বোঝবার কোন উপায় নেই।'

বিজনের এই পরিবর্তন কেমন করে হলো জানার জন্ম আমাদের পুরানো কথায় ফিরে যেতে হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছুকাল আগে থেকে ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের কর্মীদের চেষ্টায় কলকাতার এবং কোন কোন জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক লেখক গোষ্ঠী তৈরী হয়। তারা

কোথাও কোথাও সাময়িকপত্রও প্রকাশ করে। কলকাতায় তখনকার দিনের আনন্দবাজারের সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে ঘিরে একদল তরুণ সাহিত্যিক গোষ্ঠী ছিল যাদের নিয়ে অধ্যাপক হীরেণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুরেন্দ্র গোস্বামী, অধ্যাপক গোপাল হালদার প্রভৃতি বৈঠক করতেন, পার্টি সদস্য হিসাবে আমার উপর ভার ছিল যোগাযোগ রক্ষার — কারণ পার্টি তখন অবৈধ এবং আমি পার্টির গোপন ও প্রকাশ্য কাজের মধ্যে একটি সংযোগ হিসাবে কাজ করছিলাম। বিজন ভট্টাচার্য ছিলেন সত্যেন মজুমদারের ভাগ্নে এবং 'অগ্রণী' নামে যে কাগজটি পার্টি সমর্থকরা প্রকাশ করতেন, তাতে লেখা দিয়েছিলেন। এই পত্রিকায় সুবোধ ঘোষের বিখ্যাত গল্প 'ফসিল' প্রকাশিত হয় এবং আমি ঐ কাজে স্তালিন সম্পাদিত রুশ কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের কয়েকটি অধ্যায় অনুবাদও করেছিলাম। 'অগ্রণীর' পরিচালক দেবকুমার গুপ্ত ও প্রফুল্ল রায় পুলিশের আদেশে কলকাতা ত্যাগ করতে বাধ্য হলে ঐ কাগজটি বন্ধ হয়। যুদ্ধের শুরুতেই কমিউনিস্ট পার্টির 'গণশক্তি' কাগজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং একটি বামপন্থী সাপ্তাহিকের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়। এমনি সময় সত্যেন মজুমদার 'অরণি' সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। এই কাগজে গোপন এবং অবৈধ কমিউনিস্ট পার্টির অনেক বক্তব্য ছদ্মনামে প্রকাশ করা হতো — সত্যেন-মজুমদারের মত নিয়েই। এখানে আমাদের পূর্বোক্ত সাহিত্যিক গোষ্ঠীর আড্ডাও বসত — যার মধ্যে বিনয় ঘোষ, অরুণ মিত্র, অনিল কাঞ্জিলাল, সরোজ দত্ত, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিজন আসতেন। বিজনের সঙ্গে আলাপ এই সময় হৃদ্যতায় পরিণত হয়। বিজন আনন্দবাজারে কাজ করতেন ও তাদের বর্মন স্ট্রীটের অফিস থেকে হেঁটে আসতেন 'অরণি' অফিসে। অফিসটা ছিল শশীভূষণ দে স্ট্রীটে। বিজন 'অগ্রণী'তে যেমন ছোটগল্প লিখেছিলেন তেমনি 'অরণি'-তেও ছোট ছোট স্কেচ লিখতেন এবং আমাদের আড্ডার সদস্য বা বাইরের সাহিত্যিক শিল্পীদের চরিত্রের অনুকরণ করে এমন সব রস সৃষ্টি করতেন — যার জন্য আমরা তাকে নাটক লিখতে বলি।

ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক লাইনের পরিবর্তন অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে ফ্যাশিস্ট বিরোধী জনযুদ্ধের লাইন গৃহীত হয়েছে। ফ্যাশিস্ট বিরোধী লাইন গ্রহণের ফলে ফ্যাশিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘ গঠিত হয়েছে। ইতিপূর্বে গঠিত ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিটিউটের সদস্যদের নিয়ে গানের দল ফ্যাশিস্ট-বিরোধী জাতীয়তাবাদী গান গেয়ে নতুন রাজনৈতিক লাইনকে শহরের নানা মহলে প্রচার করতে গিয়ে সাড়া পাচ্ছে। এর কারণ ছিল আপোষপন্থী কংগ্রেস রাজনীতির প্রতি বাঙালীর অনেক দিনের সন্দেহ এবং জাপানী আক্রমণে বিপদের আশংকা। তরুণ কমিউনিস্ট লেখক সোমেন চন্দের হত্যায় — এই আশঙ্কা ঘনীভূত হলো। বুদ্ধিজীবিরা অধিকতর সংখ্যায় সাড়া দিতে

লাগলেন। এই অবস্থায় কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট শুরু হলো। বিজন আনন্দবাজার অফিস থেকে 'অরণি' অফিসে আসার সময় পুলিশের লাঠি চার্জের সামনে পড়েন। আঘাত তেমন গুরুতর কিছু হয় নি —কিন্তু বিজন কংগ্রেসের উপর বেশ চটে গেলেন। কংগ্রেসের রাজনীতির ফলে পঞ্চম বাহিনী সুযোগ পাচ্ছে এই ধারণা তখন অনেক পার্টি সদস্যদের ছিল। বিজন তখনো পার্টি সদস্য নয়, কিন্তু তারও সেই ধারণা—বিজনের প্রথম নাটকে যা কোন দিন প্রকাশিত হয় নি কিন্তু আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন, তাতে বড় প্রকট হয়ে ছিল। আমাকে পড়তে দেওয়ার কারণ কেবল আমাদের পরিচয় নয়। আমি তখন 'জনযুদ্ধ' সাপ্তাহিকের সেল সেক্রেটারি এবং সেই সেলেই অনিল কান্তি-লাল, বিনয় রায়, চিন্মোহন সেহানবীশ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, জোতির্ময় সেনগুপ্ত প্রভৃতি ছিলেন। আর এই সেল থেকেই পরে পার্টির সাংস্কৃতিক সেল চারটি তৈরী হয়। দ্বিতীয়তঃ এই সেলটি প্রত্যক্ষ ভাবে প্রাদেশিক কমিটির তত্ত্বাবধানে ছিল। তৃতীয়তঃ প্রাদেশিক কমিটির অন্যতম পার্টি নেতা সোমনাথ লাহিড়ীর সঙ্গে আমি একই ফ্ল্যাটে বাস করতাম। পার্টি পত্রিকা সম্পাদনার কাজে তাঁকে সাহায্য করতাম। অর্থাৎ যে কোন দরদী সংস্কৃতিবান কর্মীর তুলনায় পার্টি-নেতৃত্বের সঙ্গে আমার যোগাযোগ অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ ছিল। তাই আমার বিবেচনায় যখন বিজনের প্রথম নাটক পরিত্যক্ত হলো তখন বিজন কিন্তু কোনরূপ আপত্তি করেন নি। এই সময় 'জনযুদ্ধ' কাগজে নাটিকা চাই বলে পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়। তাতে বিশেষ সাড়া পাওয়া গেল না দেখে ফ্যাশিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের তরুণ লেখকদের মধ্যে প্রচার চালানো হয়, এবং তারই ফলে বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরী' এবং বিজনের 'আগুন' নাটিকা লেখা হয়। দুইটি নাটকের বিষয়বস্তু ভিন্ন। বিনয়বাবুর নাটকের বিষয়বস্তু : বড় বৈজ্ঞানি-কেরও রাজনীতি পরিহার করে থাকা চলে না। জীবন তাকে রাজনীতির মধ্যে টেনে আনে। প্রফেসার ম্যামলক নামে একটি বিলাতী ছবি থেকে বিনয়বাবু প্রেরণাটা পান। কিন্তু গল্পটি একেবারে এ দেশী এবং 'জনযুদ্ধের' রাজনীতি মাথায় রেখেই লেখা। এই নাটকে বিশেষ করে বলানো হয় যে কংগ্রেসী বা 'জনযুদ্ধের' নীতির বিরোধী মাত্রেই পঞ্চম বাহিনী নয়। প্লট, রাজনীতি, বিন্যাস এবং চরিত্র-সৃষ্টির দিক থেকে 'ল্যাবরেটরী'-কে নিশ্চয় একটি সুগঠিত নাটিকা বলা যায়। এর পাশে বিজনের 'আগুন' (২৩শে এপ্রিল ১৯৪৩-অরণি)-কে বিচার করলে দেখা যাবে তৎকালীন জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্র : কৃষক শহরের দোকানে লাইন দিয়ে সামান্য ২।১ সের চাল সংগ্রহের জন্য রওনা দিচ্ছে। শ্রমিক এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকেরও সেই অবস্থা—অর্থাৎ প্রত্যেক পরিবারের জন্য একটি করে দৃশ্য রচনা করা হয়েছে।

শেষ দৃশ্যে একটি দোকানের সামনে লাইন এবং সেই লাইনে ঠেলাঠেলিকে

সংযত করছে একটি সিভিক গার্ড পুলিশী কায়দায়—অর্থাৎ অন্যায়ভাবে। এখানে একটি উড়িয়া খরিদ্দারের মারফৎ বলা হলো যে হিন্দু মুসলমান ও সাহেব সকলেই চাল সংগ্রহের প্রশ্নে এমনি জোট বাঁধছে যে দোকানীর পক্ষে ব্যবসা করার সুখ আর থাকলো না। দোকানী যে ব্ল্যাক করতে পারছে না এমনি একটি ইঙ্গিত। এই নাটিকার মূল বক্তব্য: চাল যতটুকু আছে—তা সুশৃঙ্খলভাবে বাঁটোয়ারা করে নেওয়া সকলের কর্তব্য। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই নাটিকা বিনয়বাবুর 'ল্যাবরেটরী'র তুলনায় অনেক দুর্বল। 'ল্যাবরেটরী'তে বৈজ্ঞানিক পিতার রাজনৈতিক পুত্র-কন্যার সঙ্গে যে মতাদর্শগতবিরোধ তার সমাপ্তি হলো—চাল সংগ্রহের ব্যাপারে সংঘর্ষের মধ্যে আহত পুত্রের সঙ্গে পিতার মিলন এবং তার পূর্বে একজন অসাধু ব্যবসায়ীর সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পিতার তর্কের মধ্যে মুনাফা ভিত্তিক ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রকৃত রূপ উদ্‌ঘাটনে। শম্ভু মিত্র 'ল্যাবরেটরী'তে বৈজ্ঞানিকের ভূমিকায় গণনাট্য সংঘে প্রথম অভিনয় করেন এবং বিজন 'ল্যাবরেটরী'-র অসাধু ব্যবসায়ী, 'আগুনে'র একটি কৃষক এবং আমি আর একটি কৃষকের ভূমিকায় অভিনয় করি। 'আগুন' নাটিকার কিছু কিছু সংলাপ—বিশেষ করে কৃষক ও তার বউয়ের সঙ্গে সংলাপ—তার উত্তরকালে রচিত 'জবানবন্দী' ও 'নবান্নের সংলাপ মনে করিয়ে দেয়।

প্রথমেই বলেছি যে এই দুটি নাটিকা যখন লেখা হয়েছে তখন মহামন্বন্তরের প্রথম পর্যায়—অর্থাৎ চালের অভাব ঘটেছে কিন্তু গগনচুম্বী দাম হয় নি। শীঘ্রই সেই অবস্থা হলো। কলকাতার পথে পথে মৃত্যু শুরু হয়ে গেল নিরন্ন গ্রামবাসীদের। বাংলার অন্নহীনদের সাহায্যের জন্য হারীণ চট্টোপাধ্যায় এবং বিনয় রায়ের নেতৃত্বে সাংস্কৃতিক দল গেল পাঞ্জাবে—যেখানে তখনো চাল ও গমের দাম অনেক সস্তা, কারণ অনেক উৎপাদন হয়েছিল। ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের লেখক, কবি, নাট্যকার ও গায়কদের উপর পার্টি দাবি করলে—অবস্থা বুঝে নতুন সৃষ্টির জন্য। ৪৬ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীটের অফিসে পার্টির রিলিফ ফ্রন্টের নেতা পাঁচু ভাদুড়ি এসে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বাস্তব অবস্থা বর্ণনা করতেন—ফলে প্রায় সময় নির্দিষ্ট করেই নাটক চাওয়া হলো এবং বিজনের 'জবানবন্দী' (২২শে অক্টোবর ১৯৪৩—অরণি) ও নট-নাট্যকার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'হোমিওপ্যাথী' প্রায় একই সময়ে রচিত হলো। এই নাটক দুটির অভিনয়কাল ও স্থান সম্পর্কে বিজন এবং তার সম্প্রতিকালের বন্ধু ডক্টর বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের যে ভ্রান্ত ধারণা আছে তা বিজনের 'ছায়াপথ' নাট্যগ্রন্থের ভূমিকায় লক্ষ্য করেছি। 'জবানবন্দী' ও হোমিওপ্যাথী' প্রথমে শ্রীরঙ্গমে মঞ্চস্থ হয় নি, হয়েছিল স্টার থিয়েটারে ৩রা জানুয়ারি ১৯৪৪ সালে। বিভূতিবাবু 'ছায়াপথের' ভূমিকাতে ছাড়াও 'চলচ্চিত্র' কাগজের রবীন্দ্র-শতাব্দী স্মারক সংখ্যা বৈশাখ '৬৮-তে 'নব নাট্যের পটভূমি' প্রবন্ধে লিখেছেন: "আগুন'-এর রচনাকাল

১৯৪১ এবং 'জবানবন্দী'র সঙ্গে 'হোমিওপ্যাথী' ও 'ল্যাবরেটরী' লেখা হয় কিন্তু শেষোক্ত দুটি নাটক অভিনীত হয় নি।" —এই সব রচনা পড়ার পর তাঁকে আমি ভুলগুলি সম্পর্কে সতর্ক করে দিই এবং প্রমাণ পত্রগুলি দেখার জন্য আমার বাসায় আসতে বলি কিন্তু তিনি বিজনের সঙ্গে অভিনয় করতে পেরে বোধ করি বিজনের উক্তিকেই তর্কাতীত মনে করে বসে আছেন।

যাই হোক, 'জবানবন্দী' তুলনায় 'আগুনে'র থেকে অনেক বেশি সুগঠিত নাটক। খণ্ড খণ্ড চিত্র সৃষ্টি করার পরিবর্তে একটি অভাবগ্রস্ত কৃষক পরিবারের গ্রাম ত্যাগ থেকে শুরু করে কলকাতার ফুটপাতে শিশুপুত্রের ও বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু এবং কৃষক রমণীর সতীত্ব হানির কাহিনী এই নাটকে বিবৃত আছে। যেভাবে প্লটের বিস্তার করা হয়েছে—তাতে বিজনের নাটক লেখার হাত যে পাকছে তা বোঝা যায়। তাছাড়া গ্রাম ছেড়ে কলকাতার পথে অন্ন সংগ্রহের আশায় এসে কৃষকেরা যে ভাবে ব্যর্থ হলো—তার ফলে কৃষকের আশা এবং শহর জীবনে বাস্তবের মধ্যেকার সংঘর্ষ নাটককে চরম পরিণতিতে পৌছানো যুক্তি-গ্রাহ্য করেছে। ঘটনা ও সংলাপের সুষ্ঠু প্রয়োগে 'জবানবন্দী' সেই সময়কার দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের যে মর্মন্তুদ চিত্র তুলে ধরে তা ব্যাপক জনসাধারণের অন্তর গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। আমার ধারণা 'জবানবন্দী'ই গণনাট্য সংঘের নাট্যশালার পরবর্তী 'নবান্ন' সৃষ্টির সুনিশ্চিত সোপান তৈরী করেছিল। এই নাটকের পরিচালক ছিলেন বিজনের সঙ্গে শম্ভুবাবু। এবং প্রথম রজনীতে তিনি যে একবারই রমজানের ছোট ভূমিকা নিয়েছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে আমি শুধু স্মরণ শক্তির উপর তত ভরসা করি না বলেই প্রথম রাত্রিতে একবার মাত্র বিনয় রায় ঐ ভূমিকা করেছিলেন বলে দৃঢ় মত এখনি প্রকাশ করতে চাইছি না। পরবর্তী অভিনয়ে মনোরঞ্জন বড়াল করে ছিলেন। শম্ভুবাবু কলকাতায় একবার মাত্র, আমি যে পদার ভূমিকা করতাম—সেই ভূমিকায় নামেন। পরে বাংলার বাইরে 'অন্তিম অভিলাষ' নামক হিন্দি অনুবাদে তিনি কৃষক পিতার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। শহরবাসী দর্শকদের মধ্যে 'জবানবন্দী' অভিনয়ের যে প্রভাব আমি দেখেছি তাতে মনে হয় যুগ্ম পরিচালক হিসাবে শম্ভুবাবু না থাকলেও এই একটি মাত্র ক্ষুদ্র নাটকের জন্য বিজনের নাম নাট্য ইতিহাসে স্থান পেত। বস্তুতঃ এই নাটক অভিনয় করে বিজন, গঙ্গাপদ, তৃপ্তি ও আমি ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মত বিদগ্ধ সমা-লোচক, শচীন সেনগুপ্তের মত নাট্যকার, নরেশ মিত্র এবং বিশ্বনাথ ভাদুড়ি অভিনেতাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করি। তবু সে যুগে আমরা গর্বে স্ফীত হই নি, কারণ ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ থেকে 'তিনটি নাটিকা' নামে যে বইয়ে 'ল্যাবরেটরী' 'জবানবন্দী' এবং 'হোমিওপ্যাথী' প্রকাশ করা হয়েছিল তার ভূমিকায় লেখা আছে: 'নিজেদের কলম ঠিক হয় নি, অভিনেতাদের

শিক্ষানবিশী হয় নি···।' অর্থাৎ খ্যাতির বিড়ম্বনা তখনো শুরু হয় নি।
'আগুন' ও 'জবানবন্দী' নাটকের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে শ্রেণী-সংঘর্ষ বা শ্রেণী-চেতনা বলতে আজকের মার্কসবাদে অভিজ্ঞ ছেলেরা যা বোঝে—তার কোন চিহ্ন ঐ দুটি রচনায় নেই। 'আগুনে' কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের চালের অভাবের কথা বলা আছে—কিন্তু উড়িয়া ক্রেতার মুখে সাহেবদের খাদ্যাভাবেরও উল্লেখ করা হয়েছে। সমস্ত চরিত্রগুলির মধ্যে এক সিভিক গার্ডকেই কেবল হৃদয়হীন আমলা রূপে চিত্রিত করা আছে। আর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক যখন ঘরের বার হচ্ছেন তখন স্ত্রী গৃহদেবতাকে প্রণাম করে যাওয়ার কথা বললে তিনি প্রণাম করায় আরো একটু সন্দেহ প্রকাশ করলেন এবং অফিসের বড় কর্তারা কর্মচারীদের নামে চাল সংগ্রহ করে কালোবাজার করছেন বলে উষ্মাও প্রকাশ করলেন। বিনয়বাবু 'ল্যাবরেটরী'-তে ব্যবসায়ী সভ্যতার যে চিত্র অসাধু ব্যবসায়ীর চরিত্র এনে প্রকাশ করেছিলেন—তা এই দুটি নাটকে পাওয়া যায় না। 'জবানবন্দী'তে শহরের এক ধরণের ভদ্রলোক শ্রেণী এবং ঈশ্বর সম্পর্কে অভিযোগ আছে—কিন্তু শ্রেণী বিদ্বেষ বা শ্রেণী সংগ্রামের কথা—কিংবা কৃষককে নায়ক করার মত কোন চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায় না। 'জবানবন্দী'তে কৃষকের দুরবস্থার কথা গভীর দরদের সঙ্গে বলা হয়েছে—তার জন্য দর্শকের মনে অন্য সকল প্রশ্ন ধামা চাপা পড়ে গেছে। মানবিকতাই এখানে মূল প্রেরণা।
এরপর 'নবান্ন' রচনাতে বিজন আবার 'আগুনের' মত স্কেচ রচনার পথ ধরলেন। আগস্ট বিপ্লব, বন্যা ও সাইক্লোন, অন্নাভাব ও রোগ, গ্রামত্যাগ এবং শহরে এসে নিদারুণ অভাবে পরিবারের কর্তার মস্তিষ্কবিকৃতি, কৃষক-বধূর নারী ব্যবসায়ীদের ফাঁদে পড়া, সরকারী প্রচেষ্টায় পরিবারের কিছু অংশের গ্রামে ফেরা—এবং শেষ পর্যন্ত চাষবাস করে নতুন ধানের 'নবান্ন' উৎসবের মধ্যে বিকৃতমস্তিষ্ক কর্তার প্রত্যাবর্তনের উপলক্ষে ভবিষ্যৎ দুর্ভিক্ষ রোধ করার প্রতিজ্ঞাতেই নাটক শেষ করা হয়েছে।
'জবানবন্দী'র গল্পের সঙ্গে 'নবান্ন'-এর গল্পের অনেক মিল আছে। 'জবানবন্দী'তে যেমন বুড়ো বাপ ও দুই ছেলে—'নবান্নে' তার বদলে জ্যেঠা এবং দুই ভাইপো আছে। 'জবানবন্দী'তে বড়ভাইয়ের স্ত্রী ও একটি পুত্র—'নবান্নে' বড় ভাইয়ের স্ত্রী ও একটি পুত্র ছাড়া ছোট ভাইয়েরও স্ত্রী আছে। 'জবানবন্দী'-তে যেমন নাতি না খেতে পেয়ে কলকাতার ফুটপাথে মারা গেল,—'নবান্ন'-তে অপুষ্টিজনিত শিশুমৃত্যু গ্রামের বাড়িতেই ঘটল। 'জবানবন্দী'-তে কৃষকবধূকে কলকাতার পথে ফুসলানো হলো—'নবান্নে'ও সেই ঘটনা। তবে এখানে গ্রামের দুষ্ট ব্যবসায়ী দুশ্চরিত্রা সহকারিণী, শহরে চালের ব্যবসায়ী ও নারী ব্যবসায়ী—দারোগা, সংবাদপত্রের প্রেস ফটোগ্রাফার প্রভৃতি চরিত্র আমদানি করে কৃষকের দুরবস্থার জন্য যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে দায়ী তাদের অনেককে চিত্রায়িত করা

হয়েছে। নাটকের প্রথম অঙ্কটির সব কটি দৃশ্য কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতীক চিত্র হিসাবে অঙ্কিত: আগস্ট আন্দোলন, বন্যা ও সাইক্লোন, (মেদিনীপুরের পটভূমিকা)। অভাবক্লিষ্ট পরিবারে এক ভাইয়ের গৃহত্যাগ, অভাবের জন্য নাতির অপুষ্টি-জনিত রোগ ও গ্রামের মহাজনের সঙ্গে বিবাদে বড় ভাই অত্যাচারিত এবং পুত্র মৃত। ৫টি দৃশ্যের ৪টির মধ্যে মূল পরিবারে মাত্র দুটি বাইরের লোক এনে ঘটনাকে নাটকীয় করার চেষ্টা হয়েছে। শহরে আসার পর থেকে চাল-ব্যবসায়ী ও গ্রামের মহাজন গ্রেফতার হওয়া পর্যন্ত প্লট যথা নিয়মে গড়ে উঠেছে—যার মধ্যে হাসপাতালের দৃশ্য প্রক্ষিপ্ত। নাটকের শেষ দুটি দৃশ্য অর্থাৎ তাঁদের গ্রামে ফিরে যাওয়া এবং 'নবান্ন' উৎসব করা নাটকের বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতি-বিহীন বলে বহু সমালোচক মত দিয়েছেন।
এই প্রসঙ্গে সে যুগের কিছু সংবাদ পত্রে প্রকাশিত মন্তব্যের মধ্যে আমার উক্তির পক্ষে প্রমাণ আছে। গণনাট্য সংঘের সভাপতি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন যে 'জবানবন্দী' ও 'নবান্নের' বিষয়বস্তু প্রায় এক—নতুনত্বের চমক পাওয়া যাবে না: "নবান্ন পড়ে মনেই হয় না এর মঞ্চোপযোগিতা থাকতে পারে। এ নাটকে রূপ দেবার সাহস ও সফলতা গণনাট্য সংঘের পক্ষেই সম্ভব। ...ছোট বড় বহু সংখ্যক ভূমিকা সমান ভাবে প্রাণ দিয়ে অভিনয় করতে পারেন তাঁরাই, যাঁরা জানেন মাত্র জনসেবাই এর লক্ষ্য—নিজেদের প্রতিষ্ঠা নয়।... 'জবানবন্দী' 'নবান্ন' এদের বিচার অন্য নাটকের সূত্রে চলবে না।" (জনযুদ্ধ) আমাদের বিশেষ বন্ধু সাহিত্যিক সুশীল জানা লিখেছেন: "নাটকের গতির সঙ্গে সঙ্গে একটা জিনিস মনে আঘাত করে। মনে হয় এর প্রত্যেকটি দৃশ্য স্বয়ং সম্পূর্ণ। প্রত্যেকটি দৃশ্য শেষ হচ্ছে একটা চরম আবহাওয়ায় এসে তাতে নাট্য কাহিনীর ক্রম পরিণতি ব্যাহত হচ্ছে।" সুশীলবাবু সে যুগের নিষ্ঠাবান পার্টি কর্মী হিসাবে শেষ দৃশ্যে দয়ালের প্রতিরোধ করার সংকল্পের উপর জোর দিয়ে বলেছেন এই খানেই 'নবান্ন' 'নীলদর্পণের' থেকে নতুন ও বলিষ্ঠতায় সমৃদ্ধ। কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে এটা রাজনৈতিক মত—যা নাটকের বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত নয় কিন্তু অভিনয়গুণে এই বক্তব্য উৎরে গেছে—(অরণি)। 'পরিচয়' কাগজের অন্যতম সম্পাদক পার্টি দরদী অথচ প্রকৃত সাহিত্যসেবী হিরণকুমার সান্যাল সে কথা 'পরিচয়ে' প্রায় পরিষ্কার করে বলেছেন। তার আগে সাহিত্য-সমালোচক কালিদাস রায়ের উক্তি পাঠকের অবগতির জন্য উল্লেখ করতে চাই: 'নবান্নকে একটি পরিপূর্ণাঙ্গ নাটক না বলিয়া ইহাকে একখানি দৃশ্য কাব্য বলিতে চাই। ইহাতে গীতধর্ম অপেক্ষা চিত্রধর্মই অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে।'
হিরণকুমার সান্যালের উক্তিটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ তিনি পার্টি দরদী এবং গণনাট্য সংঘের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন; দ্বিতীয়তঃ রবীন্দ্রযুগের একজন বিশিষ্ট সাহিত্যবোদ্ধা হিসাবে তিনি পরিচিত, স্পষ্টবাদী হিসাবে বহু

লোকের শ্রদ্ধাভাজন এবং সেই হিসাবে আমাদের তরুণ দলের অর্থাৎ আনন্দ-বাজারের অরুণ মিত্র, অরণি-র সুশীল জানা ও স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, অমৃতবাজার পত্রিকার সরোজ দত্ত প্রভৃতির মত বিজনের এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু নন যে সব ত্রুটি চেপে যাবেন। তৃতীয়তঃ হিরণবাবুর লেখা নিয়ে তখনকার দিনে প্রগতি লেখক ও শিল্পী শিবিরে প্রবল বিভেদ সৃষ্টি হয় যার জন্য বিজনের পক্ষে বিষ্ণু দে ও জ্যোতির্ময় রায় ('উদয়ের পথে' ফিল্‌ম খ্যাত) প্রভৃতিকে দিয়ে হিরণ সান্যালের মত খণ্ডন করার চেষ্টা হয়। কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাসে 'নবান্ন' নিয়ে যে মত-পার্থক্য দেখা দেয়—তারই একটি ধারা ১৯৪৮ সালের রাজনৈতিক হঠকারিতাকে বিচিত্র ভাবে পুষ্ট করে। এ ইতিহাস এখানে আলোচ্য নয় বলে ক্ষান্ত হলাম—তবে এই কথা বলা দরকার যে, এই বিতণ্ডায় প্রাদেশিক পার্টি নেতৃত্ব কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে নি এবং 'নবান্নের' সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত আমার মত কর্মী এই বিতণ্ডা থেকে কিছু শিখতে চেষ্টা করেছিল। কারণ এই নাটকের রিহার্সালের যুগ থেকেই আমাকে এই নাটকের রাজনৈতিক বক্তব্যের ত্রুটি মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করতে হয়েছে এবং অভিনয়ের আগেই সতু সেনের সমালোচনা থেকে হিরণবাবুর বক্তব্যকে গ্রহণ করার মনোভাব তৈরী করেছি। সতু সেনকে অভিনয়ের আগেই 'নবান্ন'র পাণ্ডুলিপি পড়িয়ে শোনানো হয় এবং তিনিও শেষ দুটি দৃশ্যের বাস্তবতা ও নাটকীয় পরিণতির দিক থেকে তার যৌক্তিকতার সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন।

এখন হিরণ সান্যালের বক্তব্য শোনা যাক :

"একেবারে প্রথম দৃশ্যে বিশেষ একটি গ্রামের ও সেই সঙ্গে সমগ্র দেশের যে অবস্থা উদ্ভাসিত হয় পরবর্তী দৃশ্যগুলির সঙ্গে তার সংযোগের সূত্র অতি ক্ষীণ। এ ক্ষেত্রে ত্রুটি শুধু নাট্যকারের নয়—পরিচালকেরও। আচমকা কতগুলি লোম-হর্ষক ব্যাপার ঘটল, পরের ঘটনা প্রবাহে থাকল তার অস্পষ্ট রেশমাত্র। অর্থাৎ নাটকটির সূত্রপাতে এমন একটি রহস্য থেকে গেল যার সমাধান শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল না। কিন্তু তবু অভিনয় জমল, লেখকের মর্মস্পর্শী আলেখ্য অবলম্বন করে, অভিনেতা অভিনেত্রীদের নৈপুণ্য ও পরিচালক প্রযোজকের শক্তিশালী পরিকল্পনার ফলে। মাঝে মাঝে স্খলন হয়েছে যদিও গুরুতর নয়, যথা :

"ছোটবউর গায়ে হাত তোলার অপবাদ দিয়ে বড় ভাই নিরপরাধ ছোট ভাইর উপর যে-ভাবে গগন-ভেদী মারণ ও তাড়ন লীলা প্রকট করলেন তাতে ছোট বউ মুখ বুঁজে থাকা ভাসুর-ভাদ্র-বৌর সলজ্জ সম্পর্কের দোহাই দিয়েও অত্যন্ত অস্বাভাবিক, বিশেষত চাষীর ঘরে। 'তোরা যা আমি যাব না।' বেসুরো গলায় এই সুরোৎপাদনের প্রচেষ্টা খুব শোভন হয় নি ; ততোধিক অশোভন এই সঙ্গে নট-নটীর তথা ভিক্ষুক ও ভিখারিনীর তালে তালে পা ফেলে নিষ্ক্রমণ। এই দৃশ্যে অশোভনতার চরম বংশী-বিলাপ। খেলো সিনেমার আঙ্গিকের এই অনু-

করণ নবান্নের আসরে একেবারেই অপাংক্তেয়। ··· নবান্নের দুর্বলতম অংশ এর শেষদৃশ্য। এই দৃশ্যে গ্রন্থকার যে ভাবে তার উদ্ভাবিত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন তা শুধু রোমান্টিকও অবাস্তব নয়, নাটকটির পূর্বাংশের সঙ্গে একেবারে সঙ্গতিহীন। মারী ও দুর্ভিক্ষে যে গ্রাম ছারখার হয়েছে ও এই প্রচণ্ড দ্বৈত বিভীষিকা যথেষ্ট নয় মনে করে গ্রন্থকার যে গ্রামকে বন্যা দিয়ে বিধ্বস্ত না করে খুশি হন নি, ঠিক সেই গ্রাম প্রধানের কুটির প্রাঙ্গণে অক্ষতদেহে ফিরে এল একটির পর একটি গ্রাম ত্যাগী দুঃস্থ যারা দু দিন আগে শহরের পথের ডাস্টবিন্ হাতড়ে খুঁজেছে জীবন ধারণের শেষ সম্বল। বৃদ্ধ প্রধান পর্যন্ত এই মিলনান্ত দৃশ্য থেকে বাদ পড়লেন না, তাঁর মাথা গেল বিগড়ে কিন্তু আশী বছরের প্রাচীন দেহ কায়কল্প চিকিৎসা না করেও শেষ পর্যন্ত রইল সক্ষম। মাঝখান থেকে মারা গেল একটি অসহায় শিশু, তাও গ্রাম ত্যাগের আগেই। লেখকের এই শিশু হত্যার প্রবৃত্তি—পূর্বনাটক 'জবানবন্দী' স্মরণীয়—তাঁর কলমের পক্ষে মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। ··· একটি অক্ষম নাটককে অবলম্বন করে অভিনয় ও প্রযোজনার এতখানি কৃতিত্ব কি সম্ভব? এর উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে তা' যদি সম্ভব না হ'ত তাহলে বাংলা দেশে শিশির ভাদুড়ির মত অভিনেতার অভ্যুদয় হ'ল কি উপায়ে? "আমার শেষ কথা এই যে গণনাট্য সংঘ তাঁদের নামের সম্পূর্ণ উপযোগী নাটক আজ পর্যন্ত পেলেন না কিন্তু তাতে তাদের অগ্রগতি বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন হয় নি। নিখুঁত গণনাটক রচনার আশায় বসে না থেকে উপস্থিত যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে আসরে নামার প্রয়োজন ছিল। গণনাট্য সংঘ সাহসের সঙ্গে আসরে নামলেন, বিজনবাবুও সাহসের সঙ্গে রচনা করলেন প্রথমে 'জবানবন্দী' ও পরে 'নবান্ন'। ঠিক গণনাটক বোধ হয় হ'ল না। কিন্তু ভবিষ্যতে যাতে পুরো দস্তুর গণনাটক হতে পারে তার অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে। এখন গণনাট্য সংঘকে এগুতে হবে পরীক্ষা ও বর্জনের মধ্য দিয়ে। 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' সার্থকতা অর্জন করল সাহিত্য হিসাবে নয়, গণনাট্য সঙ্ঘের এই পরীক্ষা ও বর্জনের পথকে প্রশস্ত করে।" (পরিচয় পৌষ ১৩৫১)

হিরণবাবু মার্ক্সবাদী দলের সভ্য না হয়েও এই যে আলোচনা করেছেন—তা তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির পরিচায়ক একথা বর্তমান যুগের সমালোচককে স্বীকার করতেই হবে।

'নবান্ন'র বিষয়বস্তুর রাজনৈতিক ত্রুটির কথাও এই প্রসঙ্গে বলা দরকার। এই নাটকের রচনা ও প্রযোজনার সঙ্গে আমি এত ঘনিষ্ট ভাবে জড়িত যে লিখতে বসলে কলম সংযত রাখা মুশকিল। শৌভনিক আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় বিজন বলেছিলেন (অভিনয়-দর্পণ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি সংখ্যা ১৯৬৯) "নবান্ন যখন প্রযোজিত হয় তখন সে নাটক আমি দেশের কথা ভেবেই লিখেছিলাম কোন দলীয় রাজনীতি বা বিশেষ মতবাদে প্রভাবিত হয়ে নয়। ১৯৪২ সনে যে আগষ্ট

আন্দোলন, সে আন্দোলনের পিছনে আমার দলের সমর্থন না থাকলেও আমি একটা উদ্দীপনা বোধ করেছিলাম।" আমি এই উক্তির প্রতিবাদ করে 'অভিনয়-দর্পণে'র পরের সংখ্যায় প্রমাণ করি যে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির লাইন বিজন যতটা বুঝেছিলেন—ততটাই 'নবান্ন'তে আগাগোড়া প্রতিফলিত হয়েছে। লালবাজারে পুলিশের ছাড়পত্র নিতে আমি ও বিজন যাই। পুলিশ অফিসার, যিনি নাটকটি পড়েছিলেন (বর্তমানে ইনকাম ট্যাক্স বিষয়ে আইনজ্ঞের কাজ করেন) বললেন "আপনারা কি এম, এন রায়ের দলের?" শুনে তো আমি দুশ্চিন্তায় পড়লাম। কি করে সেই বদনাম কাটানো যায় তার জন্য রিহার্সেলের মধ্যে কোন কোন জায়গায় সংলাপ এমন ভাবে বদলানোর ব্যবস্থা করালাম যার নমুনা আমার কাছে আজো আছে। রায়-পন্থীরা তখন যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করার জন্য অর্থ সাহায্য চেয়ে ব্রিটিশ সরকারের কাছে গিয়েছিল এই অভিযোগে জাতীয়তাবাদী মহলে অত্যন্ত নিন্দিত হচ্ছিল। শিশিরকুমারও এই অভিযোগ উত্থাপন করেন আমাদের বিরুদ্ধে। এখন 'নবান্ন'-র প্রথম দৃশ্য যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে আগস্ট আন্দোলন সম্পর্কে সে যুগের কমিউনিস্ট পার্টির মতামতের সঙ্গে তার সহমর্মিতা। কংগ্রেস নেতাদের গ্রেফ্‌তারের প্রতিক্রিয়াতে দেশে আন্দোলন স্বরু হলো—কিন্তু তাকে কংগ্রেস প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পরিবর্তে ধংসাত্মক আন্দোলনে নিয়ে গেল প্ররোচকরা—এই ছিল কমিউনিস্টদের বক্তব্য। ফরোয়ার্ড ব্লক ও কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টির যারা ধ্বংসাত্মক কাজ করেছিলেন—গান্ধিজী এবং সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি নেতারা তাদের আন্দোলন কে কংগ্রেসের কাজ বলেন নি; তাঁরাও ব্রিটিশ সরকারের নিষ্ঠুর দমন লিওনাইন (সিংহ বিক্রম) ভায়োলেন্স নীতিকে দায়ী করেন যার বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া জনসাধারণের মধ্যে হয়। প্রথম দৃশ্যে প্রজ্জ্বলিত মশাল হাতে জনতার অর্থ হলো অগ্নিগর্ভ ভারত এবং তারপর পিছনের সাদা পর্দায় লাল আলো জলে ওঠার সঙ্গে মেশিন গানের শব্দ—কংগ্রেস নেতাদের গ্রেফ্‌তারের প্রতীক। ঘোষক ১৯৪২ সাল তিনবার বলে শেষ বারে ৯ই আগস্ট বলতো লাল আলো ফেলার আগে। প্রধান সমাদ্দার ছিল অত্যাচারে উৎপীড়িত ভারতবাসীর প্রতীক। পুলিশের গুলিতে দুই পুত্র হারিয়ে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য উন্মাদ প্রায়। বড় ভাইপো কুঞ্জ তার বিপরীত। সে অকারণ প্রাণ দিতে চায় না—গোটা ব্যাপারটি সম্পর্কে তার দ্বিধা আছে। প্ররোচক এসে উত্তেজিত করলেও সে উত্তেজিত হচ্ছে না। তার মনে 'কিন্তু' আছে আর উন্মাদ-প্রায় বৃদ্ধ সেই 'কিন্তু'র টুঁটি টিপে মারতে চায়। সেই যুগে জাতীয়তাবাদী শক্তি কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কী রূপ মারমুখী হয়েছিল—তা যেমন বাস্তব জীবনে কমিউনিস্ট লেখক সোমেন চন্দর হত্যাতে প্রকাশ পেয়েছিল তেমনি 'নবান্ন' নাটকের প্রথম দৃশ্যে প্রধান সমাদ্দার বৃদ্ধের সংলাপে তা প্রকাশ করা হয়েছে। তখনকার দিনে কংগ্রেস

আন্দোলনের উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দেহবাদী বিরাট জনসাধারণের প্রতীক ছিল কুঞ্জের চরিত্র। বিজন প্রধান সমাদ্দারের ভূমিকায় এমনি ভাবপ্রবণ অভিনয় করতো যে একদিন কুঞ্জরূপী আমার গলা ভীষণভাবে চেপে ধরে। ফলে আমার জিভ বেরিয়ে শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম এবং গলায় তার আঙুলের চাপে কাল-শিরে পড়ে যায়। পরের দিন আমি মাসিমাকে (বিজনের মাকে) তা দেখিয়ে বলেছিলাম দ্বিতীয় দিন এমন করলে মঞ্চের মধ্যে ঘুঁষি কসিয়ে দেব। মোটের উপর 'নবান্ন'র প্রথম দৃশ্য ১৯৪২-এর আন্দোলনকে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে প্রতিফলিত করেছে—যদিচ ঐ দৃশ্যের স্বদেশী বাবুকে একটি দায়িত্ব জ্ঞানহীন প্ররোচনাকারী হিসাবে চিত্রিত করে পার্টি লাইনকে রক্ষা করা হয়েছে। তারপর দ্বিতীয় দৃশ্যে প্রধান সমাদ্দারের মুখে কিছু অতিরিক্ত সংলাপ দিয়ে—যা প্রথম অরণিতে প্রকাশিত বইতে ছিল না—আরো প্রমাণ করা হলো—যে সাধারণ মানুষ ইংরাজের উপর ক্রুদ্ধ হয়েই নিজেরাই ধানের গোলায় আগুন দেয়; ব্রিটিশ সরকার জাপানীদের অবতরণ আটকাতে নৌকাগুলি কেড়ে নেয় এবং নদী বা সমুদ্র উপকূলবর্তী গ্রামবাসীদের ২৪ ঘণ্টার নোটিশে গ্রাম ছাড়া করে। মূল নাটকে ছিল—কৃষকরা নিজ হাতে ধানের গোলা পুড়িয়েছে এবং কিছু ধান মাটির নিচে পুঁতে রেখে নষ্ট করেছে। অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের জন্য আগস্ট আন্দোলন এবং কৃষকরাই দোষী। নাটকের এই রাজনৈতিক ত্রুটি কাটাবার জন্য ব্রিটিশ ও গ্রামের মহাজন-বেপারী শ্রেণীকে দোষী করার মত সংলাপ বিজন ও আমি সংযোগ করতে লাগলাম। যে দৃশ্যে পুলিশ কর্তৃক শহরের মজুতদার ও গ্রামের নারী ব্যবসায়ীরা গ্রেফ্‌তার হয়; প্রথম রাত্রির অভিনয়ের পর পার্টির অনেক নেতা বললেন—এইভাবে পুলিশকে নিরপরাধ দেখানো বাস্তব নয়। ফলে পুলিশ যে ঘুষ খেয়ে ওদের ছেড়ে দেবে তার একটা ইঙ্গিত অভিনয়ের মাধ্যমে দেওয়া হলো—যাতে দর্শক বুঝতে পারে ব্যাপারটা। তদনুযায়ী সংলাপে পরিবর্তন করাও হলো। রিহার্সালের সময়েই শেষ দৃশ্যের আগের দৃশ্যে কিছু সংলাপ যোগ করতে হলো—এই বোঝানোর জন্য যে গাঁতায় খেতেই কৃষকের সব সমস্যা দূর হবে না। গাঁতায় খাটা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার সূচনা মাত্র। পার্টির রাজনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখার আর একটি দৃষ্টান্ত বিশেষ ভাবে আছে—গ্রামীণ দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের গ্রামে ফিরে যাওয়ার দৃশ্যে। সে যুগে লর্ড ওয়াভেল ভারতের বড়লাট হয়ে এসে কলকাতার রাস্তায় মৃত্যুকে ঢাকতে পুলিশ ভ্যানে করে ক্ষুধার্তদের শহর থেকে দূরে প্রতিষ্ঠিত লঙরখানায় পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। কাজটা সুশৃঙ্খলভাবে হতো না। ফলে গোটা পরিবারের অর্ধেক যেত এবং অর্ধেক রাস্তায় পড়ে থাকতো, স্ত্রী যেত তো স্বামী বা সন্তান পড়ে থাকতো। অব্যবস্থা ছাড়াও একটা আশা দেওয়া হয়েছিল যে গ্রামে প্রচুর ধান হয়েছে, কৃষকরা গ্রামে ফিরে গেলে কাজ ও ধান পাবে। পার্টির বক্তব্য ছিল সরকারী ব্যবস্থা যেন

সুশৃঙ্খল হয়—অর্থাৎ গোটা পরিবার যেন গ্রামে ফিরে যেতে পারে। এ ছাড়া 'জবানবন্দী' বা 'নবান্ন'তে কোথাও জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলা হয় নি।

'নবান্ন' নাটকের রচনায় যে আঙ্গিকগত দুর্বলতা ছিল—তা দূর হয়—ঘূর্ণায়মান মঞ্চের জন্য, চট ব্যবহার করে দৃশ্যগুলিকে প্রতীকধর্মী করার জন্য এবং মাইকের সাহায্যে শব্দের যথাযথ প্রয়োগের উপর। খণ্ড খণ্ড চিত্রকে গতি সমন্বিত না করতে পারলে নাটক জমবে না—এটা শম্ভুবাবু বুঝতেন বলেই তিনি যে মঞ্চে রিভলভিং নেই সেখানে 'নবান্ন' করতে চাইতেন না। বিজন 'কালান্তর' কাগজে লিখেছেন যে প্রতি জেলায় নাকি 'নবান্ন' করেছেন। কলকাতার বাইরে যশোর, বহরমপুর, বর্ধমানের হাট গোবিন্দপুর এবং মেদিনীপুর ছাড়া আর কোথাও 'নবান্ন' হয়েছে—এমন কোন প্রমাণ কেউ দেখাতে পারেন? যে নাটকের এমন ঐতিহাসিক ভূমিকা—সেই নাটক কটা 'নবনাট্য' আন্দোলনের অংশীদার দল করেছে—তা কি বলবেন? গত ৩৩ বছরে আমি গোটা পাচেক দল দিয়ে একবার করে করিয়েছি। এর অন্যতম কারণ নাটকটি যে ভাবে আমরা অভিনয় করতাম—সে ভাবে ছাপানোতে বিজনের আপত্তি। আমি তাকে অনেক অনুরোধ করেছিলাম—কিন্তু তিনি রাজি হন নি। আমার দৃঢ় ধারণা—সেই ভাবে নাটক ছাপা হলে আজও লোকে 'নবান্ন' অভিনয় করত। 'নবান্ন' অভিনয়ের আগেই আমি পার্টিকে বলেছিলাম—এই নাটক নিয়ে বাংলার জেলায় ঘোরা সম্ভব হবে না—কারণ নাটকে যতগুলি চরিত্র আছে—তার অভিনেতারা নানা কারণে যখন তখন কলকাতা ছাড়তে পারবেন না এবং যে আঙ্গিক প্রয়োগ করা হয়েছে—তা প্রয়োগ করার মত মঞ্চ আমাদের জেলা শহর-গুলিতে নাই। কথাটি এই কারণে বলতে হলো যে 'নবান্ন'র জন্য সর্বক্ষণের কিছু কর্মী নেওয়ার সময় আমাকে বলা হয় যে ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের মা এমন একটি মোটর ভ্যান দেবেন—যা রাত্রিতে মঞ্চে রূপান্তরিত করে অভিনয় করা যাবে এবং দিনের বেলায় অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়ে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় যাবে এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িত ও রোগগ্রস্ত বাঙালীর জন্য অর্থ সংগ্রহ করবে। পার্টি নেতৃত্বের আশা ছিল যে নাট্যকার প্রয়োজন মত নাটককে ছোট করে নেবেন। কিন্তু তার কোনটাই হয় নি—কারণ রিভলভিং মঞ্চ পাওয়া যখন বন্ধ হলো তখন 'শ্রী' সিনেমা—কিম্বা রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে অভিনয় করার সময় দেখা গেল আগেকার মত দর্শক হচ্ছে না—এমন কি কালিকা থিয়েটারে এসেও দর্শক পাওয়া গেল না। 'নবান্ন' নাটকের দর্শক সংগ্রহের ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টি যে ভাবে চেষ্টা করেছে—ভারতের কোন অপেশাদার নাট্য গোষ্ঠীর সাফল্যের জন্য কোন সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান তেমন কাজ ব্রিটিশ ভারতে করেছে বলে জানি না। একাডেমি পুরস্কার পাওয়ার পর বিজন কমিউনিস্ট পার্টির কাছে এই ঋণ স্বীকার করেছে

কিন্তু মুক্তাঙ্গনের সম্বর্ধনা সভায় সে কথা স্বীকার করতে তার দ্বিধা ছিল। আর আমি তার প্রতিবাদ করায় 'বহুরূপী'র 'নবান্ন' স্মারক সংখ্যায় শমীক বন্দ্যো-পাধ্যায় লিখলেন: "এ সম্পর্কে 'নবান্ন' নাটকের অন্যতম অভিনেতা এবং ব্যবস্থাপক শ্রীসুধী প্রধান অন্যমত পোষণ করেন। তিনি দাবী করেছেন সরা-সরি কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে ও পার্টির কর্মনীতি 'অনুসারেই' 'নবান্ন' রচিত হয়েছিল। ব্যক্তিত্ব ও অবদানের বিচারে বিজনবাবুর স্থান এতই উঁচুতে যে স্বভাবতই তাঁর বক্তব্যকেই আমরা বেশী মূল্য দিই।"

ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে যে পদ্ধতি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বাতলালেন তাতে আমাকে নস্যাৎ করতে গিয়ে যে তিনি ইতিহাসেরই বিরুদ্ধাচারণ করলেন এবং ইতিহাসের তথ্য যে রুচিনির্ভর নয়—এই সহজ কথাটা ইনি জানেন না দেখে বিস্ময় মানতে হয়।

ভদ্রলোক 'নবান্নে'র ভূমিকা নির্ণয় করতে গিয়ে তুলসী লাহিড়ীর নাটকের যে সমালোচনা করেছেন এই প্রসঙ্গে তার এবং কৃষকের চরিত্র নিয়ে আমাদের মহান পূর্বসূরী মধুসূদন ও দীনবন্ধু যে নাটক রচনা করেছেন—তার সম্পর্কে কিছু বলে 'নবান্ন' প্রসঙ্গ শেষ করব। "গণনাট্য সংঘ জনগণকে তারকায়িত করে"—এই বুলি আমরা বহু দিন ধরে বলে এসেছি। 'নবান্ন'—কিম্বা 'জবানবন্দী'তে দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের দুঃখের মর্মান্তিক দৃশ্য আছে বটে কিন্তু 'তারকা' বা 'নায়ক' বলতে কোন চরিত্র কি আমরা এই নাটক দুটিতে পাই? অপর পক্ষে 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'র হানিফ এবং নীলদর্পণের তোরাপ প্রকৃত পক্ষে ঐ দুটি নাটকের প্রকৃত নায়ক। ঠিক তেমনি 'দুঃখীর ইমানের' অনেক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ধর্মদাস এবং মুসলমান কৃষক জামাল তাদের আচরণের দ্বারা অন্য সমস্ত চরিত্রকে ছাড়িয়ে উঠেছে এবং সক্রিয় নায়কের ভূমিকা নিয়েছে। যে মঞ্চে আলমগীর, রামচন্দ্র এবং জীবানন্দের মত নায়ক প্রাধান্য পেয়েছিল, সেখানে 'দুঃখীর ইমান' যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনল—তা শমীক বাবুদের মত পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের মানুষের চোখে পড়বে এমন আশা করি না। তিনি দেখলেনই না যে 'ছেঁড়াতারে' তুলসী লাহিড়ী অর্থনৈতিক সমস্যার সঙ্গে বাঙালী জীবনের বৃহত্তর অংশের তালাকের সমস্যা যে নাটকীয়তায় তুলে ধরেছেন—যা তখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র তো নয়ই কোন মুসলমান সাহিত্যিকও করতে প্রয়াসী হন নি। আমি জানি তুলসীবাবু মার্ক্স ও লেনিন এক পাতাও পড়েন নি আবার শমীকবাবুদের মত ইউরোপ আমেরিকার অবক্ষয়বাদী সাহিত্য সমালোচনার আধুনিক সংস্করণও পড়ার সুযোগ পান নি।

গণনাট্য সংঘে থাকতে বিজনের পরবর্তী নাট্যকর্ম হচ্ছে 'জীয়নকন্যা' ও 'অবরোধ'। 'জীয়নকন্যা'কে গীতিনাট্য বলা চলে। 'জবানবন্দী' রচনার কিছু

কাল পরেই জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র 'নবজীবনের গান' রচনা করেন। নবজীবনের গান যা পরে স্বরলিপি করে প্রকাশ করি—তা কিন্তু একদিনের রচনা নয়। আস্তে আস্তে একটি দুইটি করে রচনা হচ্ছিল এবং গাওয়াও হচ্ছিল। প্রসঙ্গটি এই কারণে উল্লেখযোগ্য যে একটা পরিকল্পনা নিয়েই এই কাজগুলি হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা' ও 'চণ্ডালিকা'র আদর্শ সামনে রেখে তৎকালীন বাস্তবকে গানে রূপায়িত করা এবং গণনাট্যের শ্রোতাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য এই চেষ্টা হয়েছিল। কোন ভাল রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইয়ের সামনে 'নবজীবনের গান' এবং 'জীয়নকন্যা' গাইলে তারা বলে দিতে পারবেন—রবীন্দ্রনাথের কোন কোন গানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আছে। কিন্তু 'নবজীবনের গানের' তুলনায় 'জীয়নকন্যা'য় বেশ কিছু পার্থক্য দেখা যায়। তার প্রধান কারণ রবীন্দ্র সঙ্গীত অপেক্ষা—লোক সঙ্গীতের সঙ্গে বিজনের গভীর পরিচয়। যেমন 'নহে ভিক্ষা, নহে ভিক্ষা, ভিক্ষায় না মিলিবে প্রাণ' রবীন্দ্র সঙ্গীতের সম্পর্কিত, তেমনি 'বেহুলা লো, তুই ঘুমেতে হলি কাতর, আজ ঘুমে হারালি বালা লক্ষীন্দর'—লোক সঙ্গীতের সঙ্গে সম্পর্কিত। আমার ইচ্ছা আছে—একটি পৃথক প্রবন্ধে 'জীয়নকন্যা' ও 'নবজীবনের গানের' সুরারোপ এবং আঙ্গিক নিয়ে আলোচনা করা। কারণ এই দুটি রচনাকে জনপ্রিয় করার জন্য সংগঠক হিসাবে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলাম—এবং 'নবজীবনের গানের' স্বরলিপি আমিই জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের দ্বারা করিয়ে নিই। এই যুগে কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের 'অভ্যুদয়' গীতিনাট্য সুকৃতি সেনের পরিচালনায় বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। আমাদের বৃন্দবাদন দলের নেতা সেতার বাজিয়ে অমিয়কান্তির মতে—'নবজীবনের গান' 'অভ্যুদয়ের' তুলনায় অনেক বলিষ্ঠ রচনা। কিন্তু নাটকীয়তা কম থাকায় এবং ঠিক সেই কারণেই নাট্য পরিচালক শম্ভুবাবুর অবহেলায় 'শ্যামা' 'চণ্ডালিকার' মত পৃথকভাবে অনুষ্ঠান করে প্রযোজনা করা যায় নি। অপর পক্ষে বিজন আমার সাহায্যে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের দুইদিন পরে—১৭ই আগস্ট কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে 'জীয়নকন্যা'র অনুষ্ঠান করে। শম্ভুবাবু কোনদিনই এই দুটি গীতিনাট্য প্রযোজনায় উৎসাহ দেখান নি।

'জীয়নকন্যা'-র বিষয়বস্তুও একেবারেই কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতি ভিত্তিক। সর্পদ্রষ্টা উলুপীকে ভারতবর্ষের প্রতীক বলা যায়—যে পরাধীনতার বিষে মৃত প্রায়। নানা গুণীনদের সমাবেশ করা হয়েছে তাকে বাঁচাবার জন্য। এই গুণীনগুলি হচ্ছে রাজনৈতিক দল—যারা প্রত্যেকে বলেছে তারা ভারতবর্ষের মঙ্গল চায়। কিন্তু বিষ তুলতে পারছে না কারণ বিষ তোলার মন্ত্র বা ধন্বন্তরী সাতখানা হাতে পাঁচ খানা হয়েছে বলে তার জোর কমেছে। কিন্তু পাঁচখানা একত্র হলে 'তখন এই বেমিলের ভিতর হয়তো লাগতে পারে, যেখানে মূল ধন্বন্তরী মন্ত্রটায় একটা নাড়া লাগাতে পারে—এই কথা'। কমিউনিস্ট পার্টি এই

যুগে 'কংগ্রেস-লীগ' ঐক্যের উপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়েছিল এবং বাংলার দুর্ভিক্ষ ও মহামারী রোধের ব্যাপারে হিন্দু মহাসভাকে পর্যন্ত একত্র করতে পেরেছিল—তার জন্য রাজা জমিদার কাউকে সে বাদ দিতে চায় নি। এই রাজনীতির ভ্রান্তি আমার এখন আলোচ্য নয়—কিন্তু শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন 'জীয়নকন্যার' সপর্কে সামাজিক পাপ ও দুর্বলতার প্রতিভূ বলে ধরে নেন তখন বলতে হয় যে গণনাট্য সংঘের নাটক সমালোচনা করতে হলে কেবল ইউরোপীয় নাট্য তত্ত্বের জ্ঞান নিয়ে করা যায় না—ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের জ্ঞানও থাকা চাই। কিন্তু তাঁর তাই যেন দায়িত্ব ছিল সে যুগের যোশীবাদী নীতির চূড়ান্ত সংস্কারবাদী রূপকে গোপন করা এবং সেই সংস্কারবাদী নীতির ফলে বিজনের মত নতুন ও প্রতিভাবান শিল্পীর যে ক্ষতি হয়েছে তাকে প্রকাশ না করা। 'নবান্নে' শ্রেণী সংঘর্ষের কথা না থাকলেও কৃষকদের সঙ্গে যাদের দৈনন্দিন সম্পর্ক যেমন গ্রামের মহাজন শহরের ব্যবসায় ও আমলা এবং তথাকথিত ভদ্রলোক শ্রেণী সম্পর্কে ঘৃণা সৃষ্টির প্রয়াস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু 'জীয়নকন্যায়' শেষপর্যন্ত শ্রেণীচেতনাহীন ও সংগ্রামহীন ঐক্যের আবেদন নানা সুর-বৈচিত্র্যে পূর্ণ হলেও সামগ্রিকভাবে রসানুভূতি ও চিন্তাকে জাগ্রত করতে পারে নি। 'জীয়নকন্যার' গানের সুরের যে ব্যবসায়িক সম্ভাবনা ছিল তা সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায় 'নাগিন' ছবিতে কাজে লাগিয়েছেন। রাজনৈতিক দুর্বলতা বিজনের বিষয়বস্তুকে জলো করেছে বটে—কিন্তু এই গীতিনাট্যের কথা ও সুরে বিজনের প্রতিভার পরিচয় আছে।

'অবরোধ' নাটক শ্রমিকদের এবং কারখানার মালিকদের নিয়ে লেখা। অথচ এই নাটক গণনাট্য সংঘ কেন করতে পারলো না? কারণ দুটি। একটি বিজনের কারখানা ও পুঁজিবাদী ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব এবং দ্বিতীয় 'জনযুদ্ধের' রাজনীতিতে শ্রমিক আন্দোলন—তখন যে ভাবে অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া সর্বাপেক্ষা ন্যূনতম স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল তার মধ্যেকার বিরোধের কৌশলগত রূপকে বুঝতে না পারা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যুগে কৃষকরা যেমন বাংলায় না খেতে পেয়ে মরেছে—তেমনি যুদ্ধ প্রচেষ্টায় নিযুক্ত শ্রমিক সংঘবদ্ধ হয়ে নানাধরণের সুবিধা আদায় করে শহর ও সৈন্য ছাউনির আশেপাশে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে নিম্নগামী হতে দেয় নি। বস্তুতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কংগ্রেস যে দীর্ঘদিন ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের রাস্তা নিয়েছিল তা ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই। কারণ যুদ্ধ প্রচেষ্টায় মাল সরবরাহ করে টাটা-বিড়লা গোষ্ঠী প্রভৃত মুনাফা সঞ্চয় করে এবং শ্রমিক আন্দোলন সুযোগ বুঝে সেই মুনাফা থেকে কিছু আদায় করতে সমর্থ হয়। আগস্ট আন্দোলনে কয়েক-দিনের জন্য টাটার কোন কোন কারখানা বন্ধ ছিল—মালিকদের উৎসাহে।

একমাত্র শ্রীগোপাল হালদার ছাড়া বাংলার কোন সাহিত্যিক ছিলেন না—সে যুগের ভারতের জটিল পরিস্থিতিতে দেশীয় ধনিক শ্রেণীর এইরূপ সাহিত্যে প্রতিফলন করার। বিজন গ্রামের কৃষকদের যত চেনে কারখানা পুঁজিবাদ এবং শ্রমিককে তত চেনে না। ফলে 'অবরোধ' নাটকের শোষিত শ্রমিক এবং মালিকের বঞ্চিতা স্ত্রীর জীবন 'জবানবন্দী' ও 'নবান্নের'র বঞ্চিত কৃষকের দুঃখের প্রতিধ্বনি তুলতে অক্ষম হলো।

তা ছাড়া সে যুগে গণনাট্য সংঘের মধ্যেকার বিভেদও এই দুটি রচনার প্রতি উদাসীন হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। 'নবান্ন'-এর সাফল্য কার জন্যে হলো—এই নিয়ে সে যুগে শম্ভুবাবু ও বিজনের মধ্যে মন কষাকষি হয়। 'নবজীবনের গান' যন্ত্রসঙ্গীতের সাহায্যে পরিবেশন করার চেষ্টায় আমি বুলবুল চৌধুরী, অমিয়কান্তি ও জ্ঞান মজুমদারদের সাহায্য নিতে অর্থাৎ শম্ভু বিজন ছাড়া অন্যদের আনাতে ওরা আমার প্রতি ক্ষুব্ধ হন। 'নীলদর্পণ' করকে শম্ভুবাবু রাজি হলেন না।

১৯৪৬-৪৭ সালের রাজনৈতিক অচল অবস্থার সঙ্গে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যেও অচল অবস্থা দেখা দিল। কৃষক জীবনের যে অভিজ্ঞতার পুঁজি 'জনযুদ্ধ' যুগের রাজনীতিতে বিজন কাজে লাগিয়েছিল—কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক মতের পরিবর্তনের অন্তবর্তীকালে সে পুঁজি যথেষ্ট নয় বলে দেখা গেল। এই পরিস্থিতিতে বিজনকে ছেড়ে শম্ভুবাবু ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হয়েছেন কিন্তু গণনাট্য আন্দোলনকে ছেড়ে বিজনের লোকসান হয়েছে প্রচুর। গণনাট্য সংঘ বলতে কেবল একটি তথাকথিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান মনে করি না এবং বিজনের ক্ষেত্রে আমি শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সংগ্রামী কৃষক আন্দোলনের সম্পর্কের কথাই মনে করি। ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত গণনাট্য সংঘের মধ্যে এই নেতৃত্ব যে ঐকান্তিকতা সৃষ্টি করতে পেরেছিল—বোম্বাই কেন্দ্রীয় স্কোয়াডে শিল্পী হিসাবে তৈরী অথচ রাজনীতিতে উদাসীন কিছু সাংস্কৃতিক ব্যক্তিদের আসার ফলে সংস্কৃতি আন্দোলন অপেক্ষা কিছু ব্যক্তির শিল্পজীবনের বিকাশের সমস্যা সংঘে প্রবল হতে থাকে। বোম্বাইয়ের দলের পিছনে (যারা 'ভারতের মর্মবাণী' ও 'অমর ভারত' নৃত্যানুষ্ঠান করেন) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎপরতা—কলকাতার নাটকের দলের অ-রাজনৈতিক নেতাদের মনেও উচ্চাশা সৃষ্টি করে, ফলে ১৯৪৩ সালের আবহাওয়া নষ্ট হয়ে যায়। তরুণ ও প্রগতিশীল রচনাকার বিজন ভট্টাচার্য সেই নষ্ট আবহাওয়ার বলি। সারা পৃথিবীর কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের যারা খবর রাখেন তারা জানেন যে ব্রিটিশ, ফরাসী, আমেরিকা প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক দেশের পার্টির সঙ্গে যুক্ত প্রগতিশীল লেখকদের অনেকেরই অবস্থা এই রকম হয়েছে, অনেকে নিরপেক্ষ হয়েছে এবং অনেকে চূড়ান্ত কমিউনিস্ট বিরোধী ও প্রতিক্রিয়া

শীল হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু ও তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়ার শিবিরে যাওয়ার আগেই পশ্চিম ইউরোপ এবং আমেরিকায় এই পশ্চাদ্‌গতি শুরু হয়েছিল—যার দৃষ্টান্ত 'পরাভূত দেবতা' নামক বইয়ে কিছু আছে।

যাই হোক বিজনের সঙ্গে আর দুটি নাটকের প্রযোজনায় কৃষিজীবন সম্পর্কে বিজনের পুঁজির মূলে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছিল—তার একটি 'নীলদর্পণ' এবং অপরটি বিজনের রচনা—'মরাচাঁদ'। দীনবন্ধুর নাটক 'নীলদর্পণকে' এ যুগের উপযোগী করতে বিজনের যে বিশিষ্ট ভূমিকা আছে তা আমি নানা প্রবন্ধে আলোচনা করেছি বলে এখানে উল্লেখ করলাম না। 'নীলদর্পণ' নাটকের মধ্যে কৃষক জীবনের যে বাস্তবতা সংগ্রামমুখী ছিল—বিজন নিঃসন্দেহে তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল এবং শম্ভুবাবুকে বাদ দিয়ে পরিচালনার ব্যাপারে নিজস্ব রীতি সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু 'মরাচাঁদে' সে আবার ব্যর্থতার পথ ধরলেন। 'মরাচাঁদ' প্রথমে একাঙ্কিকা ছিল এবং সেখানে আমি অভিনয় করি—সমাজসেবী শচীনবাবুর ভূমিকায়। পরে নাটকটির কলেবর বৃদ্ধি হয় এবং আমার পরিবর্তে বিভূতি মুখোপাধ্যায় অভিনয় করেন।

'মরাচাঁদ' নাটকটি বাউল, বৈরাগী ও কৃষিজীবি সম্প্রদায়ের জীবন নিয়ে লেখা। জমি, কৃষিঋণ, বীজ ধান ও জলকরের সমস্যার সঙ্গে অন্ধগায়ক পবন তার সুন্দরী স্ত্রী রাধা এবং মাসির সংসারের অভাব অনটনের সমস্যার ভিত্তিতে নাটকটি রূপায়িত হয়েছে। সমাজসেবী শচীনবাবু পবনের গানের সাহায্যে কৃষকদের সমাবেশ করেন। কারণ পবনের একখানা গান 'দশখান বক্তিমের সমান'—কিন্তু পবনের বাড়ির অন্নাভাবের খবর কদাচিত রাখেন। পবন অথচ শিল্পের সামাজিক মূল্যের চেতনা নিয়ে কেতকদাস নামে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের আদি-রসাত্মক গানের দল থেকে বেরিয়ে এসে জীবনের সমস্যা আরো বৃদ্ধি করে। এবং সেই কারণে যুবতী ও সুন্দরী স্ত্রী কেতকদাসের প্রলোভনে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে। পবনের জীবনে অর্থনৈতিক দুর্দশার উপর প্রিয়তমা স্ত্রী হারানোর ব্যথা নিদারুণ হয়। সে আর বিনা পয়সায় শচীনবাবুদের জনসমাবেশে গাইবে না। কিন্তু শচীনবাবু যখন তাকে বোঝাতে সমর্থ হলেন যে জনমুখী হলেই কেবল জীবনের সমস্যা দূর করা সম্ভব, তখন অন্ধ পবন চিৎকার করে উঠল—'দেখতে পেয়েছি' এবং হেমাঙ্গ বিশ্বাসের রচিত 'বাঁচবো, বাঁচবো রে আমরা' গান গেয়ে নাটক শেষ করল।

এই নাটকে শিল্পের উচ্চাদর্শকে রক্ষা করার জন্য জীবনকে বঞ্চিত করার সঙ্গে ব্যবসায়ী আদি-রসাত্মক শিল্পের সংঘর্ষ যথেষ্ট নাটকীয় পরিণতি সৃষ্টি করতে পারে নি—শচীনবাবুর মত সমাজসেবীর চরিত্র সৃষ্টির জন্য—যে সমাজসেবী শিল্পীকে আন্দোলনের প্রয়োজনে ব্যবহার করে অথচ তার নিজের জীবনের সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। ১৯৪৮—৫০ সনের কমিউনিস্ট আন্দোলনে যে সংকীর্ণ বামপন্থী বিচ্যুতি বিভিন্ন গণ আন্দোলনকে দুর্বল করেছিল সংস্কৃতি

আন্দোলন তার অন্যতম। অনেক সংস্কৃতি-কর্মী এই বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছেন। 'মরাচাঁদ'-এ যদি সেই সংগ্রামের কিছু চিহ্নও থাকতো তাহলে তা একটা ঐতিহাসিক দলিল হতো। অন্ধ দোতারা বাদক টগর অধিকারী এবং গুমানী দেওয়ান, গুরুদাস পাল নিবারণ পণ্ডিত ও রমেশ শীলের মত লোক-কবিদের যেমন আমরা পেয়েছি কমিউনিস্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ সংকটের তোড়ে অনেক সংস্কৃতি কর্মীর মত তাদেরও কিছু কিছুকে হারিয়েছি। তাই সেই পাওয়া-হারানোর দ্বন্দ্ব যদি সামান্যও 'মরাচাঁদ'-এ প্রতিফলিত হতো তাহলে বিজনের চেষ্টার একটি ঐতিহাসিক মূল্য থাকতো। কিন্তু যে নাট্যকার সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমিকায় নাটক রচনার পাঠ নিয়েছিলেন —তিনি সেই পটভূমিকা ছেড়ে কেবল টগর অধিকারীর ব্যক্তিগত জীবনের বাস্তবতাকে ভিত্তি করে বেশি দূরে অগ্রসর হতে পারলেন না। এই প্রসঙ্গে সকলের অবগতির জন্য জানাই যে টগর ১৯৭৫ সালের মে মাস পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন এবং তার কিছু বক্তব্য টেপ রেকর্ড করে আনা আছে। অবশ্য তাতে টগরদের মত শিল্পীর প্রতি আমাদের উদাসীনতার কোন ক্ষমা নেই। কিন্তু অন্যায় হবে তার জীবনকে নিয়ে গালগল্প তৈরী করা। এই প্রসঙ্গে 'মরাচাঁদ' নাটকের ভূমিকায় বিজন কিছু ভুল তথ্য দিয়েছে—যা সংশোধন করা দরকার। টগর অধিকারী দিনাজপুরের নন, রংপুরের এবং সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলনে ১৯৪৪-এর ডিসেম্বরে প্রথম কলকাতায় আসেন নি—এসেছিলেন ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের অধিবেশনে ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে। সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলনের সময় গণনাট্য সংঘের গোয়াবাগানের রিহার্সাল ঘর ভাড়া নেওয়া হয় নি। ঐ বাড়িটা আমার নামে ভাড়া নেওয়া ছিল এবং শুনেছি গত বছর পর্যন্ত আমার নাম চলছিল যদিচ আমি ১৯৪৮ সালেই ঐ বাড়ি ছেড়ে এসেছি। ছাত্র সম্মেলনের ২।৩ দিন পরে গণনাট্য সংঘ 'নবান্ন' করে নি। অবশ্য ভূমিকায় আই. পি.টি-এর জায়গায় আই. পি. সি এ লেখা আছে। শুনেছিলাম দক্ষিণ পন্থী কমিউনিস্টরা ১৯৬৮ সালের দিকে ইণ্ডিয়ান পিপ্‌ল্‌স কালচারাল এসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠন গড়ে। কিন্তু তার সঙ্গে ১৯৪৫ সালের ইপটার কোন সম্পর্ক নেই। মরাচাঁদ দক্ষিণ পন্থী কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশক সংস্থা মনীষা' প্রকাশ করে বলে হয়তো—এই সকল পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু ইতিহাস প্রয়োজনমত বদলানো যায় না—যা বিভূতিবাবু, বিজনবাবু, শমীক বন্দোপাধ্যায় এবং জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র মশারীর 'কালান্তর' কাগজে এবং দক্ষিণ পন্থী কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবান্বিত কাগজপত্রে করছেন।

এরপর বিজন যে সকল নাটক লিখেছেন তার মধ্যে আমি দেখেছি 'গোত্রান্তর' ও দেবীগর্জন'। আরগুলির কয়েকটি পড়ে আমাকে আলোচনা করতে হচ্ছে। বিজনের বড় নাটকের ছাপানো বইয়ের সঙ্গে অভিনীত পাণ্ডুলিপির অনেক

পার্থক্য যে হয় তা 'নবান্ন' এবং 'মরাচাঁদে' লক্ষ্য করেছি। সুতরাং আমার আলোচনা ত্রুটি পূর্ণ হতে পারে এটা স্বীকার করতে আমার দ্বিধা নেই। তবে সাধারণভাবে এই কথা বলা যায় যে, বিজন যখন কৃষক জীবনের বিষয় নিয়ে নাটক লেখে—তখন সে স্বভাবস্থ হয় এবং শত ত্রুটি নিয়েও তা দৃশ্যকাব্য হিসাবে তথাকথিত মনোবিকলনের নাটকগুলির তুলনায় সুস্থ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। কিন্তু সুস্পষ্ট সমাজ চেতনার অভাবে এই নাটকগুলি সব সময়ে যুক্তিগ্রাহ্য এবং নাটকীয় ভাবে হৃদয়গ্রাহী হয় নি।

পূর্ব-বাংলার বাস্তহারার জীবন নিয়ে 'গোত্রান্তর' ও একটি পূর্ব-বাংলার শিক্ষকের পশ্চিম বাংলায় বসবাসের সমস্যাকে ভিত্তি করে নাটকটি লেখা এবং হিন্দু উদ্বাস্তু মেয়ের সঙ্গে সমাজকর্মী মুসলিম ছেলের বিবাহ দিয়ে নাটকের শেষ হিন্দু-মুসলমান সমস্যার এই সহজ সমাধান—যা নজরুলপ্রভৃতির কিছু উদার প্রকৃতির চিন্তাশীল ব্যক্তির পছন্দ ছিল কিন্তু সাধারণ ভাবে গৃহীত হয় নি—তা নাটকের প্রতিপাদ্য করতে গিয়ে নাটক মার খেয়েছে। বিজন যদি 'জবানবন্দী'র মত এই নাটকটিকে পূর্বোক্ত শিক্ষকের ট্র্যাজেডিতে দাঁড় করাতেন তা হলে তার নাট্য রচনায় আর একটি কীর্তি সৃষ্টি হতো। উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে আজ পর্যন্ত যত নাটক সৃষ্টি হয়েছে 'গোত্রান্তরে'র প্রথম অঙ্কের পাশে তারা নিষ্প্রভ বলে আমার ধারণা। 'নবান্ন'র গাঁতায় খেটে অন্ন সমস্যা দূর করার সহজ সমাধানের মত 'গোত্রান্তরে'-ও সহজ সমাধান বিবাহ। হিন্দু-মুসলমান বা ভারত-পাকিস্তান বিরোধের মূল দ্বন্দ্ব সাধারণ মানুষের মধ্যে যে বিচিত্র বিদ্বেষমূলক ও মর্মান্তিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে—কেবল তার বাস্তব এবং মানসিক প্রতিক্রিয়ার চিত্রাদি দিয়ে নাটক শেষ হতো তাহলে নিশ্চয় বাংলা নাট্য সাহিত্যে নতুন জিনিস হতো। বিজন পরে এই মুসলিম চরিত্র বাদ দেন বলে শুনেছি। এই প্রসঙ্গে তুলসী লাহিড়ীর 'বাংলার মাটি' নাটকটির কথা মনে হয়। পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু-মুসলমান যে বাঙালী এবং ধর্মের বিরোধ সত্ত্বেও তাদের মাতৃভাষা যে তাদের ঐক্যকে দৃঢ় করবে—এই বিষয় নিয়ে নাটকটি লেখা। বস্তুতঃ ভাষা আন্দোলনে শহীদ হওয়ার আগেই প্রধানতঃ মুসলিম চরিত্র নিয়ে লেখা এই নাটক—তুলসী লাহিড়ীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি—যা কলকাতার গোড়া সাম্প্রদায়িক সমালোচকরা স্বীকার করেন না।

বিজনের 'ছায়াপথ' এবং 'চুল্লী' কলকাতার ফুটপাথ নিবাসী ও শ্মশানচারী প্রভৃতিকে নিয়ে লেখা। এগুলিতে অনেক আকর্ষণীয় চরিত্র সৃষ্টি আছে—কিন্তু গল্পাংশ ও বিন্যাসের কোন প্রতিপাদ্য নেই। 'ছায়াপথে' অন্ধ, খঞ্জ ও দেহ বিলাসিনীর সঙ্গে গ্রামের কৃষক স্বামী স্ত্রী ও পুত্র আছে যে পুত্র লরী চাপা পড়ে মারা যাবে বলে ইঙ্গিত আছে। প্রতি বছর কলকাতার নিকটস্থ জেলায় অন্নাভাব হলে কিছু ক্ষেত-মজুর পরিবার যে ফুটপাথে চলে আসে তাদের সঙ্গে কানা-খোঁড়া

নিমাই ঘোষ

থিয়েটার ওয়ার্কশপের মহাকালীর বাচ্চা।

৭৮-র কলকাতার বিতর্কিত প্রযোজনা

নান্দীমুখের পাপপুণ্য

নিমাই ঘোষ
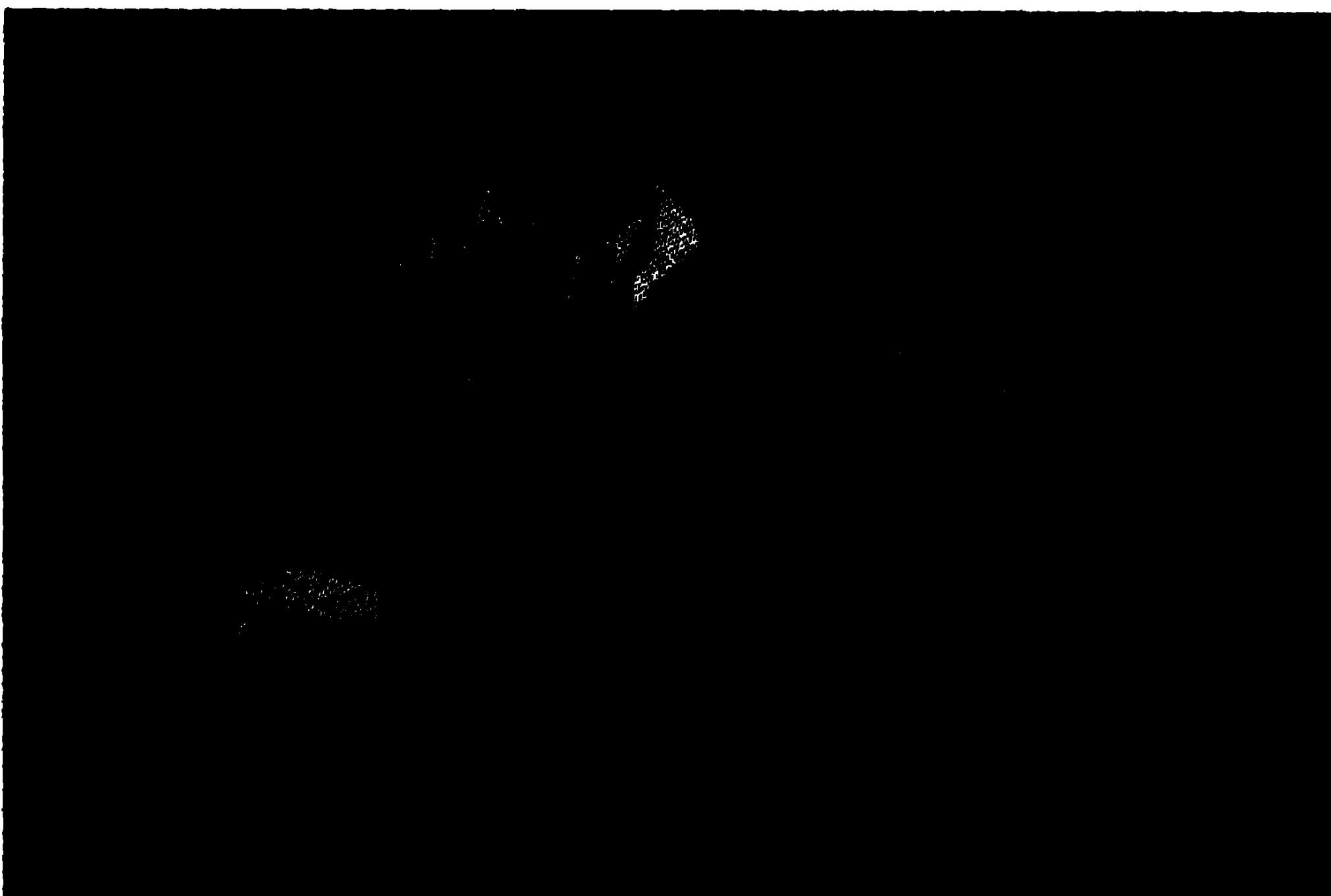
গন্ধর্বর বদনাম

৭৭-র ৭৮-র নাটক

চেনা-অচেনার জিওরদানো ব্রুনো
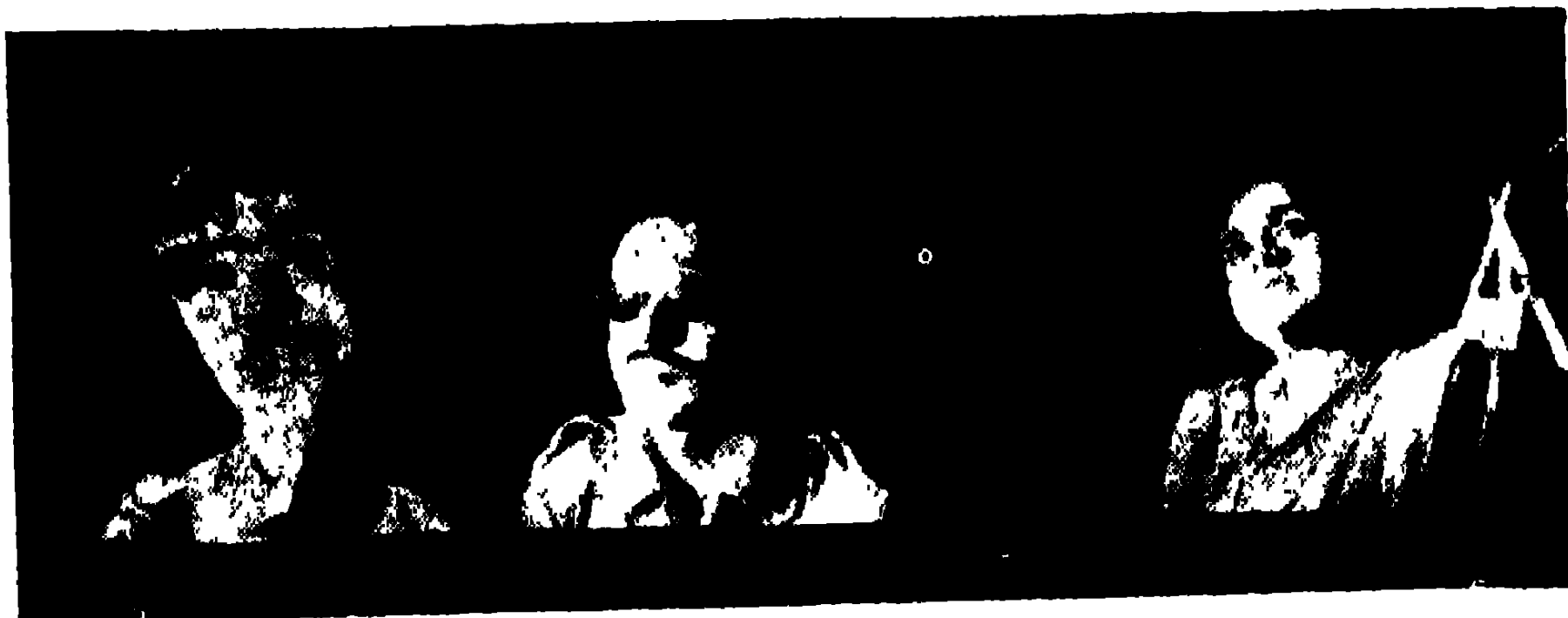
যাত্রিকের গঙ্গা তুমি বইছ কেন

কল্লোলের লোহিত কণা

বা যারা পথে জন্মায় ও মরে—তাদের কিছু পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। একদল সুযোগ পেলেই গ্রামে ফিরে যায় আর একদলের ফেরার কোন জায়গা নেই। 'দুইমহল' নাটকে জোছন দস্তিদার এদের কথা বাংলা নাট্য সাহিত্যে প্রথম এনেছেন। বিজনের 'ছায়াপথ' সেই নাটকের তুলনায় অনেক দুর্বল। কিছু চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে—কিন্তু নাট্য পরিণতিতে বিজনের বিশেষত্ব দেখা যায় না।

ঠিক তেমনি উদ্দেশ্যহীন ও দুর্বল হলো 'চুল্লী'। এই নাটকের প্রথমাংশ পড়ে মনে হয়েছিল—নকশালী হামলায় গ্রামের জোতদার এবং শহরের কোন কোন সরকারী কর্মচারী নিধনের বিষয় নিয়ে ১৯৭২-৭৪ সালে যে বিভীষিকা পশ্চিমবঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল বোধ করি তারই একটি চিত্র। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সেইসব লোকের জীবনী—যারা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে জন্ম নেয়, যাদের বাপের ঠিকানা নেই, মা জন্ম দিয়েই মারা গেছে, যারা গায়: 'শিকল-বেড়ি নেইকো মোদের/মোরা আজব ছেলের জাতকয়েদী/যত্রতত্র ঘুরে বেড়াই/থানা পুলিশ খোড়া ডরাই/যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের /মেয়াদকালে শেষ হবে নি।

এরা শেষ পর্যন্ত কোন একটি মিছিলে যোগ দেয়, তাদের চালচিত্রের উপর লাল রং ছড়িয়ে দিয়ে। পূর্বেই বলেছি এই নাটকে কিছু বিচিত্র চরিত্র সৃষ্টি আছে—কিন্তু সমাজ জীবনে তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যে ফসল ফলায়—তা মোটেই নাটকীয় হয় নি। ১৯৭২-৭৪ সালে নকশাল ও কংগ্রেস যে ব্যক্তি হত্যার রাজনীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে বিদ্যাসাগরের প্রস্তর মূর্তির মুণ্ডচ্ছেদ থেকে—গ্রামের দু একটি জোতদার, শহরের কিছু সাধারণ সরকারী কর্মচারী ও পুলিশ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ও স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতিকে হত্যা করেছিল—তার মানসিকতাও যদি এই নাটকের বিষয়বস্তু হতো তাহলে বোঝা যেত। দু একজন স্বল্প পরিচিত নাট্যকার এইসব বিষয় নিয়ে ভাল একাঙ্ক নাটক লিখেছেন—কিন্তু বিজন যদি শোধনবাদী রাজনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে শুধু মানবিক দিক থেকেও চিন্তা করতেন—নাটকটি ভিন্নপথে গতি নিয়ে সফল হতো। বিজনের 'দেবীগর্জন' নাটকটি ইদানীংকালে তার অন্যান্য রচনার তুলনায় বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিজনের নিজ নাট্যগোষ্ঠী ছাড়াও বাইরের কোন কোন নাটুকে দল নাটকটি অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেছে। লক্ষ্য করার বিষয় যে, নাটকটি লেখা হয় যখন অতুল্য-প্রফুল্ল পরিচালিত পশ্চিম বাংলা সরকারের ক্রিয়া কর্মে পশ্চিমবাংলার মানুষ বিরাটপ্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল হচ্ছে এবং দুইটি কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হলেও গণ প্রতিরোধের ব্যাপারে নিচের তলায় কর্মী ও সংগঠনগুলি ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্রতিরোধ সংগ্রামে নেমেছে যার ফলে প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট তৈরী হয়েছিল। নাটকটি বই আকারে ছাপা হয় ১৯৬৯ সালে অর্থাৎ দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের যুগে—যখন নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলন চরমপন্থা

গ্রহণ করতে থাকে। নাট্যকার 'দেবীগর্জন' নামের দুটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন ; প্রথমটি হলো : দেবী অর্থে বসুধা গর্জন করছেন, অশান্ত হয়ে উঠেছেন জননী ; দ্বিতীয় অর্থ হলো—শরৎকালে পূজার উৎসবে শিব-দুর্গার ঝগড়া শেষ পর্যন্ত রফা হয় ৩।৪ দিনের কড়ারে বাপের বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দানে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বীরভূমের পটভূমিতে আদিবাসী ও সাঁওতাল চাষীদের আন্দোলনের ভিত্তিতে শত্রুকে পরাস্ত করে জননীকে খুঁজে পাওয়ার সংগ্রামী সাধনা। লোক সংস্কৃতির বহতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বিজন পৌরাণিক নাম দিয়েছেন—আধুনিক নাট্য বিষয়কে।

প্রভঞ্জন নামক একটি মহাজন-জোতদার বেনামীতে এবং নানা কৌশলে কৃষকের জমি দখল করে, সুদের নামে আধিয়ারদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে এবং তাদের ভিটে মাটি গ্রাস করেও তৃপ্ত হয় না—কৃষক যুবতীদের সতীত্ব নাশ করে। প্রভঞ্জনের সহকারী ত্রিভুবন চিরাচরিত দালালের মত—তাকে সাহায্য করে। অপরদিকে বৃদ্ধ সর্দার, তার যুবক পুত্র ও যুবতী পুত্রবধূ, সঙ্কারিয়া নামে পুত্রের বন্ধু এবং অন্যান্য কৃষক—নানাভাবে প্রভঞ্জন ত্রিভুবনের অত্যাচারের শিকার হয় এবং প্রতিরোধও করে। সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় প্রভঞ্জনের ধর্মগোলাকে অবরোধ করা হয়। এই গোলার মধ্যে ধানের বদলে পাওয়া যায়—কৃষক বধূর মৃতদেহ, যাকে প্রভঞ্জন লালসা চরিতার্থ করার জন্য গুম করে রেখেছিল। নাটকের শেষ দৃশ্য—সংলাপের উপর দাঁড়িয়ে নেই—আছে বর্ণনায় যাকে অ্যাকশনে পরিণত করে নাটক শেষ করতে হয়—যথা : 'ওদিকে ধর্ম-গোলা অবরোধ পর্ব শেষ হয়। ধানের বদলে মংলা (বৃদ্ধ কৃষকের পুত্র) খুঁজে পায় মাঠের লক্ষ্মী রত্নাকে (পুত্রবধূ)। মান বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিয়ে আত্মশুদ্ধির পথে মুক্তি পেয়েছে সে। জনতা পাথর। সতীর দেহস্থ ভার নিয়ে এগিয়ে আসে মংলা সামনের দিকে। শুইয়ে দেয় রত্নাকে মাটিতে। এইবার শুধু একটি কঠিন কর্তব্য। হাত বাড়িয়ে শস্ত্র খোঁজে মহাবলী। ঘুগরা (একটি কৃষক) মংলার হাতে টাঙি এগিয়ে দেয় ··· দৃপ্ত ভঙ্গীতে দু হাতে ঘুরিয়ে ধরে টাঙি মংলা প্রভঞ্জনের মাথার উপর। আশেপাশের সমস্ত অস্ত্রগুলিও ঝিলিক দিয়ে ওঠে শত্রুকে লক্ষ্য করে।' মোটামুটি এই গল্পাংশের মধ্যে সতর্ক দৃষ্টি রাখলে দেখা যাবে ঘটনা সংস্থানে 'নবান্ন', 'নীলদর্পণের' কোন কোন দৃশ্যের অনুকৃতি ধরা পড়ছে। 'নবান্ন'র ছোট ভাইয়ের গৃহত্যাগের সঙ্গে মংলার গৃহত্যাগের অনেক সাদৃশ্য আছে। 'নবান্ন'র হারু দত্ত—যুবতী ছোট বউয়ের যে ভাবে সন্ধান পেয়ে-ছিল—প্রভঞ্জনের দালাল ত্রিভুবনও ঠিক তেমনি ভাবে মংলার স্ত্রী রত্নাকে দেখতে পায়। প্রভঞ্জনের ঘরে অপহৃতা রত্নাকে নিয়ে যে দৃশ্য, তার সঙ্গে রোগ সাহেব ও ক্ষেত্রমণির দৃশ্যের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। প্রথম থেকেই নাটকে অনেক অস্বাভাবিক ঘটনা আছে, যথা মংলার রক্তপাত প্রভঞ্জনের লাঠিয়ালদের হাতে,

অথচ অনতিবিলম্বে মংলার বিয়ের জন্য ঘরবাড়ি বাঁধা দিয়ে প্রভঞ্জনের কাছ থেকে টাকা ধার করা, স্ত্রী অপহৃতা হয়েছে জেনেও মংলার দীর্ঘ সময় নিষ্ক্রিয়তা এবং নাট্যকার তারপর দৃশ্যের পর দৃশ্য রচনা করেছেন এত বড় মারাত্মক ঘটনাকে চাপা দিয়ে। অথচ রত্নার মৃত্যু দিয়েই নাটকের চরম মুহূর্ত সৃষ্টি করা হলো। তাই কৃষক বিদ্রোহের কাহিনী হলেও নাটকটি অত্যন্ত দুর্বল, অন্ধ রচনার অনুকৃতি এবং ফরমুলা নাটকের মত। বীরভূমের আদিবাসীদের ভাষাও সর্বত্র রক্ষিত হয় নি। বিজন ছোট বেলায় বসিরহাটে অনেকদিন ছিলেন—যার জন্য ঐ অঞ্চলের সংলাপে তার যত দখল, অন্য অঞ্চলের সংলাপে তত দখল নয়। তাই সব মিলিয়ে শ্রেণীসংগ্রামের একটি গ্রামীণরূপ দেওয়ার চেষ্টা থাকলেও চরিত্র সৃষ্টি ও বিষয়বস্তুর বিন্যাসে নাটক হিসাবে উচ্চশ্রেণীর রচনা নয়।

এই নাটকের ভূমিকাতে বিজন এমন কিছু মন্তব্য করেছে যাতে তার আদর্শগত বিভ্রান্তি দিনের আলোর মত দেখা যায়। প্রাণ-চৈতন্য নামক একটি ধারণা নাটকে খুঁজে বার করার নির্দেশ দিয়ে বিজন লিখছে 'কৃষি-ভিত্তিক বাংলার সাংস্কৃতিক রূপ রেখায় শ্রেণী সংগ্রামের অনিবার্য্যতা স্বীকার করে নিয়েই সেই cultural cell-টিকে আমাদের খুঁজে পেতে হবে এবং প্রাণ-চৈতন্যের বহতা অক্ষুন্ন রেখে বর্ত্তমান জীবন সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষণিকতায় তার নিরাকরণ করতে হবে। রাজনীতি, সমাজনীতি—যাই বলুন, প্রত্যেকটি দেশেরই প্রাণনীতির নিজস্ব একটা চলন আছে। এই চলনের সরগম যাঁরা ইকনমিজ্‌মের ভিত্তিতে কলকারখানায় শ্রমিকের আপাত স্বার্থের বা জমিতে কৃষকের অগ্রাধিকারের খাতিরে প্রত্যক্ষ আন্দোলন করেন, তাঁরা এই প্রাণনীতির ধারা সম্পর্ক সচেতন নন। এখানে হয় নেতৃত্ব সচেতন নন, অথবা phasewise উত্তরণের খাতিরে সচেতন অবস্থায় অচেতনের ভাণ করে অখণ্ড বৈপ্লবিক জাগৃতির ঝুঁকি নিতে অস্বীকার করেন। এখানে রাজনৈতিক কর্মীর শিক্ষা কখনও সংস্কৃতির কর্মীর দীক্ষা হতে পারে না। প্রকরণ মতে দুটোই স্বতন্ত্র।"

শ্রেণী চেতনার বদলে প্রাণ-চৈতন্যের জাতীয় স্বরূপ, বিপ্লবের স্তর অনুযায়ী কর্মপদ্ধতি গ্রহণের পরিবর্তে 'অখণ্ড বৈপ্লবিক জাগৃতি', রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে শিক্ষা ও দীক্ষার নামে যে পার্থক্য বিজন বোঝাতে চেষ্টা করেছে—বিশেষ করে ভিয়েৎনাম ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার আদর্শ তুলে ধরে তা মার্ক্স-বাদের জগা খিচুড়ি ছাড়া আর কিছু নয়। আর এই কারণেই 'গর্ভবতী জননী' নাটকের প্রকাশনার জন্য চরম প্রতিক্রিয়াশীল আনন্দবাজার পত্রিকার ততোধিক প্রতিক্রিয়াশীল প্রবোধবন্ধু অধিকারীর শরণাপন্ন হতে হয়েছে এবং ইন্দিরা গান্ধীর বিশ দফার জয়গান গেয়ে বেড়াতে হয়েছে। আমরা যারা একদিন পর-মোৎসাহে বিজনের নাট্য প্রতিভার সম্ভাবনাকে সফল করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলাম—তাদের কাছে এই দৃশ্য অসহনীয় বললে কিছু অত্যুক্তি হবে না।

'গর্ভবতী জননী' বেদের জীবন নিয়ে লেখা—জীয়নকন্যা থেকে যার শুরু।
এই বেদেরা বনবাজার থেকে গাছ-গাছড়া বাছাই করে বাজারের দালালদের
কাছে বিক্রি করে। যারা আবার সেগুলি বড় শহরের ঔষধের ব্যবসায়ীদের
কাছে বেশি দামে বিক্রি করে। এই গাছ-গাছড়া যোগাড় করতে তাদের বন্য-
জন্তু, সাপ খোপের হাতে অনেক সময় প্রাণ দিতে হয়। অনেক সময় আগাম
নিয়েও কাজ করতে হয়—তাই যথাযোগ্য দাম নানাভাবে কাটা যায়।
এই নাটকে গর্ভবতী রমণী ছিল—এবং কয়েকজন পালা গান গাইয়ে ছিল।
এই গাইয়ের মধ্যে একজন পাওনাদারদের পাওনা মেটাতে পদ্মবনে গাছ-
গাছড়া আনতে গিয়ে সাপের কামড়ে মারা যায়। গর্ভবতী বেদেনীও সন্তান
হতে গিয়ে মারা যায়। ওঝা ডেকে গর্ভবতীকে বাঁচানোর চেষ্টা বৃথা হয়—বরং মন্ত্র
উচ্চারণের উপলক্ষে ধোঁয়া সৃষ্টি করে ওঝা পূজার জিনিষ নিয়ে পালিয়ে যায়।
বেদেরা শবদেহ নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে কি যেন খোঁজে
—যেন কেউ কাউকে চিনতে পারছে না। মঞ্চে মামা নামে একটি বেদে ধানের
গুচ্ছ নিয়ে প্রবেশ করে এবং শবদেহের পায়ের কাছে গুচ্ছটি পুঁতে দিয়ে প্রণাম
করে। তার দেখাদেখি আর সকলে মাথা নত করে প্রণাম করতে যায়—নাটক
শেষ হয়।

এই নাটকে বেদে শ্রেণীর এই গাছ-গাছড়া সংগ্রহকারীদের জীবনের অসহায়তা,
অর্থনৈতিক দুরবস্থা, দৈব নির্ভরতা প্রভৃতিকে তুলে ধরা হয়েছে। আর ঐ মামা
নামক চরিত্রটিকে দিয়ে এমন সব আলোচনা করা হয়েছে যা বেদের পক্ষে সম্ভব
বলে মানা কঠিন। নাটকের পালা গানে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে—তা
বেদের পক্ষে অস্বাভাবিক। 'দেবীগর্জনের' পরে রচিত এই নাটক যে এক-
ধরণের আধ্যাত্মিক প্রতিক্রিয়া—তা প্রবোধবন্ধুর ভূমিকায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
প্রবোধবন্ধু লিখেছেন (১৯৭১ সাল): 'গণনাট্য আন্দোলনের সময় নাট্য-
সংস্কৃতির খিড়কি দরজা দিয়ে ঢুকে রাজনীতি সবকিছুকে শুদ্ধ করে দিয়ে আপন
কর্ম সমাধা করতে চেয়েছিল। কিন্তু বমালশুদ্ধ ধরা পড়ায় সেদিনের সে উদ্দেশ্য
তার সফল হয় নি। সেই আহত শ্বাপদ আজ প্রতিশোধ নিয়েছে। নানা প্রলো-
ভনের গোলাপ দেখিয়ে; মানুষকে সমাজ সচেতন করার নামে দলীয় রাজনীতিতে
প্রভাবিত করে আজকের এই সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিমুখতার সৃষ্টি তাঁদেরই।
গ্রুপ পলিটিক্স বাড়তে বাড়তে নাট্যক্ষেত্রেও এসেছে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা।
সাহিত্য সংস্কৃতির শেষ চিহ্নটি মুছে ফেলার জন্য রাজনীতি কোমর বেঁধে আসরে
নেমেছে ··· আর্থিক সাহায্যের জন্য প্রায় অধিকাংশ দিনই কোনো না কোনো
রাজনৈতিক তাঁবুর নীচে আশ্রয় নেওয়ায় সুষ্ঠু নাট্য-ঐক্য গঠনের পথটি আর
পরিষ্কার নেই।'

এই অবস্থার প্রতিকার করতে প্রবোধবন্ধু যে কয়টি নাটক পছন্দ করে বই বার

করলেন তার প্রথম নাটক বিজনের 'গর্ভবতী জননী'। প্রবোধবাবু লিখছেন: "আদি কালের বিশ্বাস নিয়ে তাই তাঁর নাটকের চরিত্ররা টান-টান দাঁড়িয়ে থাকে। গর্ভবতী জননীতে সেই বিশ্বাসের ঈশ্বর 'মামা'। তার কথা: সব নিয়েই পরিপূর্ণ মানুষ; কিছুই বাদ দিয়ে নয়। আমরা সংকীর্ণ, আমরাই বৃহৎ। তাই অর্থের প্রলোভনে পড়ে কণ্ঠ যখন পদ্ম আনতে জীবন দেয়, সকলের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলেও মামাকেই নিরুদ্বেগ দেখি। যেন যাওয়া আর আসার রহস্যটা তার বেশি করে জানা। মামা তাই বলে 'জলে স্থলে অন্তরীক্ষে তার এত দাপট, অথচ মানুষেরই দেখি কোন ভরসা নেই।..."

'দেবীগর্জনের' জোতদার নিধন থেকে আমরা যে অদৃশ্য শক্তির লীলা খেলায় নেমে এলাম তাকি কেবল নব কংগ্রেস নকশাল তৎপরতার জন্য? মার্কস-বাদ, কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রেণী চেতনা ও শ্রেণী সংঘর্ষের চিন্তাধারার সঙ্গে যার এত কালের সম্পর্ক সেই নাট্যকার কেমন করে এই অবস্থায় পৌছলেন? একাদেমি পুরস্কার পাওয়ার পর তিনি কালান্তরে বিবৃতি দিয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির জন্যই তিনি নাট্যকার হতে পেরেছেন। আনন্দের আতিশয্যে তিনি বলেছেন শিশিরকুমার ভাদুড়ি নাকি উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে 'নবান্ন' নাটক দেখতেন এবং একদিন বিজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগায় তিনি নাকি লজ্জায় বলে-ছিলেন: আই হ্যাভ ক্রস্‌ড মাই লিমিট্‌স। এসব নিছক গালগল্প। কেবল আসিয়া কথা শিশিরকুমারের পুত্র তো এখনো জীবিত। 'নবান্ন' অভিনয়ের প্রথম রাত্রি ছাড়া বিজন ক বার শিশিরবাবুর সামনে গিয়েছে এ কথা কে বলতে পারেন? বিজনের একবারও মনে এল না শম্ভুবাবুর জ্ঞাতি গোত্র ও স্তাবকরা একাডেমি পুরস্কার পাওয়ার অনেক পরে তাকে পুরস্কার দেওয়া মানে অপমান করা। সরকারী খেতাব ছুঁড়ে ফেলার যে দৃষ্টান্ত শিশিরকুমার দেখিয়ে গেছেন সে কথাও কেন বিজনের মনে এল না।

কৃষক জীবনের প্রতি এবং বিশেষ করে গরীবমানুষের প্রতি বিজনের আগ্রহ দেখে মনে হতো—বিজন নিশ্চয় একদিন পথ খুঁজে পাবে। কিন্তু শ্রেণী সংগ্রাম আজ পৃথিবীর সর্বত্র এমন এক সুরে উঠছে যে রাজনৈতিক শিক্ষার থেকে সাংস্কৃতিক কর্মীর দীক্ষার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আবিষ্কার করতে গেলে বিভ্রান্তি, গোঁজামিল এবং প্রতিক্রিয়া শিবিরের পথ সহজগম্য হয়। বিজনের ব্যক্তিগত জীবন সুখের ছিল না—তুলনায় তার অনেক সহযোগী রাজার হালে আছে—আবার অনেকের জীবনে সংগ্রামের অন্ত নেই। তবু জীবন পরিবর্তনের সংগ্রাম অগ্র-গামী। ভারতের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির পট পরিবর্তন আসন্ন। বড়ই দুঃখের বিষয় এ যুগের কৃষক জীবনের পথিকৃত নাট্যকার স্বেচ্ছায় বিভ্রান্তির বিষ পান করে অকালে চলে গেলেন—ফিরবার সময় পেলেন না—এটা বাংলা নাটকের পক্ষে নিঃসন্দেহে দুঃখজনক ঘটনা।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজন ভট্টাচার্য : ষাট সত্তরের নাটক

১.

আমরা যারা 'নবান্ন'-র সময়ে শিশু ছিলাম,
আমরা বিজনদাকে আবিষ্কার করি 'গোত্রান্তরে'।
যত দূর মনে পড়ে 'স্বাধীনতা' পত্রিকার এক জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে
'গোত্রান্তর' দেখি। 'গোত্রান্তরে' আজও যা অভিভূত করে,
উদ্বাস্তু এক পরিবারকে নিয়ে নাটক লিখলেও
বিজনবাবু ফেলে আসা পূর্ববঙ্গের মায়ায় মজেন না,
ইতিহাসকে অস্বীকার করে দুই বাংলার মিলনের নেশাগ্রস্ত
স্বপ্ন দেখেন না, পূর্ব বাংলার মানুষকে পশ্চিম বাংলার
এক বস্তির জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে নাটক শেষ করেন।
পূর্ব পশ্চিমের বিরোধ, মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকের বিরোধ
বিজনবাবু অবলীলায় মেলান মানবিক সম্পর্কের স্ফুরণে,
সম্পত্তির নির্মম মালিকদের বিরুদ্ধে সমবেত প্রতিরোধে।
পরে এক সাক্ষাৎকারে বিজনবাবু আমাকে বলেন,
'দেশ-ভাগের অভিজ্ঞতা আমি তুলে ধরি
এক বাস্তুচ্যুত শিক্ষকের এপারের অভিজ্ঞতায়।
মধ্যবিত্ত সমাজ তাকে অস্বীকার করে।
শেষ পর্যন্ত বস্তির শ্রমিকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে
তাদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে সে মুক্তি পায়।
কমিটমেন্টের রাজনীতি, একত্র সংগ্রামের
রাজনীতিই ছিল আমার রাজনীতি।'
'গোত্রান্তরে' নাট্যকাঠামোর যে আদল গড়ে উঠতে শুরু করে,
'দেবীগর্জন' ও 'গর্ভবতী জননী' নাটকে তা পরিণতি
ও স্পষ্টতা লাভ করে। 'গোত্রান্তরে'র কাঠামো সে-তুলনায় জটিল।
কিন্তু তথাকথিত স্বাভাবিকবাদী নাটকের বড় সীমিত
পরিপ্রেক্ষিত 'আগুন' নাটকেই বিজনবাবু বর্জন করেছিলেন।
'গোত্রান্তরে'র শুরুতেও অন্য নাট্য কল্পনার আভাস—
শিক্ষার পরিমণ্ডলকে বিজনবাবু যেন
এক স্বতন্ত্র কসমস্ করে তোলেন।

একজন শিক্ষক একজন ছাত্রের সেই চিরায়ত সম্পর্ক ক্ষীণপ্রাণ হয়ে বেঁচে থাকে ; নাম ডাকার প্রায় অর্থহীন মন্ত্রোচ্চারণে' যে যজ্ঞস্থলের অবাস্তব অনুষঙ্গ গড়ে ওঠে, তাকে বিজনবাবু স্থাপন করেন উদ্বাস্তু কলোনির সচল জীবনযাত্রার ধারার মধ্যে। পাঠশালার চৌহদ্দির মধ্যে বাইরের টানা-পোড়েনের ঢেউ যেন লাগেই না, কিন্তু তার ঠিক বাইরে দিয়েই লোকজন চলেছে, ব্যস্ত মানুষ, যাদের কাছে এই পাঠশালাটা ক্রমশঃই অবান্তর হয়ে উঠেছে। হরেন মাস্টার একজন একজন করে পরিচিত পথচারীদের ডাকেন, একই আবেদন নিয়ে —'তোমাদের দশজনের ভরসাতেই খুললাম ইস্কুল'—শেষপর্যন্ত একই উপেক্ষায় পর্যুদস্ত হতে। পুরনো জীবনধারা, তার পুরনো বিশ্বাস ও সংস্কার নিয়ে সরে সরে যাচ্ছে, মুছে যাচ্ছে, অর্থনৈতিক তাড়নায়, এই একই অমোঘ প্রক্রিয়ার শিকার শিক্ষা ও লোকশিল্পকে মেলান বিজনবাবু : হরেন মাস্টার হরিপাল পটুয়াকে বলেন 'তোমার সরার দেবদেবীর প্রাণ নাই পাল। নাইলে দেখতা, তোমার বেবাক দেবদেবী, তাগো সহস্র বাহনগুলারে ল্যাজ মলা দিয়া ক্ষেপাইয়া তুল্যা, স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে একটা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড বাধাইত। দেবতার ত্রিশূল দানবে হাত করছে
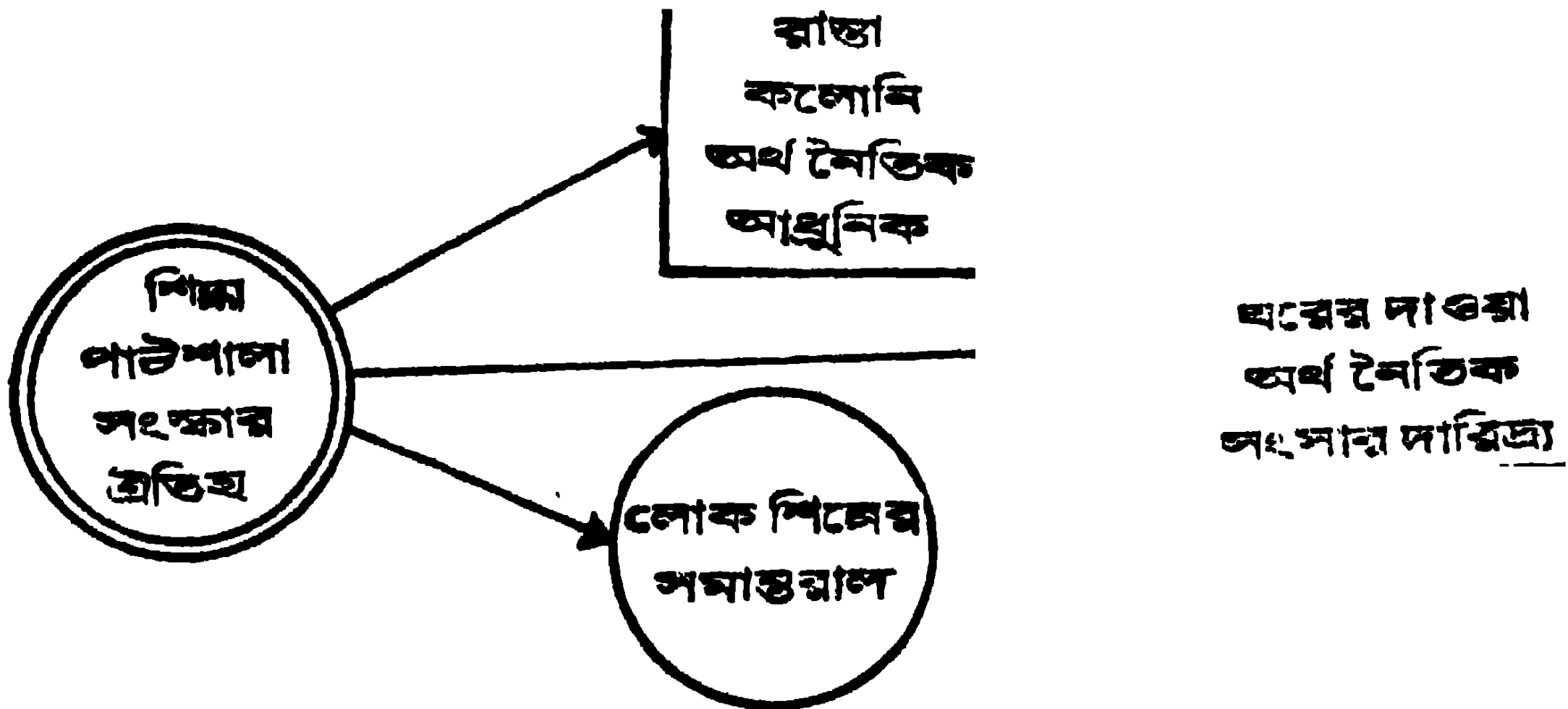
শিক্ষার শুদ্ধ আদর্শ বাঁচাবে কেমন করে ? পালাতে পারবে না হরেন মাষ্টার নিজেও অর্থনৈতিক বাস্তবের রূঢ় শাসন থেকে।

পাল, আজ আমাদের এক কঠিন পরীক্ষা, বুঝলা!' যত্ন করে দেখলে দেখা যায়, কি সূক্ষ্ম কারিগরি দিয়ে বিজনবাবু নাটকের ভূমিকে বিস্তৃত করছেন, পাঠশালা থেকে সামনের রাস্তায়→পাঠশালা থেকে যাবতীয় প্রথাগত ধারার অখণ্ড ক্রমান্বয়তায়→পাঠশালা থেকে বাড়ির দাওয়ায়। পাঠশালা থেকে ঘরে, একটা খোলস থেকে আরেকটা খোলসে। বদ্ধ খোলস, তার থেকে বেরোতে না পারার যন্ত্রণাতেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তিক্ততা, এমনকি আঘাতও। শহরে যাত্রা যেন একটা মুক্তি, খোলস থেকে বাইরে। কিন্তু সেখানেও তৈরি হয় নতুন খোলস, বেকারি আর ঋণ, বাকি বাড়ি ভাড়া গোপন করে চাপা দিয়ে সুখী সংসারের একটা মিথ্যা গড়তে গিয়ে আবার নিজেদের খোলসে পুরতে হয়। মধ্যবিত্ত পাড়া

থেকে বস্তি, মুক্তির আরেক পদক্ষেপ। সেখানে আস্তে আস্তে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা, প্রথমে পাঠশালা পুনরুদ্ধার। আবার সেই শিক্ষার যজ্ঞসত্র, আবার সেই অন্য স্টাইলে প্রতিদৈনিক টালমাটালের বাইরে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা কস্‌মস্‌ :

('তারপর শুরু হয় তাণ্ডব পাঠ যাজ্ঞিক হরেন মাস্টারের। গোটাটাই বিভ্রান্তি, তবু পাঠ হয় মন্ত্রোচ্চার। সেই মন্ত্র সোচ্চারিত হয় পড়ুয়াদের কলকণ্ঠে।)

না, খবরদার না, — আমরা ক'তে কলাগাছ কমু না, খ'তে খরগোস বলব না ? আমরা বলব — ক'তে কলকারখানা, খ'তে ক্ষেতখামার, গ'তে গান্ধীরাজা, ঘ'তে ঘর ঘর ভাই, ঙ'তে উয়াং চুয়াং, চ'তে চল বাড় চল, ছ'তে

(আবাহন চলতে থাকে পূজার ধূমে।)

একটা নতুন চেতনা সেই বদ্ধ কস্‌মসের মধ্যে অনুপ্রবেশ করছে, তাকে বিদীর্ণ করতে চলেছে। কিন্তু এখনও মূলত ভাষার স্তরে। শিক্ষা, ভাষা, দুটোই বিজনবাবুর চেতনায় মানুষ ও সমাজের রূপান্তরের বায়ুমণ্ডল। 'গোত্রান্তরে' ভাষার বৈচিত্র্য ব্যক্তিক পটভূমির গভীরে প্রোথিত। তাই কলোনির হরেন-মাস্টারের ভাষা বদলে যায় কেশবের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই। ইংরেজি শব্দের বাড়াবাড়ি একটা মিথ্যা বড়াইয়ের হাস্যকর ধ্বনিচিত্র রচনা করে। কলোনি জীবনের দীনতা হরেন মাস্টার মানতে চান না, এ জীবন যেন একটা সাময়িক ব্যত্যয়। কেশবের আসা মানেই এ জীবন থেকে মুক্তি, তাই হরেন মাস্টার একদিকে যেন মধ্যবিত্ত ভদ্রস্থতায় প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনায় অন্য ভূমিকার জন্য নিজেকে ঝালিয়ে নিতে থাকেন, অন্যদিকে ছেলেমানুষের মতো কেশবকে যেন বোঝাতে চেষ্টা করেন, তিনি এতটুকু বদলান নি, তিনি অন্তত তাঁর ভাষার জোরে এখনও এই কলোনি-জীবনের গ্লানির অনেক ঊর্ধ্বে। হরেন মাস্টার যখন বলেন 'এইটা রেয়ার সুবিধা আইজকালকার দিনে মানে জল কল আর ইলেকট্রিসিটি সমেত একটা সেল্‌ফ্‌ কনটেন্‌ড্‌ ফ্ল্যাট···চা খাও তো,' তার অবাস্তব শৌখিনতা, ডিকেন্‌সের উপন্যাসের অটল আশাবাদী মিকৃঅবারের হাস্যকরতা, প্রবল আয়রনিক মাত্রা পায় আধুনিক ফ্ল্যাটের লোভনীয় শখের সঙ্গে চা খাওয়ানোর আতিথেয়তার সাযুজ্যে। দারিদ্র্যের পরিবেশের মধ্যে কথাগুলো একটা মিথ্যাকে টেনে তুলে আনে, মধ্যবিত্ত সংস্কারের আশ্রয়ে বাঁচবার প্রাণান্ত চেষ্টা। এই চেষ্টাটাই বারবার মার খেতে থাকে শহরে।

তিতাস মাঝির সমুদ্র যাত্রা

ঘরটিতে কোন ফুলদানি নেই। টেবিলে নেই কোন
ছাইদানি। দেয়ালে নতুন টিকটিকি। সিলিংয়ে পুরনো
মাকড়সা ঝুলছে। ফ্যানের বিশাল লম্বা ছায়া ডানদিকের
দেয়াল বেয়ে নেমে এসে খাট ছুঁয়েছে। খাটের ওপর একটা
দীর্ঘ শরীর শিথিল হয়ে পড়েছে। মাথার ওপাশে
খোলা বাতায়ন। বাইরের লনে ফণীমনসা। ঈদের চাঁদ।
হাত নড়ছে না। পা নড়ছে না। বুক নড়ছে না।
হাঁটু নড়ছে না। তার মানে ঘুম। ঘুমিয়ে পড়েছে।
কারা যেন বলল – 'সব শেষ।' সমবেত সবাই চোখ মুছতে লাগল।
ভদ্রলোক শুয়ে আছেন। খাড়া নাক। পুরু ঠোঁট।
কপালে, বা গালে খাঁজ ফেলে ভদ্রলোক স্থির হয়ে আছেন।
দুঠোঁট ঈষৎ ফাঁক। দাঁত চাপা। চিবুকে রেখা।
কপালে লেখা। তিতাস নদীর মাঝি ঘুমিয়ে পড়েছে।
আর কেউ ঘুম ভাঙাতে পারবে না।
দূর সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে। একা একা।
এ রকম কথা ছিল না।
অনেক প্রতিজ্ঞা, স্বপ্ন অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। মনোরাজ্যে একদা
গড়ে তুলেছিল আদর্শ কর্তব্য।
তাই ছিল সমাজের শ্রেষ্ঠ নির্দেশ।
অনেক প্রশ্নও ভিড় করেছিল তিতাস মাঝির মনে।
আমরা কে? আমরা কী? আমরা কেন?
অমৃতের পুত্র? সার্কাসের শিক্ষিত জন্তু?
আমরা কী শুধু মরবার জন্যে?
আর যতদিন বাঁচি ততদিন ভোগের জন্যে?
সে কি অস্তি? না, সে কি নাস্তি?
এই প্রশ্নের মীমাংসা খুঁজতে বেছে নিয়েছিল
কাঠের তক্তার ওপর কান্না হাসির দোল দোলানো খেলা।
তিতাসের সুবল মাঝির প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা অরুণ রায়ের

জন্ম এই কলকাতা মহানগরীতে। ১৩ই ফাল্গুন, ১৩৩৮ সাল। আশৈশব শিল্প সাহিত্যের হাসিভরা গৃহ অঙ্গনের মাঝেই লালিত। শৈশবের রক্তে বোনা বীজই উত্তরকালে তাঁকে রূপান্তরিত করে কলাকারে। মাত্র দশ বছর বয়সে সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল'-তে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় শুভাঙ্কন। সাউথ সুবার্বানে (মেন) পড়ার সময়ে নাটকের প্রতি অনুরাগ তীব্র হয়ে ওঠে। বঙ্গবাসী কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট পড়ার সময় থেকেই জীবন জিজ্ঞাসায় মুখর হয়ে ওঠে তাঁর সংবেদনশীল শিল্পীমন। তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন নাটক ও অভিনয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়, বাঁধে চিরদিনের গাঁটছড়া। এই সময়ে নাট্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু, তাঁর চলিষ্ণু মন এতে নিবৃত্ত হয় না। সক্রিয় ভাবে গড়ে তোলেন 'ক্রান্তি শিল্পী সংঘ।' এই সময় সারা দেশ জুড়ে শুরু হয় গণনাট্যের জোয়ার। এই চলমান জীবন প্রবাহে সম্পূর্ণ ভাবে সঁপে দিয়ে বড়িষায় গড়ে তোলেন গণনাট্য-সংস্থার নতুন শাখা 'ভরত সেনা' ১৯৫৫ সালে। তাঁর এই নাট্য প্রীতি ও যোদ্ধ মনোভাবে আকৃষ্ট হন উৎপল দত্ত। তিনি তাঁকে কাছে টেনে নেন। শ্যামল সেনের মাধ্যমেই ঘনিষ্ঠ হন তৎকালীন এল. টি. জির সঙ্গে। এখানেই অরুণের শিল্পীমন ও চেতনা একের পর এক অভিনেয় চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সার্থক উত্তরণ ঘটে। এল.টি.জিতে প্রথম মঞ্চাবতরণ 'অঙ্গার' নাটকে। এরপর ফেরারী ফৌজ' (প্রকাশ মুখুটি/হিতেন), 'তিতাস একটি নদীর নাম' (সুবল)' 'নীচের মহল' (নট নারায়ণ), 'ছায়ানট' (অভিনেতা), 'ভি আই পি.' (কাঞ্জিলাল) এবং 'কল্লোল' নাটকে সহকারী পরিচালক ও প্রধান অভিনেতা রূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

এল. টি. জিতে থাকাকালীন শেক্স্পীয়রের চতুর্থতম শতবার্ষিকীর অরুণ ছিলেন প্রধান আহ্বায়ক। শেক্সপীরিয়ান নাটকের বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টির মধ্যেও তাঁর দীপ্ত অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। অভিনেয় চরিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম 'জুলিয়াস সীজার'-এ ব্রুটাস, 'ওথেলো' তে ডিউক (ইং/বাংলা, মিডসামারস্ নাইট্স ড্রিম'-এ রাজা, 'রোমিও জুলিয়েট'-এ টিবলম্। একান্ত ব্যক্তিগত কারণে এল. টি. জি-র সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করেন। এরপর ১৯৬৩ থেকে ৬৬ সাল পর্যন্ত এক নিঃসঙ্গ কালরাত্রির মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত হয় শিল্পীজীবন। কিন্তু, রক্তের মধ্যে যে বীজ ছড়িয়ে গেছে তাকে উপেক্ষা করতে না পেরে ১৯৬৭তে 'লোকায়ণ' নাট্যসংস্থা গঠন করে নিয়মিত অভিনয় শুরু করেন। এখানে একে একে অভিনীত হয়, 'দ্বীপের রাজা' 'কলকাতা—কলকাতা কলকাতা' 'মালিনী,' 'গন্ধরাজের হাততালি,' 'বাজপাখী,' 'শুক্ল বাক্য ও চৌর্যানন্দ' (একাঙ্ক), 'কালোদিন ও লাল রাত্রি,' এবং 'উলট্ পুরাণ'।

শুধু নাট্য জগতে নয় বাংলার অন্যতম প্রাচীন লোকশিল্প যাত্রা জগতেও অরুণ রায় তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। যাত্রায়—'আমি মুজিব বলছি'

(পুরস্কৃত), 'ভগৎ সিংহ,' 'মাদার ইণ্ডিয়া,' 'গঙ্গা যমুনা,' 'পলাতক,' 'বিক্ষুব্ধ রোডেশিয়া,' 'চে গুয়েভারা,' 'কালো তলোয়ার,' 'মহাকবি কালিদাস,' 'মায়া মৃগ,' ইত্যাদি পালাগান রচনা করেন। যাত্রায় মোট একুশটি পালার তিনিই রচনাকার ও নির্দেশক। কলকাতা দূরদর্শনে যাত্রা পালা 'মানুষ আমার নাম।' চলচ্চিত্রেও বিখ্যাত পরিচালকদের অধীনে অভিনয় করেন। প্রথম চলচিত্রাভিনয় সত্যজিত রায়ের 'অভিযান'। এ ছাড়া পূর্ণেন্দু পত্রীর 'স্বপ্ন নিয়ে,' ঋত্বিক ঘটকের 'যুক্তি-তক্কো-গপ্পো,' রাজেন তরফদারের 'আকাশ ছোঁয়া,' 'অগ্নিসম্ভবা,' তরুণ মজুমদারের 'সংসার সীমান্তে,' 'গণদেবতা' উল্লেখযোগ্য। একটি ছবির আউট ডোর স্যুটিং-এ অংশগ্রহণ করার সময় অসুস্থ হন। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার সুখলাল কারনানি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। চিকিৎসক এবং অগণিত শুভানুধ্যায়ীদের সব চেষ্টা ও মঙ্গল কামনা ব্যর্থ করে গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর ৭৮ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কিন্তু উত্তর পাবার আগেই সব শেষ হয়ে গেছ। মানুষকে বড় ভালবসত তিতাসের সুবল মাঝি। দীর্ঘ দেহের দরাজ বুকে অনেক স্নেহ মমতা জমা ছিল। নির্মেঘ হাসিতে মুখভরা ছিল ঝকঝকে রোদ্দুর। লৌহ কঠিন হাতে দৃঢ় বুকে আকাশ ভরা আশা নিয়ে সুবল মাঝি নাও ভাসিয়েছিল সাগর পাড়ি দিতে। সকালের আলো অভিষেক জানিয়েছিল তাকে, প্রশস্ত ললাটে পরিয়ে দিয়েছিল রাজটীকা। কিন্তু, ঈশাণ কোণে জমা মেঘ ছেয়ে ফেলেছিল সারা আকাশ। পথের মাঝেই পথ হারিয়ে ফেলল মাঝি। তীরে অনেক অপেক্ষা উপেক্ষা করেই হারিয়ে গেল। চিরদিনের মতো। তবুও সুখ যায় স্মৃতি যায় না, ক্ষত ভাল হয়, দাগ ভাল হয় না। মানুষ যায়, নাম থেকে যায় যুগ থেকে যুগান্তরে।

সমীর ঘোষ দস্তিদার

মহাকালীর বাচ্চা : একটি গবেষণার বিষয়

গর্ভাবস্থাতেই থিয়েটার ওয়ার্কশপের 'মহাকালীর বাচ্চা' তাঁদের শুভার্থীদের মনে আশার আনন্দ জাগিয়েছিলো ; ভূমিষ্ঠ হবার পর দেখা গেলো মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কেউ বলছে গায়ের রঙটা ভালো তবে ওজন বেশি নয়। কারোর অভিমত, মুখশ্রী ভালো তবে বাপ-মায়ের সঙ্গে মিল নেই। কেউ বা রীতিমত রুষ্ট : শিশুর মুখ দেখবো কি করে, গোটাটাই যে নক্সা-করা কাঁথায় ঢাকা ? কিন্তু যে যাই বলুক, 'মহাকালীর বাচ্চা' দেখতে চাইছে সবাই ; আর সদ্যজাত খোকাটি, যে যাই বলুক, হাত পা ছুড়ে জমিয়ে ফেলেছে ইতিমধ্যে।

সুতরাং যে কোনো একটি সিদ্ধান্তে আসা গোঁয়ার্তুমির মত মনে হতে পারে। আবার কোন সিদ্ধান্তে না আসার অস্বস্তিও কম নয়। মূল নাটক ও তার মঞ্চ রূপায়ণ সম্বন্ধে একই নিঃশ্বাসে প্রশস্তি ও আক্ষেপ এমনভাবে জড়িয়ে গেলে তা হয়ে ওঠে এক গবেষণার বিষয়। থিয়েটার ওয়ার্কশপের 'মহাকালীর বাচ্চা', নাটকের বাচ্চাটির মতই, মনে হয় একটি গবেষণার বিষয় হয়ে উঠবে।

কারণ এ নাটক সব দিক থেকেই 'নতুন' অথচ 'পরিচিত', 'জটিল' অথচ 'সরল'—এক কথায়, অভিনব মিশ্রণ. যা থিয়েটার ওয়ার্কশপের প্রসিদ্ধ রীতিকে ভেঙ্গে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে চাইছে, অথচ এই 'নতুন কিছু' যে কী, তা ধরতে গিয়েও আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, পরিচালকের এবং আমাদেরও।

রাজরক্ত, চাকভাঙ্গা মধু, অশ্বত্থামার পর ওয়ার্কশপ যখন 'নরক গুলজার' করলেন তখন অনেকেই এই হাল্কা মেজাজের নাটককে জনপ্রিয় করার নানান আয়োজনকে শুধু অস্তিত্ব-রক্ষার উপায় বলে মেনে নিয়েছিলেন। এখন মনে হয় 'নরক গুলজার' দিক-পরিবর্তনের সংকেত। একটি দল শুধু একই রকম রীতিতে আবদ্ধ থাকবে তা আশা করার অর্থ তার অপমৃত্যু কামনা করা। তাই ওয়ার্কশপ রাজরক্তের পর চাকভাঙ্গা মধু করেছেন, এবং তারপর অশ্বত্থামা, এমন কি 'পাঁচু ও মাসী'র মত ক্ষুদ্র নাটক। আঙ্গিকে প্রত্যেকটি ভিন্ন ও স্বকীয়, তবে মিল একটি সুরে,—পরিচ্ছন্ন পরিকল্পনা, সংহত রূপ, বিন্দুতে সিন্ধু দেখানোর কল্পনাশক্তি ; ফল : এক আশ্চর্য গভীরতা! 'নরক গুলজারে' ঠিক এইখানে একটা অভাব থেকে গেলো, যদিও আয়োজনের ত্রুটি ছিল না—কুশীলবের সংখ্যা-বৃদ্ধি, মজাদার দৃশ্যপট ও উপকরণ, মনমাতানো গান। বোঝা গেল 'ওয়ার্কশপ' তাঁদের ছিমছাম ছোটখাটো ভুবনের সীমানা বাড়াতে আগ্রহী, আঙ্গিকের জটিলতাও, যা সমসাময়িক জনরুচির স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। 'মহাকালীর বাচ্চাতে' তাঁরা

এই জনবহুল বৃহদায়তন জমজমাট জগতটিকেই আবার নতুন রীতিতে সাজিয়েছেন, এবং এই 'রীতিটি' আত্যন্ত এক পরীক্ষামূলক মিশ্রণ; কিন্তু মিশ্রণটি যান্ত্রিক, রাসায়নিক হয়ে ওঠে নি।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের মূল নাটকটিতেই গঠন-বিন্যাসের একটা ফাঁক ছিলো। বেশ খানিকটা বাস্তববাদী বিকাশের পর নাটকটি তাঁর পরিচিত এক্স্‌প্রেশনেস্টিক পথ ধরে ফেলে এবং শেষ হয় পুরোপুরি প্রতীকী ফ্যান্টাসির মধ্যে। মহাকালীর বাচ্চা যে ভাবে জন্ম নেয়, তার জন্মগত ধারালো দাঁত দিয়ে সে যে ভাবে সব কিছুকে আঘাত দিয়ে সবার তাড়া খেয়ে জঙ্গলে পালায়, গ্রামের প্রধান জোতদার যে ভাবে এতে প্রথমে শংকিত হয়, ও পরে তার প্রতি শহুরে কাগজের দৃষ্টি পড়ায় যেভাবে প্রসন্ন হয়ে ওঠে আত্ম-প্রতিষ্ঠার লোভে—এ সবই বাস্তবে প্রায়ই ঘটে। কাগজে আমরা প্রায়ই নানান রকম উদ্ভট শিশুর জন্ম ও তাকে নিয়ে জল্পনা-কল্পনা এমন কি বাণিজ্যেরও খবর পাই। মোহিত এই প্রাকৃতিক অঘটনের মধ্যে শোষিত সমাজের পুঞ্জীভূত আক্রোশের এক প্রতীকী ব্যঞ্জনা এনেছেন দক্ষ হাতে। নাটকের প্রথম অংশে বাস্তবতা ও প্রতীকীবাদ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকে, কিন্তু তারপরই ফুটে ওঠে এক দিশেহারা ভাব। কেন্দ্রবিন্দু সরতে সরতে এক বিশাল কুয়াশাচ্ছন্ন পটভূমিকায় হারিয়ে যায়। মহাকালীর বাচ্চাকে নিয়ে রিসার্চ সেণ্টার, কমিশন, রেডিও, টি ভি, কাগজ ও সরকারী প্রশাসনের কর্মব্যস্ততায় বাস্তববাদী গ্রামীণ পটভূমিকাটি বদলে গিয়ে এক অযাচিত 'শহুরে' পরিবেশ তৈরী হয়। আসলে রাষ্ট্রপতি থেকে চৌকিদার পর্যন্ত একটি মুঠিতে ধরার এই প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য হলেও হাতের মুঠিটা সেই অনুপাতে বিশেষ শক্ত নয় বলে আক্ষেপ থেকে যায়। জোতদারের ঘরোয়া কাহিনী বৃত্তাকারে বেড়ে বেড়ে গোটা গ্রামীণ সমাজকে টেনে আনে, তারপর এত বড় হয়ে যায় যে মূল চরিত্রগুলি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, পরিশেষে অবশ্য আবার তাদের নাটকের কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনা হয়। এই ঢিলেঢালা বিন্যাসের জন্য একা নাট্যকার দায়ী নন, পরিচালকের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। প্রথম ও দ্বিতীয় অভিনয় যাঁরা দেখেছেন তাঁরা বুঝেছেন নাটকের দ্বিতীয় অংশের সাংগঠনিক দুর্বলতা দূর করার চেষ্টা কতটা আন্তরিক ও অক্লান্ত, তবু প্রথম অংশের পক্ষে এখনও তা পুরোপুরি অপরিহার্য হয়ে ওঠে নি। বিভাস চক্রবর্তীর বহুশ্রুত মুন্সীয়ানার একাধিক প্রমাণ মেলে বিভিন্ন সংযোজনে, কিন্তু সার্বিক গঠন-বিন্যাসের দৃষ্টিকোণ থেকে এখনও প্রথম ও দ্বিতীয় অংশকে মনে হয় দুটি ভিন্নধর্মী ভিন্ন স্বাদের নাটক। গ্রামের শোষিত মানুষদের 'কোরাস' হিসেবে ব্যবহার করে পরিচালক যে ভাবে সাংগঠনিক ঐক্য আনতে চেয়েছেন নাটকে তা সুদৃশ্য ও সুশ্রাব্য হলেও শেষ বিচারে বিশেষ কাজে দেয় না। এর মূলে আছে, আশংকা করি, পরিচালকের নিজেরই দিশেহারা ভাব, যা এমন একটা অসাধারণ সম্ভাবনার অথচ অসংহত নাটক হাতে

নিয়ে যে কোনো পরিচালক প্রাথমিক পর্বে অনুভব না করে পারেন না। বিভাস ক্রমশঃ এই দিশেহারা ভাব কাটিয়ে উঠবেন আশা করা যায়, যেহেতু পূর্ণবিকাশের দিকে এগিয়ে যেতে পারে যে কোনো নাটক, যদি পরিচালকের লক্ষ্য থাকে সেদিকে।

'মহাকালীর বাচ্চা' নাটকে যে রীতিটি সর্বাগ্রে মুগ্ধ করে তা হলো জোতদারের প্রাসাদের স্তম্ভ স্বরূপ শোষিত গ্রামবাসীদের ব্যবহার। তারা দরজার ফ্রেম নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, এবং হঠাৎ হঠাৎ জোতদার ও তার সহধর্মিণীর সংলাপের ব্যঙ্গাত্মক প্রতিধ্বনি করে ওঠে। মহাকালীর বাচ্চা জোতদার গিন্নিকে কামড়ে দিলে তারা মুখে কপট সান্ত্বনার আওয়াজ তোলে, কখনো সখনো দরজার ফ্রেম থেকে মুখ বার করে অবাক হয়ে সমস্ত ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে।

এ শহরে এক্সপ্রেশনেস্টিক রীতি অপরিচিত না হলেও এ রকম প্রয়োগ নতুন বলেই মনে হয়, বিশেষ করে একই অভিনেতাদের দিয়ে প্রতীকী মঞ্চসজ্জা, শোষিত মানুষের ক্রিয়াকর্ম ও কোরাসের কাজ করিয়ে নেবার কৌশলটি। এই কৌশলটির আর একটি দিক গান এবং নাচ। তবে তা অপরিহার্য ছিল বলে মনে হয় না, যদিও দেবাশিস দাশগুপ্তের সুর-পরিকল্পনা সুন্দর। নাটক শুরু হয় আবছা আলোয় 'চলো, সোনাকুঠি গ্রামে চলো' গান দিয়ে, যে-গান স্বপ্নের কথা, যা হয় নি অথচ হতে পারে তার কথা বলে। কিন্তু এই সুরের ফলে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে নাটকের প্রথম দৃশ্যের মেজাজের মিল নেই। প্রথম দৃশ্যই নাটকটিকে ব্যঙ্গাত্মক সুরে বেঁধে দেয়, যা ঠিক নাটকের অন্তিম মুহূর্তের আগে পর্যন্ত এক টানা বেজে চলে, এবং ক্রমশঃ সোচ্চার ও কৃত্রিম হয়ে ওঠে। নাটকের অন্তিম মুহূর্তে আবার তৈরী হয় আবছা আলোয় ছায়া-নৃত্যের প্রভাবে শুরুর সেই রোম্যান্টিক ফ্যান্টাসির পরিবেশ। মাঝখানের ব্যঙ্গাত্মক অংশ অবশ্য সামাজিক নাটকের বাস্তববাদী পথ ধরে চলে নি। সেখানে নানান পদ্ধতির মিশ্রণে আমরা অনবরত বাস্তব থেকে অবাস্তবে ঘোরা ফেরা করি। তবু যতক্ষণ নাটক জোতদারের ঘরে আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ বাস্তবতার সুর প্রাধান্য পায়, তারপর নিউজ রীলের মত কাটা কাটা ছবির কোলাজ হয়ে ওঠে বাকি অংশটুকু। বাস্তব-অবাস্তবের সুষ্ঠু মিশ্রণে অসাধারণ মুহূর্ত সৃষ্টি হয়েছে দুটি দৃশ্যে—মহাকালীর গৃহত্যাগ, এবং জঙ্গল থেকে (লাঠি ঠক ঠক করতে করতে) বোবা চৌকিদারের আবির্ভাব। কিন্তু প্রায়শই প্রতীকী—ইঙ্গিতধর্মী মঞ্চোপকরণ ও মূল পাত্রপাত্রীর আচরণে মিল পাওয়া যায় না। ইঙ্গিতধর্মী সেটগুলো এত কাব্যিক, অথচ, অভিনয়ে তার বিপরীত সুর—স্যাটায়ার। মঞ্চসজ্জা গতিশীল হলেও তাতে বাস্তবমুখী ব্যঙ্গের চেয়ে কাব্যিক কল্পনার ছাপ বেশি। বিভাস বোধ হয় চেয়েছিলেন দুই বিপরীত সুরের নিরন্তর সংঘাত। কিন্তু পরিকল্পনাটি লোভনীয় হলেও প্রয়োগে তা ঢাকা পড়ে যায়। তাই গান ও নাচ দিয়ে দৃশ্যান্তরে যেতে হয়, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে

বাড়তি অলঙ্কার বলে মনে হয়। অলঙ্কারের ভার বোধ হয় একটু বেশি-ই এ নাটকে। পরিচালকও বোধ হয় তাই চেয়েছিলেন। নইলে কেনই বা যেখানে ঘরের দেওয়াল হয়ে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে, সেখানে মানুষ পুলিশের বদলে কাগজে পুলিশের আবির্ভাব হয়। অবশ্য নানান সাজসজ্জা ও রীতি-নীতির প্রয়োগে যে চোখ ভরে না তা নয়, তবে কিনা জিজ্ঞাসু মন কিঞ্চিৎ অস্বস্তিতে পড়ে যখন দেখা যায় প্রয়োগ-পদ্ধতি মুহুর্মুহু বদলে যাচ্ছে, খণ্ডন করছে একটি আর একটিকে।

কয়েকটি উদাহরণ : এ নাটকে কোরাস—অভিনেতারাই প্রধানত নেপথ্যের আবহ রচনা করে ; কিন্তু শেষে মাইকের ব্যবহার করতে হয়, সর্বক্ষণ আলো আসে মঞ্চের বাইরে থেকে, শেষ মুহূর্তে আলোর উৎস পর্যন্ত মঞ্চে দেখানো হয় —অথচ গানের সময় যন্ত্রবাদকেরা সর্বদা মঞ্চের বাইরেই থাকেন ; ইঙ্গিতধর্মী বলেই মনে হয় জোতদারের ঘরের দরজা—দেওয়াল বেশ বাদশাহী ধরনের, কিন্তু ঘরে তার আসবাবপত্র যদিও বাস্তব, তবু অবাস্তব রকমের বে-মানান। তার গিন্নিকে তাই 'একটা বেঞ্চে বসতে হয় এক সময়। এ নাটক শুরু হয় মহাকালীর বাচ্চা' দিয়ে, যে তার জন্মগত ধারালো দাঁত দিয়ে শ্রেণী-শত্রুদের আঘাত করে, কিন্তু শেষ হয় সেই শিশুর প্রতীক দিয়ে, যার দাঁত নেই, তবে মাড়ি দিয়ে শ্রেণী-শত্রুর হাত কামড়ে ধরে। কেন এই পরিবর্তন বুঝতে অসুবিধে হয়। বুঝতে অসুবিধে হয় গ্রামের মানুষ জোট বাঁধছে প্রতিরোধের জন্য এমন বাস্তব দৃশ্যের পর কেন আবার শিশুর প্রতীককে ফিরিয়ে আনা হয়। বিভাস দেখাতে পারতেন, প্রাসাদ কাঁধে নিয়ে যে-শোষিত মানুষেরা দাঁড়িয়েছিল তারা সরে যাওয়ায় বা রুখে দাঁড়াতে শোষণের ইমারত ধসে গেল। তবে আরো বেশি সংহত রূপ পেত মঞ্চসজ্জা ও নাটকের বিন্যাস। শেষ দৃশ্যের ছায়া-বাজি অবশ্যই চোখকে মুগ্ধ করে তবে মননকেও পীড়িত না করে ছাড়ে না। এ রকম একটা নাটকে, যেখানে টেপ ব্যবহার করে আবহ সংগীত বাজানো হয় না, মঞ্চের আড়াল থেকে বাদকবৃন্দ সেই দায়িত্ব পালন করে, এমন কি রেডিও নিউজ রীলের সূচনা-সঙ্গীতও হারমোনিয়মে বাজানো হয়, সেখানে সাদা পর্দায় আলোর সাহায্যে ছায়ার ইলিউশন তৈরী করার তাৎপর্য ধরতে কষ্ট হয়। বাস্তবকে কার্টুনিস্টের দৃষ্টিতে দেখিয়ে একটা স্বপ্নিল রোম্যান্টিক পরিবেশে পৌছনোর এই পদ্ধতিতে একটা পরিচিত উল্লম্ফন ধরা পড়ে।

এ নাটকে অভিনয়ের সুযোগ কম, যেহেতু পাত্রপাত্রীর চরিত্র এক-মাত্রিক। তবু অশোক মুখোপাধ্যায়ের ইন্দুশেখর, জয়তী ঘোষের পদ্ম, মানিক রায়চৌধুরীর পুলিশ আমলা, রণজিৎ চক্রবর্তীর ডাক্তার, শরদিন্দু রায়ের কৈলাস প্রভৃতির অভিনয়ে পরিশ্রম ও আন্তরিকতার ছাপ পাওয়া যায়। অশোকের অভিনয়ে মাঝে মাঝে 'চাকভাঙা মধুর' মাতলার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়, সেটা কাম্য নয়।

জয়ন্তীর কণ্ঠস্বরে ও চলাফেরায় আরো কম শহুরে ভাব থাকলে চরিত্রের প্রতি সুবিচার হবে।

সব মিলিয়ে 'মহাকালীর বাচ্চা' একটি দুঃসাহসিক পরীক্ষা। মনে হয় সাধারণ দর্শক এবং বুদ্ধিজীবীদের এক অংশ এই পরীক্ষা নিরীক্ষাকে যেমন তারিফ করবে, অন্য অংশ তেমনি প্রশ্ন তুলবে বারবার। কিন্তু এই বিতর্কই বোধ হয় তাদের সবাইকে একাধিক বার পাঠাবে এ নাটক দেখতে। কারণ 'মহাকালীর বাচ্চা' নিয়ে আমাদের গবেষণা সবে শুরু হলো এবং চলবে বহুদিন।

দীপেন্দু চক্রবর্তী

মধ্যবিত্তের প্রস্তুতি

ইন দ্য বিগিনিং হাউ দ্য হেভেনস্ অ্যাণ্ড আর্থ রোজ আউট অব ক্যাওস্।

আমরা বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এমনই এক তীব্র সমাজচেতনার আলোতে দাঁড়িয়ে আছি যে মানুষের সমাজ জীবনের বহু প্রশ্নই আজ মধ্যাহ্নের রৌদ্র-দীপ্ত বস্তুর মত প্রকট স্পষ্ট। আর এই, যে দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন বস্তুর বিচার বিশ্লেষণ করা হচ্ছে তা পৃথিবীর নানা দেশের সমাজ গবেষণাগারে এক পরীক্ষিত সত্য। আজ আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি পৃথিবীর অতীত ইতিহাসে দুই দেশের ভেতর যত সংগ্রাম কোনটিই আসল সংগ্রাম নয়, ব্যাপক মহাযুদ্ধ নয়—সবই শাসকশ্রেণীর খেয়ালখুশির নরহত্যার নৃশংস খেলা। আসল যুদ্ধ শ্রেণী সংগ্রাম—যা সর্ব ব্যাপক—নানা সীমান্তে চলে সে যুদ্ধ। শ্রেণীশত্রুর সঙ্গে একদিকে যেমন চলে বাস্তব যুদ্ধ, তেমনই অন্যদিকে চলে সাংস্কৃতিক যুদ্ধ, ব্যক্তির পুরোনো ধারণার সঙ্গে তার নতুন অভিজ্ঞতার যুদ্ধ।

কিন্তু এই সংগ্রামে বাস্তব যুদ্ধ-পর্বের পূর্বে চলে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের যুদ্ধ—সৈনিকদের মানসিক প্রস্তুতির পর্ব। আর সেই পর্ব চলছে এখন আমাদের দেশে। এর গতি প্রকৃতি নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু এটা যে ঘটনা, এ ব্যাপারে মতানৈক্য ঘটবে না। নাটক এই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক শক্ত হাতিয়ার। প্রগতি শিবিরের সৈনিক হিসেবে থিয়েটার কমিউন ইতিমধ্যেই নিজেকে চিহ্নিত করে নিয়েছে এবং বিগত প্রযোজনা দানসাগর দিয়ে যে জয়যাত্রা শুরু করেছিল, সাম্প্রতিক হাতিয়ার 'প্রস্তুতি' দিয়ে তাকে অব্যাহত রাখছে।

প্রস্তুতি : সংগ্রামের প্রস্তুতি। কোথায় সে প্রস্তুতি? কী ভাবে সে প্রস্তুতি? প্রস্তুতি নাটকের প্রায় সারা অঙ্গ জুড়ে কোথাও সে প্রস্তুতির চিহ্ন নেই—কোন আভাস নজরে পড়ে না, যেমন পড়ে না আমাদের এই সমাজের দিকে তাকালেও

—যেখানে শুধু জীর্ণতা ক্লীবতা জড়তা, অন্ধতা। অথচ আমরা তো বিপ্লবের কথা বলি, বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আশায় বুক বেঁধে বসে আছি। তাহলে? হতাশা? নৈরাশ্যের নিশ্ছিদ্র অন্ধকার? সাধারণ্যে তাই প্রায়শঃই শোনা যায়—'ও কিছু হবে না এ দেশে। ও সব দেশের কথা আলাদা।' কিন্তু সমাজ তো থেমে থাকে না চিরদিন। কোন সাময়িক স্তব্ধতা দেখা গেলে তা কাটিয়ে গতিশীল হওয়াই সমাজ শক্তির ধর্ম। আসলে গতিহীন স্তব্ধতার মধ্যেও গতিহীনতা কাটিয়ে ওঠার, গতিশীলতার মধ্যেও আরও বেগবান হওয়ার আবেগ ইচ্ছা কখনও দৃশ্য কখনও বা অদৃশ্যভাবে নিয়ত কাজ করে চলে। এই দুনিরীক্ষ্যকে দেখতে আরও সূক্ষ্ম চোখ, আরও প্রবল ইচ্ছা দরকার। 'প্রস্তুতি' সমাজ দেহে চেতনার সেই প্রস্তুতির বীক্ষণ যন্ত্র। এবং সেটা তুলে দেওয়া হয়েছে দর্শকদের হাতেই। সঙ্গে একটা সূত্রও "একটা বদল যে ভেতরে ভেতরে ঘটে চলেছে—তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ··· যখন ওরা খুন করতে এসেছিল, সারা বস্তি তখন একজোট হয়ে ওদের বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত।···বস্তির কেউ আজ একা নয়। সবাই এক। সবাই মিলে একটা জোট।' এই সূত্রটি হাতে পেলেই তবে সহজে নজরে আসে একটি শক্তি সত্যিই কাজ করে চলেছে তার ভেতরে। নইলে সবই তো দেখি মলিন ঘোলাটে, স্বার্থের সংঘাত, অবক্ষয়ের ধ্বস।

অতি বিষণ্ণ এক সকাল। ঐ যে ছেলেটি, দধিচীর মত চেহারা, ব্যায়াম করছে, শক্তি সংগ্রহ করতে চাইছে। কাকের কোলাহলের মত কলতলায় ঝগড়া চলে উচ্চরোলে। মদ্যপ কর্মহীন বৃদ্ধ কিছু সাশ্রয়ের জন্য ইয়ার বন্ধুর ঘরেই ছাগলের দুধ চুরি করে। ধরা পড়েও বেপরোয়া সাফাই গায়। সংসার ত্যাগের হুমকি দিয়ে দুন্দার চলে যায়। অথচ হিংস্র শ্যেনের ঝাপট খাওয়া পরিবারে শোকে গুমরে-মরা সদাসন্ত্রস্ত মা, অকালে সংসারের হালধরা ঝড়ঝঞ্ঝায় বিধ্বস্ত কালী, উদার সারল্যে ঝলমলে হাসিনা (একে এ সংসার থেকে পৃথক করে না দেখে) তিনজনে এক শান্ত শ্রীমন্ত ঘর সাজাতে ব্যাকুল, পরিবারের নৈতিক সুস্থতা আনতে আগ্রহী। শুধু এই নিরাপদর পরিবার কেন, সমস্ত বস্তিটাই অভাব আর তার আনুষঙ্গিক রোগে ভুগছে। সাদাত সামান্য দুধের জন্য কাজিয়া করতে আসে নিরাপদর সঙ্গে, নির্বিকার চিত্তে হাত পেতে ক্ষতিপূরণের পয়সা নেয়। নিরাপদর কাছে তার প্রীতিটুকু যেন শুধু ঐ শুঁড়িখানার উৎকট আবহাওয়ায়।

নিরাপদর ছেলেবেলার মাইণ্ড টু মাইণ্ড ফ্রেণ্ড জয়কৃষ্ণ-জ্যাকসন—সীম্যান ডলফিন লাখপতি হয়ে ফিরে এসেছে। জ্যাঘোকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বন্দরে বন্দরে যার পাঁচ পাঁচটি করে স্ত্রী, ব্যাংকে পঞ্চাশ হাজার টাকা, আর আছে স্বদেশ সম্বন্ধে অজ্ঞতা, ঔদাসীন্য। তারই কাছে নিরাপদ, ডুবন্ত একটা মানুষ কুটো ধরার ব্যাকুলতায় হাত পাতে, পায়ে ধরে। প্রতিদানে যা জোটে তা হলো হৃদয়হীন ঘৃণামিশ্র প্রত্যাখ্যান, ঠিক যেমন দেখা যায় প্রবাসে সৌভাগ্যবান স্বদেশকে

ভুলে যায়, অশ্রদ্ধা দেখায়, অথচ স্বদেশের দুর্ভাগ্য মোচনে তাদের দায়টুকুও এড়িয়ে যায় সুকৌশলে।

ধর্মঘট করায়, চাকুরি যাওয়ার ভয়ে সদাসন্ত্রস্ত দিনেশ, পেটের চাহিদা মেটাতেই ধর্মঘট, এ বুঝেও ভয়ে ন্যুব্জ পিঠ সোজা করে দাঁড়াতে পারে না,যাহোক একরকম করে মিটমাট করে চাকুরিটা বজায় রাখতে চায়। কারখানার লকআউটের গুজবে খেপে গিয়ে সহমর্মী—সহকর্মীর মাথা লক্ষ্য করে ইট ছুঁড়তে দ্বিধা করে না। মরিয়া লোকের মত দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য। শত্রুপক্ষকে খবর দেয় কালীর সম্বন্ধে।

বন্ধুর নিদারুণ প্রত্যাখ্যানের ও ছেলের তীক্ষ্ণ তিরস্কারের অঙ্কুশে বিদ্ধ নিরাপদ একবার মাত্র তার আহত মনুষ্যত্ব নিয়ে জ্বলে ওঠে। তার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তখন প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প। পরিত্রাহি আর্তনাদ করে নিরাপদ: 'কালী, তুই আর আমায় বকিস না।' এই একটি বারের সকরুণ আর্তিই নিরাপদকে (অনবদ্য প্রকাশ ভঙ্গিমা নীলকণ্ঠের) আমাদের ঘনিষ্ট করে। খুশির আবেগে ভাল হওয়ার উৎসাহ তাকে পেয়ে বসে। দিলদরিয়া হয়ে বাজার করে নিয়ে আসে দুহাত ভরে। কিন্তু সে কতক্ষণ! চরিত্রটির বুকে এই ক্ষণিকের বিদ্যুত দীপ্তি খেলেই পর মুহূর্তে নিশ্ছিদ্র আঁধার নেমে আসে। কালী যখন আদর্শনিষ্ঠ থাকার জন্যে মস্তানদের হাতে নিগৃহীত হচ্ছে, তখন নিরাপদ শুঁড়িখানায়; ফিরে আসে মাতাল হয়ে, তখন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে কালী। মনুষ্যত্ব অবক্ষয়িত, তাই স্ত্রীর মুখেই নিরাপদর মৃত্যুকামনা প্রোসিনিয়ামের এপারে বসে থাকা নিরাপদ-মানসিকতার অর্থ সহস্র ফুসফুসে যেন বা বাতাস টান পড়ে।

তাহলে আবার সেই পুরানো প্রশ্নে আসা যাক—কোথায় প্রস্তুতি? আছে,প্রাক্-সংগ্রাম পাঠ আছে এবং আছে বলেই মুক্তির আশায় বুক বাঁধা যায়। কী সেটা? কী ভাবে? চারিদিকে অবক্ষয়, তবু তারই মধ্যে জন্মাচ্ছে মানুষ—শক্ত ধাতুতে গড়া সমাজ সচেতন একটি দুরন্ত শক্তি। ভাবা যায়, সন্তুর মত ছেলে নিরাপদর ঘরে! কল্পনা করা যায় নিরাপদরই ছেলে পিছিয়ে পড়া কালী কত দ্রুত এগিয়ে আসে শ্রমিক আন্দোলনে। হতাশায় শতধা দিনেশ কেমন করে মুহূর্তে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে সঠিক কর্তব্য চিনে নেয়, বস্তির ছড়ান ছিটানো মানুষগুলি, যাদের দিন শুরু হয় কলতলায় ঝগড়া দিয়ে,সামান্য স্বার্থের টানা হ্যাঁচড়া দিয়ে, কত শীঘ্র জোট বেঁধে প্রতিরোধের শক্ত দুর্গ গড়ে তোলে যা দেখে শেয়ালের মত পালিয়ে যায় কালীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া পোষা সন্তানরা। এটাই তো সেই দুনিরীক্ষ্য প্রস্তুতি—আসন্ন সংগ্রামের সৈন্যসমাবেশ। হঠাৎ কতকগুলি বিপ্লবী গজিয়ে ওঠে না ব্যাঙের ছাতার মত—ধীরে ধীরে সাদা চোখের আড়ালে অঙ্কুরিত, পল্লবিত হয়ে উঠতে থাকে বিপ্লবের মানুষেরা। সমাজ সচেতন মানুষের শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিকে দাবিয়ে রাখতে শ্রেণী শত্রুর চামচারা জখম করে কালীকে। কিন্তু

যে দিনেশ খবর দিয়েছিল অমিয় মস্তানদের, সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সেই চিৎকার করে নিদ্রিত পাড়াকে জাগিয়ে তোলে—সবাই ছোটে আততায়ীদের ধরতে—শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে, হামলাবাজির বিরুদ্ধে।

নাটকে একটা পারভেডিং সোল সন্ত। প্রারম্ভে কাকডাকা ভোরে তারই কণ্ঠ শুনছে দর্শক, সারা নাটকে বহুজনের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে তার কথা—নানা প্রেরণা আবেগে সন্ত মূর্ত। নাটকের শেষে আবার ধ্বনিত হয়েছে সন্তর কণ্ঠ নাটকের বিভিন্ন বিষয় চরিত্র ঘটনায় সমাধান সূত্র হিসেবে। সন্ত বিপ্লবের প্রতীক, পীড়নের শিকার, আশার আশ্বাস।

নাট্যকার নিজে ইনভলভড্ হন না। কিন্তু দর্শককে ইনভলভ্ করানোর প্রয়াস নাটকে, নাট্যাভিনয়ে। সেই ইনভলভ্মেণ্ট-এ জড়িয়ে আমরা কখনও কালী, কখনও দিনেশ, কখন মা, কখনও হাসিনা, কখনও বা নিরাপদ অন্তপক্ষে যা আমরা কখনই হতে চাই না—বলা যায় নেগেটিভ ইনভলভ্মেণ্ট তা হলো কখনও অমিয় কখনও জ্যাকসন। এই দুই পক্ষের একটা অলক্ষ্য সংঘাত চলছেই—শুভ ইচ্ছার সঙ্গে মন্দর অবিবেচনায়। আর আমরা নিশ্চয় করেই শক্তি দুর্বলতা মিশিয়ে প্রথম দলে। থিয়েটার কমিউনের শিল্পীদের নিপুণ অভিনয় আমাদের চেতনার শাখা প্রশাখার সঙ্গে সমধর্মী ঐ সব চরিত্রের সেতুবন্ধ রচনা করে। তাই কখনও আমরা নিরাপদর (নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত) মত প্রাণখোলা অচেতন, মা-র (মণিদীপা রায়) মত সহিষ্ণু শোকস্তব্ধ সদা শঙ্কিত, কালীর (সুজিত মুখোপাধ্যায়) মত কর্মিষ্ঠ টগবগে, হাসিনার (সরস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায়) মত সহমর্মী, দিনেশের (তপন সেনগুপ্ত) মত ভীরু ও দ্বিধাগ্রস্ত। সৌভাগ্যদর্পী জ্যাকসন ওরফে জয়কৃষ্ণ (সুব্রত ভট্টাচার্য) একবার মাত্র প্রবেশ-অবস্থান-প্রস্থানেই আমাদের বিবেককে দিয়ে বলিয়ে ছাড়ে 'না, না—এ আমরা হতে চাই না।' দলগত অভিনয়ের সামগ্রিক ফসল এখানেই। তবু এ দলের মধ্যে অনবদ্য অভিনয়ে যিনি সবাইকে ছাড়িয়ে, অভিনয়ে পরিচালনা ও নাট্যকর্মে যিনি কলকাতায় শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন তিনি নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত। অসাধারণ তাঁর অভিনয় গুণে প্রতি দৃশ্যের নানা বাস্তবনিষ্ঠ অভিব্যক্তির শৈল্পিক চাপে মেটিয়াবুরুজের নিরাপদ দাস এক কালের নামডাক ওয়ালা ওস্তাগর, দর্শকমনে এক দীর্ঘস্থায়ী চরিত্র-চিত্রে মুদ্রিত হয়ে যায়।

প্রথম দৃশ্যের সিল্যুয়েটে একটা বস্তি ঘরের কাঠামোর ভেতর খাটানো মশারী দড়িদড়া, শরীর চর্চারত একটি যুবক এবং নাটকের 'প্রস্তুতি' নাম হঠাৎ কেমন করে যেন এক নির্মীয়মান যুদ্ধ-শিবিরের ভ্রম জাগিয়ে দেয় দর্শকের চোখে। এ এক আশ্চর্য দর্শন অভিজ্ঞতা। জ্যাকসনের কাহিনী নিয়ে সামন্ত-অভ্যাসের সঙ্গে শিকড়হীন দেশত্যাগীর মিতালি—নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের ট্র্যাজেডির একটা করুণ দিক। ইংরেজী গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে কতকাল পরে দেখা ছেলেবেলার

চাপা দিয়ে হত্যা করায়। সন্তানের জন্ম এবং হত্যার মধ্য দিয়ে নিতাইয়ের জগৎ সংসারে এক প্রচণ্ড বিপ্লব ঘটে! সব কিছু ওলোটপালট হয়ে যায়, নিজের জীবনের কবর রচনা করবে জেনেও নিতাই আদুরীকে আশীর্বাদ জানাতে গিয়ে, আত্মপাপের কথা প্রকাশ করতে থাকে। জীবনের যা কিছু অন্যায়, অবিচার, লোভ, পাপ কাজের বিনিময়ে প্রকাশ্যে সে আত্মশুদ্ধির জন্য 'পারের কড়ি চেয়ে বেড়ায়'। 'কাউরে কিছু জিগ্যেস কইরো না। যা করিচি আমি একা করিচি। যা হইয়েছে সব আমার একার পাপের ফল। কোথায় নে যাবে, চল। আমি একা যাব।' প্রকাশ্যে আত্মস্বীকৃতি করে নিতাই আত্মশুদ্ধি ঘটায়। ঘটে কি?

এই নাট্য-আখ্যানের মধ্য দিয়ে নাট্যকার আমাদের কাছে একটা সত্যের কথা পৌঁছে দেন, সেটা হলো—সামাজিক বিভিন্ন স্তর ও মূল্যবোধ পেরিয়েও, বৈভব প্রতাপের একচ্ছত্র মনিব হয়েও অন্যায় ও আত্মস্খলন ও পাপবোধকে কখনও গোপন করা যায় না। বৈভব দেয় না পাপ থেকে মুক্তি, সামাজিক প্রতিপত্তিও দেয় না মানবিক সুখের কোন সন্ধান, আত্মপ্রবঞ্চনায় যে বিশাল ফাঁক থাকে সেই ফাঁক পুরণ করতে পারে না কোন প্রতিপত্তির কারচুপি—একদিন ব্যক্তিকে ফিরতে হয় সেখানেই, যেখানে জীবনে সন্ধ্যা নামে, সব পাওনা গণ্ডা ছেড়ে যেতে হয়। ইহজীবন থেকে আর এক জীবনের জন্য মাশুলের কাঙাল হতে হয়। আর সেই মাশুল হলো স্থিত সমাজের ন্যায়বোধ, সততা, সমস্ত দুষ্কৃতির নিঃসর্ত স্বীকৃতি। প্রত্যেক মানুষকেই তার ইহজীবনের কাজ শেষ করার পর পরযাত্রায় 'মহাধর্মের' জন্য 'পারের কড়ি' ফেরি করতে হয়! পৃথিবীর নাট্যশালায় একক প্রবেশ ও প্রস্থানে এ নিয়মের কোন ছেদ নেই। 'কুলের মুখে লাথি দিয়ে নিচ্চয় বাহিরাব/আমি যাবগো তোমার সঙ্গে যাব বঁধু যাব।' এই আকুতি নিষ্ফল হয়ে শুধু ব্যর্থ গুমরেই কাঁদে।

কিন্তু সর্বস্খলনের সেই স্বীকৃতি—সে যে কত বড় কঠিন কাজ, মনোজগতের কত বড় অসাধ্য সাধন—তা কল্পনাও করা যায় না। যদি করা যেত তাহলে এ জগতে পাপের মাত্রা বোধ হয় অনেক কমে যেত। মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস বোধ আরও নিবিড় ও সহজ হতো।

টলস্টয় 'দি পাওয়ার অব ডার্কনেস' লেখেন ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে ঠিক 'দি ডিস্টিলিয়ার' রচনার দু বছর পরেই। ১৮৮৯ সালে 'দি পাওয়ার অব ডার্কনেস' রচনার সময়ে রাশিয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট কারও অবিদিত নেই। নাটকটি রচিত ও অভিনীত হয় ঠিক সেই সময়েই, যখন রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থা রীতিমত উত্তপ্ত, জারতন্ত্রের সাথে শ্রমিকশ্রেণীর দ্বন্দ্ব ও সংঘাত উচ্চকিত, ১৯০৫ সালের অভ্যুত্থানের জন্য শ্রমিক-কৃষক প্রস্তুয়মান, পশ্চিম য়ুরোপে চলমান সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নাটকে বিদ্রূপ-বিদ্রোহ স্থানে পেতে শুরু করেছে, স্বদেশেই আন্তন চেখভের মত নাট্যকার 'দি প্রপোজাল', 'দি ওয়েডিং', 'অন দি হাই রোড'

'দি উড ডিমন' ও কিছুকাল পরে 'চেরি অর্চার্ড' লিখতে শুরু করেছেন, মায়াকোভ্স্কি যখন শিল্প-সাহিত্যের আসরে তপ্ত হাওয়া তৈরি করতে শুরু করেছেন, গোর্কী সরাসরি নাটকের জগতে না এলেও সাহিত্যের অন্তধারার লড়াকু সেনাপতি শিরোপা নিয়ে লড়াই করছেন, রাশিয়ার মঞ্চ জগতে বাস্তবতা ও সমাজ বাস্তবতার রূপ নিয়ে যখন প্রচণ্ড তোলপাড় চলছে, শ্রমজীবী মানুষের জন্য সাহিত্য-শিল্পে কী করা কর্তব্য – এই নিয়ে যখন স্বয়ং লেনিনও ভাবিত, তখন টলস্টয়ের 'দি পাওয়ার অব ডার্কনেস' রাশিয়ার মঞ্চে হাজির হলো এবং ভীষণ বিতর্ক তুললো। এই নাটক তৎকালীন পরিবর্তনকামী রাশিয়ার মানুষকে কি দিতে পারছে এবং দিতে পারছে না, এর নির্যাস সাধারণ কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষ এমনকি সাধারণ মধ্যবিত্তদেরও ক্রম পরিবর্তনশীল সামাজিক মূল্যবোধকে সঠিক ভাবে রূপায়িত করে ইতিবাচক অনুভূতি দিতে পারছে কিনা তা নিয়েও বিতর্ক হলো।

প্রায় এক শতাব্দী আগের সেই বিতর্ক এক শতাব্দী পরে বাঙালী দর্শকদের মধ্যেও ওঠা স্বাভাবিক। সমাজ পরিবর্তন ও বিপ্লব কোন কিছুই ছক বাঁধা এক চেহারায় ঘটে না কিন্তু ঐতিহাসিক রূপারোপ ও অনুষঙ্গ প্রায় অবিকৃতই থাকে। পশ্চিমবাংলার ১৯৭৮ সালের মানুষ যখন নাট্যশিল্পের মধ্য দিয়ে তার জীবন অবগাহন করবেন, সমস্যা জর্জরিত নিত্যদিনের চেহারার মধ্য দিয়ে অন্তর্নিহিত চরম জীবন সত্যের আকাঙ্ক্ষায় ধাবিত হবেন তখনই একটা সোচ্চার প্রশ্ন উঠবে কী পেলাম? দুই দশকের এত পরিবর্তন ও এত রক্তক্ষয় সংঘাত-সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে আমার আত্মজীবনের কি বাণী শুনলাম? আমি অবহেলিত, আমি যদি নিতাই গড়াই হই, তাহলে আমার জীবন দ্বন্দ্বে কেন আমি – পরাণের ভূমিগ্রাসী অথবা দাদন রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী না হয়ে তার যুবতী বউয়ের প্রতি আসক্ত হই? নিতাই রেলশ্রমিক থেকে রূপান্তরিত হয় দেশের জনমজুরে – ঐতিহাসিক ধারার এই রূপান্তর বৈজ্ঞানিক সমাজবাদীরা গ্রহণ করতে পারে না। নিতাইয়ের মনে চিরকালই আশা, সে জোতের মালিক হবে (মায়াবতীর সংলাপ : নিতাই-দাদার কত আশা ছেল টাকা পয়সা হবে ···মালিক হবো)। তাহলে নিতাইয়ের মনে ছিল না কোন জনমজুরের দ্বন্দ্ব? অন্নপূর্ণা কি আমার প্রতীক? অন্নপূর্ণা কি আমারই মত অবহেলিত একজন? তাহলে তার জীবন ধারায় সামাজিক অবহেলার, ফাঁকির, বঞ্চনার দ্বন্দ্ব নেই কেন? কেন পরাণের প্রতি তার ঘৃণা শুধু বার্ধক্য ও যৌবনের অক্ষমতার জন্য? কিন্তু আমি নিতাই যে বাবা হাকিম গড়াইয়ের একদা ধর্মনিষ্ঠ – সৎ-বিবেকবাদী আদর্শে গড়া কৈশোর অতিবাহিত পুরুষ, তাহলে কেন আমি জনমজুর হয়েও শ্রেণী হিসেবে পরাণের প্রতি ঘৃণাহীন কেন? কেন অন্নপূর্ণার যৌবন আকর্ষণ বিস্মৃত হয়ে পরাণকে শ্রেণী হিসাবে ঘৃণা করার একবারও স্পৃহা জাগে নি? আর মা বাতুবরী? যিনি সংসার চালাতেও

দশটা টাকা কর্জ করেন জোতদারের কাছে, কেন তার মনে একবারও পরাণের প্রতি শ্রেণী-ক্রোধ জাগে না? শ্রেণী-ক্রোধ বা বিদ্বেষ তো অ্যাকাডেমিক সূত্রেই মনে গ্রথিত হয় না, যারা প্রত্যক্ষ শ্রমজীবী (নিতাই কিছুকাল রেল শ্রমিক ছিল) তারা শ্রেণীবোধ অর্জন করে তো প্রত্যক্ষ শ্রমের অভিজ্ঞতা থেকেই। মার্কসের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধারার সাথে এখানেই ছিল টলস্টয়ের চিন্তার পার্থক্য! জনমজুর নিতাইয়ের চারিত্রিক গঠনের মধ্যে কোথাও জনমজুরের প্রকাশ নেই, দ্বন্দ্ব নেই, তাই যতই বলা হোক না কেন, আমরা নিতাইকে গল্পের খাতিরে একজন মানুষ হিসাবেই গ্রহণ করি, কিন্তু জনমজুরের ছাপ নিয়ে নয়। তাই নিতাইয়ের জীবনের নাট্যময় ঘটনা বা অঘটনা নিতাই বিচ্ছিন্ন নিতাইয়ের, এর সাথে পশ্চিমবাংলার কোন প্রকৃত জনমজুরের জীবন দ্বন্দ্বের সাদৃশ্য বা প্রতিনিধিত্বের কল্পনা করতে গেলে আমরা মুহূর্মুহূ ঠোকর খাব, সে আঘাতে আমরা সচেতন হবো, জনমজুর নিতাই গড়াই সচেতন হবে না। হাকিম গড়াইয়ের যতই মানসিক সৎ অভীপ্সাই থাকে—'পাপপুণ্যে'র নিতাই গড়াই শেষ পর্যন্ত কিছুতেই বাংলার জনমজুরে উত্তীর্ণ হতে পারে না। তার আত্ম-সাফাই, পরকালের কড়ি ভিক্ষা একালের খেয়াও পার করতে পারে না। তার শ্রেণীবোধহীন জীবন-দ্বন্দ্ব জোতদারের পরিবারের সকলকে ভোগ করেও কোন কষ্ট সন্তুষ্টি আনতে পারে না দর্শকের। তাই নিতাইয়ের হাহাকার (এবং প্রথমার্ধে পরাণের হাহাকার) কোথায় যেন ছন্দহীন মনে হয় এবং শেষ পরিণতিতে কেমন যেন শ্রেণী-সাযুজ্যের ইমেজ তৈরী করেও দর্শকের কাছ থেকে শেষ পারানির কড়ি পায় না, কোন সহানুভূতি আদায় করে না। বরং নাট্যসম্বন্ধে, চরিত্র গঠনে কাহিনী পরম্পরায় নিতাই 'পাপপুণ্যে'র বেড়িতে আবদ্ধ হয়ে শুধু সামাজ্য প্রথার মধ্যে রিরংসার বীজ ছড়ায়। অতৃপ্ত বোধকে কোথায় প্রচণ্ড নাড়া দেয় আর দার্শনিকভাবে সিদ্ধান্তে আসে বীভৎস বিকৃত যৌন পাপ করেও আত্মস্বীকৃতিতে কী আত্মশুদ্ধি আনে, আত্মমুক্তি ঘটে! কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায় শেষ পর্যন্ত—নিতাইয়ের তথাকথিত মুক্তিতে সমাজমুক্তি ঘটে কী? নাকি সমাজ পরিবর্তনে কোন সাহায্য ঘটায়? নিতাই কী প্রকৃত জনমজুরের জীবনদ্বন্দ্ব নিয়ে পুণ্যের জয়গান গায়?

'নান্দীমুখ'-এর এটিই প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনা। প্রযোজনা যাতে জনপ্রিয় হয় তার জন্য নাট্যবস্তুর সর্ব নির্যাস সংরক্ষণে এমনকি 'অপ্রাপ্তবয়স্কদের আনবেন না' বিজ্ঞাপনেও এরা যত্নশীল ও নিঃসংকোচ! এবং বলতে দ্বিধা নেই, এমন একটি নেতিমূলক দৃষ্টির নাটকের সাথে একমত না হয়েও এর বিচক্ষণ, সৃষ্টিশীল, আশ্চর্য ও সহজিয়া প্রযোজনা কর্ম দেখে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়।—কি বিপুল আর কি প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও কল্পনা-কর্ম দিয়ে নির্দেশক অভিজেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রযোজনাকে উপস্থাপিত করেছেন। একটিমাত্র সেটে আলো

ও ধ্বনির পৃথক পৃথক এফেক্ট তৈরী করিয়ে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের আনাগোনার মাধ্যমে ভিন্নতর পরিবেশ স্থান কাল নির্দেশ করেছেন পরিচালক। তিনি বিশ্বাস করেছেন আইডিয়াই হচ্ছে প্রধান—তাই শিল্পকর্মে সর্বত্র প্রাধান্য দিয়েছেন আইডিয়াকে। সুন্দর শৈল্পিক অথচ ছন্দ ও নৃত্যবদ্ধ স্থাপত্যময় কম্পোজিশান ও সূক্ষ্ম ইঙ্গিতবাহী ট্রিটমেণ্টে তিনঘন্টার নাটকটি পূর্ণ শিল্পময়। পরাণের মৃত্যুর পর কৃত্রিম কান্নায় ভেঙ্গে পড়া অন্নপূর্ণা ও গ্রামবাসীর নীরবে আগমনের কম্পোজিশান ও শ্মশান যাত্রার ইঙ্গিত, অন্নর প্রতি নিতাইয়ের আসক্তির নিবিড় সংকেতের ছবি কিংবা অন্ন কর্তৃক ছুঁড়ে দেওয়া সদ্যোজাত আদুরীর সন্তান ও নিতাইয়ের লুফে নেওয়ার নাটকীয় ব্যঞ্জনা হতাশ নিতাইয়ের গলায় দড়ি দিতে যাওয়ার অসহায় প্রতিমূর্তি কিংবা বরযাত্রীদলের আগমন ও নিক্রমণ বা বরকর্তার মত্ত অবস্থায় গা টেপার কম্পোজিশান, শেষ পর্যায়ে নিতাইয়ের পরপারের কড়ি যাচ্ঞার আকৃতির গ্রুপিং কম্পোজিশন এবং সমস্ত চরিত্রের স্বগতঃ আত্মভাবনার প্রকাশ নাটকে চরিত্রকে ফ্রিজ করে নেপথ্যে মাইক্রোফোনে তার কণ্ঠ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে যে গতিবেগ ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়েছে—তার নিঃসর্ত একক গৌরবভাগী নির্দেশক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈজ্ঞানিক প্রথার অভিনয় ও প্রযোজনা কর্ম যে দর্শকের চোখে ও মনে কত সহজিয়া নিপুণ ভাবে ধরা দিতে পারে ও তথাকথিত নাটকীয়তা বিহীন নাটকীয়তা তৈরী করতে পারে—তা নির্দেশক নিজে ও তার প্রায় সব নতুন শিল্পীদের দিয়ে সেটা স্পষ্ট প্রমাণ করে দিয়েছেন। আর এতেই প্রমাণ হয় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় কত উঁচুস্তরের পরিচালক ও দক্ষ অভিনেতা। কত নিঃসংকোচ, কত আপোষহীন, কত কল্পনা প্রণালী ও কত নির্ভীক। প্রচলিত ফর্মকে তিনি কত সহজে ভাঙেন, রূপ দেন কত নতুন ফর্ম অভিজ্ঞ বিশ্বকর্মার হাতে। একটি মাত্র সেটে ছটি দৃশ্যে ছটি কল্পনার জগতে কত সহজভাবে তিনি নিয়ে যান। সন্ধ্যা দে-র মধ্য দিয়ে তিনি জীবন্ত করে তুলছেন আদুরীকে। আর মাতৃময়ীর মধ্য দিয়ে অভিনয়ের এক প্রচণ্ড সম্ভাবনা—শ্যামলী ঘোষকে। কণ্ঠের উচ্চারিত ধাতব প্রতিধ্বনি আর কান্নাজর্জরিত মূর্চ্ছনা বীণা মুখোপাধ্যায়কে অন্নপূর্ণার চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে একটু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে কিন্তু সন্ত্রক্রন্দমান বিবেকরূপী হাকিম গড়াইয়ের অনিন্দ্য কুণ্ড সবসময় সন্ততার তীক্ষ্ণ অনুভূতি আমাদের মননে প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে বাহবা পেতে বাধ্য, যেমন বাধ্য 'পরাণের' আশ্চর্য বিচিত্র চরিত্র সৃষ্টি ঘটিয়ে অফুরন্ত বাহবা পেতে রঞ্জিত চক্রবর্তী। কিশোরী সুস্মিতা মালাকারের 'সুনা'র সহজ অভিনয় আমাদের বিস্মিত করে। যেমন সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য করে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিতাই গড়াই। তার বিশাল দেহসৌষ্ঠব কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের চোখের নির্মল শান্তিকে ক্ষুণ্ণ করলেও তাঁর 'নিতাই'-রূপ কণ্ঠ মাধুর্য স্বর প্রয়োগের স্বাভাবিক উত্থান পতনে, অভিব্যক্তিতে চলনে—ভঙ্গীতে

নাট্যক্রিয়ায় আমাদের অভিভূত করে ফেলে, প্রেক্ষাগৃহের পরিমণ্ডল থেকে টেনে নিয়ে যায় অন্য জগতে—যেখানে আমাদের অনুভূতি কেমন তন্ময় হয়ে যায়—আর তখনই মনে হয় তিনি কতবড় শিল্পী—কতবড় তাঁর সৃষ্টি প্রতিভা, বাংলা মঞ্চে কত কিই না তিনি করতে পারেন।

কিন্তু তিনি কি 'পাপপুণ্য'ই করবেন? তথাকথিত কলামন্দিরের তথাকথিত জীবন সন্ধানের পুরোহিত হয়েই থাকবেন? তাঁর মধ্য দিয়ে কি আসবে না আজকের মানুষের জীবন্ত সত্তার কোন নির্ভীক পুরুষ? একদা গণনাট্যের কর্মী কি 'পাপপুণ্য' অনুসন্ধানেই ব্যস্ত থাকবেন?

চিত্তরঞ্জন দাস

এ সম্পর্কেও বিতর্ক কাম্য।—সম্পাদক।

রবীন্দ্রনাথের বদনাম : গন্ধর্বর বদনাম

অন্ধকার মঞ্চে এক জাঁদরেল পুলিশ অফিসারের মুণ্ডু আলোয় এসে ইংরেজ সরকারী মহলে কেজো লোক হিসাবে আপন সুনাম এবং দাপটের কথা সগর্বে ঘোষণা করল। আরও বলল যে, এবার তাঁর উপর বর্তেছে আরও একটা গুরু দায়িত্ব। কিন্তু এ দায়িত্বের দায়ভাগ কৌশলে আপন গৃহিনীর কাঁধে চালান করে দিতে চান তিনি। সন্দেহ সদু তাঁর প্রতিপক্ষের অন্যতম সাহায্যকারিণী। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে আপন কর্তব্যের বদনাম রুখতে তিনি বদ্ধপরিকর। দ্বিতীয় মূর্তি সৌদামিনীর। ভাগ্যদোষে পুলিশে অফিসারের গিন্নী হবার ক্ষেদ মেটাচ্ছেন বিপ্লবী অনিল মিত্রকে আশ্রয় দিয়ে—যে তাঁর স্বামীর এই মুহূর্তের চোখের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে। দামাল ছেলেদের সামাল দেবার দায়িত্ব নিয়েছেন সৌদামিনী। এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে বদনাম। বদনাম নাটকে পুলিশ অফিসার যুগপৎ বদনামের ভাগীদার হলেন এবং কাঁটা দিয়ে কাঁটাও তুললেন। আর তাঁর স্ত্রী সদু স্বামীর দেওয়া দায়িত্ব পালন করেই দামাল বিপ্লবী অনিলকে সামাল দিয়েছেন। বিপ্লবী অনিল জাঁদরেল বিজয় চৌধুরীর হাত থেকে পালাল। প্রশাসনের কাছে চৌধুরী সাহেবের মাথা হেঁট। এটা তো বুঝলাম। কিন্তু কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা হলো কি করে! উত্তর, এই জায়গায় বিজয় চৌধুরীর মুখোশ খুলে যায়। প্রকাশ পায় অন্তর্বাহিত তাঁর বিপ্লব সচেতন মন। একজন পুলিশ অফিসারের প্রকাশ্য বিদ্রোহ অপেক্ষা পদে থেকে প্রশাসনকে কাহিল করা আরও বেশি ফলপ্রদ। তাই বিজয়বাবু বিপ্লবী অনিল মিত্র সম্পর্কিত দায়দায়িত্ব স্ত্রীর ঘাড়ে চাপিয়ে খবর আদায় করার ছলে তাঁর মমতাময়ী সদুকে সরকারী খবর সম্বন্ধে বারংবার সচেতন করেছেন। আর স্নেহময়ী সৌদামিনী সেইমত সামাল দিয়েছেন তাঁর

প্রিয় দামাল ভাই বিপ্লবী অনিলকে। ঘরছাড়া বিপ্লবীকে দিয়েছেন ঘরের ছায়া।
ফলে অত্যাচারীর মুষ্টি বদ্ধ হতে পারে নি।
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত নাট্যরূপে গন্ধর্ব প্রযোজনা বদনাম, আমাদেরই লোক রবীন্দ্রনাথের শেষ ছোটগল্প বদনাম অবলম্বনে। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষতা এবং আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের দামামা ধ্বনিতে ফ্যাসীবাদের নগ্নরূপে আতঙ্কিত বিশ্বকবি তাঁর বর্তমান রচনায় কৌশল-যুদ্ধের যে আভাস দিয়ে গেছেন সে সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন করার দায়িত্ব নিয়েছেন গন্ধর্ব। সময় জরুরী অবস্থা। রবীন্দ্র ভাবনার সময়োপযোগী সম্মান দিয়েছেন গন্ধর্ব তাঁদের বদনাম উপস্থাপনায়। জরুরী অবস্থাকালে মুক্তিসূর্যের বদ্ধমুষ্টিতে আবদ্ধ ভারতাত্মাকে মুক্ত করতে প্রশাসন যান্ত্রিকদের প্রতি বিজয় চৌধুরীর ইশারাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন গন্ধর্ব। এঁরা তাই সমগ্র গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন মানুষের কাছে ধন্যবাদার্হ।
নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণে প্রথম ভাবনায় পুলিশ অফিসার বিজয় চৌধুরী তাঁর কেজো লোকের দাপট সর্বতোভাবে প্রকাশ করা সত্বেও যখন বিপ্লবী অনিলকে ধরতে পারেন না তখন আমাদের সামনে তাঁর যে চরিত্রটা ফুটে ওঠে তা হলো ক্লৈব্য। মঞ্চে তাঁর কর্মকাণ্ড শেষতক্ এতই হাসির খোরাক বহন করে যে বিজয় চৌধুরীর অন্তর্বহা বিপ্লব সচেতনতা, নির্দিষ্ট কয়েকটি কথা এবং ভাবে বাহিত, তা প্রচণ্ড ঝড়ে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের মতোই উড়ে যায়। কোন দাগ কাটে না। আবার এই হাসির স্রোত দীর্ঘবহা বলে এক এক জায়গায় হাসির বদলে আসে বিরক্তি। এ বিষয়ে নাট্যকার এবং নির্দেশক উভয়েরই চিন্তায় ভারসাম্যবোধের একান্ত অভাব। খুব সচেতনভাবে নাটকটা অনুধাবন করলে তবেই এনাটকের সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।
চৌধুরী গিন্নীর সর্বত্রই একই যুক্তি—স্নেহ-ভালবাসা মায়া মমতা। ভাই বিপ্লবী, সেটা তাঁর গৌরব। পুলিশ অফিসার তাঁর কাছে হেরে যান সেটাও তাঁর কাছে সমান গৌরব। এই একটা জায়গাতেই তাঁর একটা অন্যরূপ পাওয়া যায়। কারণ, চৌধুরী মশাই ইংরেজদের গোলামি করেও স্ত্রীর কাছে নতি স্বীকারের মাধ্যমে ইংরেজ বিরোধিতা করে। আর তাতেই সৌদামিনীর স্নেহ ভালবাসা আরও রূপ পায়। 'বিপ্লবীদের ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু নেই'—এটা তিনি মানেন না। তিনি স্বামীপুত্র আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে দিয়ে দেশকে ভালবাসতে চান। এও তাঁর মধ্য ভালবাসা-মমতার প্রকাশ। আর অনিল মিত্র মোক্ষম কথাটাই ফাঁস করে দিয়েছিল প্রায়। বোকার মত এই প্রিয়জনের কাছে প্রশ্ন রেখেছিল, 'সত্যি করে বলো তো, আমি না হয়ে অন্য কেউ হলে তুমি কি ঠিক এই রকম চিন্তা করতে?' অথবা, 'তোমার উৎকণ্ঠা কি শুধু অনিল ডাকাতের জন্য না, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যে কোন ডাকাতের জন্যেই'?—সদু কিন্তু এর উত্তরটা এড়িয়ে গিয়েছিলেন।

প্রকাশ্য বিপ্লবী অনিল তাঁর কর্মকাণ্ড নেপথ্যে রেখেছেন। মঞ্চে এসেছেন ঐ নেপথ্যকৃত কর্মের প্রমাণ রাখতে সব্যসাচী হয়ে। আমার মনে হয় পুলিশ অফিসার আর সৌদামিনীকে প্রতিষ্ঠা দিতেই এঁর আগমন। এবং তা যথাযথ রূপায়িত। কখনো সেই বিপ্লবীর ধুতিশার্ট খোঁচাখোঁচা দাড়ি, কাঁধে ব্যাগ চিরাচরিত রূপে, কখনো সাহেব অফিসার কখনো বা সাধুরূপে এঁর প্রবেশ। চিন্তায় এখানে নির্দেশকের হাতের কাজ বোঝা যায়। সাহেবের মুখে বাধো বাধো—ভাঙা হিন্দি মেশা নয়—পরিষ্কার বাংলা বুলি সেই মান্ধাতা আমলের সাহেবের বাঙলা বলা থেকে মুক্তি দেয়। এখানে পরিচালকের ভাবনা বেশ সুচিন্তিত। কিন্তু অনিলের আফগানিস্তান যাত্রার হঠাৎ ঘোষণা কেমন প্রস্তুতি বিহীন মনে হয়। বিপ্লবী বলেই হয়তো!

সাব ইন্সপেক্টর বিরাজ বশংবদ লোক। নিজের উন্নতিই ওঁর একমাত্র লক্ষ্য। এর জন্য উনি বিপ্লবীদের পিটিয়েও মারতে পারেন। পারেন তাদের ঘর পুড়িয়ে দিতে। উন্নতির জন্য ঠিক সময় মতো উপরওয়ালাকে ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল-এর মন্ত্রণা দিতেও যেমন পারেন—তেমনই বস-কে দেখে ডিগবাজী খেতেও পারেন—উপরওয়ালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য। পরিষ্কার চরিত্র। এঁদের সম্বন্ধে সাবধান হওয়া দরকার।

গিরীশ। আরেক দারোগা। নিতান্তই মধ্যবিত্ত লোক। উলুখড় জাতীয়। ইনি ঘরপোড়া গরু। তাই সাধু সন্ন্যাসীতে গদগদ। এঁদের প্রতি সচেতন হয়ে মেরুদণ্ডে জোর আনবার ভাবনা মাথায় ঢোকাতে হবে।

নিতাই। ব্রিটিশদের চর! সন্দেহ হয় বিজয়বাবুর ব্যাকিংয়ে নিতাই চাকরি পেয়ে ছিল বলে।

বাকি রইল ছেদীলাল। এ ফ্যাসীবাদের নগ্ন অত্যাচারের সাক্ষী। এঁরা গণমানসের চেতনা স্বরূপ।

অভিনয় ক্ষেত্রে গন্ধর্বর শিল্পীবৃন্দ শক্তিমান। সে শক্তির প্রকাশও তারা ঘটিয়েছেন কিন্তু সব চরিত্রের প্রতি নির্দেশকের ভাবনা সর্বদা যুক্তিযুক্ত নয় বলে কোন কোন অভিনেতা কোন কোন জায়গায় ছলকে উঠেছেন, পূর্বাপর চারিত্রিক সঙ্গতি রক্ষা না করে। বেশ বোঝা যায় এইসব দক্ষ নটেরা এখানে অসহায়, নির্দেশকের ইচ্ছার ক্রীড়নক। এ নাটকে কয়েকটা লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে:

১. নাটকের মঞ্চসজ্জা। পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় কৃত এ মঞ্চ পরিকল্পনা রঙ তুলির নিজস্বতায় কাব্যিক। মঞ্চ দেখে প্রথমেই মনে হয় এটা রবীন্দ্র নাটক।

২. এ নাটক আবহ-সুরহীন। পরিচালকের মুন্সিয়ানার পরিচয় এখানেই অধিক মেলে। তিনি এ নাটকের গতিময়তা শেষতক অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তাই সুর ছাড়াই বদনাম সুরেলা।

৩. ধূপ ধুনো দেওয়া আলমারীর কাঁচ ভেঙে গন্ধর্ব রবীন্দ্রনাথকে বার করে

এনেছেন। শীতল পাটিতে বসতে দিয়েছেন। আর খেতে দিয়েছেন গুড় মুড়ি। কালিঝুলি মাখা, ক্লান্ত, অফিস ফেরৎ, হাঁটু অবধি কাদা মাখা সব লোকেই ঐ একই জায়গায় বসে ঐ একই খাবার খাচ্ছে। পরিবেশক গন্ধর্ব। এই প্রথম রবীন্দ্ররচনা—যা তথাকথিত ঢুলু ঢুলু রবীন্দ্র ভাবনার দরজা ভেঙে আমাদের লোককে আমাদের মধ্যে এনে দিয়েছে।

বসন্ত রায়

কুম্ভকর্ণের ঘুম : অযান্ত্রিক (চিত্তরঞ্জন)

সম্প্রতি মফঃস্বলের একাঙ্ক নাটকে বেশির ভাগ সময়ই চরিত্র বলে কিছু দেখা যায় না, দেখা যায় একটি সংঘাত। আর যদি নাটক খুব ভাল হয়ে উঠল তা এই সংঘাটিতকেই দেখান হয় শিল্পসম্মত করে। সংঘাতটি হলো প্রায়শঃ যুযুধান শোষক ও শোষিত শ্রেণীর। কিন্তু চরিত্র? লড়াইয়ের প্রান্তরে যুদ্ধরত দুই পক্ষের সবাই যার যার শিবিরের সৈনিকের মত এক আদলের এক আদপের—কাজ কথা হাসিকান্না রণহুঙ্কার—সবই দুই দলের দুই ছকে বাঁধা। ফলে কোন পক্ষের কোন চরিত্রই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে না, যন্ত্রমানবের কত আচরণ করে মাত্র। কেউ বলবেন নাটক যখন শ্রেণী সংগ্রামকেই বিধৃত করার উদ্দেশ্য নিয়ে, চারিত্রিক ভালমন্দের কিংবা ব্যক্তি সংঘাতের আবাহন বাহুল্য। কিন্তু যদি আমরা একটু সতর্কভাবে লক্ষ্য করি তবে দেখব ওটা বাহুল্য নয়। শ্রেণীসংগ্রামে শুধু শ্রেণীচরিত্র নয়, ব্যক্তিচরিত্রও কাজ করে সমানভাবেই। তাই একাঙ্ক নাটকে যতই বক্তব্যকে দ্রুত সুস্পষ্ট ভাবে বলার চেষ্টা করা হোক না কেন, যুযুধান দুই পক্ষের শ্রেণী-চরিত্রের সঙ্গে ব্যক্তি-চরিত্র চিত্রণেরও প্রয়োজন রয়েছে। এটা অনেক নাট্যকার ভুলে যান বলেই অনেক নাটক শ্রেণীসংগ্রামের একঘেয়ে রণহুঙ্কার বলে দর্শকদের প্রায়শঃ ক্লান্ত করে, নাটক সম্বন্ধে অনীহা সৃষ্টি করে। এ সবের বিরল ব্যতিক্রমের মধ্যে অযান্ত্রিক সংস্থা (চিত্তরঞ্জন) প্রযোজিত 'কুম্ভকর্ণের ঘুম' একটি। উল্লেখযোগ্য নাট্য প্রয়াসে নাট্যকার বংশী মুখোপাধ্যায় তাঁর এই একাঙ্কে নতুন কোন বক্তব্য না বললেও বলার ধরণে নিঃসন্দেহে ক্লিশে থেকে মুক্তি এনে দেন।

এ নাটকে মহাজনের ঘৃণ্য শোষণের রূপ আছে, অসহায় অজ্ঞ শোষিত মানুষের নিদ্রাভঙ্গের লক্ষণ আছে, কিন্তু যা বেশ শিল্পিত চেহারায় আছে তা হলো এক নাটকের মহড়া ও রাখুর চৌকিদারী প্রাপ্তি উপলক্ষ্য করে কতগুলি থ্রি-ডাইমেনশনাল চরিত্রের সমাবেশ। রাখু (সুনীল ভট্টাচার্য) বাতাসী (রীতা চক্রবর্তী) চরিত্র দুটি স্বাভাবিকতায় আমাদের বিশ্বাস অর্জন করে নেয় সহজেই। অন্যান্য চরিত্রগুলিতেও নিষ্ঠার সঙ্গে অভিনয় করে অযাত্রিকের শিল্পীরা তাদের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

একটা সহজ গল্প সুন্দরভাবে এগিয়ে গেছে। মহাজনের গ্রাসে সব খুইয়ে নিঃস্ব রাখু। সেই রাখুর বাড়িতে বসে সখের যাত্রাদলের মহড়া। স্ত্রী বাতাসী হরণের কল্পনাকে মনে রেখে রাখু অভিনয় করে রামের ভূমিকায়। সীতা হরণের রুদ্ধ-বেদনা তার মত আর কেউ ফুটিয়ে তুলতে পারে না। তাই যোগ্য লোককেই যোগ্য ভূমিকা দেওয়া হয়। কিন্তু গাঁয়ে মোড়ল থাকলেই দল চাই; মোড়লেরই স্বার্থে। তাই যাত্রাদলে দলবাজি চলে, আর মোড়লের আত্মীয় অযোগ্য নিতাইকেও লক্ষ্মণের ভূমিকা দিতে হয়।

গাঁয়ের চৌকিদারের চাকরিটা মোড়লের হাতে। রাখু মনে অনেক আশা পোষণ করলেও, সামান্য ভরসাও পায় না। 'মোড়ল দেবে চাকরি, তাও বিনি পয়সায় দেবে!' কিন্তু কি আশ্চর্য পয়সা ছাড়াই রাখুকে চাকরি দেয় মোড়ল। সরল বিশ্বাসে, মোড়লের ভালমানুষীতে মুগ্ধ হয় রাখু, বাতাসী কৃতজ্ঞতায় আনত হয়। 'কিন্তু ভাল মনে থাকার যুগ না এটা, লুটে পুটে খাবার যুগ'— এটাই রাখু বেশি করে বোঝে, যখন ধান চাল পাচারকারী গাড়ি ছেড়ে দিতে হয় মোড়লেরই পরোক্ষ নির্দেশে, যদিও সে ভেবেছিল গাঁয়ের সকলকে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে দেওয়ার দায়িত্ব তারই ঘাড়ে। 'কি দিন পড়ল, কে চোর কে সাধু বোঝা দায়' এবার চরম উপলব্ধিতে পৌঁছালো রাখু যখন তার বাতাসীকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে বলাৎকার করল মোড়ল। না সীতার মত বাতাসীকে কোন প্রত্যাখ্যান বা অগ্নিপরীক্ষার অপমানে অপমানিত করল না রাখু। বাতাসীকে ছুঁয়ে সমব্যথীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে শোষকের অত্যাচারের কদর্যতা বুঝতে পারলে রাখু। ওদিকে রাস্তায় তখন নকল নির্বাচনে মোড়লের জয়লাভের মত্ত উৎসব চলছে।

কিন্তু শুধু আর্ত উপলব্ধি নয়, শেষ দৃশ্যে এই সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে সকলের সংঘবদ্ধ দৃঢ় প্রতিরোধের আভাস দিয়ে যবনিকা টানলে বোধ হয় দর্শকমনে অত্যাচারীদের প্রতি শোষিত মানুষের তীব্র ঘৃণার আগুনটি জ্বালানো যেত। নাটকটি সফল করার সযত্ন চেষ্টা করেছেন পরিচালক অভিনেতা সুনীল ভট্টাচার্য। বংশী মুখোপাধ্যায়ের কলমের ভাষাকে মঞ্চের ভাষায় মুখর করতে অযাত্রিকের সব কলাকুশলীরাই সমান যত্নবান—একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

নানা হে: প্রান্তিক (বহরমপুর)

কোন আমদানি করা বস্তুর বাসি গন্ধ নয়, সদ্যতোলা মাটির গন্ধ মাখা বস্তুর মত মফঃস্বলের কিছু নাটক আমাদের কাছে এক অনাস্বাদিত রসোপকরণ। এ নাটক যারা লেখেন তারা আক্ষরিক অর্থেই মাটির কাছাকাছি, কৃষাণের জীবনের শরিক। আর যারা এ নাটক করেন তারাও মফঃস্বলের মানুষ। প্রকৃতি পরিবেশ অলক্ষ্যে মানুষের আকৃতিতে এমন এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আরোপ করে যে, গ্রামীণ চরিত্রে ঐ সব অভিনেতৃবর্গ যখন অভিনয় করেন তখন চাল-চলনে তাদের অকৃত্রিম গ্রামের মানুষ বলেই মনে হয় কৃত্রিম রঙচঙ ছাড়াই; অনাবশ্যক মনে হয় রূপশিল্পীর কারিগরী।

এত কথা বলতে হলো বহরমপুর প্রান্তিক প্রযোজিত দিব্যেশ লাহিড়ীর নাটক নানা হে সম্পর্কে। নতুন আঙ্গিকের এই নাটকের প্রথম দিকটা দেখতে দেখতে মনে হয় সত্যিকারের 'গম্ভীরা' গানের আসরে বসে মূল গায়েন জগামাস্টার (তন্ময় সান্যাল) এবং তার সহযোগীদের আঞ্চলিক ভাষার বিচিত্র সুর-তালের গান শুনছি, নানা ভঙ্গিমার স্বচ্ছন্দ নাচ দেখছি। সঙ্গে সুদক্ষ সহযোগিতা করে চলেছে আসরের ও প্রান্তে বসে থাকা একদল বাদক।

ধূপ জালিয়ে আসরের ধূলো মাথায় নিয়ে গায়কেরা শুরু করে গান—নানার (শিব) কাছে অভিমানমিশ্র ক্ষোভ—'কী সুখেতে রাইখ্যাছো নানা!' এর পরই আরম্ভ হয় কথায় গানে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ বাণ—সমাজের নানা আদর্শভ্রষ্টদের উদ্দেশে। 'এ তোর ইস্কুলের মাস্টার নয় যে যা খুশি তাই বলবি।' 'কলকাতার বি. এস. সি.—খুব তেজী মাল অনেক চেয়ার টেবিল ভেঙেছে।' দেশনেতার ভূমিকা নিয়ে মূল গায়েন যুবদের উদ্দেশ্য করে বলে: 'তোমাদের সেবার লেগ্যে মদের দোকান ২৪ ঘণ্টা খোলা।' তীক্ষ্ণ শ্লেষ এবং সামান্য আভাস ইঙ্গিত বা সাজে-শানের প্রয়োগে মুহূর্তে রচিত হয় দুঃসহ কতকগুলি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং তাদের কদর্য স্বরূপ। দর্শকমণ্ডলী সম্ভোগ করে গম্ভীরা গানের মেজাজ।

কিন্তু গম্ভীরা গান নয়, আমরা তো দেখতে বসেছি নাটক। নানা হে-র পরবর্তী অংশে দিব্যেশবাবু আমাদের সেই আশা পূরণ করেছেন। আমরা এই অংশে দেখতে পেলাম দরিদ্র গায়কদের আর্তজীবনের ইতিবৃত্ত ও বর্তমান। আর সেই সঙ্গে অর্থ ও প্রতিষ্ঠার প্রলোভন পরিত্যাগ করে দারিদ্র্যের পীড়ন ও শাসকশ্রেণীর অত্যাচারের মুখেও আদর্শনিষ্ঠ থাকার সংকল্পে অটল জগামাস্টারের প্রেরণাদায়ী দৃষ্টান্ত। এমন সব গণশিল্পীদের তো অবাধে কাজ করতে দেওয়া যায় না। তাই এদের ওপরে নেমে আসে পুলিশ ও পুলিশের পক্ষপুটাশ্রিত মাস্তানদের জুলুম-অত্যাচার। সোচ্চার প্রতিবাদ করে শিল্পীরা: 'গায়ে হাত দেবে না,

আমরা কারো গোলাম নই।' অব্যাহত অত্যাচারেও দমে না শিল্পীরা—'লাঠিই মারুক আর খাতাই ছিঁড়ুক গান আমাদের বন্ধ হবে না।' 'যত অত্যাচার বাড়ছে গান তত জোরদার হবে।' যেন আমাদের প্রত্যেকের অন্তরের নানাকে আশ্বাস দেয় 'আমরাই তোমার ডমরু হয়ে মানুষের ঘুম ভাঙাবো।' কিন্তু তার জন্য চাই সমবেত প্রয়াস, শুধু শিল্পীরা কী করতে পারে অত্যাচারের মুখে 'আসরের সবাই যদি যায়' তবে সার্থক প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়, দমন করা যায় শিল্পীর ওপর শাসকশ্রেণীর হামলাবাজি। কিন্তু আশু দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে গণশিল্পীরাই শেষে এক জোট হয়ে এগিয়ে আসে—অত্যাচারী শাসকের প্রতিভূ পুলিশ মাস্তানকে পেরে ফেলে।

নাটকে ডাইনীর অংশটি সুপ্রযুক্ত মনে হয় না; জগামাস্টারের বিরুদ্ধে অন্যান্যদের অভিযোগ উষ্মাও কিছু বেশি দীর্ঘ। তবু চমৎকার প্রযোজনা নানা হে। তন্ময় সান্যালের জগামাস্টার ও প্রদীপ ভট্টাচার্যের মণ্টু, আবেগবাহিত দুটি জীবন্ত চরিত্র। অন্যান্য শিল্পীরাও সমান তালে চলে নির্দেশক অঞ্জন বিশ্বাসের সযত্ন প্রয়াসকে বাস্তবায়িত করতে সহায়তা করেছেন। প্রারম্ভিক এই সঙ্গীত সমৃদ্ধ শ্লেষাত্মক নাটক গণ-চেতনা উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে ৭৭-৭৮র মফঃস্বলের গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনে নিঃসন্দেহে একটি বলিষ্ঠ অবদান।

স্বপন দাস

প্রতিযোগিতা মঞ্চের নাটক

একক প্রতিভার দান কাব্য ও কথাসাহিত্য এবং সেগুলি প্রায়শঃই পাঠকের নিভৃত উপভোগের বস্তু। কিন্তু একই সঙ্গে নাট্যকার, অভিনয় শিল্পী, কলাকুশলী ও দর্শকমণ্ডলীর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সম্মিলন ঘটিয়ে নাট্যকলা হয়ে ওঠে সমাজের এক জীবন্ত সাংস্কৃতিক প্রয়াস। সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে সমাজজীবনে নাট্যকলার প্রভাব যেমন ব্যাপক তেমনই গভীর। গত দু তিন দশক ধরে বাংলায় নাট্যসাহিত্য ও নাট্যসংস্থার সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। এ যেমন আশার কথা, এই সঙ্গে উৎকণ্ঠার কারণও ঘটছে। নাট্যসাহিত্যের মর্যাদা বা নিষ্ঠাবান গ্রুপ থিয়েটারের সাধনা—এ দুয়ের কোনটিই যে নাটক পায় নি তার সম্বন্ধে বলার কিছু নেই—নাট্যকলা-সভার বাইরেই তার জন্ম-মৃত্যু। কিন্তু ভাল নাট্যসাহিত্যও যখন নাট্যশালা খুঁজে পায় না, অথচ কতগুলি ভারহীন বিষয়-গর্ভ নাটক ভ্রষ্টাচারী নাটক-কারবারীদের মঞ্চকারিগরী ও অভিনয় দক্ষতার চমক লাগিয়ে নীলবর্ণ শৃগাল সেজে নাট্যশালা জাঁকিয়ে বসে থাকে, তখন সেটা অভ্যন্ত

উদ্বেগের কারণ হয়। যেহেতু এভাবেই, শুধু যে দুর্বল হাতের অপরিণত রচনা প্রশ্রয় পায় তা নয়, কখনও নগ্নভাবে, কখনও বা সুচতুর কৌশলে অপসংস্কৃতি ও প্রতিক্রিয়ার বিষ ছড়ান হয়।

অর্থ অর্জন বা অবসর যাপন নয়, প্রগতিবাদী বক্তব্য প্রকাশের তাড়নায় যে অসংখ্য ছোট ছোট নাট্যসংস্থা গড়ে উঠেছে, একাঙ্ক নাটককে তারা তাদের শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে এবং এদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে বহুসংস্থা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে। কিন্তু সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে এখানেও এমন কিছু নাটক ময়ূর-পুচ্ছ লাগিয়ে প্রবেশ করছে, যেগুলি দুর্বল লেখকদের কাঁচা হাতের বিভ্রান্তি, না প্রতিক্রিয়া প্রচারকদের সন্তর্পণ অনুপ্রবেশ এটাই এখনও স্পষ্ট নয়। কিন্তু ব্যাপার যাই হোক এ ধরনের নাটক নিন্দনীয়। সঙ্গে সঙ্গে ভাল নাটককে প্রশংসায় উৎসাহিত করার প্রয়োজন আছে।

গত ৫ই থেকে ২১ শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কাঁচরাপাড়া হাইওমার্স ইন্‌স্টিটিউটের উদ্যোগে তাদের রঙ্গমঞ্চে যে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা হয়ে গেল তাতে মোট একত্রিশটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি নাটক ছিল প্রগতি বাদী ও উচ্চাঙ্গের। কয়েকটি ছিল নিতান্তই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির, যেগুলি দর্শক মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। সেগুলি সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে সামাজিক তাৎপর্যপূর্ণ কতকগুলি প্রযোজনার বক্তব্য ও কারুকর্ম নিয়ে এখানে আলোচনা করছি।

ক্রান্তিকাল : সমবেত সওয়াল জবাব

নভেন্দু সেনের 'সমবেত সওয়াল জবাব' উপস্থাপন করলেন সোদপুরের ক্রান্তি-কাল। অ-নাটকীয় ফর্মে প্রযোজিত হলেও এ নাটকের বক্তব্য স্পষ্ট। পুঁজিপতি সম্প্রদায় ভোগকারীদের দুর্বলতার সুযোগে চোরা কৌশলে কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করে নিজেদের পণ্যের বাজার সৃষ্টি করে। দুষ্ট শাসন যন্ত্র আর দুর্বল মানুষকে যে কীভাবে তারা কাজে লাগায়, তা সিরিও-কমিক পদ্ধতিতে দেখানো হয়েছে। নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখানো হয়েছে দুর্বল জনতা অবশেষে শোষক শ্রেণী এবং তাদের শাসনযন্ত্রের ক্লেদাক্ত স্বরূপ ধরতে পেরে রুখে দাঁড়িয়েছে—আর বারবার নিপীড়নের মুখে ধ্বংস হতে হতেও শেষ পর্যন্ত তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে শোষক এবং তার শাসনযন্ত্রের সমবেত সওয়াল জবাব দিয়েছে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে। প্রযোজনার কারুকর্ম নির্দেশক নভেন্দু সেনের মৌলিক থিয়েটার ভাবনার পরিচয় বহন করে। ক্রান্তিকালের অভিনেতৃবর্গও মূল নাট্যদ্বন্দ্বের গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছেন অভিনয়ের স্বচ্ছন্দ গতিবেগে। সমগ্র প্রযোজনার মধ্যে একটি প্রসঙ্গেই আমরা নির্দেশকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো—সেটি হলো আঞ্চলিক ভাষার অ্যাকসেন্টগুলি স্বর প্রক্ষেপণের ত্রুটির জন্য অনেক সময়েই সংলাপের শ্রুতিগ্রাহ্যতাকে নষ্ট করেছে

—ভাঙা মানুষের পারস্পরিক বিবাদের সময়েই এই ত্রুটি ধরা পড়েছে।

ইলা স্মৃতি সংঘ : ক্রীতদাস

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দায়িত্ববোধের প্রেরণায় রচিত হয়েছে রতন ঘোষের 'ক্রীতদাস' একাঙ্কটি। আর সে দায়িত্ব হলো অপসংস্কৃতি দূর করা। আপাত প্রগতিশীল নাটকও কেমন করে চতুর বিজনেস ম্যাগনেটের নির্দেশে মোড় নিয়ে অপসংস্কৃতির আবর্জনা হতে পারে, শুধুমাত্র বক্স অফিসে ভরিয়ে হাজার রজনী চলতে পারে তার ইঙ্গিত যেমন নাট্যকার দিয়েছেন, তেমনি ইঙ্গিত দিয়েছেন কেমন করে নাট্যশিল্পীদের তা প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসতে হবে—সঙ্গে নিতে হবে দর্শক সাধারণকেও। কাজের কাটারিতে শিল্পের নক্‌শা না থাকাটা নিন্দনীয় নয়। তাই ক্রীতদাস নাটকেও শিল্পসৌষ্ঠব গড়ে উঠেছে কমই। তবে যারা এ নাটক মঞ্চে উপস্থাপনা করলেন সেই ইলা স্মৃতি সংঘের (গয়েশপুর) শিল্পীরা—অভিনয়, নির্দেশনা, আলো, সংগীতে আরও মুন্সিয়ানা দেখাতে পারলে এ নাটক রসোত্তীর্ণ হতে পারত বিশেষতঃ দর্শকগণ যখন অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে বক্তব্য শুনতে চাইছেন। নির্দেশক ভূপাল বক্‌সীর ক্ষমতা আছে, কল্পনা আছে, নিজস্ব অভিনয়ে ফেসিয়াল এক্‌সপ্রেশন আছে—এমন কি কণ্ঠস্বরে মড্যু-লেশনও আছে কিন্তু যেটা নেই সেটা হলো উচ্চারণের স্পষ্টতা। এ বিষয়ে তাঁকে সতর্ক হতে অনুরোধ করি, শুধু তাঁর নিজের ক্ষেত্রে নয়, দলের অন্যান্য শিল্পীদের ক্ষেত্রেও।

আঙ্গিক : সমবেত সওয়াল জবাব

উদ্দেশ্যধর্মী একাঙ্ক নাটকগুলো, আজকাল যা প্রগতিবাদী নাট্য আন্দোলনে জোয়ারের মত আসছে, তা এতবেশি সোচ্চার কিম্বা জটিল হয়ে উঠছে অনেক সময়ই, যাকে নিন্দুকেরা 'মঞ্চে শ্লোগানের দাপাদাপি' নয়ত 'কিম্ভূত' বলে নিন্দা করেন। নিন্দুকদের উল্টে নিন্দা করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। শিল্পকর্ম যাদের কাছে উপস্থাপন করা হয় তাদের ভাবিয়ে তোলা এবং মূল বক্তব্যের দিকে পথ নির্দেশ করা শিল্পের আদর্শ—জোরজবরদস্তি ঠেলে দেওয়া নয়। মানুষের মন এমনই চতুর সংবেদনশীল যে বোঝালে বোঝে, জোর করলে বেঁকে বসে। ভাল শিল্প কর্ম এসব সর্তের দিকে লক্ষ্য রেখেই রচিত হয়। নাট্যকার জ্যোৎস্নাময় ঘোষ তাঁর নাটক 'সত্তর দশক' রচনাকালে নিশ্চয়ই এসব কিছু মনে রেখেছিলেম। বিপ্লবী মারা গেলেও 'বিপ্লব যায় না', বিপ্লবকে এগিয়ে দিতে হয় 'বিপ্লব আসে' এই সোজা কথাটা বেশ পরিশীলিতভাবেই কোনরকম রাজনৈতিক শ্লোগান না রেখেই নাট্যকার বলতে পেরেছেন, তাঁর নাটক 'সত্তর দশক'-এ। নাটক মঞ্চস্থ করলেন কাঁচরাপাড়ার আঙ্গিক নাট্যসংস্থা। এক বিপ্লবীর মৃত্যু বার্ষিকীর সন্ধ্যায়

শান্তসমাহিত মেজাজটি ধরে রেখে অভিনেতারা মূল কথাটি বলে দিতে পেরেছেন। তবে এ মেজাজটি বিঘ্নিত হয়েছে কিছুটা সাধারণ আলো নিভিয়ে স্পট লাইটে অভিনয় দেখানোর চেষ্টায়। স্থির আলোতেও উচ্চাঙ্গের অভিনয় অসম্ভব নয়। মধু মজুমদার ভালই করলেন অধ্যাপকের ভূমিকায়, কিন্তু বয়সের ভার আনতে ব্যর্থ হলেন। কাজল সুরের 'বিপ্লব' প্রথমদিকটায় সহজ চমৎকার কিন্তু শেষদিকের উত্তেজিত মুহূর্তগুলিকে ধরে রাখতে পারল না। আবহ সংগীতাংশ ভাল। নাট্যাভিনয়ের ত্রুটিগুলো সংশোধনযোগ্য কিন্তু বড় কথা, ভাল নাটকের সফল মঞ্চপ্রয়াস অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

যান্ত্রিক : বাতাসে বারুদের গন্ধ

নৈহাটির যান্ত্রিক তাদের এতদিন ধরে গড়ে তোলা ঐতিহ্যের মর্যাদা রেখেছেন রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের বলিষ্ঠ বাস্তবধর্মী নাটক 'বাতাসে বারুদের গন্ধ' মঞ্চস্থ করে। নাটকটি প্রচার মুখর হয়েছে শেষদিকে। কিন্তু তা ঢাকাচাপা দেওয়ার বিশ্রী প্রয়াস নেই। রাতারাতি পুলিশ কর্তৃক দশটি যুবকের হত্যাকাণ্ড নিয়ে এই কাহিনী। নাটকের প্রারম্ভে অনেকটা সময় ধরে ঘটনার সঙ্গে দর্শকদের জড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা বেশ সফল হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের এবং এর করুণ আবেদনের সঙ্গে মুক্তধারার যন্ত্ররাজের বাঁধের কাছে হারিয়ে যাওয়া সুমনের, এবং অম্বার (সে যে সকল যুগের মা) আর্তরোদনের অভেদ প্রতিষ্ঠা করায় নাটকের ডাইমেনশেন অনেক বেড়ে গিয়েছে। অভিনেতারা নাটকটি পরিচ্ছন্ন পরিবেশনে তৎপর ছিলেন এবং সফলও হয়েছেন।

রক্তকরবী নাট্যসংস্থা : সময়ের স্রোত

অমল রায়ের নাটক 'সময়ের স্রোত' কি করে ইতিহাস কিম্বা মহাকাব্যের সত্য ব্যাখ্যা খুঁজতে হয়, কি ভাবে অলিখিত অনেক সিদ্ধান্তে আসতে হয় সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছিল। বিহারে এক গ্রামে এবং দিল্লীতে হরিজন নিগ্রহের ঘটনা যে শুধু এ যুগের বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন এক অন্ধ সম্প্রদায়িকতার দৃষ্টান্ত নয়। এটা শোষক ও সমাজে সুবিধাভোগী শ্রেণীর শোষিত শ্রেণীকে পীড়নের—এক কথায় শ্রেণী সংঘর্ষেরই ধারাবাহিক ইতিবৃত্তে গ্রথিত একটি ঘটনা। মহাকাব্যে রামকর্তৃক শূদ্রনেতা শম্বুকের হত্যার ঘটনাকে ভিত্তি করে নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন বিভিন্নযুগে শ্রেণী সংঘর্ষের অভিন্নতা। একটা নাটকের মহড়ার মধ্য দিয়ে একটি ইতিহাস গতিশীল হয়েছে। আর আমাদের সুপ্তসত্তায় ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, এসব ঘটনা, ভুলে যাও কি করে। বাস্তব জগতে ফিরে আসার জন্য মাঝে মাঝে রূপকের কাহিনী থেকে নাটকের ঘটনায় ফিরে আসা চমৎকার শিল্পসম্মত। প্রযোজক খড়দহের রক্তকরবী নাট্যসংস্থার সব অভিনেতারাই ভাল অভিনয়

করেছেন। কিন্তু যিনি সবচেয়ে বেশি দীপ্তি পাচ্ছিলেন, তিনি শম্বুকবেশী চান্থ মিত্র। উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠ সম্পদ, বলিষ্ঠ চেহারা, দৃপ্ত ভঙ্গিমা, অমিত্রাক্ষর ছন্দের নিখুঁত উচ্চারণ ও নিয়ন্ত্রিত স্বর প্রক্ষেপণ সব মিলিয়ে তিনি অবিস্মরণীয়।

এল এম এ সি : সেই সুর

বিশ্ববিখ্যাত ছোটগল্পকার ও' হেনরি-র গল্প দি কপ অ্যাণ্ড দি অ্যানথেম অবলম্বনে 'সেই সুর' একাঙ্ক নাটিকাটি লিখেছেন সোমনাথ চৌধুরী। ছোটগল্পর মূল সুরটি ধরে রেখে বিষয়বস্তুকে সার্থকভাবে এ দেশীয় পটভূমিকায় রূপ দেওয়া হয়েছে। রূপান্তর করার খাতিরেই মূল ছোটগল্পের ছাতার বদলে একটা প্যাকেট, রেঁস্তোরার বদলে এক দরিদ্র খাবারওয়ালা যেমন এসেছে, তেমনই মেশার-এর অংশটি সুবিবেচিত ভাবে বর্জিত হয়েছে। নতুন অংশ সংযোজিত হয়েছে – চোলাইমদ কারবারীদের ব্যাপার। ও' হেনরি-র গল্পের বক্তব্যটা কি ? – সেটা হলো সমাজের অবহেলিত দরিদ্র মানুষের জীবন এবং পচা আইনের হাতে তাদের নিগ্রহ। তাকেই পরিস্ফুট করতে নাট্যরূপকার আইনের রক্ষকদের এনেছেন তাদের অদ্ভুত ডিউটি চোলাই মদ পাহারা দেওয়া ও অসঙ্গত আচরণের প্রতি তীব্র কটাক্ষ হেনেছেন। কোন স্বগতোক্তি না এনে অন্তর ভাবনা দেখাতে 'বিবেক' সংযোজন শুধু সমর্থক নয় – দৃশ্যত নাটকীয় দ্বন্দ্ব চমৎকারিত্ব এনেছে। এই সফল নাট্যরূপকে মঞ্চে পরিবেশন করলেন নৈহাটির এল. এম. এ. সি সংস্থার শিল্পীরা। অত্যন্ত নিপুণ মঞ্চসজ্জা, চোখজুড়ানো। ল্যাম্পপোস্টের হলুদ আলো শুধু পরিবেশের নিস্প্রভতার দ্যোতকই নয়, আর্ত শীতকালকেও মনে করিয়ে দেয়। দরিদ্র খাবারওয়ালার ভূমিকায় প্রাণময় অভিনয় করেছেন সুকান্ত লাহিড়ী।

তরুণ সংঘ : সারি সারি মৃতদেহ

'সারি সারি মৃতদেহ' মঞ্চস্থ করলেন রাসখোলার তরুণ সংঘের শিল্পীরা। বাইরে সারি সারি মৃতদেহ পড়ে আছে – তার দুর্গন্ধপীড়িত দৃশ্য দেখে মানসিক চৈতন্য অবধি ফিরে পাওয়ার উপায় নেই। এমনই অচলায়তন শিক্ষাব্যবস্থা। শাসক শ্রেণী তাদের শোষণের কদর্য স্বরূপ এবং আসন্ন ভয়ংকর পরিণতির সম্বন্ধে অজ্ঞ নয়। আর তাই বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়কে পীড়ন প্রলোভনে করায়ত্ত করে রাখতে চায়। অন্য সবাইকে পারলেও সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস পুরুষ অদমিত থাকতে চায়। তাই তাঁরই বরাতে জোটে সবচেয়ে বেশি নিস্পেষণ। পৃথিবীর অন্য সব দেশ যখন দুর্ভিক্ষ কবলিত, তখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আর বৈজ্ঞানিক সাফল্যের উৎসব করে না, আগ্রাসনের কালো হাত বাড়ায় পীড়িত দেশগুলির দিকে। পদলেহী সম্প্রদায়ের সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও শোষকশ্রেণী তার ভয়ঙ্কর

পরিণতি থেকে রক্ষা পাবে না সারি সারি মৃতদেহগুলি যে প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে আসবে এই ইঙ্গিত দিয়ে নাটক শেষ। প্রবীর দত্ত রচিত 'সারি সারি মৃতদেহ' নাটকের বিষয়বস্তু এই, নিঃসন্দেহে ভাল। তাকেই যোগ্য মর্যাদা দিয়ে অভিনয় করেছেন শিল্পিরা যদিও কোরাস অংশ কিছু অস্পষ্ট হয়েছিল। মন্ত্রীর ভূমিকায় পরিচালক অভিনেতা বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় সাবলীল অভিনয় করেছেন, রাজাবেশী সুকান্ত ভট্টাচার্যও ভাল।

মঞ্চদূত : ভোরাই খেয়া

শ্যামলতনু দাশগুপ্তের নাটক 'ভোরাই খেয়া'-র আখ্যানবস্তুতে নতুন কিছু অবশ্য নেই। আইনের খড়গে দরিদ্র চাষীকে হত্যা করে মনের ফুর্তিতে মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানে মাতাল কানাবাবু একরকম বিপন্নভাবেই আশ্রয় পেয়েছে সদাশয় সদামাঝির ঝুপরিতে। কিন্তু নেশা কাটতেই সে তার অর্থলোলুপ গ্রাস বাড়িয়ে দেয় সদামাঝির দিকেই। এবং ক্লাইম্যাক্সে তার রক্ষা কর্তাকে পিছন থেকে ছুরি মারতে উদ্যত হয়। এ হেন দানবের নিধন তাই অপরিহার্য হয়ে ওঠে। আগরপাড়ার মঞ্চদূত সংস্থা মঞ্চস্থ করলেন 'ভোরাই খেয়া'। শোষকেরা নয়, শ্রেণীশত্রু নিধন করে শোষিত মানুষেরাই শেষপর্যন্ত ভোরাই খেয়া ধরতে পারবে। নাটকের নামকরণের তাৎপর্য এখানেই। নাটকের দৃশ্যসজ্জা বেশ ভাল। সব অভিনেতাদের ব্যক্তিগত দক্ষতা ও দলগত নৈপুণ্যে একটি সার্থক প্রযোজনা এটি।

খামারপাড়া মিলন সমিতি : জাগরী

সাময়িক দুটি জ্বলন্ত সমস্যা, শিক্ষাজগতে বিশৃংখলা ও পরিণামে পরীক্ষায় অসাধুতা এবং বেকারত্ব—এই বিষয়কে নাট্যবস্তুরূপে নির্বাচিত করেছেন নাট্যকার সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর 'জাগরী' নাটকে। শিক্ষাজগতে যে অসাধুতা চলছে তার সমাধানের উপায় নাট্যকার স্পষ্ট ও যুক্তিনিষ্ঠ উত্তরে না দিলেও, যুবশক্তিকে সংঘবদ্ধ হওয়ার সংকল্প শুনিয়েছেন। খামারপাড়া মিলন সমিতির এই প্রযোজনা কিন্তু নাটকের চেয়ে দুর্বল ছিল।

সপ্তর্ষি : চোখে আঙুল দাদা

মনোজ মিত্রের 'চোখে আঙুল দাদা' মঞ্চস্থ করলেন নৈহাটির সপ্তর্ষি নাট্যসংস্থা। পৃথিবীতে অবস্থানকালে 'চোখে আঙুল দাদা' সর্বদা সকলের ছিদ্রান্বেষণ করে ঝিনিঝিনি রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকে গিয়েও বিধাতা, চিত্রগুপ্ত সহ সকলের ত্রুটি ধরতে লাগল। ফলে তা দর্শকদের দম ফাটানো হাসিতে মাতিয়ে দেয়। কিন্তু ওখানেই শেষ হলে নাটকটি খানিকটা ভাঁড়ামোতেই ভরে

থাকতো। সৌভাগ্য তা থাকে নি, কারণ নাট্যকার সবশেষে দেখিয়েছেন অন্ধ সমালোচকরা আপনারাই মরে। 'চোখে আঙুল দাদা'র ভূমিকায় দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর অভিনয় চমৎকার।

রঙ্গাজীব : একটি মোরগের কাহিনী

কল্যাণীর রঙ্গাজীব গোষ্ঠী মঞ্চস্থ করলেন প্রদীপ খাজাঞ্চীর 'একটি মোরগের কাহিনী'। কবি কিশোর সুকান্তর 'একটি মোরগের কাহিনী'র মূলধারার সঙ্গে নাট্যকার প্রদীপবাবু সুকান্তরই অন্য বহু কবিতার সংযোগ ঘটিয়ে দিয়ে মূল-ধারাকে পরিপূর্ণ করে নাচ গান অভিনয় সমৃদ্ধ নাটিকা রচনা করেছেন তা সুকান্ত-কীর্তিকে বই-এর পাতা থেকে তুলে এনে দর্শকদের চোখের সামনে উপস্থাপিত করার এক আদর্শ দৃষ্টান্ত। চরিত্রগুলির মুখে ঠিক সময়ে সুকান্তর সঠিক কবিতা বা কবিতাংশ যোগাম দিয়ে নাট্যকার কাহিনীকে সর্বদাই গতিশীল রেখে অবশেষে সেই করুণ পরিণতির দিকে নিয়ে গিয়েছেন যেখানে লোভী শোষকদের হাতে সুন্দর মোরগটি নিহত হলো। এই চমৎকার সৃষ্টির সঙ্গে তাল মিলিয়ে মঞ্চ উপস্থাপনার চমৎকারিত্ব এনেছেন পরিচালক ডাঃ বল। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য অবিস্মরণীয় শেষ দৃশ্য, যেখানে ঘাতকের ছুরির নিচে পড়ে আছে অসহায় মোরগটি, সঙ্গীর এই মর্মান্তিক পরিণামের দিকে ভীত বিস্ফারিত করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে অন্য তিনটি মোরগ. আর তারই পাশে দানবীয় উল্লাসে হা-হা করে আকাশ ফাটাচ্ছে লোভী জমিদার, নিষ্ঠুর করুণ এই দৃশ্য দীর্ঘদিনের মত দর্শকমনে মুদ্রিত করে দিতে কতকগুলি শিশু কিশোর অভিনেতৃ স্থিরচিত্র হয়ে গেল। সুন্দর অভিনয় করেছে সবাই।

কল্লোল : লোহিত কণা

স্বরূপ ব্রহ্ম রচিত 'লোহিত কণা' পরিবেশন করলেন চুঁচুড়ার কল্লোল নাট্য-সংস্থা। বর্ণনা ব্যাখ্যান ভাগ প্রাধান্য লাভ করায় এ নাটকে অ্যাকশন গড়ে উঠতে পারে নি। 'মাস্তান' ও এম এল-এর দেহরক্ষীর দ্বারা ধৃত এবং হত্যার উদ্দেশ্যে বনের অভ্যন্তরে আনীত এক পার্টি কর্মী এবং এক পার্টি সমর্থক কী ভাবে অব্যাহতি পেলেন কাহিনীটি তাই নিয়ে। পার্টি কর্মীটি তার বাবা এই পরিচয় জানার পর, বাকি বন্দীকে অবশ্য সমর্থক যুবকটি সহ মুক্তি দিল ; কোন মানসিক পরিবর্তন তাঁর দেখানো হলো না। লড়াইয়ের ময়দানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করার জন্য কী ভাবে পাওয়া যাবে তাকে, বোঝা দুষ্কর। লেডী গ্রেগরী-র দি রাইজিং অফ্ দি মুন-এ বিপ্লবী পুলিশ সার্জেন্টের মানসিকতায় যে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে কমরেডদের সঙ্গে চলে যেতে পেরেছিল, এ নাটকে তা অনুপস্থিত। তাহলে কী ভাবে এই ধরণের অ্যাকশনহীন নাটক দর্শকচিত্তে নাড়া দিতে

পারবে? মঞ্চ সজ্জা ভাল, আবহসংগীত বেশ ভাল। তবে শিল্পীরা অভিনয়দীপ্ত হতে পারেন নি।

তিতাস : চলো যুদ্ধে

চাকদহের তিতাস সংস্থা পরিবেশিত চন্দন সেনের 'চলো যুদ্ধে' যে কৌশলে যাতুকরের মাধ্যমে অতীতকে মঞ্চে উপস্থাপন করা হয়েছে; তার দৃষ্টান্ত আমরা ইতিপূর্বেই পেয়েছি। কৌশলের কথা যাক, যাদের নাটকে উপস্থাপন করা হয়েছে তারা দমদম সেণ্ট্রাল জেলের সেই সব উগ্রপন্থীরা যাদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল। খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই নাটকে তাদের একজনকে স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে। সে সমীর। যার চাকুরির ইণ্টারভিউ-এর দৃশ্য পুরোনো মামুলি ব্যাপার। কোন সামাজিক চেতনা নয়; চাকুরি জোটাতে ব্যর্থ সমীর উগ্রপন্থী-দের দলে যোগ দেয়, অবশেষে সেণ্ট্রাল জেলে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দেয়। নাটকের শেষ কথা, বিপ্লবীদের হত্যা করে বিপ্লব রোধ করা যায় না। প্রযোজনা অত্যন্ত ঢিলেঢালা এবং ছকে বাঁধা।

আমরা কজন : যে আলো ইতিহাস

'যে আলো ইতিহাস' একাঙ্কটির কাহিনী প্রতিভাসিত হয়েছে লৌহ কারার অভ্যন্তরে যেখানে বর্তমান সমাজ ও আইন ব্যবস্থায় যাদের অপরাধী বলা হয় এমন চারজন অপরাধীকে নিয়ে। তারা প্রত্যেকেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক অপরাধের আসামী। সেখানে এসেছে আসামী বলে চিহ্নিত নবাগত এক যুবক যে অন্যসব আসামীদের চোখে সেই আলো জেলে দিলে যে আলোতে সবাই দেখতে পেল তাদের ব্যক্তিগত অপরাধ প্রকৃত পক্ষে সামাজিক অব্যবস্থারই পরিণতি—এবং এর মূলে সমাজ ব্যবস্থাই দায়ী। এমনই একটা বড় ভাবনার দিকে যেতে যেতেও কিন্তু বিষয়বস্তু কেমন শিথিল হয়ে গেল। নবাগত যুবক কী চাইছে সেটা স্পষ্ট হয় না। সে একা বাইরে যাওয়ার কথা বলছিলই বা কেন অথবা কীভাবেই বা কী তার সঙ্গে ছিল যা দিয়ে কারা প্রাচীরে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভেঙে ফেলা যেতে পারে বস্তুটি সে সঙ্গীদের হাতে দিতেই বা অস্বীকার করছে কেন, কিছুই স্পষ্ট নয়। পরিশেষে তার মৃত্যু এবং কর্মীদের অসহায় অবস্থা কোন দীপ্ত আলো নিক্ষেপ করে কি? বৃদ্ধ ছাড়া আর কেউ খুব একটা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অভিনয় করতে পারেন নি।

ব্রাত্যসংঘ : গুপ্তবিদ্যা

'গুপ্তবিদ্যা' শ্লেষাত্মক নাটক। তীব্র তীক্ষ্ণ কিছু নয়—নিতান্তই নিরীহ। রাজা থেকে আরম্ভ করে রাজকর্মচারীরা সবাই চোরের সমগোত্রীয়। কিন্তু দেশ জোড়া

আরও লোক আছে—স্বভাবতঃ না হলেও অসাধু হওয়ার সুযোগের অভাবে সৎমানুষ একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে পৃথিবী থেকে এটা নঞর্থক ভাবনা। শ্লেষাত্মক নাটক বলেই কি নেতিবাদী জীবনদর্শনের প্রবক্তা হতে হবে নাট্যকারকে। এ নাটক মঞ্চস্থ করলেন ভ্রাতৃসংঘ, নৈহাটি। ভ্রাতৃসংঘের ক্ষমতাবান শিল্পীরা তাঁদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন এই দুর্বল বক্তব্যের নাটক নির্বাচন করে।

কোরাস-কল্যাণী : তাহার নামটি রঞ্জনা

বিধায়ক ভট্টাচার্যের ভাবাবেগ সর্বস্ব একাঙ্ক 'তাহার নামটি রঞ্জনা' অভিনয় করলেন কল্যাণীর কোরাস নাট্যসংস্থা। কোন শক্তিশালী, স্পষ্ট বা অভাবিত বক্তব্য নাটকে না থাকলেও এর আবৃত্তি অংশ ইতিপূর্বে শম্ভু মিত্র এবং তৃপ্তি মিত্র তাঁদের একাধিকবার বেতার নাটকের অভিনয়ে বহু শ্রোতার মনে মুদ্রিত করে দিয়েছেন। আর সেই প্রভাবকে কোরাসের প্রধান দুই শিল্পী কাটিয়ে উঠতে পারলেন না কেন? তবে রঞ্জনার ভূমিকায় লক্ষ্মী দাশগুপ্তা সমস্ত দর্শককে নিশ্চয়ই আবেগায়িত করতে পেরেছেন। জয়ন্ত বিশ্বাস স্বাভাবিক।

ব্যঞ্জনা : দিন আসবেই

দক্ষিণেশ্বরের 'ব্যঞ্জনা' গোষ্ঠী অভিনয় করলেন অমল রায়ের 'দিন আসবেই'। দিন কি শুধু মাত্র ৪ঠা এপ্রিলের শহীদ সিরাজুলের স্মৃতিকে মনে রাখলেই আসবে? বড় জোর ধরে নেওয়া যেতে পারে শ্রমজীবী কমরেডদের পিঠবাঁচানোর নীতিতে ক্ষুব্ধ এবং কিঞ্চিৎ একসেনট্রিক কেষ্ট তার স্ত্রী রাধার ঘৃণাজনিত অভিমানে, এক শ্রমিক নেতাকে বাঁচানোর প্রেরণায় আত্মত্যাগের মধ্যেই ভবিষ্যতের দিনের আভাষ নিহিত রয়েছে। কিন্তু তাও খুব একটা বড় কিছু হয়ে উঠছে না কারণ আত্মত্যাগের বিচারশীলতার চেয়ে আত্মহননের আবেগস্পর্শই ঘটনায় বেশি। পৃথিবীর আবর্তনের দিন আপনিই আসে, কিন্তু মানুষের ইতিহাসের দিনকে সুযোগ বুঝে শক্তি দিয়ে ছিনিয়ে আনতে হয়। নইলে হাজার বছর সে প্রতীক্ষা অপচিত হয়ে যাবে। কেষ্টর ভূমিকায় মনোরঞ্জন ঘড়া বিক্ষোভ বিদ্রূপের পাহাড় ফাটিয়েছেন কিন্তু শম্ভু মিত্রের নকল করার চেষ্টায় চরিত্রটি থ্রী ডাইমেনশন্যাল হতে পারল না। রাধার আড়ষ্ট নিষ্প্রাণ অভিনয় সত্যিকারের কিছু নয়—নাটক দেখছি মনে করিয়ে দেয়।

মর্ডান আর্ট থিয়েটার : প্রোসিনিয়াম

দেবব্রত গুহরায়ের 'প্রোসিনিয়াম'-এর বক্তব্য সাদামাঠা—অভিনয় করার সুযোগ চাই। 'রকে' বসে সময় কাটানোর বিকল্প হিসেবে 'চামু' নানা নাট্যসংস্থায়, যাদের আদর্শ বলে কিছু দেখানো হয় নি, তাদের দরজায় দরজায় ঘুরে যে

অভিজ্ঞতা পেল তা খানিকটা নো ভ্যাকেন্সি ধরনের। নাটকাভিনয় রকবাজির বিকল্প এ সংকীর্ণ ধারণা থেকে নাটকের নিষ্ঠা কিম্বা প্রগতিবাদী নাট্য আন্দোলন গড়ে তোলার সংগ্রামে নামা যায় না। তা ছাড়া আদর্শ গ্রুপ থিয়েটারের দৃষ্টান্ত কিম্বা ইঙ্গিত না থাকায় আমাদের মনে হয়েছে এ নাটকের অভিনয় না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রযোজক সংস্থা মডার্ন আর্ট থিয়েটারের শিল্পীরা মঞ্চে উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারেন নি। মুড ক্লাবের বর্ণনার মধ্যে একটা গা ঘিন ঘিন করা কদর্য দৃশ্য দর্শকদের সামনে তুলে ধরার অশুভ প্রয়াস নিন্দনীয়।

অনীক : স্বপ্ন-কামনা-ভাবনা

তপন রায়ের একাঙ্ক 'স্বপ্ন-কামনা-ভাবনা' নামকরণের যথার্থতা বহন করে না সঠিক ভাবে। আর কতগুলো বেকার যুবকের স্বপ্ন-কামনা-বাসনা যদি প্রচ্ছন্ন-ভাবে কিছু থেকেও থাকে তাও সংকীর্ণ। তারা তাদের বেকারত্বের জন্য দায়ী করে ব্যক্তিবিশেষকে—বাবা, দাদা, মেসো, পিসেকে, সামাজিক অবস্থাকে নয়। বৃদ্ধ অভিভাবকরাও একই রকম সংকীর্ণ দৃষ্টি নিয়ে দেখেন সমস্যাটাকে। রাজ-নৈতিক নেতারা সব নীচ, ট্রেড ইউনিয়ন নাকি ব্যবসা! আর এ ব্যবসায় ঘা পড়লে তারা খুনও করেন। ধর্মঘট করে কিছু হবে না, মধ্যবিত্ত বুদ্ধি-জীবিরা সব সুবিধাবাদী, পিঠ বাঁচিয়ে চলেন এমনই সব কথা আছে নাটকে। কিন্তু কিভাবে শ্রমিক কৃষকেরা নেতৃত্বে আসতে পারেন, ট্রেড ইউনিয়নের বিকল্প কী হতে পারে এখনই, এসব দিকে নাট্যকার মনে হয় সুচতুর সচেতনভাবেই নীরব। বহুজনের মুখ দিয়ে বিমানকে আদর্শ ব্যক্তিত্ব মণ্ডিত করা হয় অথচ তাকে উপস্থাপন কালে দেখা যায় তারি সামনে যুবকেরা টুইস্ট নাচে মত্ত। বড় বড় কথা ছাড়া বিমান যে কোন্ মহৎ কীর্তির অধিকারী বোঝা গেল না।
নাটকে শুধু নঞর্থক দিকই দেখানো হয়েছে, অস্ত্যর্থক কিছুই নেই। অত্যন্ত অপরিণত চেতনা প্রসূত কাঁচা হাতের রচনা। এ নাটক পরিবেশন করলেন লিলুয়ার 'অনীক' নাট্যসংস্থা। শিল্পীদের অভিনয়, পরিচালনা, সর্বদিকে এ এক অর্থহীন প্রয়াস, দর্শকদের সময় অপচয় করার জন্য ক্ষমা চাইতে হয়।

বিশ্বরঞ্জন দাস

'গ্রুপ থিয়েটার'-এর শুভ আবির্ভাবকে স্বাগত জানাচ্ছি। গ্রুপ থিয়েটার-এর প্রয়াস আমাদের নাট্য-আন্দোলনের বহতা ধারাকে নিঃসন্দেহে আরো বলীয়ান করবে, গণনাট্যের আদর্শে বিশ্বাস রেখে এবং প্রগতিশীল গ্রুপ থিয়েটার আজ ঐক্যবদ্ধ ও গণঘনিষ্ঠ হবার জন্য ভারতের সংগ্রামী নাট্যকর্মীরা 'গ্রুপ থিয়েটার' পত্রিকার সঙ্গে একাত্ম অনুভব করে গৌরবান্বিত বোধ করবেন, 'নাট্যদর্পণ' পত্রিকাও আজ সেই গৌরবে গৌরবান্বিত।

আগামী দিনে নাট্যদর্পণ তার সীমিত সাধ্য নিয়েও 'গ্রুপ থিয়েটার'-কে সহযোগিতা করতে প্রতিশ্রুতি রইল।

শশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী
সম্পাদক, নাট্যদর্পণ
ডিব্রুগড়

আমি অনেক সময় দেখেছি প্রতিযোগিতা করতে গেলেই নাটকের নিজস্ব ঐক্যটি হারিয়ে যায়। কেননা প্রতিযোগিতা মানেই—তার নিজস্ব একটা ট্রিটমেণ্ট আছে। আর ঐ ট্রিটমেণ্ট রক্ষা করতে অনেক সময় নাটকের বাঁধন বেশ ঢিলে হয়ে যায়। আর সেই কারণেই সাজানো মঞ্চ থেকে, উন্মুক্ত ১০´ ৮´ চৌকির ঘেরে মাঠে-ঘাটে নাটক করে আরও আনন্দিত হয়েছি।

আপনাদের সমবেত প্রচেষ্টায় 'গ্রুপ থিয়েটার' কাগজ পেয়ে ভীষণ ভালো লাগলো। একটা পরিচ্ছন্ন ও পরিমার্জিত নাটকের কাগজের আমাদের ভীষণ অভাব ছিল। সেই অভাব 'গ্রুপ থিয়েটার' মেটাতে সক্ষম হবে এই আশা রাখি। তবু জানাবো, কতকগুলি কেবলি খবর (প্রতিযোগিতার) দিয়ে ভরিয়ে তুলবেন না। বরং কিছু মৌলিক আলোচনা আমরা চাই, যাতে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে নাটক করা বা উল্টোপাল্টা লিখিয়েদের সাবধান করে দেওয়া যায়। এবারের কয়েকটি আলোচনা ভীষণ ভালো লেগেছে।

পম্পু মজুমদার
যুগাগ্নি, বহরমপুর

সম্ভবতঃ পত্রলেখক 'গ্রুপ থিয়েটার'-এর প্রথম ক্রেতা এবং পাঠক। ১৪ই অগাস্ট কলেজ স্ট্রীটের পাতিরাম বুক স্টলে পত্রিকাটি পৌঁছানোর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই একটি পত্রিকা কিনে ফেললাম, সেই রাতেই পড়ে ফেলা গেল। ভাল লাগল। বিচ্ছিন্নভাবে রচনাগুলির আলোচনায় না গিয়ে শুধু এটুকুই বলতে চাই, ঠিক এ রকম একটি পত্রিকার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

পত্রিকার শেষ পাতায় গ্রুপ থিয়েটার সংক্রান্ত নিয়মাবলী সম্পর্কে আমার সামান্য কিছু প্রশ্ন আছে। বি. ই. কলেজের ছাত্রছাত্রীরা গত ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ও মঞ্চে অত্যন্ত সফলভাবে নাট্য প্রযোজনা করছেন। বিভিন্ন আন্তঃকলেজ নাট্য প্রতিযোগিতায় তারা সমস্ত বিভাগে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। সম্প্রতি রাজ্য সরকার আয়োজিত 'যুব-ছাত্র উৎসবে' তারা অভিজ্ঞান পত্র পেয়ে তাদের ভূমিকার স্বীকৃতি পেয়েছেন। এ সমস্ত ঘটনার ফলশ্রুতি বি. ই. কলেজের নাট্যোৎসাহী ছাত্রসমাজ কলেজগতভাবে একটি অলিখিত কিন্তু স্বীকৃত গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেছেন। ভারতবর্ষে এ ধরণের প্রচেষ্টা সম্ভবতঃ এই প্রথম।

এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে, আপনার পত্রিকায় আমাদের কলেজের নাট্যচর্চার সংবাদ এবং বিজ্ঞাপন কিভাবে দেওয়া যায়, এ ব্যাপারে মতামত সত্বর জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

অমিতাভ রায়

বি ই. কলেজ, শিবপুর

এই তালিকা সম্পূর্ণ না হলেও গ্রুপ থিয়েটারগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষায় ব্যবহারিক প্রয়োজন অনুভব করেই এখানে প্রকাশ করা হলো। যে সকল গ্রুপ অনুল্লেখিত রইল, পরবর্তী সংখ্যা থেকে সেগুলি ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে। এ ব্যাপারে মফঃস্বলের সংগঠন গুলির পূর্ণ সহযোগিতা যাচ্ঞা করি।

ঠিকানা পরিবর্তন হলে বা মুদ্রণে ভুল থাকলে সেটা পরবর্তী সংখ্যায় সংশোধিত হবে।

সঠিক ঠিকানা এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহের জন্য নিচের ছকের প্রশ্নগুলির উত্তর পাঠিয়ে সংগঠনগুলি আশা করি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

১. সংগঠনের নাম। ২. প্রতিষ্ঠা কাল। ৩. ঠিকানা। ৪. সংগঠন স্থাপনের উদ্দেশ্য। ৫. সদস্য সংখ্যা। ৬. প্রথম প্রযোজিত নাটক এবং তৎসংক্রান্ত বিবরণ। ৭. এ যাবত প্রযোজিত নাটকের সংখ্যা এবং তার পূর্ণ বিবরণ। ৮. নির্দেশক এক না একাধিক। নাম। ৯. কোথায় কোথায় কত রজনী অভিনয় করে এ যাবত আনুমানিক কত দর্শক পেয়েছেন। ১০. দর্শকের চরিত্র—শিক্ষিত শহরে মধ্যবিত্ত কত/ নিরক্ষর গ্রামীণ মানুষ কত।

কলকাতা

অঙ্কুর আর্ট থিয়েটার ১৯ : ৩।১ গ্রোভ লেন ৭০০০২৬

অনামিকা ১৯ : বিশপ লেফ্রয় রোড ৭০০০২০

অনুকৃতি ১৯ : ১৭ দীননাথ চ্যাটার্জী স্ট্রীট বেলঘরিয়া ৭০০০৫৬

অরিন্দম ১৯৭৬ : ১ দেবনারায়ণ ব্যানার্জী রোড ৭০০০২৬

আমরা ক জন ১৯৬৮ : ৬ নারিকেল বাগান লেন ৭০০০০৯

আন্তরিক ১৯ : ৫৩ পঞ্চাননতলা লেন ৭০০০৩৪

অপরূপ নর্থ ১৯ : ২০ যদুমিত্র লেন ৭০০০৪

উন্মেষ নাট্যসংস্থা ১৯ : ৪।৩ মলঙ্গা লেন ৭০০০১২

এভার গ্রীন ১৯ : ৬৪ তরুণ পল্লী দেশপ্রিয় নগর বেলঘরিয়া ৭০০০৫৬

এ না গো ১৯ : পি-৩৫ মতিঝিল এভিনিউ দমদম ৭০০০৭৪

একতারা ১৯ : ২৩ ডাঃ প্রিয়নাথ গুহ রোড ৭০০০৫৬

এ্যাক্টরস্ ইউনিয়ন ১৯ : ১২১-এ বিধান সরণী ৭০০০০৬

ঐকতান ১৯ : ২৪ কুমুদ ঘোষাল রোড ৭০০০৫৭

কায়ানট ১৯ : ৪।১এ গোপাল ব্যানার্জী স্ট্রীট ৭০০০২৫

ক্যালকাটা সাইলেন্ট থিয়েটার ১৯ : ৪৭ চক্রবেড়িয়া রোড ৭০০০২৫
কুহক ১৯ : ৪৭।২ চেতলা রোড ৭০০০২৭
কেতন ১৯ : ৪৪ বি গোকুল বড়াল স্ট্রীট ৭০০০১২
কোরাস ১৯ : ১২১ হরিশ মুখার্জী রোড ৭০০০২৬
গান্ধার ১৯৬১ : ৬ সুবারবন হসপিটাল রোড ৭০০০২০
চারণিক ১৯ : ২৯।৬ গল্‌ফ ক্লাব রোড ৭০০০৩৩
চিলড্রেন্স কয়্যার ১৯ : ২৫৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রীট ৭০০০১২
থিয়েটার গিল্ড ১৯৭১ : ১০৭ হরিশ মুখার্জী রোড ৭০০০২৬
থিয়েটার গ্রিম ১৯ : ২০ গরফা মেন রোড ৭০০০৩২
থিয়েটার ইনস্টিটিউট ১৯৭১ : ৪৪ শিবাজী রোড পশ্চিম রাজাপুর ৭০০০৩২
থিয়েটার ব্রিগেড ১৯৭৮ : ব্লক এ।৯২১ লেক টাউন ৭০০০৫৫
দমদম লিট্‌ল গ্রুপ ১৯ : ২৭।১ এম সি গার্ডেন রোড ৭০০০৩০
ধূমকেতু ১৯ : ৩৫।২ ভগবতী চ্যাটার্জী রোড ৭০০০৫৬
ধ্রুবনট্ট নাট্য সংসদ ১৯ : ৩৭।২ পূর্ব সিঁথি রোড ৭০০০৫০
নটরাজ ১৯ : দক্ষিণ উদয়পুর নিমতা ৭০০০৪৯
নটসেনা ১৯৭১ : ঠাকুরপুকুর বেহালা ৭০০০৬৩
ননামি ১৯ : ২০।১ ডি রাজা মণীন্দ্র রোড ৭০০০৩৭
নাগরিক ১৯ : ১৬৫।২০।১৩ গোপাল মিশ্র রোড ৭০০০৩৪
নান্দনিক ১৯৬০ : ১৫৮ মন্মথ দত্ত রোড ৭০০০৩৭
নিউ থিয়েটার্স গ্রুপ ১৯৭৭ : ১২।১৩ পশুপতি ভট্টাচার্য রোড ৭০০০৩৪
নেফা নাট্যগোষ্ঠী ১৯ : ২২।১ ডায়মণ্ড হারবার রোড ৭০০০৫৩
টিচার্স থিয়েটার্স গ্রুপ ১৯ : পূর্বপাড়া বরিষা ৭০০০৬৩
পরবেশ ১৯ : ১৪ মনসাতলা রোড ৭০০০২৩
পথিকৃৎ ১৯ : ৮৮ বি বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রীট ৭০০০১২
পঞ্চশর (নর্থ) ১৯ : ৭৮ এ গড়পার রোড ৭০০০০৯
পিপল্‌স লিট্‌ল থিয়েটার ১৯৬৯ : ১৪০।২৪ নেতাজী সুভাষ রোড ৭০০০৪০
পিপল্‌স আর্ট থিয়েটার ১৯ : ১২ রাজচন্দ্র সেন লেন ৭০০০০৯
প্লে প্রোডিউসার্স ১৯ : পি।২ বল্লভ স্ট্রীট ৭০০০০৩
প্রতিবিম্ব ১৯ : ৩৭।৫ পূর্ব সিঁথি রোড দমদম ৭০০০৩০
বালিগঞ্জ নাট্যসংসদ ১৯৬৪ : ২।এ হিন্দুস্থান রোড ৭০০০২৯
ব্যঞ্জনা ১৯৭৬ : অবধায়ক মনোরঞ্জন ঘড়া চারুশ্রী ৭০০০৩৫
ভগ্নদূত ১৯ : ১৩ বি ফরডাইস লেন ৭০০০১৪
ময়ূখ ১৯ : এম বি রোড বিরাটি ৭০০০৫১
মেঘমন্দ্র ১৯ : ৭ ফকির চক্রবর্তী লেন ৭০০০০৬

রক্তকরবী : ১৯ : ৬৩।১ সূর্য সেন ষ্ট্রীট ৭০০০১২
রঙ্গন ১৯ : ৭এ দুর্গাপুর লেন ৭০০০২৭
রঙ্গনাট্য ১৯৭৬ : ২৫।৩এ কানাই ধর লেন ৭০০০১২
রঙ্গলোক ১৯ : ১।১ই তেলিপাড়া লেন ৭০০০০৪
রূপান্তরী ১৯৬১ : ৮২।১৫ দিলখুসা ষ্ট্রীট ৭০০০১৭
রূপদক্ষ ১৯৬১ : ৪১৮ কালিঘাট রোড ৭০০০২৬
রূপমঞ্চ নাট্যগোষ্ঠী ১৯ : ২১৫ ডঃ এ কে পাল রোড ৭০০০৩৪
রেনেশাঁ ১৯ : ৮বি নলিন সরকার ষ্ট্রীট, ৭০০০০৪
লাইফ থিয়েটার ১৯ : ২০এ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট ৭০০০০৪
শতাব্দী ১৯ : ১এ প্যারী রো ৭০০০০৬
সবার প্রিয় ১৯ : অর্জুনপুর ৭০০০৫৯
সব্যসাচী ১৯ : ১৯।১সি উল্টাডাঙ্গা রোড ৭০০০০৪
সৌভ্রাত্রিক ১৯ : ১ আশুবাবু লেন কবিতীর্থ ৭০০০২৩
সাত্ত্বিক ১৯ : ১৬এ রাধানাথ ঘোষ লেন ৭০০০০৬
স্পার্টাকাস ১৯ : ১৬।৭ ডোভার লেন ডি২।১৮৫ গভঃ কোয়ার্টার্স ৭০০০২৯
সোনার তরী ১৯ : ৩৮ বারুইপাড়া লেন ৭০০০৩৬

সংশোধনী

সুন্দরম্ ১৯৫৭ : ৫৭ যতীন দাস রোড ৭০০০২৯
চার্বাক সম্প্রদায় ১৯৭৬ : ২৯।১ পণ্ডিতিয়া রোড ৭০০০২৯

২৪ পরগণা

আদি মৈত্রী সংঘ ১৯ : ভাটপাড়া নৈহাটি
অনামী ১৯৬০ : গ্রাম মাদরাল পো মাদরাল কাঁকিনাড়া
অনামী নাট্যসংস্থা ১৯ : আকড়া নওয়াপাড়া মহেশতলা
আমরা ক জন ১৯ : গ্রাম হরিণাভি পো হরিণাভি
আমরা ক জন ১৯৭০ : অবন্তীপুর মণ্ডল পাড়া রোড শ্যামনগর
অ্যাজিট গ্রুপ ১৯৭৬ : পুরাতন রাসখোলা খড়দহ
ইউথ সেণ্টার ১৯ : ১৮ শীতলাতলা রোড চন্দন পুকুর বারাকপুর
এল এম এ সি ১৯ : জনস্টন রোড গরিফা নৈহাটি
ঐকতান ১৯ : কালিয়া নিবাস দক্ষিণ বারাকপুর
ঋতম্ ১৯ : পি ১৯১ বসুনগর মধ্যমগ্রাম
আঙ্গিক ১৯৭৭ : ৬২ নলিনী বসু রোড কাঁচরাপাড়া ৭৪৩১৪৫

কুয়াশা ১৯ : কাশীনগর পো কাশীনগর

কল্লোক ১৯ : অবধায়ক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় দেশবন্ধু পার্ক সোনারপুর

কৃষ্টিসংসদ ১৯৫৮ : ১২১ কে এম রায় চৌধুরী রোড পো দক্ষিণ জগদ্দল

ক্রান্তিকাল ১৯৬৮ : ১ দক্ষিণ পল্লী পো সোদপুর

গান্ধার বাটানগর ১৯ : ই ৩/৬ ফ্যামিলি কোয়ার্টার বাটানগর

চলমান ১৯ : গ্রাম মণ্ডল পাড়া পো মণ্ডল পাড়া শ্যামনগর

চলিষ্ণু ১৯ : অবন্তীপুর পো মণ্ডল পাড়া শ্যামনগর

ছদ্মবেশী থিয়েটার ইউনিট ১৯৫৯ : পো হালতু

জাগৃতি ১৯৫৩ : ১৫ ফেরীঘাট রোড আটপুর শ্যামনগর

টাকী কালচারাল ইউনিট ১৯ : অবধায়ক শত্রুঘ্ন ঘোষ পো টাকী

তরঙ্গ ১৯ : স্কুল রোড সোদপুর

তরুণ সংঘ ১৯ : রাসখোলা খড়দহ

তিয়াস ১৯ : গ্রাম ঘাটেশ্বর পো ঘাটেশ্বর

ত্রিতয় ১৯ : মুন্সী রথতলা বাটানগর

থিয়েটার এজ ১৯ : অবধায়ক প্রফুল্ল রায় সাফই পৈলান পো আমগাছিয়া

দর্পণ ১৯ : চড়কতলা গোয়াল পাড়া ইছাপুর

নটতীর্থ ১৯ : ১৬ জাফরপুর রোড কালিয়া নিবাস বারাকপুর

নৈহাটি কালচারাল ইউনিট ১৯ : ৫ হরিদাস ঘাট রোড নৈহাটি

নীহারিকা ১৯ : বি ১০ আনন্দপুরী বারাকপুর

নবীন সংঘ ১৯ : তালপুকুর বারাকপুর

পানিশিলা অঙ্কুর ১৯ : পো পানিশিলা সোদপুর

প্রগতি ১৯ : সুন্দিয়া গভঃ কোয়ার্টার্স পো জগদ্দল ৭৪০১২৫

প্রতিদ্বন্দ্বী ১৯ : অবধায়ক স্বপন চক্রবর্তী ভট্টাচার্যপাড়া পো বারুইপুর

প্রতিরূপ ১৯৭১ : পলতা পো পলতা

প্রেক্ষণ ১৯ : এফ আই টি ৯/৭ নর্থ ল্যাণ্ড ইছাপুর

প্রতিবিম্ব ১৯ : গ্রাম মাত্রাল পো মাত্রাল

বলাকা ১৯ : চক্রবর্তী পাড়া জয়নগর-মজিলপুর ৭৪৩৩৩৭

বারাকপুর জাগৃতি সংঘ ১৯ : তালপুকুর বারাকপুর

বঙ্কিম স্মৃতি সংঘ ১৯৬৯ : রাধাবল্লভ রোড নৈহাটি

বাটানগর থিয়েটার ইউনিট ১৯ : মল্লিকবাজার বাটানগর

বিধায়ক ১৯ : আকড়া নোয়াপাড়া মহেশতলা

বসিরহাট কালচারাল ইউনিট ১৯ : মুন্সেফপাড়া পো বসিরহাট

বাটানগর আর্ট থিয়েটার ১৯ : উলুডাঙ্গা বাটানগর

বিচিত্রা নাট্যসংস্থা ১৯ : গ্রাম সাতঘরা পো ফুটিগোদা

ভিসুভিয়াস ১৯ : ১৩ অ্যাসোয়ার্থ রোড পো গরিফা নৈহাটি
ভ্রাতৃ সংঘ ১৯৬৫ : কাঁঠালপাড়া নৈহাটি
মঞ্চদূত ১৯৭১ : নর্থ স্টেশন রোড সেনবাগান আগরপাড়া
মঞ্চসেনা ১৯৭৬ : বাবুব্লক কাঁচরাপাড়া ৭৪৩১৪৫
মডার্ন আর্ট থিয়েটার ১৯ : মীনা ডেকরেটর্স রামকৃষ্ণ আশ্রম রোড পো পানিহাটি
মুকুল নাট্য সংস্থা ১৯ : কাকদ্বীপ পো কাকদ্বীপ
মৈত্রী সংঘ ১৯ : দেশবন্ধু কলোনী কাঁচরাপাড়া ৭৪৩১৪৫
মহুয়া নাট্যসংস্থা ১৯ : রেল কলোনী হালিশহর পো নবনগর
যান্ত্রিক ১৯৫৮ : ঠাকুরপাড়া রোড নৈহাটি ৭৪৩১৬৫
রবিবাসরীয় ১৯৬৩ : ৯১ দেবীতলা রোড মাঝের পাড়া নবাবগঞ্জ পো ইছাপুর
রক্তকরবী নাট্যসংস্থা ১৯ : কল্যাণনগর পো রহড়া খড়দহ
রূপ ও অরূপ ১৯ : পো জয়নগর মজিলপুর
রূপান্তর ১৯ : অবধায়ক বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় পো গোবরডাঙ্গা
রূপান্তর নাট্যসম্প্রদায় ১৯ : ৩৭ সঞ্জীব চ্যাটার্জী রোড নৈহাটি
শিল্পীলোক ১৯ : ৭৬ পশ্চিম ঘোষপাড়া রোড পো ভাটপাড়া
শিল্পীসেনা ১৯৭৪ : সুভাষপল্লী পো মধ্যমগ্রাম
সাগ্নিক ১৯ : গরিফা নৈহাটি ৭৪৩১৬৫
সপ্তর্ষি ১৯ : ৫১ অরবিন্দ রোড পো নৈহাটি ৭৪৩১৬৫
সুমেরু ১৯ : কাছারীপাড়া বজবজ বসিরহাট
স্ফুলিঙ্গ ১৯ : ১২টি। ডি ওল্ড স্টেশন পো বজবজ
হলিডে ক্লাব ১৯ : মালোপাড়া পো গরিফা নৈহাটি

হাওড়া

অঙ্কুশ ১৯ : ২১ হালদার পাড়া লেন শিবপুর ৭১১১০২
অন্বেষণ ১৯ : নোনা পো উলুবেড়িয়া ৭১১৩১৫
অর্পণ ১৯৬৮ : ১৫ ধর্মতলা রোড সালকিয়া ৭১১১০৬
অনির্বাণ ১৯ : ৩৮।১ শাস্ত্রী নরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি রোড ৭১১১০৪
অনীক ১৯ : ৮ পদ্ম ঘোষ বাগান লিলুয়া
ইউ টি সি ১৯৫৮ : ভৈরব দত্ত লেন সালকিয়া ৭১১১০৬
কলাকেন্দ্র ১৯ : ২৭৫ গভর্ণমেন্ট প্রেস কোয়ার্টার পো গভ প্রেস কোয়ার্টার
কালপুরুষ ১৯ : বাসুদেব পাঁজা ১৪ স্বামী বিবেকানন্দ রোড ৭১১১০৬
কালপুরুষ নর্থ ১৯ : ১১।১ ঘোষপাড়া লেন
চিন্তন ১৯৭৭ : অবধায়ক বিকাশ দাস জেটিঘাট উলুবেড়িয়া ৭১১৩১৫

তরুণ মিলন সংঘ ১৯৫২ : ৬৭।২ কৈবর্তপাড়া লেন লালকিয়া ৭১১১০৬
ঋত্বিক ১৯ : ৫৪।৩।১ নীলমণি মল্লিক লেন ৭১১১০১
নটরঙ্গ ১৯ : ১৩৮।১ শাস্ত্রী নরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী রোড ৭১১ ০৪
নাট্যম ১৯ : অবধায়ক জয়ন্ত নন্দী ন্যাশনাল প্রেস পো বকসাপাড়া
ড্রামা সোসাইটি ১৯ : আব্দুল মৌড়ি
পরিচায়ক ১৯৭১ : মহাবীর মুখোপাধ্যায় ৫।৩ হরিকুমার ব্যানার্জী লেন বালী
পিপ্‌লস অ্যালবাম থিয়েটার ১৯৭৪ : শিবানন্দ বাটি পো মুন্সীর হাট ৭১১৪১০
বিষাণ ১৯ : ২১।১।১ বিশ্বেশ্বর ব্যানার্জী লেন হাওড়া ৭১১১০১
বর্ণালী ১৯ : পো উত্তর বাকসাপাড়া
বি ডি টি সি ১৯ : ৩।৪ রামকৃষ্ণ মন্দির পথ ৭১১১০১
রূপায়ণী ১৯ : গ্রাম সামতা পো সামতা
রৈবতক নাট্যসংস্থা ১৯ : ৫১ প্রাণকৃষ্ণ গাঙ্গুলী রোড পো বালী
শতভিষা ১৯ : ৪১ কৈলাস ব্যানার্জী লেন বালী
শপথ ১৯ : ১৪।১ কালীকুমার মুখার্জী লেন ৭১১১০২
শ্যাতনিক ১৯ : ১০।১৯ মোহনলাল বাহারওয়ালা রোড বালী
সংস্কৃতি ১৯ : চাকপোতা পো আমতা
সারথী ১৯ : রামচন্দ্রপুর শাঁখরাইল ৭১১৩১৩

হুগলী

ইউনিট থিয়েটার ১৯ : শান্তিনগর ভদ্রকালী
গণনাট্য সংঘ অভিযাত্রী ১৯ : চারমন্দিরতলা পো গোন্দলপাড়া চন্দননগর
অভিযান ১৯ : শৈলেন অধিকারী মন্দির রোড পো তারকেশ্বর
অভিযান ১৯ : শুকদেব চৌধুরী থানা রোড পো তারকেশ্বর
অশনি নাট্যসংস্থা ১৯৭৩ · বাগবাজার পো চন্দননগর
আমরা ক জন ১৯ : তেলেনীপাড়া চুঁচুড়া
এষণা ১৯ : প্রশান্ত ভট্টাচার্য ক্রুকেড লেন বড়বাজার চুঁচুড়া
কল্লোল ১৯৫৩ : পাল গলি ষণ্ডেশ্বরতলা পো চুঁচুড়া
কাদের ক্লাব ১৯ : ১৪১ এন সি চ্যাটার্জী স্ট্রীট পো কোন্নগর
কিংশুক ১৯ : ৩৪ আদিবর্ত পো নবগ্রাম ৭১২২৪৬
ক্লাসিক ১৯ : খলিসানী ব্রাহ্মণপাড়া পো চন্দননগর
কাণ্ডারী ১৯ : শরৎ সরণী পো হুগলী
নটতীর্থ ১৯ : তন্ময় ঘোষ ঘোষপাড়া পো হরিপাল
নবারুণ ১৯৭০ : গ্রাম বাকসা পো বাকসা
নাট্যমন্দির ১৯৭১ : হংসেশ্বরী রোড বাঁশবেড়িয়া হুগলী ৭১২৫০২
নাট্যরঙ্গ ১৯ : বারাসত দশভুজাতলা পো চন্দননগর
ডানলপ ড্রামাটিক ক্লাব ১৯ : ৬৪ ডানলপ স্টাফ কোয়ার্টার সাহাগঞ্জ

প্রতিবিম্ব ১৯ : ডানলপ বি এস কোয়ার্টার্স খেয়াঘাট পো সাহাগঞ্জ
রিসড়া বলাকা ১৯ : ২ এন সি পাকড়াশি লেন পো রিসড়া
রেনেশাঁ নাট্য সংস্থা ১৯ : তপন ঘোষ বড়ালগলি লেন পো হুগলী
শৌনক ১৯৭৩ : ১১১ নেতাজী সুভাষ এভিনিউ পো শ্রীরামপুর ৭১২২০১
সমকালীন ১৯ : কারবালা রোড পিপুল পাতি হুগলী
সংলাপ ১৯ : ৫১ ষষ্ঠীতলা স্ট্রীট পো রিসড়া
সাহানা ১৯ : ২ রামমোহন সরণী পো শ্রীরামপুর
চেনা অচেনা ১৯৬৫ : চন্দননগর পো চন্দননগর
সুপ্রতীম ১৯৭১ : ৬৪ ভাগীরথী লেন পো শ্রীরামপুর

বর্ধমান

অশোক সংঘ ১৯ : অবধায়ক মনোজ দত্ত রানীগঞ্জ বর্ধমান
অযান্ত্রিক ১৯ : কোয়ার্টার্স নং ৪৪।এ রাস্তা নং ২৩ পো চিত্তরঞ্জন
কল্লোল থিয়েটার গ্রুপ ১৯ : এল ভি ১০ এ ভি বি কলোনী দুর্গাপুর ৭১৩২০৮
ছদ্মবেশী ১৯ : বি ২।২৩০।১ বিশ্বকর্মানগর দুর্গাপুর ৭১৩২০২
রূপক-দুর্গাপুর ১৯ : বি ২-৫৫২।৩ ভি কে নগর দুর্গাপুর ৭১৩২০৫
রানার গ্রুপ ১৯৬৯ : ১৪।২৫ আইনস্টাইন এভিন্যু দুর্গাপুর ৭১৩২০৫
রূপনারায়ণ রিক্রিয়েশান সেন্টার ১৯ : পো. হিন্দুস্থান কেবল্‌স রূপনারায়ণপুর
প্রগতি ১৯৬৯ : ২।২০৩ ফার্টিলাইজার টাউনশিপ দুর্গাপুর ৭১৩২১২
প্রগতি সংস্থা ১৯ : অবধায়ক নন্দ চৌধুরী আপার কুলটি ইমলিতলা পো কুলটি
প্রান্তিক ১৯ : কোয়ার্টার ২।এ রাস্তা ২৬ পো চিত্তরঞ্জন
মিতালী গোষ্ঠী ১৯ : রানীতলা পো কুলটি ৭১৩৩৪৩
বর্ধমান সংস্কৃতি পরিষদ্ ১৯৫৪ : ১ মহতাব রোড বর্ধমান ২
বর্ধমান নটরাজ ইউনিট ১৯৬৯ : অবধায়ক অজিত ঘোষ শ্যামলাল রোড বর্ধমান
তরঙ্গ ১৯ : বি ২-৩ ৬।৪ বিশ্বকর্মা নগর দুর্গাপুর ৭১৩২০২
জয়শ্রী সংঘ ১৯ : কাটোয়া স্টেশান বাজার পো কাটোয়া
শিল্পায়ন ১৯৬৭ : ৫।২৭ আইন স্টাইন এভিনিউ দুর্গাপুর ৭১৩২০৫
শৌভিক ১৯ : ২২।২৪ চণ্ডীদাস এভিনিউ দুর্গাপুর ৭১৩২০৫
সৃজনী ১৯ : ১৭।১৭ গুরু নানক রোড দুর্গাপুর ৭১৩২০৪
সেভেন স্টার কালচারাল ইউনিট ১৯ : ২ শ্যামবাজার বর্ধমান ৪
দি লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ ১৯ : শৈলেন্দ্রনাথ দে জগদানন্দপুর পো দাঁইহাট
লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ ১৯ : পথ ৮২, ঘর ১৪এ চিত্তরঞ্জন ৭১৩৩৩১
মুখোশ লিট্‌ল কালচারাল ইউনিট ১৯ : রাস্তা ২২ বাড়ি ৩ বি চিত্তরঞ্জন
আর আর সি ১৯ : পো হিন্দুস্থান কেবল্‌স রূপনারায়ণপুর বর্ধমান

বাঁকুড়া

অপরূপ নাট্যসংস্থা ১৯ : ৩২৩ রবীন্দ্র সরণী বাঁকুড়া

ঐকতান ১৯৭৩ : রামপুর পাঠকপাড়া মোড় বাঁকুড়া

বীরভূম

অভিযান নাট্যসংস্থা ১৯ : অবধায়ক সুবিনয় দাস রবীন্দ্রসদন সিউড়ী ফোন ৯১

আনন ১৯ : পো সিউড়ী বীরভূম

পুরুলিয়া

ঋত্বিক ১৯ : সাস্তালডি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পো সাস্তালডি

উদয়ন নাট্যসংস্থা ১৯ : বরাকর রোড পুরুলিয়া ৭২৩১০১

বিভা ১৯ : অবধায়ক অনুপ কর ভাগাবাঁধপাড়া পো পুরুলিয়া

হুড়া তরুণ সংঘ ১৯ : পো হুড়া পুরুলিয়া

নদীয়া

আগ্রনজন গোষ্ঠি ১৯ : বেথুয়াডহরী পো বেথুয়াডহরী

কল্যাণী কোরাস ১৯৭৩ : বি ৮।১৩২ কল্যাণী ৭৪১২৩৫

নাট্যচক্র ১৯ : ৯ বি কে চাটার্জী লেন পো কৃষ্ণনগর

ড্রামাটিক ক্লাব ১৯ : পায়রাডাঙ্গা প্রীতিনগর

পদাতিক ১৯ : ২৭ এন এস রোড শান্তিপুর পো শান্তিপুর

রঙ্গাজীব ১৯ : নেতাজী সুভাষ স্যানাটোরিয়াম কল্যাণী ৭৪১২৩৫

নেপথ্যে ১৯৭৪ : বি ১২।১৮৮ কল্যাণী ৭৪১২৩৫

লোক-গীতি-নাট্যম ১৯ : ৭১ কে বি পি স্ট্রীট পো শান্তিপুর

হ-য-ব-র-ল ১৯ : চাকদহ থানা পো চাকদহ

তিতাস ১৯৭৭ : রঞ্জনপল্লী পো চাকদহ

গণনাট্য সংঘ :

মঞ্চনাট্যম শাখা ১৯ : রানাঘাট পো রানাঘাট

রূপক ১৯৭২ : পি ১২।২ সেন্ট্রাল এভিনিউ ইস্ট কল্যাণী ৭৪১২৩৫

কুচবিহার

ইউনাইটেড ক্লাব ১৯ : পো হলদিবাড়ি কুচবিহার

ইন্দ্রায়ুধ ১৯ : পো কুচবিহার

চেনামুখ ১৯ : পো হলদিবাড়ি কুচবিহার

'থিয়েটার সেন্টার ১৯ : পো হলদিবাড়ি

নক্ষত্র নাট্যগোষ্ঠী ১৯ : অবধায়ক আশুতোষ দত্ত রাজারহাট কুচবিহার

প্রগতি নাট্যসংস্থা ১৯ : পো দিনহাটা কুচবিহার ৭৩৬১৩৬

প্রগতি যুব নাট্যসংস্থা ১৯ : পো হলদিবাড়ি কুচবিহার

হলদিবাড়ি থিয়েটার সেন্টার ১৯ : পো হলদিবাড়ি কুচবিহার

পশ্চিম দিনাজপুর

ত্রিতীর্থ ১৯৬৮ : গোবিন্দ অঙ্গন পো বালুরঘাট
বিবেকানন্দ নাট্যচক্র ১৯ : সুদর্শনপুর পো রায়গঞ্জ
রূপন ১৯ : পো মোহন বাটি রায়গঞ্জ
সংকেত নাট্যগোষ্ঠী ১৯ : বুনিয়াদপুর রায়গঞ্জ
ছন্দম্ ১৯ : রায়গঞ্জ
যাযাবর ১৯ : ইটাহার
শিল্পীচক্র ১৯ : উকিল পাড়া রায়গঞ্জ

মুর্শিদাবাদ

ছান্দিক ১৯৬৭ : ১২ প্রাণচাঁদ নন্দী লেন বহরমপুর ৭৪২১০১
প্রান্তিক ১৯ : ২৪ কৃষ্ণনাথ রোড বহরমপুর ৭৪২১০১
যুগাগ্নি ১৯ : চূড়ামন চৌধুরী লেন খাটিকতলা বহরমপুর ৭৪২১০১

দার্জিলিং

কণিক ১৯৬৯ : প্রফুল্ল চাকী সরণী দেশবন্ধু পাড়া শিলিগুড়ি ৭৩৪৪০১
কল্লোল-শিলিগুড়ি ১৯ : শিলিগুড়ি পো শিলিগুড়ি
কোরাস ১৯ : শিলিগুড়ি ৭৩৪৪০১
দামামা ১৯ : ১৫৪ শক্তিগড় পো শিলিগুড়ি
মিত্র সম্মিলিনী ১৯০৯ : পো শিলিগুড়ি
সুব্রতী সংঘ ১৯৭২ : গ্রাম নকশালবাড়ি পো নকশালবাড়ি

জলপাইগুড়ি

বান্ধব নাট্যসমাজ ১৯২৪ : জলপাইগুড়ি

মালদহ

মালদা ড্রামা লীগ ১৯৬৯ : পুড়াটুলি মালদহ ৭৩২১০১
মালদহ ড্রামাটিক ক্লাব ১৯০১ : বাঁধ রোড মালদহ ৭৩২১০৮

মেদিনীপুর

তিয়াস ১৯৮৫ : ঘাটেশ্বর পো ঘাটেশ্বর মেদিনীপুর
সুভাষ সংঘ ১৯ : পুরাতন বাজার খড়্গপুর
উদয়ন ১৯৮০ : নন্দীগ্রাম পো নন্দীগ্রাম
একাঙ্ক নাটক সমিতি ১৯৫৮ : অবধায়ক দিলীপ জানা পো কোলাঘাট
বন্ধুমহল ১৯ : ৩৮০ সি।১ ডেভেলপমেন্ট পো সেট্‌লমেন্ট খড়্গপুর
উদয় সংঘ ১৯৬৯ : ডেভেলপমেন্ট সেট্‌লমেন্ট পো খড়্গপুর

আসাম

এপোলো ক্লাব ১৯ : উমা জুয়েলারী স্টোর্স জে বি রোড পো জোড়হাট

আমরা কজন ১৯ : অবধায়ক সত্যেন্দ ভট্টাচার্য বাঁশবাড়ি পো রাজাবাড়ি জোড়হাট ৭৮৫০১৪
ঋত্বিক ১৯ : পান্নালাল ভট্টাচার্য রেল কলোনী পো করিমগঞ্জ কাছাড়
সপ্তরথী ১৯ : ১৮বি কোয়ার্টার বড়বাড়ি রেল কলোনী পো ডিব্রুগড় ৭৮৬০০১
পূবালী ১৯৭২ : ঘোষ ব্রাদার্স সেন্ট্রাল রোড শিলচর জেলা কাছাড় ৭৮৮০০১
যাযাবর ১৯ : ইউ বি আই ডিগবয় শাখা পো ডিগবয়
ভাবীকাল ১৯ : পোস্টাল সুপারিনটেনডেন্ট অফিস ডিব্রুগড় ৭৮৬০০১
করিমগঞ্জ নাট্যগোষ্ঠী ১৯ : স্টেশন রোড পো করিমগঞ্জ কাছাড়

মণিপুর

কোরাস রিপার্টরী থিয়েটার ১৯ : ইম্ফল মণিপুর

ত্রিপুরা

অনামী ১৯ : জয়নগর পোঃ আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা।
ঋত্বিক ১৯ : আগরতলা ত্রিপুরা

মহারাষ্ট্র

অঙ্কুর ১৯ : জি ৩৬ অর্ডন্যান্স এস্টেট অম্বরনাথ জেলা থানা ৪২১৫০২
বর্ণক ১৯ : ২।৮।১৮৪ এফ সি আই কলোনী চেম্বুর বোম্বাই ৪০০০৭৪
ব্লু-স্টার ১৯ : এইচ ১৬।৩ পো অম্বরনাথ এস্টেট অম্বরনাথ ৪২১৫০২
শিশির নাট্য পরিষদ ১৯৭১ : সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় বালগন্ধর্ব নাট্যমন্দির বান্দ্রা বম্বে

উড়িষ্যা

বেঙ্গলী ক্লাব ১৯ : খুরদা রোড পো জটনী জেলা পুরী
রেনেশাঁ গ্রুপ ১৯ : টাইপ ২।.৮৭ এ জি কলোনী ইউনিট-৪ ভুবনেশ্বর ৭৫১০০১
বি এ সি ইউ ১৯ : বানভাসুনভা উড়িষ্যা

বিহার

অসকা ১৯ : পো চন্দ্রপুরা ডি ভি সি বিহার
চৈতালী ১৯৭০ : বোকারো থার্মাল পাওয়ার স্টেশন পো বোকারো জেলা গিরিডি
পথিক সাংস্কৃতিক চক্র ১৯ : রাধাগোবিন্দ ঘোষ কুমারধুবী ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস, কুমারধুবী ধানবাদ
মঞ্চসেবী ১৯ : ডি ভি সি পো চন্দ্রপুরা জেলা গিরিডি
রঙ্গমঞ্চ ১৯ : পো চন্দ্রপুরা জেলা গিরিডি
চতুরঙ্গ ১৯ : অবধায়ক সোমেন বড়ুয়া ২২৬ কো-অপারেটিভ কলোনী বোকারো স্টীল সিটি বোকারো
নক্ষত্র ১৯ : নবেন্দু সেন বোকারো স্টীল সিটি বোকারো
স্বপন ১৯ : অবধায়ক সুশোভন সেন বোকারো স্টীল সিটি বোকারো
বৈশাখী ১৯ : পো চন্দ্রপুরা ডি ভি সি জেলা গিরিডি

বিদ্রোহী ড্রামাটিক সোসাইটি ১৯ : অভয় কুটির ভাডি গর্দানীবাগ পাটনা৮০০০০১

উত্তর প্রদেশ

অনামিকা সঙ্গীত গোষ্ঠী ১৯ : অবধায়ক ডঃ এস কে বসু ২১ মডেল হাউস লক্ষ্ণৌ
বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক সমিতি ১৯ : ২০ শিবাজী মার্গ লখনৌ ২২৬০০১
বারোভূত ১৯ : ১২১।৬০৯ শাস্ত্রীনগর পাণ্ডুনগর কানপুর ৫
তরুণ সংঘ ১৯ : অবধায়ক সুধীর ভট্টাচার্য ২৬।৭৩ করাচি খানা কানপুর ২০৮০০১
ছায়ানট ১৯ : ৪৯৬ কর্ণেল গঞ্জ এলাহাবাদ ২১১০০২
কালচক্র ১৯ : ডি ২৩১ সর্বোদয় এনক্লেভ নয়াদিল্লী ১১০০১৭
শিল্পী সংঘ ১৯ : অবধায়ক সুনীলকুমার দেব আর্মাপুর এস্টেট কানপুর
শনিচক্র ১৯ : ৭এ।৬২ ডবলু ই এ কারোলবাগ নয়াদিল্লী ৫
লুকার গঞ্জ ক্লাব ১৯ : ৫২ লুকারগঞ্জ এলাহাবাদ ২১২০০১

মধ্যপ্রদেশ

অনীক ১৯ : পোঃ বৈকা বাগিচা জব্বলপুর মধ্যপ্রদেশ
বাঙালী সমিতি ১৯৬৬ : বিলাসপুর (আর. এস.) মধ্যপ্রদেশ
বুদবুদ নাট্যসংস্থা ১৯ : ভিলাই মধ্যপ্রদেশ
শিল্পবোধ ১৯ : নাগপুর মধ্যপ্রদেশ
প্রসূজ ১৯ : সি ৯২০ কুর্লা ক্যাম্প উলহাস নগর ৪২১০০৫

বাংলা দেশ

প্রবাহ নাট্যগোষ্ঠী ১৯ : মাল পাড়া মুন্সীগঞ্জ ঢাকা
রূপম সংসদ ১৯ : কুড়িগ্রাম রংপুর
বৈশাখী নাট্যগোষ্ঠী ১৯৭৩ : কাষ্ঠঘর সিলেট
লোকালয় ১৯ : ৮৮ আবদুস সাত্তার রোড চট্টগ্রাম
দিনাজপুর নাট্য সমিতি ১৯ : স্টেশান রোড দিনাজপুর
ফ্রেণ্ডস্ ক্লাব ১৯ : চৌমুহানী নোয়াখালি
বহুবচন ১৯ : ১১।২ জয়নাগ রোড বক্সীবাজার ঢাকা-১
মরুপরাগ ১৯৭২ : ব্যাংক রোড পাবনা
প্রতিধ্বনী ১৯ : ১৩৬ শাঁখারী বাজার ঢাকা-১
রূপান্তর ১৯ : শান্তিধাম খুলনা
রাজসাহী সাংস্কৃতিক সংঘ ১৯৬৫ : ঘোড়ামারা রাজসাহী
বগুড়া নাট্যগোষ্ঠী ১৯ : মনোরা বোর্ডিং উত্তরা হাউস কবি নজরুল ইসলাম সড়ক বগুড়া
নাগরিক নাট্যগোষ্ঠী ১৯ : গুপ্তপাড়া রংপুর
বিংশতি নাট্যসংস্থা ১৯ : ৩০৩ গুলবাগ ঢাকা ১৭
যান্ত্রিক নাট্যগোষ্ঠী ১৯ : কুমিল্লা বাংলাদেশ
গণায়ন নাট্যসম্প্রদায় ১৯ : ৩৭ হাজারী লেন চট্টগ্রাম
শিখা সংসদ ১৯ : টাউন হল ভবন রংপুর

প্রাসঙ্গিকী

অভাবিত প্রাকৃতিক দুর্যোগে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ আজ যে ভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছে, তাকে মোকাবিলা করার মানসিকতা নিয়ে হয়তো আমাদের এই পত্রিকার প্রকাশ আজ স্থগিত রাখা উচিত ছিল। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়, কারণ তাতে কতকগুলি বাস্তব অসুবিধা দেখা দেবে। যাই হোক এই দুর্যোগের জন্যই আমাদের এই থিয়েটারগত বেঁচে থাকার ব্যাপারটাকে খানিকটা কেটে ছেঁটে ছোট করতে হলো। পরিকল্পনা মতো যে সমস্ত লেখা হাতে পেয়েও ছাপা গেল না, সেগুলি হলো মনোজ মিত্র দেবাশিস মজুমদার উপেন্দ্র সেনগুপ্ত সমরু দত্তের একাঙ্ক নাটক, গীতা সেনের 'চীনের থিয়েটার' সংক্রান্ত লেখা, প্রগতি সংঘ-দুর্গাপুর, এন এল টি জি সিন্দ্রী ও নেতাজী মঞ্চ আয়োজিত প্রতিযোগিতা মঞ্চের নাট্যসমালোচনা, জিওরদানো ব্রুনো-র আলোচনা গ্রুপ থিয়েটার পরিচিতি—অর্থাৎ আরো বহু কিছু।

এতদ্‌সত্ত্বেও 'গ্রুপ থিয়েটার' পত্রিকার এই দ্বিতীয় সংখ্যা শারদীয়া সংখ্যা রূপে যে কলেবর নিয়ে প্রকাশিত হলো তাকে রূপ দেওয়ার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন শ্রীদামোদর প্রেসের কর্মীগণ। তাঁদের অধিকাংশেরই ঘরবাড়ি মেদিনীপুরের বন্যায় বিধ্বস্ত হয়েছে—এ খবর জেনেও তাঁরা তাঁদের দায়িত্বচ্যুত হন নি—এ সব ঘটনা আমাদের কাছে অভিজ্ঞতা। এর সঙ্গে বুক্‌স এণ্ড প্রিণ্ট এবং প্রিণ্ট এণ্ড ব্লক কনসার্ন—এই দুই প্রেসের কর্মীবৃন্দকেও তাঁদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই আমাদের পত্রিকার প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সেই নাট্যামোদী ২৪১ জন গ্রাহককে, যাঁরা বাৎসরিক ১৫ বা ৩· টাকা দিয়ে ইতিমধ্যেই গ্রাহক হয়ে আমাদেরকে দায়বদ্ধ করেছেন। আমাদের লক্ষ্য ১ হাজার গ্রাহক। আশা করি—পশ্চিমবঙ্গ দুর্যোগমুক্ত হবার পরে-ই বাকি ১৫০০ জন পাঠকের মধ্যে ৭৫০ জন গ্রাহক পেয়ে যাবো। এ ছাড়া আমাদের বিজ্ঞাপনদাতাদেরও সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আর সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই গ্রুপ থিয়েটারের সেই সব শিল্পীবন্ধুদের যাঁরা ইতিমধ্যেই বন্যাদুর্গত জনগণের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, তাদের সাহায্যের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করছেন। আমাদের পত্রিকারও দুইজন কর্মীবন্ধু এই ত্রাণকার্যে কাঠবিড়ালীর ভূমিকা নিয়েছেন—এই দুঃসময়ে এই আমাদের সান্ত্বনা।

রমন মহেশ্বরী

সংযুক্ত সম্পাদক

রমন মহেশ্বরী কর্তৃক ১৮ এর পার্ক স্ট্রীট কলকাতা ১৬ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক শ্রীদামোদর প্রেস ৫২ এ কৈলাস বসু স্ট্রীট কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

নিয়মাবলী

পত্রিকা সম্পর্কে

গ্রুপ থিয়েটার—জনগণের সংগ্রামী নাট্যচেতনার ত্রিমাসিক। প্রকাশকাল: জুলাই, অক্টোবর, জানুয়ারি ও এপ্রিল। প্রতি সংখ্যার মূল্য চার টাকা। শারদীয়া সংখ্যার (অগাস্ট-অক্টোবর) মূল্য আট টাকা।

লেখক সম্পর্কে

সংগ্রামী নাট্যচেতনায় আস্থাবান যে কোন লেখকের রচনাই সাদরে গৃহীত হবে। লেখা পাঠানোর সময় অনুলিপি রেখে পাঠাবেন। পাণ্ডুলিপি ফুলস্কেপ সাইজের কাগজের এক দিকে লিখবেন। নাট্যকারেরা নাটকের পাণ্ডুলিপিতে অ্যাকশন বর্ণনার অংশটুকু লাল কালিতে চিহ্নিত করে দেবেন। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০টি শব্দে পংক্তি ধরে ৩০ পংক্তির বেশি রাখবেন না।

গ্রুপ থিয়েটার সম্পর্কে

গ্রুপ থিয়েটারের সম্পর্কে বিবরণ পাঠাতে গিয়েও সংস্থার প্রতিনিধিগণ যেন এই নির্দেশ অনুসরণ করেন। আগামী শারদীয়া সংখ্যা এবং যে কোনও সংখ্যার জন্যই গ্রুপ থিয়েটারের বিজ্ঞাপনের হার সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ৩৫ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ২৫ টাকা। বিশেষ স্থানের জন্য বিশেষ মূল্য। পত্রিকার কপি বিনা-মূল্যে পাবেন।

গ্রাহক সম্পর্কে

বৎসরে বিশেষ শারদীয়া সংখ্যা নিয়ে যেখানে মোট ৪টি সংখ্যার দাম পড়ে ২০ টাকা, সেখানে পত্রিকার বাৎসরিক গ্রাহকমূল্য ১৫ টাকা। পত্রিকা অবশ্য হাতে হাতে ডেলিভারী দেওয়া হবে; সুবিধা মত আমাদের দপ্তর থেকে পত্রিকা সরাসরি নেওয়া যাবে বা পিওন মারফৎ গ্রাহকের বাড়ি পৌছে দেওয়া হবে। সুতরাং সবদিক বিবেচনা করে গ্রাহক হওয়াই লাভজনক। আর ডাকে নিতে গেলে রেজেষ্ট্রি ডাকে পড়বে ৩০ টাকা। সাধারণ ডাকে পত্রিকা খোয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বলে প্রবাসী গ্রাহকদের পত্রিকা পাওয়ার নিশ্চিতির জন্য রেজেষ্ট্রি ডাকে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

এজেন্সী সম্পর্কে

মফঃস্বল এজেন্টদের শতকরা ২৫% কমিশন। ১০ টাকা জমা রাখতে হয়। ৫ কপির কম এজেন্সী দেওয়া হয় না। ক) ৫ কপি নিলে ডাকব্যয় (ভি. পি. খরচ) এজেন্টদের। খ) ৫ থেকে ১০ কপি নিলে ভি. পি. খরচ অর্ধেক আমাদের। গ) ১০ কপির ঊর্ধে নিলে ডাক খরচ সম্পূর্ণ আমাদের।

কলকাতা ও শহরতলী এলাকার নির্দিষ্ট এজেন্ট:

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী | বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৯

পাতিরাম বুক স্টল কলেজ স্ট্রীট মোড়, কলকাতা-৯

নিচের ঠিকানায় বাণিজ্যিক যোগাযোগ করুন:

গ্রুপ থিয়েটার | ৬৮ এম পার্ক স্ট্রীট। কলকাতা-১৬ | ৪৪-৬০৫৭

এন. এল. টি. জি. (সিন্দ্রী)

—আয়োজিত—

৺ভবেশ স্মৃতি একাংক নাটক প্রতিযোগিতার ফলাফল

সেপ্টেম্বর, ১৯০৮

যুগ্ম শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা
[ভবেশ স্মৃতি চ্যালেঞ্জ শীল্ড ও নগদ]
(ক) সংস্থা : অযান্ত্রিক, চিত্তরঞ্জন।
নাটক : কুম্ভকর্ণের ঘুম।
(খ) সংস্থা : প্রান্তিক, বহরমপুর।
নাটক : নানা হে।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা
[লোকনাথ দাস স্মৃতি পুরস্কার]
অসীম চক্রবর্তী।
সংস্থা : অপরূপ, (নর্থ), কলিকাতা।
নাটক : খামারের গপ্পো।

শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী
[দুর্গাসুন্দরী স্মৃতি পুরস্কার]
গীতা চক্রবর্তী।
সংস্থা : অযান্ত্রিক, চিত্তরঞ্জন
নাটক : কুম্ভকর্ণের ঘুম।

শ্রেষ্ঠ পরিচালক
[শচীনন্দন মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার]
অনুপম বিশ্বাস।
সংস্থা : প্রান্তিক, বহরমপুর।
নাটক : নানা হে।

শ্রেষ্ঠ আলোকশিল্পী
হরিগোপাল দাস এবং বিমল দাস।
সংস্থা : প্রতিবিম্ব, দমদম।
নাটক : ডেড লাইন।

শিশু শিল্পী
ফাল্গুনী সাহা।
সংস্থা : এন. জি. সি. ক্লাব, দেওঘর।
নাটক : মহেশ।

গুণ স্বীকৃতি পত্র :
প্রযোজনায় (ক) আমরা কজন, কলিকাতা।
নাটক : আর এ কাব্য নয়।
(খ) কালপুরুষ (নর্থ), হাওড়া।
নাটক : বিবর্ণ বিস্ময়।

যুগ্ম দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা :
[সরলাবালা দেবী চ্যালেঞ্জ শীল্ড ও নগদ]
(ক) সংস্থা : প্রতিবিম্ব, দমদম।
নাটক : ডেড লাইন।
(খ) সংস্থা : কল্লোল, চুঁচুড়া।
নাটক : বিদ্রোহের থিয়েটার।

দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা
মনোরঞ্জন ঘড়া।
সংস্থা : ব্যঞ্জনা, কলিকাতা।
নাটক : পথ বেঁধে দিল।

শ্রেষ্ঠ সহঃ অভিনেতা
[ভবদেব মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার]
অনিল ভট্টাচার্য।
সংস্থা : কালপুরুষ, (নর্থ) হাওড়া।
নাটক : বিবর্ণ বিস্ময়।

শ্রেষ্ঠ নাট্যকার
নিবেদন লাহিড়ী।
সংস্থা : প্রান্তিক, বহরমপুর।
নাটক : নানা হে।

শ্রেষ্ঠ মঞ্চশিল্পী
[জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার]
(ক) প্রদীপ চ্যাটার্জী।
সংস্থা : ব্যঞ্জনা, কলিকাতা।
নাটক : পথ বেঁধে দিল।
(খ) রঞ্জনা মল্লিক।
সংস্থা : ব্যঞ্জনা, কলিকাতা।
নাটক : পথ বেঁধে দিল।

অভিনয়গুণ :
(ক) বাসু মজুমদার, বহুরূপ, ধানবাদ
নাটক : স্পার্টাকুস।
(খ) প্রদীপ ভট্টাচার্য, প্রান্তিক, বহরমপুর।
নাটক : নানা হে।
(গ) সুনীল ভট্টাচার্য, অযান্ত্রিক, চিত্তরঞ্জন।
নাটক : কুম্ভকর্ণের ঘুম।
(ঘ) শুক্লা ঘোষ রায়, রূপম, ধানবাদ।
নাটক : আবু পাংচার।
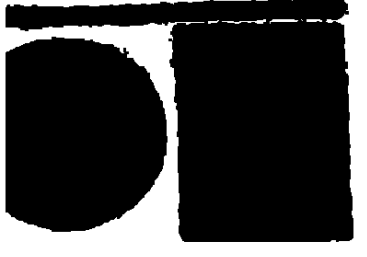
১. ১. ৭৭ তারিখে নান্দীমুখ নাট্যসংস্থার জন্ম।

১. ১. ৭৮ তারিখে এর একবছর বয়েস পূর্ণ হোলো।

গত একবছরে আমরা অভিনয় করেছি মোট ৮৬ বার॥ পূর্ণাঙ্গ নাটক করেছি তিনটি: শের আফগান সওদাগরের নৌকা এবং পাপপুণ্য। একাঙ্ক নাটক দু-টি: নানারঙের দিন এবং তামাকু সেবনের অপকারিতা॥

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় রাধারমণ তপাদার বীণা মুখোপাধ্যায় রঞ্জিত চক্রবর্তী সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় সুধাংশু সাহা দীপক দেব গীতা দাশ শ্যামল পোদ্দার সুনীল চট্টোপাধ্যায় অসিত কুণ্ডু প্রাণতোষ দত্ত নারায়ণ মুখোপাধ্যায় সন্ধ্যা দে অশোক চট্টোপাধ্যায় সুমিতা মালাকার শ্যামলী ঘোষ অনিমেষ মজুমদার শান্তিপ্রিয় দেব সরকার স্বপন বসাক জয়া চক্রবর্তী গৌতম সরকার অর্চনা সেন দীপা সরকার অতীক চট্টোপাধ্যায় প্রদীপ মৌলিক সুব্রত সেন স্বপন ভট্টাচার্য শিপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় সুধীর সেনগুপ্ত গৌতম গঙ্গোপাধ্যায়

নির্দেশক:

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

নান্দীমুখ॥ পি ৮৩ এ, সি. আই. টি. রোড। কলকাতা ৭০০০১০

দরিদ্র গ্রামীণ শিল্পীর সহায়তা

এবং

গ্রামীণ শিল্পের সামগ্রিক উন্নতির জন্য

খাদি ও গ্রামোদ্যোগজাত শিল্পবস্তু ক্রয় করুন

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

"আমাদের গ্রামীণ হস্ত ও কুটির শিল্পসম্ভারের মান, শিল্পীদের সৃজনশীল প্রতিভা এবং প্রচেষ্টায় যথেষ্ট উন্নত ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। দামের দিক থেকেও এগুলি সব শ্রেণীর ক্রেতার পক্ষে তুলনামূলকভাবে সুবিধা-জনক। এই সব গ্রামীণ শিল্পীদের আরও বেশী উন্নত করে তুলবার জন্য সকলের কাছ থেকে আনুকূল্য ও সক্রিয় উৎসাহ প্রয়োজন। সরকার গ্রামীণ শিল্প ও গ্রামের শিল্পীদের সহায়তায় নতুন উদ্যোগ নিয়েছেন।

বিভিন্ন উৎসবের সময় এবং নিজেদের প্রয়োজনে মানুষ যখন নানা রকম দ্রব্যসামগ্রী কিনছেন সেই সময় গ্রামের শিল্পীদের কথা মনে রেখে খাদি ও গ্রামোদ্যোগজাত শিল্পবস্তু ক্রয় করলে হাজার হাজার দরিদ্র গ্রামীণ শিল্পীকে সহায়তা করা হবে,তাদের কাজে উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে এবং তার ফলে গ্রামীণ শিল্প সামগ্রিকভাবে আরও উন্নত হবে।"

জ্যোতি বসু

মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

পুজোয় চাই
নতুন জুতো
খোকার জুতো খুকুর জুতো
বাবার জুতো মায়ের জুতো
সবার জন্যে বাটার জুতো
সাইজ ৫-৮
টা ১৭.৯০
Bata
সাইজ ৩-৭
টা ২১.৯৫
সাইজ ৩-৭
টা ৩২.৯৫
সাইজ ৫-১০
৬৮.৯০